# পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

# পূর্ব বঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

: পরিবেশনা :

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলিকাতা ৭০০০৭৩

PURBA BANGER KABIAL KABI-SANGEET
(Life-sketch of Folk-poets of East Bengal and their Songs) by
Dr. Dinesh Chandra Sinha
Calcutta University

প্রথম প্রকাশ ঃ রথযাত্রা, ১৩৪৭

প্রকাশক ঃ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সিংহ
পোঃ+গ্রাম ঃ দৌলতপুর, ফুলবাগান
২৪ পরগণা ( দক্ষিণ )

"পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।"

মুদ্রাকর ঃ শ্রীনির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

## উৎসর্গ

জীবন-প্রভাতে হারানো
পিতৃদেব ৺ললিতমোহন সিংহ,
পিতার অবর্তমানে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ দাঙ্গাহাঙ্গামা
দেশভাগ দেশত্যাগের তরঙ্গসঙ্কুল
দিনে যিনি আমাদের কোলে করে কূলে
তুলেছেন, যাঁকে বাড়িতে চিন্তাক্লিষ্ট
রেখে অচেনা অজানা জায়গায় গান ও তথ্য
সংগ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছি, যিনি দেশী
গান-বাজনা বড় ভালবাসতেন, আমার সেই
পরম স্নেহমমতাময়ী সম্প্রতি হারানো
মাতৃদেবী ৺সৌদামিনী সিংহ
এবং
কবিগানের লীলাক্ষেত্র হারানো
মাতৃভূমি পূর্ব-বঙ্গের শতস্মৃতি বিজড়িত
মাটি ও মানুষের অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

# EAST BENGAL BINAPANI KABI PARTY

PRO : KABI NAKULESWAR SARKAR

*P.O. & St. Chakdaha.*
KHOSHBASH MAHALLA
AJGUBITALA KABI KUTIR
DIST. NADIA.

*Branch*
2, DURGACHARAN MITRA STREET
CALCUTTA-6

পূর্ববঙ্গ কবির রাজ্য তার ভিতরে জনপূজ্য
ঢাকার সেই হরি আচার্য সকলের প্রধান।
অসংখ্য তাঁর শিষ্যছাত্র সকলে হয়ে একত্র
বাংলাদেশে কবির ক্ষেত্র করলেন নিরমাণ॥
গোটা বাংলাদেশটা জুড়ে ঢোল কাঁসী আর সানাইর সুরে
কবির কণ্ঠে ঝরে পড়ে মধুর সুরের রেশ।
বঙ্গ বিভাগ হওয়ার ফলে সকল গেল রসাতলে
যবনিকার অন্তরালে ডুবে গেল দেশ॥
বাংলা পড়ল পাকিস্তানে রাষ্ট্র পেল মুসলমানে
দেশবরেণ্য কবিগানে ভাটা পড়ে যায়।
পড়ে পাকিস্তানের হাতে দেশবিভাগের সাথে সাথে
সেই কবিগান বাংলা হতে অবলুপ্তপ্রায়॥
স্বনামধন্য কবি যত কেউ জীবিত কেউ বা মৃত
সবাই হয়ে বাস্তুচ্যুত করে পলায়ন।
প্রাণ বাঁচাবার অভিলাষে পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসে
ঘৃণ্য যাযাবরের বেশে করেন কালযাপন॥
এসেছি এই তরজার দেশে তরজা তারা ভালবাসে
কবিদের এই কাব্যরসে তুষ্ট হয় না মন।
বাংলার কবির রসতত্ত্ব বুঝতে তারা অসমর্থ
তরজা গানে হয়ে মত্ত থাকে সেই কারণ॥
তারা বলে কবির খনি লম্বোদর আর শেখ গুমানী
ফিরিঙ্গী কবি এন্টনি ভোলা ময়রার নাম।
শালগ্রামের মাথার পরে সুঁচ ঘষে সব চর্মকারে
তারা কি বুঝিতে পারে শালগ্রামের দাম॥
বাস্তুত্যাগের সাথে সাথে বাংলার কবি বাংলা হতে
চির অবলুপ্তির পথে যেতেছে যখন।
দীনেশচন্দ্র সিংহ যিনি বাংলা দেশের ছেলে তিনি
গুপ্ত কবির লুপ্ত খনি করতে উদ্ঘাটন॥

কর্মে যজ্ঞে নিলেন দীক্ষা    অসীম তাহার ত্যাগ তিতিক্ষা
বাংলার কবির স্মৃতিরক্ষা    করিবার কারণ।
ত্যাগ করিয়ে আত্মস্বার্থ    ব্যয় করিয়ে নিজের অর্থ
বাংলাদেশের কবিতীর্থ    করেন পর্যটন ॥
গোটা বাংলা ঘুরে ঘুরে    সকল কবির ঘরে ঘরে
সব তথ্য সংগ্রহ করে    করিতে প্রকাশ।
জীবনান্ত পরিশ্রমে    প্রকাশ করলেন ক্রমে ক্রমে
কবিয়াল কবিগান নামে    কবির ইতিহাস ॥
মাইকেল নজরুল বঙ্কিম রবি    যার যত কবিত্বের ছবি
মুদ্রণযন্ত্রের কাছে সবই    বাঁধা চিরদিন।
যে যা লিখুক জনম ভরে    বন্ধ খাতায় থাকতো পড়ে
না উঠলে ছাপার অক্ষরে    সবই মূল্যহীন ॥
বাংলার কবি এত দিনে    উঠে নাই ছাপা মেসিনে
তাই তাদেরে নাহি চিনে    তরজা শ্রেষ্ঠ কয়।
তরজা কবি দু'টি পক্ষ    আকাশ-পাতাল কি পার্থক্য
গ্রন্থাকারে দিলেন সাক্ষ্য    সিংহ মহাশয় ॥
নিজেদের অজ্ঞতার বশে    আম ভাবিয়ে আমড়া চোষে
ঠাকুর ফেলে কুকুর পোষে    যারা ক'রে ভুল
কবিয়াল কবিগান কিনে    পড়ে দেখবেন জনে জনে
কোনদিনও কাচ-কাঞ্চনে    হয় না সমতুল ॥
স্রষ্টা যাহা সৃষ্টি ক'রে    চলে গেলেন লোকান্তরে
সৃষ্টিকে তার অমর করে    রাখিবার কারণ।
বাংলার কবির আদি অন্ত    এতদিন যারা না জানতো
দীনেশবাবুর ছাপা গ্রন্থ    শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥
বিশ্বের সকল বিদ্যার আলয়    কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অসংখ্য বিদ্বানের মেলায়    যে গ্রন্থের সম্মান।
গবেষণার পরিপাটি    যা দেখে ইউনিভারসিটি
গবেষকেরে পি. এইচ. ডি.    টাইটেল করলেন দান ॥
আমি কবি নকুল দত্ত    বলতে পারি করে সত্য
দীনেশবাবুর এই মহত্ব    থাকবে চিরদিন।
যে কবিদের তথ্য খুলে    গ্রন্থাকারে রাখলেন তুলে
শোধ হবে না কোন কালে    প্রকাশকের ঋণ ॥
আমার আয়ু শেষ হয়েছে    নয় দশক পার হয়ে গেছে
শেষ জীবনে প্রভুর কাছে    প্রার্থনা জানাই।
মানুষ হয়ে জন্ম ধরে    আবার যদি আসি ফিরে
স্নেহাস্পদ দীনেশেরে    সহায় যেন পাই ॥

নকুলেশ্বর সরকার

# সূচীপত্র

## কবি-জীবনী

## কবি-সঙ্গীত

# অবক্ষয় ও অবলুপ্তির পথে পূর্ব বঙ্গের কবিগান

জেলা নোয়াখালী। মহকুমা সদর বা সুধারাম। থানা বেগমগঞ্জ। তারই অধীন বাবুপুর। পাশাপাশি সিন্দুরকাইত, মহেশপুর, রামপুর, অভিরামপুর, জিরতলী, বিজয়নগর, আহ্লাদীনগর, হোসেনপুর, বারুইচতল, কালিকাপুর, বসন্তবাগ প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে বৃহৎ বাবুপুর অঞ্চল। এই এলাকার মাঝামাঝি স্থানে জোড়দীঘির পাড়ে বাবুপুর হাই স্কুল, মহাকালী চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল এবং কালীর হাট নামে গ্রাম্য হাট। শনি মঙ্গলবারে হাট বসে। হাটেই বাবুপুর পোস্ট অফিস।

এই অঞ্চলের উত্তরাংশে কালিকাপুর গ্রামে মোন্দার (মজুমদার) হাটে কালিকাপুর পোস্ট অফিস; পাশেই কালিকাপুর এম· ই· স্কুল। আবার দক্ষিণাঞ্চলে আহ্লাদী-নগর গ্রামেও রায়ের হাট নামে পোস্ট অফিস ও হাট এবং পাশে বাবুপুর-জিরতলী ইউনিয়ন হাই স্কুল।

এই সমস্ত গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বেশ কিছু হিন্দুর বসতি। জীবিকার্জনে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকেও নানাবিধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম আচার অনুষ্ঠানে এদের সমাজ-জীবন আনন্দমুখর। দোল দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয় সমারোহে। কালীপূজায় কবিগানের আসর বসে ঢাক ঢোল বাজিয়ে। রামলীলা কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হয় রঙচঙ মেখে। রথযাত্রা ঝুলনযাত্রা রাসযাত্রার জমজমাট মেলা বসে। বারোয়ারী ময়দানের হরির লুট, নামকীর্তনের মহোৎসব হয় পাড়ায় পাড়ায়। সাপ্তাহিক সান্ধ্য কীর্তন, সত্যনারায়ণ ত্রিনাথের সেবা এবং অন্যান্য তেহার-পর্ব পূজা-আচ্চা তো লেগেই আছে সারা বছর। আছে একাধিক বাউল বৈষ্ণবের আখড়া। সেখানে সকাল সন্ধ্যা চলে গুরুভজন গৌরগীতি। চৈত্র মাসে ঢাকগানের শেষে সিন্দুরকাইত দীঘি ও দমদমা দীঘির পাড়ে কালীতলায় নববর্ষের মেলা বসে প্রতি বৈশাখ মাসে।

এরই পাশাপাশি বিরাট মুসলমান সমাজ। জেলার জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশ। কোরাণ হাদিসের কঠোর অনুশাসনে বদ্ধ; স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অধিষ্ঠান। মসজিদ মাদ্রাসা থেকে মোল্লা মৌলবী নিয়ন্ত্রিত সমাজে রোজা নামাজ ঈদ কোরবানি প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত কোন রকমের গান-বাজনা অভিনয় বা লোকাচার লোকসংস্কৃতির স্থান নেই। তাদের মাঝেই মাত্র পনের শতাংশ হিন্দুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস। সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি সম্প্রদায়। ধর্মাচার ও লোকাচারে পরস্পরের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেও পারস্পারিক আস্থা নির্ভরতা সহনশীলতার উজ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। নিরপেক্ষ ব্রিটিশ শাসনের গুণে সংখ্যাল্প হিন্দুরা নিজস্ব ধর্ম সংস্কার এবং স্ত্রী-কন্যার মান সম্ভ্রম নিয়ে নির্ভয়ে সসম্মানে বসবাস করছে।

উক্ত কালীর হাটের চারপাশ ঘিরে পরপর বেশ কয়েকটি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বাড়ি। প্রতি বাড়িতে আট দশটি পরিবারের বাস। কিন্তু সম্প্রতি সে সব বাড়িঘরের বড়ই দৈন্য দশা। বাসিন্দাদের বেশীর ভাগ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি শূন্য খাঁ খাঁ করছে। ঘরের ধার ( ভিটি ) ভেঙে পড়েছে, দরজা বেড়ায় উই ধরেছে, ইঁদুর গর্ত মুখ দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাটি বের করছে। ঘরের চাল ও সনছা থেকে ঝুল মাকড়সার জাল ঝুলছে। ঘর নিকানো বন্ধ ; নেই সকাল সন্ধ্যা ধূপবাতি গোবর ছড়ার রীতি, উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির রব।

সময়টা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস। বছর দেড়েক হল নোয়াখালীর উপর দিয়ে অমানুষিকতা ও পাশবিকতার প্রচণ্ড ঝড় তুফান বয়ে গেছে। ক্ষমতা ত্যাগের প্রাক্কালে ব্রিটিশ শাসনরজ্জু একটু শিথিল হতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একাংশ রে রে করে বিধর্মী প্রতিবেশীর ধনজন মানসম্ভ্রমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নোয়াখালীর ক্ষুদ্র দেহের বিভিন্ন অংশে তখনো হত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহ নারী নির্যাতনের দগদগে ঘা। কিছুকাল আগে মহাত্মা গান্ধী এসে ঘুরে গেছেন ; অনেক নীতিকথা হিতোপদেশ শুনিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মার বাণী-প্রলেপে সে ঘা শুকায় নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরুপদ্রব জীবন-প্রবাহে রেখে গেছে ভাঙন বিচ্ছেদ ও অবিশ্বাসের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর।

যে দাবী আদায়ের জন্য এমন নারকীয় কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তত দিনে তা পূরণ হয়েছে। সে রক্ত হিম করা ধর্মীয় রণহুঙ্কার থেমে গেছে। যারা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিন্দুমাত্র রক্তদান করে নি, তারা শুধুমাত্র ভিন্নধর্মী নিরপরাধ প্রতিবেশীর রক্ত ঝরিয়ে ছয় মাসের মধ্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলল—ইতিহাসে এ এক নজির-বিহীন ঘটনা। ইতিমধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংস্রতার উগ্রতা ও বিছিন্নতাকামীদের মাত্রাতিরিক্ত তোষণ পোষণের মূল্য স্বরূপ, অহিংসার পূজারী স্বয়ং হিংসার যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। নোয়াখালীর হিন্দুদের তখন—"আছি কি নাই, থেকেও নাই, কেন আছি কেন নাই, কখন আছি কখন নাই, কোথায় আছি কোথায় যাই"—এমনি এক শূন্য মানসিকতা ; যা বোঝা যায়, কিন্তু বোঝান যায় না।

হিংসা ও তাণ্ডবের প্রথম ধাক্কায় যারা মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, তারা পেছন ফিরে তাকাবার, চোখের জল ফেলার ফুরসৎ পায় নি। আতঙ্কে বিভীষিকায় বীভৎসতায় তাদের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন কিঞ্চিৎ শান্ত অবস্থার মাঝেও ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে পরিবার চোখের জল মুছতে মুছতে অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিচ্ছে। সাতপুরুষের ভিটামাটির সঙ্গে তারা নাড়ীচ্ছেদের মর্মবেদনা অনুভব করছে। হিন্দুদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এ দেশের অন্নজল তাদের ফুরিয়েছে। নতুন রাষ্ট্রে নতুন জমানায় তারা অসহায় অবাঞ্ছিত অরক্ষিত। এমন সাধের স্বাধীনতার স্বাদ রক্তে ও চোখের জলে মাখামাখি হয়ে তাদের কাছে নোনতা বিস্বাদ হয়ে গেল।

গতাবশিষ্ট লোকগুলি বিষণ্ণ মনে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আচমকা ভরপুরন্ত বাড়িঘরের এমন লক্ষ্মীছাড়া দশায় তারাও বলবুদ্ধিহীন দিশেহারা। অতি আপনজনদের এমন নিঃসম্বল নিরুদ্দেশ যাত্রায় তারা হতাশাজর্জর বিষাদগ্রস্ত। যারা চলে গেছে তারা ভাল করেছে, না যারা পিছুটানে রয়ে গেল তাদের ভবিষ্যতে কাঁদতে হবে—মনে মনে সব সময় এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের টানাপোড়েন। দু'চারজন হিন্দু একত্র হলেই একমাত্র আলোচ্য বিষয়—কে কোথায় গেল, খোঁজ খবর আছে না কি, আরো কেউ যাচ্ছে না কি? তারপরেই আলোচনার মোড় ঘুরে যায়। একজন বলে —আমরা যে রয়ে গেলাম ভাল করলাম না মন্দ করলাম বুঝতে পারছি না। বাপ-ঠাকুর্দার ভিটামাটি ছেড়ে, এমন সোনার সংসার ফেলে অনালে অঘাটে যাব কোথায়। দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে তো আর কি করা যাবে। এতদিন ইংরাজ সরকারকে খাজনা ট্যাক্স দিয়েছি; এখন লীগ রাজত্বে মুসলমানকে দেব। নবাবী আমলে কি আমাদের পূর্বপুরুষেরা মুসলমান রাজত্বে বাস করে নি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছে—নবাবী আমলের নমুনা তো স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। আর সে সুখের গল্প করবেন না। রাজত্ব না পেতেই হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছে, এখন রাজত্ব পেয়ে তো হাতে মাথা কাটবে। বিশেষ করে বৌ-ঝিদের নিয়েই তো সমস্যা। রায়টের সময়ের কথা ভুলে গেছেন না কি!

তৃতীয় ব্যক্তি ইতিহাসের নজির টেনে বলছে—পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশেই অন্য ধর্মাচারীদের স্থান হয় নি। তাদের মেরে কেটে মুসলমান করেছে না হয় দেশছাড়া করেছে। পাকিস্তানেও তার অন্যথা হবে না। ধুতি-লুঙ্গি এক সঙ্গে থাকতে তারা দিবে না। হয় ধর্মছাড়া, নইলে দেশছাড়া করবেই।

এই টালমাটাল অবস্থায় কালীরহাটে কালীগাছতলায় কালীপূজার কথা উঠেছে। প্রতিবছর মহাধুমধামের সঙ্গে কালীপূজা কবিগান অনুষ্ঠিত হতো; কিন্তু গত বছর দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুন পূজা হয় নি। এবারেও হিন্দুদের ভগ্ন মানসিকতার মাঝে পূজা হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। হিন্দুপাড়ার মাঝখানে হলে কি হবে, হাটবারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতার বেশীর ভাগই মুসলমান যে। ফলে পূজা উপলক্ষ করে কোন গোলমাল না বাধে। কারো কারো মত এই ৺ মায়ের যখন ইচ্ছা নয় যে আমরা সুখশান্তিতে থাকি, তখন পূজা বন্ধ থাক। কারো কারো ইচ্ছা—কোন মতে নমোনমঃ করে এতদিনের প্রচলিত রীতি রক্ষা করা হোক।

এমন সময় দু'জন ভাল মানুষ এগিয়ে এল—জহিধর আলী ও আফজল মিঞা। প্রথম জনের পেশা চাষবাস এবং টুকটাক ব্যবসা; দ্বিতীয় জন খলিফা। জহিধর সারাদিন হাটেমাঠে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাকালে বাজারে এসে হিন্দু যুবাদের সঙ্গে গল্পগুজব করত। হাটে রামলীলা, কৃষ্ণযাত্রা, ঢপগান হলে শান্তিরক্ষার ভার ছিল তার উপর। আফজল মিঞার দরজী দোকানেই আড্ডা বসত। সে মাইজভাণ্ডারপন্থী। গানবাজনা হারাম মনে করত না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে উভয়েই লজ্জিত।

হিন্দুদের ক্রমাগত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে আন্তরিক দুঃখিত। হাটের সান্ধ্য আড্ডাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এরা আক্ষেপ করে প্রায়ই বলে—এ কি রকমের আজাদী হল? মানুষের ভয়ে মানুষ পালায়! এক জাতের এক ধর্মের লোক নিয়ে কি রাজ্য গড়া যায়! এক রং-এর ফুলে কি বাগানের শোভা হয়! এরা দু'জন ভীত ও হতোদ্যম হিন্দুদের আশ্বাস দিয়ে বলল—আপনারা পূজা করেন, কোন গোলমাল হবে না। আল্লার হুকুম, আমরা আছি।

এদের আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করে হিন্দুরা পূজার আয়োজন করল। দু'টি কবিগানের দল এবং দু'জন 'সরকার'ও (কবিয়াল) বায়না করল। কিন্তু গভীর রাতে পূজা সমাপনান্তে এবার আর কবিগানের ঢোল বেজে উঠল না। আগের মতো বাড়িঘর খালি রেখে কোন হিন্দু গান শুনতে আসার সাহস পেল না।

## ( দুই )

অথচ মাত্র দুই বছর আগে পর্যন্ত রাত তিনটে নাগাদ পূজা শেষ হতেই ঢোলের কুরুতাক্ কুরুতাক্ কু কু ডুডুম্ ডুড়ুম-এর সঙ্গে কাঁসীর ক্যান্ ক্যান্ ক্যান্‌কেনি সহযোগে 'চালি' বাজনা আরম্ভ হতো এবং ক্ষণকালের মধ্যে সদ্য ঘুমভাঙা চোখে শ্রোতারা এসে আসর পূর্ণ করে তুলত। কথায় বলে, পূর্ববঙ্গবাসীরা—

"যদি শোনে কবি'র কথা,
ঠেইল্যা ফেলে গায়ের কাঁথা।"

'চালি' বাজনা শেষ হতেই দোহারগণ 'কেকি সুরে' পৌরুষ কণ্ঠে 'ডাক' গান (গৌরচন্দ্রিকা বা মঙ্গলাচরণ) শুরু করত ঃ

কি দিয়ে পূজিব মা—
ও রাঙা চরণ দু'খানি।
আমার সভক্তি-কুসুম, আসক্তি-কুমকুম,
হারায়ে ফেলেছি জননী॥
সাজায়ে ছিলেম মা বাসনার-নৈবেদ্য,
কুচিন্তা-পিশাচী করেছে অশুদ্ধ,
শ্রীচরণে দিতে ভক্তি-রক্তপদ্ম—
বাধ সাধে মায়া-নাগিনী।
ও রাঙা চরণ দুখানি॥
বিবেক-বৈরাগ্য গঙ্গা বিল্বদল,
দুর্ভাগ্য-ডাকিনী হরেছে সকল,
এখন আছে শুধু নয়নের জল—

স্বগুণে লহ গো ভবানী।
ও রাঙা চরণ দু'খানি ॥
অন্তরা—কি দিয়ে পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
আসন নিয়ম, যোগ প্রাণায়াম,
হারায়েছি সম দম, ষোড়শোপচার ॥
প্রেম-গন্ধ-ধূপ গেল, পাপাগুণে পুড়িয়া,
সুগন্ধ গেল তার, কুবাতাসে উড়িয়া,
প্রবৃত্তি দিয়ে শ্রীমূর্তি গড়িয়া—
মোহমদে মত্ত হয়ে ভেঙেছি আবার ॥
মায়া কুহকিনী সেজে, কি খেলা খেলালে,
জপ তপ আরোপ সকলি ভুলালে,
এ দীন নকুলে অকূলে ভাসালে—
কূলে যেতে দে আমারে, শিখায়ে সাঁতার ॥

[ নকুলেশ্বর সরকার,—বরিশাল ]

'ডাক' গান শেষ হলে হারমোনিয়ামে 'মালসী' গানের সুর তোলা হতো এবং দোহারবৃন্দ সে সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে মালসী গান গাইত—

চিতান—তুমি জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী, জগৎকর্ত্রী পুরাণে প্রচার।
পাড়ন—তারিণী! তুমি দুঃখহারিণী, কালনিবারিণী—
জননী তোর এ কি অবিচার ॥

ফুকার—মা তুই কারো জন্য সুধা রেখে, কারো জন্য রাখলি হলাহল;
কারো শুকনা বৃক্ষে ফল—মা মা গো—
কারো শুকায় পূর্ণ কুম্ভের জল।
কারো ভাগ্যে বালাখানা,
কেউ পায় না ধূলায় বিছানা,
কারো ভাগ্যে মিশ্রীর পানা,
কারো ভাগ্যে জ্বলন্ত অনল ॥
মিল—কারো ঘোষে কু-কলঙ্ক, কারো গুণের কীর্তি,
কেউ করে বেশ্যাবৃত্তি,
কেউ পায় সমাজের পূজা।
মুখ—মা হয়ে মা কারো পক্ষে,
তাকাস মা কৃপা কটাক্ষে,
কারো বক্ষে দুঃখ দাও দক্ষজা:॥

ডাইনা—কেহ থাকে শ্মশানখোলা, কারো বাসা বৃক্ষতলা,
কারো বাড়ি চকমেলা দালান ;
কেহ অনশনে প্রাণে মরে—
কারো ঘরে গোলা ভরা ধান।
কেহ করে জমিদারী, কেহ বা কড়ার ভিখারী,
কেহ দৌড়ায় জুড়ির গাড়ি—
কেহ টানে পাল্কীর বোঝা ॥
খাদ—রঙ্গিনী তোর রঙ্গক্ষেত্রে, রঙ্গ যায় না বোঝা ॥ ইত্যাদি

[ অম্বিকা পাটনী—ঢাকা ]

দুই দলে কবিগান। তার প্রতি পদেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক দলের ডাক-মালসী শেষ হতেই অপর পক্ষের আসরে প্রবেশ। সে দলের দোহারগণও ডাক ও মালসী গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করত। নিশীথের নৈঃশব্দ ভেদ করে গানের সুরলহরী ছড়িয়ে পড়ত দূর দূরান্তরে। তাতে কারো অতি ফিনফিনে ধর্মীয় সূক্ষ্মানুভূতিতে কখনো সুড়সুড়ি লাগে নি বা নিরাকার উপরওয়ালার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে বলেও এতদিন শোনা যায় নি।

যা হোক, উভয় পক্ষের ডাক-মালসী গান শেষ হতে হতে ভোর হয়ে আসত। ততক্ষণে হ্যাজাকের চিমনীতে কালি পড়েছে, কা কা শব্দে কাকেরা ডাকছে ; দূরে থেকে মোরগের ডাক, আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। তখন শুরু হতো 'ভোর' গান—

চিতান—জলে ফুটল সরোজিনী, রজনী প্রভাত।
পাড়ন—পশ্চিম অস্তাচলে, মসিমুখে শশী চলে,
পূর্বাচলে উদয় দিননাথ ॥
ফুকার—ভক্তির ভূষা পরে উষা, জগতকে জাগায়,
ভক্তে মঙ্গল আরতি গায়। হায়—
সাধু শিষ্ট সচৈতন্য,
ইষ্টচিন্তায় সবে ধন্য,
যত অলস পাপী অকর্মণ্য,
কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যায় ॥
মিল—যোগী ঋষি আর ব্রহ্মচারী সদাচারে,
ব্রাহ্মমুহূর্তের সম্মান করে, করে নিদ্রাভঙ্গ।
মুখ—যত কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে,
গুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ ॥ ইত্যাদি

[ হরিচরণ আচার্য—ঢাকা ]

এক দলে "ভোর" গাইলে অপর দল গাইত গোষ্ঠ গান। যেমন—

চিতান—গোপাল ব'লে সব রাখালে,
নিশি ভোরে, করে গাত্রোত্থান।
পাড়ন—সবে সেবা করে বাল্যভোগ,
করবে বলে শুভ যোগ,
নন্দালয় আনন্দে আগুয়ান ॥
ফুকার—সবার করেতে পাঁচনী নড়ি,
খুলে বৃষ গাভীর দড়ি,
ত্বরিতে গো-পাল তাড়ায় ;
গো-পাল গোপাল না দেখে দাঁড়ায়।
যশোমতী ব্যস্ত হয়ে,
ধড়াচূড়া মোহন বাঁশী নিয়ে,
মোহন সাজে সাজাইয়ে, গোলোকনাথেরে গোঠে পাঠায় ॥ ইত্যাদি

[ রাজেন্দ্রনাথ সরকার—খুলনা ]

ক্রমে রাত প্রভাত হল। ভরপুর আসরে এবার শুরু হবে সখী-সংবাদ ও তার জবাব। প্রথম দলের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ধরনের একটি সখী-সংবাদ গাওয়া হতো—

**সখী-সংবাদ—মাথুর**

চিতান—হয়ে শ্যাম বিচ্ছেদে কাতর অতি, মথুরায় চতুরা দূতী,
মথুরাপতির প্রতি, প্রীতি বাক্যে কয়।
পাড়ন—তুমি চড়ে অক্রুর মুনির রথে, এলে বন্ধু মথুরাতে,
ব্রজের কথা সময়েতে, আর কি মনে হয় ॥
ফুকার—তোমার কুশল জানতে কাঁদতে কাঁদতে,
এলেম মধুর ধাম,
এখন আছে কি মরেছে প্যারী,
বলতে নারি শ্যাম। হায় হায় হায়—
এত যদি ছিল মনে,
পিরীতি করিলে কেনে.
পিরীত করে মারো প্রাণে,
এই কি ধর্মের কাম ॥
মিল—মোদের বৃন্দাবনের কুশল মঙ্গল, কেউ ত শুধায় না,
নিষ্ফল বৃক্ষে বানর যায় না,
ব্যক্ত আছে ধরাধাম।
মুখ—যা হবার তা হয়ে গেল, বল বন্ধু বল বল,
কেমন আছ এসে মধুর ধাম ॥

ডাইনা—প্যারী সকল ত্যজিয়া, তোমাকে ভজিয়া,
মজিয়া তোমার প্রেমে,
জাতিকুল গেল, কলঙ্ক রহিল,
এই কি ছিল পরিণামে।
জীবন যৌবন প্যারী সমর্পণ,
করিল তোমার পায় হে,—
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ, বিনে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
ব্রজলীলা সাঙ্গপ্রায় হে।
তুমি এমন কঠিন হলে, এসে মধুর দেশে,—
কুবজার এই কুবাতাসে, কুরসে মজেছ শ্যাম।
খাদ—সাধুর মতো মধু খেয়ে করলে শঠের কাম॥
ফুকার—তোমার প্রেমবিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে,
রাই কাঁচা সোনা,—
অতি কষ্টেতে করতো অষ্টযাম,
তোমার ভাবনা। হায় হায় হায়—
প্রথম পিরীতির কালে,
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে,
শেষে ডুবাও রসাতলে,
ধর্মে সইবে না॥
অন্তরা—বলতে অন্তর জ্বলে রাধে অন্তর্জলে,
কোন্ পাপেরই ফলে, কপালে এই ছিল।
ভেবে শয়নে স্বপনে, কিংবা জাগরণে,
তোমারই কারণে পরাণে মরিল॥
কল্পলতা রাই অতি অল্পকালে,
কালি দিয়েছিল সতী পতির কুলে,
এখন বৈষ্ণবকুলে, আর কিবা তাঁতিকুলে,—
স্থান নাই কোন কূলে, অকূলে ভাসিল।
কে জানে শ্যাম তোমার মনে শেষে এত ছিল॥
পরচিতান—বন্ধু প্রেমিকা প্রেমিকে বলে,
লিখা আছে প্রেম দলিলে,
পিরীত করে ছেড়ে গেলে, পশুর জীবন তার।
পাড়ন—তোমার ফুলশয্যার ধন ধূলশয্যাতে,
মুখ দেখাবে কোন লজ্জাতে,
তুমি ত শ্যাম সাজসজ্জাতে, পেলে রাজ্যভার॥

ফুকার—হলো কমলিনী পাগলিনী অস্থিচর্মসার,—
করে তোমার আশা এ দুর্দশা,
হলো রাধিকার। হায় হায় হায়—
যে যাহারে বাসে ভাল,
তারে কি কাঁদানো ভাল,
অকলঙ্ক প্রেমে হলো, কলঙ্ক তোমার ॥

[ তারিণীচরণ সরকার—ঢাকা ]

প্রথম দলটি সখী-সংবাদ গেয়ে বেরিয়ে যেতেই বিপক্ষের 'সরকার' ( পূর্ববঙ্গে কবিয়ালগণ 'সরকার' নামে কথিত ) স্বদলে আসরে এসে দোহারপত্র মারফত এক একটি ফুকার ধরে উক্ত সখীসংবাদ গানের জবাব গাওয়াতেন—

চিতান—তখন মথুরায় চতুরার বাক্যে, দুঃখে বলে রসরাজ।
পাড়ন—বৃন্দে জানা যাবে পরস্পর,
ব্রজের পিরীতির খবর,
অনেক দিন পর, দেখা হল আজ ॥
ফুকার—আমি আছি বটে মথুরাতে,
রাধার কথা দিনে রাতে,
স্মরণ পথে হয় উদয় ;
সে তো বলবার নয় গো ভুলবার নয়। হায়—
হেথায় রাজৈশ্বর্য সুহৃদ সখা,
সুবর্ণময় অট্টালিকা,
বিনে আরাধিকা শ্রীরাধিকা, মরুসম শূন্যময় ॥
ফুকার—বললে, এত যদি ছিল মনে,
পিরীতি করিয়ে কেনে,
পরাণে বধিলে রাই,
তোমার কথা শুনে ব্যথা পাই। হায়—
প্রেম পিরীতি করে যারা,
বিচ্ছেদে রয় ভাজা পোড়া,
দূতী, একবার ম'লে প্রেমের মরা,
সে মরার আর মরণ নাই ॥
ফুকার—বললে, এত যদি ছিল মনে,
পিরীতি করিয়ে কেনে,
প্রাণে মারলে রাধিকায়,
শুনে দুঃখানলে জ্বলে কায়। হায়—

ভালবাসলে প্রাণাপেক্ষা,
দূরে থাকলেও নাই উপেক্ষা,
করে প্রেমিকেরে প্রেমেই রক্ষা,
অন্তিমকালে প্রেমই চায় ॥

মিল—ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবন,
গোপী মধ্যে রাধা জীবন, আধা জীবন ভাবি তাই।

মুখ—রাধা আমার অঙ্গের আধা, সাদাসিধা কোন বাধা নাই ॥

ডাইনা—হেমাঙ্গ হিমাঙ্গ রাধার শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদ,
এ বিচ্ছেদে ব্রজলীলা হবে না উচ্ছেদ।
মৃত্যু সঞ্জিবনী রাধা, মৃত্যুনাথে স্বাধে সদা,
মৃত্যু ঘুচায় মৃত্যুর বাধা, সে শ্রীরাধার মৃত্যু নাই।

খাদ—আরো একটি কথা শুনে, মনে ব্যথা পাই ॥

ফুকার—বললে, প্রথম পিরীতির কালে,
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে,
শেষে ডুবায় রসাতল,
তারা প্রেমিক নয়, নিতান্ত খল। হায়—
শুদ্ধ প্রণয় দুগ্ধে জলে,
জ্বাল দিলে পর দুধ উথলে,
দিলে সেই দুগ্ধে শীতল জল ফেলে,
তলে পড়েও হয় শীতল ॥

ফুকার—বললে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে,
শেষে ডুবায় রসাতলে,
ধর্মে সইবে না নির্যস্;
কত ধর্মে কাটে ঘোড়ার ঘাস। হায়—
ধর্ম ধার্মিকের সাহায্যে,
কর্মে লিপ্ত জড় রাজ্যে,
যার মন মজেছে প্রেম মাধুর্যে,
ধর্ম হয় তার দাসের দাস ॥

ফুকার—বললে, প্রথম পিরীতির কালে,
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে,
শেষে ডুবায় রসাতল,
বৃথা কোন্দলে আর নাই কো ফল। হায়—

শ্রীরাধার প্রেম ফল্গু নদী,
উপর শুষ্ক নিরবধি,
আগে বালি খনন কর যদি,
নিচে পাবে শীতল জল ॥

ফুকার—বললে, যে যাহারে বাসে ভাল,
তারে কি কাঁদান ভাল,
কলঙ্কের দাগ যাবে না ;
শুনে মনে হল ভাবনা। হায়—
মাধুর্য প্রেম রসার্ণবে,
ডুবলেই কলঙ্ক হবে,
যে জন কলঙ্ক ছাড়াতে যাবে,
বিশুদ্ধ প্রেম রবে না ॥

ফুকার—আবার যে যাহারে বাসে ভাল,
তারে কি কাঁদান ভাল,
সকলে কলঙ্ক গায় ;
রইল কলঙ্কের দাগ দুইয়ের গায়। হায়—
শ্রীদাম শাপ বিচ্ছেদ শাসনে,
অদর্শনে অনশনে,
তাইতে রাধা কাঁদে বৃন্দাবনে,
আমি কাঁদি মথুরায় ॥

[ রমেশচন্দ্র আচার্য—নোয়াখালী ]

সখী-সংবাদের জবাব দিয়ে 'সরকার' বের হয়ে যেতেন। তাঁর দোহারপত্র থেকে যেত আসরে। প্রথা মতো তারাও একখানা সখী-সংবাদ গান গাইত এবং প্রথম পক্ষের সরকার এসে তার জবাব গাওয়াতেন। তারপরেও উভয় পক্ষের একখানা করে 'কবি' এবং উভয় সরকার কর্তৃক তার জবাব গাওয়া হতো।

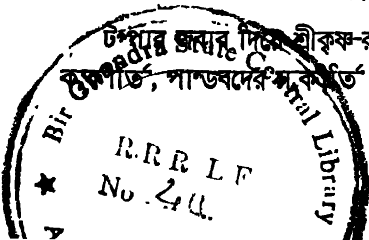
এইভাবে বিভিন্ন ধরনের গান ও জবাবে বার ঘণ্টা ব্যাপী কবিগানের প্রায় ছয় ঘণ্টা শেষ হতো। এবার সম্মুখ সমর ; উপস্থিত কবির লড়াই অর্থাৎ টপ্পা-পাঁচালীর ("চাপান-উতোর") শুরু। মাতব্বর শ্রোতারা যদি বলতেন—আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ সম্পর্কে আলোচনা শুনতে চাই ; তখন প্রথম দলের 'সরকার' গান্ধারীর ভূমিকা নিয়ে দ্বিতীয় দলের 'সরকার'কে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রেখে মনে মনে টপ্পার লহর তৈরী করে দোহারদের দিয়ে গাওয়াতেন—

আমি অন্ধের নারী নাম গান্ধারী—
তুমি শ্যাম কানাই।
আমি শত পুত্রের ছিলেম মা,
সুখের আর ছিল না সীমা,
এখন আমায় ডাকবে মা, এমন লক্ষ্য নাই ॥
শুনি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে—
দুই পক্ষ গেল যুদ্ধ করিতে ;
কুরু আর পাণ্ডবের রণ
বিবরণ এলেম জানিতে।
হল কুরু-পাণ্ডব দুই পক্ষ ;
তুমি শ্যাম কমলাক্ষ,
ছিলে সেই অর্জুনের রথে।
আমার শত পুত্র যুদ্ধে ম'ল—
কৃষ্ণ হে, কোন্ পাপে কার চক্রেতে ॥

লহর-টপ্পা শেষে কবিয়াল ধুয়া দিয়ে ছড়া-পাঁচালীতে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরো প্রাঞ্জল ও যুক্তিসিদ্ধ করে তুলতেন। প্রশ্নকর্তা কবিয়াল আসর ছেড়ে গেলে উত্তরদাতা কবিয়াল সদলে আসরে এসে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে টপ্পার জবাব গাওয়াতেন—

তুমি কল্পনায় গান্ধারী,
আমি কৃষ্ণ রসময়।
তোমার মরেছে শত পুত্র,
সেই শোকে ঝরিছে নেত্র,
দুর্যোধনের চরিত্র, জান সমুদয় ॥
ও সে কপট পাশায় দান ধরিয়ে—
ধর্মকে লজ্জা দেয় সভায় আনি ;
দ্রৌপদীর বসন টানে—
করিতে সতীর মান হানি।
সতী, তোমার মুখের বাক্য রয়,
যথা ধর্ম তথা জয়,
নির্দোষী শ্যাম চিন্তামণি।
তোমার কুরু বংশ ধ্বংসের হোতা—
একমাত্র তোমার ভ্রাতা শকুনি ॥

টপ্পার জবাব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-রূপী কবিয়ালও ধুয়া ধরে ছড়া-পাঁচালীতে কৌরবদের কুকীর্তি, পাণ্ডবদের সুকীর্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে বক্তব্য রাখতেন।


Bir Chandra State Central Library
R.R.R.L.F
No. 44.

তৃতীয় আসরে আবার প্রথম কবিয়াল এসে দ্বিতীয় কবিয়ালের দেওয়া জবাব খণ্ডন করে গান্ধারীর ভূমিকায় টপ্পায় গাওয়াতেন—

মরে শকুনির চক্রেতে পুত্র—একি শুনিলাম।
তুমি সৃষ্টি ক'রে সংসার চক্র,
তাতে দিলে মায়া-চক্র,
জানি তোমার চক্রে সব চক্র,—বক্র করে শ্যাম ॥
হল শকুনির চক্রেতে সকল—
শুনে আর বাঁচি না মনের দুখে ;
অবোধিনী বলে কি—প্রবোধ আজ দিলে আমাকে।
এই যে যথা ধর্ম তথা জয়,
নাস্তি ধর্ম পরাজয়,—বলেছি নিজেরই মুখে।
এই যে ধর্মাধর্ম দুটি কর্ম—
জীবেরে করায় কে আর করে কে ?

চতুর্থ আসরে শ্রীকৃষ্ণ-রূপী কবিয়াল পুনরায় এসে আত্মপক্ষ সমর্থন করে গান্ধারী নামধারী কবিয়ালের টপ্পা কাটাকাটি করে গাওয়াতেন—

বললে, জীবের দেহে ধর্মাধর্ম কর্ম করায় কে ?
জীবের অন্তরের ভাব বুঝতে পাই,
পাপপুণ্য আমি সব করাই,
শেষে আলগে আলগে রঙ্গ চাই—অন্তরে থেকে ॥
জীবে আমি আমি আমি করে—
আমা ত ঠিক রাখে না একতা ;
জীবে ভাবে এই ভবে, সকলি নিজের ক্ষমতা।
এই যে সুমতি কুমতি দুই,
সকল জীবের দেহে থুই,
একথা নয়কো অন্যথা।
কর্ম মনে করায় জীবে করে—
একমাত্র আমি কর্মের ফলদাতা ॥

এভাবে পাল্টা-পাল্টি চার আসর টপ্পা-পাঁচালী গাওয়ার পর দু'জনে মুখোমুখি যোটের পাল্লা গেয়ে গৌর প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দিয়ে গানের আসর শেষ করতেন।

এত গান গানের জবাব, তবু শ্রোতাদের ক্লান্তি নেই যেন। তারা বিশেষ বিশেষ গান গাইবার ফরমাইশ করত। কেউ হয়ত শুনতে চাইল 'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর' মামলা ঃ—

চিতান—মা তোর লীলা ক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লীলা হয়।
পাড়ন—মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল,
করলি অপূর্ব লীলার অভিনয় ॥

ফুকার—শুনলেম অতিপ্রিয় পুত্র তোমার,
জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার,
মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে ;
রাজার শবদেহটি সৎ লোকেরা—এলো সৎকার করে।
মাগো, হায় হায় চাঁদের বাজার আঁধার হলো,
শ্রাদ্ধশান্তি ঘুচে গেল,
মরা মানুষ ফিরে এলো,
আবার বার বছর পরে ॥
ফুকার—রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা,
স্বার্থ সাধন করতে তারা,
রাজকুমারকে বিষ খাইয়েছিল ;
হায় হায়, শ্মশানবন্ধু হয়ে তারা—শব শ্মশানে নিল।
মাগো, বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে,
শব ছেড়ে পালাল ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্মদাসে এসে, পুনর্জীবন দিল ॥ ইত্যাদি

দুই বছর আগে পর্যন্ত এমনিভাবেই ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে বার ঘণ্টা ব্যাপী কবিগানের পালা শেষ হয়েছে। কিন্তু এবারে ভাঙ্গা হাট। মরা গাঙে সেই ভরা জোয়ার বইবার আশা বৃথা। পূজা শেষ হতেই অল্প কয়জন কর্মকর্তা যে যার বাড়ি চলে গেল। পরদিন সকাল থেকে গান শুরু হবে।

## ( তিন )

যেহেতু প্রথানুসারে পূজান্তে কবিগান আরম্ভ হয়নি, সুতরাং পরদিন সময়ানুগ গানগুলি অর্থাৎ ভোর, গোষ্ঠ, সখী সংবাদ, কবি ইত্যাদি গান বাদ গেল। ডাক-মালসী গেয়েই টপ্পা-পাঁচালী আরম্ভ হল। বলতে গেলে তখন থেকেই নিয়মের ব্যতিক্রমের সূত্রপাত।

কিন্তু টপ্পা-পাঁচালী গাইতে এসেই সেদিনের এক দলের কবিয়াল ত্রিপুরার শচীন্দ্র-কুমার শীল আসরের অবস্থা দেখে মর্মাহত হলেন। আসর উজ্জ্বল করা সেই সব সমজদার শ্রোতৃমণ্ডলী কোথায়? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, ধনী চাষী ব্যবসায়ী প্রভৃতি অতি পরিচিত মুখগুলি একেবারে অনুপস্থিত। শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ শ্রোতারা আসরে নেই বললেই চলে। দুটি ভাঙ্গা দলের অবস্থাও তথৈবচ। প্রথম শ্রেণীর গায়ক কেউ নেই ; ঢোলের বদলে বাজছে খোল। আসরের দৈন্য দশা দেখে ভারাক্রান্ত মনে কবিয়াল শচীন্দ্র শীল ধুয়া গাইলেন—

দেশের মানুষ ছিল যারা—
দেশ ছাড়িয়া চৈলে যায় ;
মোদের কি হবে উপায় ॥

এই করুণ রসের ধুয়া শুনে সেদিন অনেকের চোখে জল ঝরেছিল। যা হোক, কোন রকমে অপরাহ্ন বেলায় গান শেষ হল। সেদিনের গানে অপর কবিয়াল নোয়াখালীর রমেশ আচার্য শেষ আসরে ধুয়া গেয়েছিলেন—

হায় রে—ভেঙ্গে গেছে আনন্দের বাজার,
আর তো বাজার মিলবে না।
নিভে গেছে আলোর রোসনাই—
আর তো আলো জ্বলবে না ॥

অমোঘ সত্য। সে আনন্দের বাজার আর মেলে নি; আলোর রোসনাই আর জ্বলে নি। কবিগান ও তার পৃষ্ঠপোষকদের জীবনে স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অমানিশার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সেই ১৯৪৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে পূর্ববঙ্গের কবিগানের অবক্ষয়। প্রথমে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়। পরে এই গানের উপর বড় কঠিন আঘাত পড়ল ১৯৫০ সালে। নতুন রাষ্ট্র, নতুন শাসন পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য ও স্বীকৃতি জানিয়েও হিন্দুরা বিধর্মীর উপর প্রযুক্ত শরিয়তী নির্দেশনামার হাত থেকে রেহাই পেল না। যারা নবাবী আমলের সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী হলো না। সার্থক হলো প্রসঙ্গান্তরে সতর্ক বাণী—"রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে।" সে বছর সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষাধিক হিন্দুর একযোগে দেশত্যাগের দরুন মধ্যবিত্ত হিন্দুর সমাজ জীবন ভেঙ্গে গেল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। নোয়াখালী ত্রিপুরার পর এবারে ঢাকা ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট বরিশাল ফরিদপুর খুলনা যশোহরের পালা। গানের উদ্যোক্তা সমেত গায়ক বাদক কবিয়াল শ্রোতা সবাই প্রাণের ভয়ে মানের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। কার গান, কে দেয়, কে-ই বা শোনে !

## ( চার )

পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের কাছে ঢাকা জেলার নরসিংদী ছিল কবি-তীর্থ। সেখানে ছিল কবিগানের নবরূপকার হরিচরণ আচার্যের বাসস্থান তথা আশ্রম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবিগানে যথেষ্ট আবিলতার সঞ্চার হয়েছিল এবং ভদ্রসমাজ থেকে কবিগান নির্বাসিত হয়েছিল। কিন্তু কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় কবিগানকে কলুষমুক্ত করে পুনরায় ভদ্র গৃহস্থের আঙ্গিনায় তুলে

আনেন। কবিগানের স্বর্ণ-যুগের শেষ প্রতিনিধি বরিশাল-ঝালকাটির নকুলেশ্বর সরকার বিশুদ্ধ কবিগানের পুনরুজ্জীবনে আচার্যদেবের অসামান্য অবদানের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ( হরিচরণের জীবনী দ্রষ্টব্য )

তাঁর সুদীর্ঘ ৭৫ বছর ব্যাপী কবি-জীবনে নকুলেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী যে সব কবিয়ালের সংস্পর্শে এসেছিলেন বা যে সব প্রাচীন কবিদের কথা শুনেছিলেন, তাঁদের যে প্রশস্তি গেয়েছেন ও ফিরিস্তি দিয়েছেন, তা থেকেই পূর্ব বঙ্গে কবিগানের প্রভাব ও হিন্দুদের উপর তার আবেদনের গভীরতা অনুমান করা যাবে—

| | |
|---|---|
| আচার্যের প্রেম-বাগানের ফুল | অম্বিকা রাজেন্দ্র নকুল |
| শ্রোতার প্রাণ করিত আকুল | কীর্তনের দ্বারায়। |
| তাদের সেই প্রচারের ফলে | গুরুর আশীর্বাদের বলে |
| এখন সকল কবির দলে | সেই প্রেরণা পায় ॥ |
| ঢাকায় ছিল অনেক গুণী | কুমুদ আর মধু তারিণী |
| কানাই মালী জ্ঞান পাটুনী | মহিম রাইচরণ। |
| দেবেন মদন উপেন পূর্ণ | রেবতী চণ্ডী চৈতন্য |
| কবির জগৎ করে শূন্য | করেছেন গমন ॥ |
| ময়মনসিংহে কবি প্রবর | সিংহ বিক্রম সেই হরিহর |
| আচার্যদেব করে আদর | মিতা বলে কয়। |
| রামু মালী আর রামগতি | বিজয় আচার্যের কবিকৃতি |
| কবিত্বে পেয়েছে খ্যাতি | রামকানাই রামজয় ॥ |
| রমেশ শীল চট্টগ্রামে | খ্যাত গণকবি নামে |
| দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে | গেয়ে গেলেন কবি। |
| ত্রিপুরায় করিত চারণ | হরকুমার শীল দুর্গাচরণ |
| অর্জুন নাথ গোবিন্দচরণ | পরলোকে সবি ॥ |
| জয়চন্দ্র আর জগবন্ধু | মন্হন করে কাব্যসিন্ধু |
| দেশবাসীকে বিন্দু বিন্দু | করেছিলেন দান। |
| নোয়াখালীর জন পূজ্য | কাশী রমেশ অক্ষয় আচার্য |
| নূতন নূতন ভাবগাম্ভীর্য | ভগবতীর গান ॥ |
| ফরিদপুরের কবির সাগর | অম্বিকা আর মনোহর |
| রসাল কবি সে হরিবর | রত্ন এক এক জন |
| ছোট বড় দুই রজনী | মহিম শশী আর কামিনী |
| নন্দ নিশি কত গুণী | ছিল অগণন ॥ |
| বরিশালের কবি তত্ত্ব | শরৎ ভারত কুঞ্জ দত্ত |
| করতেন কবির আধিপত্য | আরও কয়েক জন। |

ষষ্ঠী উমেশ চন্দ্রকান্ত
প্রসন্ন উপেন অনন্ত
বিধু কুসুম রাধাকান্ত
কই তারা এখন ॥
হরিনাথের রঙ পাঁচালী
কথায় কথায় হাতে তালি
কবির রাজ্য করে খালি
গেলেন লোকান্তরে।
যে হরিনাথ সভায় এসে
লোক মজাত হাস্যরসে
তেমন কবি বাংলা দেশে
আর আসবে না ফিরে ॥
যশোহরে করতেন বিরাজ
সাধক কবি তারক রসরাজ
সে জেলায় রয়েছে আজ
সুকণ্ঠ বিজয়।
খুলনায় কবীন্দ্র-রাজেন্দ্রনাথ
ছোট হরিবর প্রিয়নাথ
কবিগান হয়েছে অনাথ
বিনে মথুর বিধু ভ্রাতৃদ্বয় ॥
গোহালার নারায়ণ বালা
তারও তো আসন্ন বেলা
ছেড়ে দিয়ে কবির খেলা
নিলেন অবসর।
কবির এখন ভাঙ্গা মেলা
রক্ষা করতে কবির খেলা
নতুন নতুন কবির চেলা
আছে কিছু তর ॥
বিজয় নিশি মনোরঞ্জন
রসিকলাল অমূল্যরতন
আমার ছাত্র সুরেন একজন
তার ভাই শ্রীনিবাস।
এই কয়জন এ দেশে আছে
ভিক্ষা চাই গোবিন্দের কাছে
শত বৎসর থাকুক বেঁচে
সুখে করুক বাস ॥
প্রাচীন কবি ছিল যারা
অচিন রাজ্যে গেল তারা
ডাকিলেও দেয় না সাড়া
খুঁজে নাহি পাই।
খুলনার রাজেন চলে গেছে
আমি নকুল আছি বেঁচে
আমারও কাল ফুরায়েছে
বেশী দিন আর নাই ॥

উল্লিখিত কবিয়ালগণ ছাড়াও আগে পরে আরও অনেক খ্যাত অখ্যাত কবি ছিলেন—যাঁরা পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে গানের পসার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বস্তুতপক্ষে "পূর্ব বাংলায় কবিগান ছাড়া গ্রাম ছিল না। এ গান শোনে নি এমন মানুষ ছিল না। এ গানের সামাজিক স্বীকৃতি ছিল তাই খুব উচ্চগ্রামের। বলা হতো 'কবি শোনে ভদ্রলোকে।' দোল দুর্গোৎসবে গ্রাম-পূর্ববাংলায় এ গানের আসর বসতো। আসর হতো অন্যান্য উৎসব পরবে। আসরে কবির দুটি দল। তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ যেন দুটি বাহিনী। গানের সুরে, যুক্তির ধারে এঁরা পরস্পরকে পরাভূত করার চেষ্টা করতেন। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ—এমন কি কোরাণ পর্যন্ত যেন এঁদের নখদর্পণে। এঁরা এক একটি শ্লোক এক একটি সূত্র অনায়াসে উঠিয়ে এনে প্রতিপক্ষের দিকে যুক্তি হিসেবে ছুঁড়ে মারতেন। শ্রোতারা ভাবতেন এর বুঝি আর কোন জবাব নেই। কিন্তু জবাব আসতো। শ্রোতাদের বিস্মিত করে অন্যপক্ষ তাঁর জবাবী গান শুরু করতেন। জবাবের পর আবার সেই প্রশ্ন।

এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো কবিগান। কোন কোন সময় একটানা বারো চৌদ্দ ঘণ্টা। হাজার হাজার শ্রোতা উৎকর্ণ হয়ে সে গানের প্রতিটি কথা শুনতেন। তাতে একঘেয়েমী ছিল না।· ছিল না কোন ক্লান্তির ভাব।

দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার বহু গ্রামই ভাঙলো। সঙ্গে সঙ্গে কপাল ভাঙলো লোককবিদের। তাদের অনেকেই বাস্তু ছাড়লেন। শূন্য হাত। শুধু কণ্ঠভরা নিয়ে এলেন পূর্ব বাংলার সেই বিখ্যাত কবিগান। সে গানে পদ্মা-যমুনা-ধলেশ্বরীর মায়া, দোয়েল শ্যামা ফিঙের সুর।, (পরেশ সাহা, যুগান্তর—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬)

পশ্চিমবঙ্গেও কবিগান গাওয়া হয়; কিন্তু তার রীতি-প্রকৃতি প্রায় তর্জা গানের পাশ ঘেঁযে। আর পূর্ববঙ্গীয় কবিগানও পশ্চিমবঙ্গে এসে ক্রমে ক্রমে তার রীতি-চরিত্র হারিয়ে না-তর্জা না-কবি এমন এক পর্যায়ে পেঁাচেছে। কবিগান থেকে কবিত্ব এবং গান প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। নিম্ন মানের ছড়া-পাঁচালীর অত্যাধিক্যে কবিগানের রসমাধুর্যে নিদারুণ অবনতি ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের কবিগানের প্রকৃতিগত বিভেদ সম্পর্কে কয়েক বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবিয়াল শেখ গুমানী দেওয়ানের নিকট জানতে চাইলে, তিনি পত্রোত্তরে লিখেছিলেন—

"কবিগান সত্যই টপ্পা, আসর বিষয়ের গান, ছড়া, পাঁচালীতে পূর্ণতা লাভ করে। অতিরিক্ত ভৈরবী, প্রভাতী, গোষ্ঠ, সখী সংবাদ প্রভৃতিতে জড়ান ছিল। উহা পূর্ব-বঙ্গের গায়কগণ এখনো রেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সেটি আর নাই।"

কিন্তু খাস পূর্ব বঙ্গে কোন কোন এলাকায় কবিগানের যে সামান্য প্রচলন এখনো রয়েছে তার বর্তমান ধরণ-ধারনের নমুনা মেলে খুলনা জেলার কবিয়াল শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকারের চিঠি থেকে—

"এ দেশের শ্রোতাদের রূপ স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে; যার ফলে ডাক-মালসীর পরেই ছড়াদার হয়ে ধুয়া দিয়ে কাজ করতে হয়। ভগ্ন মনোরথে নীরবে জীবন ধারণের প্রয়োজনে গ্রামগঞ্জে বিকট চিৎকার করি। এর নাম কবিগান! ওপার বাংলায় হয় তো বা এতটা অপমৃত্যু হয় নি।"

কিন্তু কবির এই আশা অমূলক। পূর্ববঙ্গাগত কবিগানের অবস্থাও তথৈবচ। এখানেও ডাক-মালসীর পর ভোর, গোষ্ঠ, 'কবি' তো দূরের কথা, সখী-সংবাদ ও তার জবাব শোনার ধৈর্যও শ্রোতাদের মধ্যে দেখা বায় না। ডাক-মালসীর পরেই টপ্পা গাইবার হুকুম দেয়। অবশ্য সব দোষই যে শ্রোতাদের তাও নয়। সৃজনশীল কবিয়াল আর নেই বললেই চলে। হৃদয়গ্রাহী রচনা ও চাতুর্যমাধুর্যপূর্ণ জবাব দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন কবিয়াল সবাই গত হয়েছেন। এমন কি টপ্পার তাৎক্ষণিক জবাব তৈরীর ক্ষমতাও সবার নেই; তাই ধুয়া দিয়েই পাঁচালীর নামে বাচালি শুরু করেন। সঙ্গীত পরিবেশনের উপযুক্ত দোহার এবং সঙ্গত করার যোগ্য ঢুলীরও বড়ই অভাব। এক কথায় কবিগানের সার্বিক অবক্ষয়।

## পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত

দেশভাগ ও দেশত্যাগের পূর্ব ও পরবর্তীকাল থেকে কবি-জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি যে সব কবিয়ালের সঙ্গে এদেশে ওদেশে বহু আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাঁদের কয়েক জনের গুণপনা বর্ণনা করে কবি নকুলেশ্বর বলেছেন—

পূর্ব কবির গুণাবলী
হরিনাথের রঙ পাঁচালী
রাজেন্দ্রের রচনাগুলি, পাণ্ডিত্যপ্রধান।
বিজয়ের কণ্ঠস্বর মিষ্টি
নিশির ছিল ভাষায় দৃষ্টি
নারায়ণের জবাব সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ অবদান ॥
মনোরঞ্জন ভাবুকচিত্ত
রসিকের আধুনিকত্ব
অমূল্য প্রেমরস তত্ত্ব, করে আহরণ।
সুরেন চলে অন্য পথে
মিশিয়ে মতুয়ার সাথে
গুরু হরিচাঁদের মতে, করে সংকীর্তন ॥
নকুল তো লাবড়া তরকারী
সর্বরসের অধিকারী
নব রস একত্র করি, হয়েছেন সৃজন।
ভক্তাভক্ত শ্রোতা সবে
যা চাবে সে তাই পাবে
ভক্ত-প্রীতি মহোৎসবে, উৎসর্গ জীবন ॥

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এবং পশ্চিমবঙ্গে কবিগান প্রচারে নিরত এই কয়জন কবিয়ালের শতায়ু কামনা করে নকুলেশ্বর আবেদন করেছিলেন—

বাংলা দেশে কবির সৃষ্টি
রক্ষা করতে কবির কৃষ্টি
শ্রোতারাও রাখবেন দৃষ্টি
এই কবিদের পরে।
এরা ক'জন বেঁচে থাকবে
কবির স্মৃতি বজায় রাখবে
ভারতবাসী দেখে শিখবে
কবি বলে কারে ॥

কিন্তু অচিরে কবির আশা নিরাশায় পর্যবসিত হলো। খ্যাতনামা কবিরা অনেকেই পরপারে গেলেন। অনেকে দৈহিক অক্ষমতার জন্য গান ছাড়লেন। মৃত্যুর অব্যবহিত

পূর্বে কবিগানের স্বধর্মচ্যুতি ও স্বভাব স্খলন পর্যবেক্ষণ করে বিশুদ্ধ কবিগানের একনিষ্ঠ পূজারী নকুলেশ্বর সরকার সখেদে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—

থাকবে না আর বাংলার কবি,
ম্লান হয়েছে কবির ছবি,
অল্প দিনে কবির রবি—যাবে অস্তাচলে।
কবিগানের লীলা সাঙ্গ আমার মনে বলে ॥

কবিগানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই আশঙ্কা প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে তিনি লোকান্তরিত হন। ফলে পূর্ববঙ্গের কবিগানের শেষ উজ্জ্বল দীপশিখাটি নির্বাপিত হলো। তারই কিছুকাল পূর্বে রাজেন্দ্র সরকার (খুলনা), হরিচরণ সরকার (বরিশাল), নারায়ণ বালা (ফরিদপুর), দুর্গাচরণ সরকার (ত্রিপুরা), শচীন্দ্র শীল (ত্রিপুরা), রমেশ আচার্য (নোয়াখালী), রমেশ শীল (চট্টগ্রাম), বিজয় সরকার (যশোহর) প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিয়ালের মৃত্যুতে কবিগান শ্রীভ্রষ্ট হয়। সম্প্রতি কবিয়াল রসিকলাল সরকার (যশোহর) দেহত্যাগ করেন। এঁদের শূন্য স্থান পূরণ করার মতো তেমন প্রতিভাশালী কবিয়াল আবির্ভূত হন নি। কারণ ইতিপূর্বেই কবির কাব্যপ্রতিভা প্রস্ফুটনের পটভূমিই পাল্টে গেছে। রাজস্থানের মরুভূমিতে ভাটিয়ালী শোনার বাসনা যেমন বাতুলতা, তেমনি বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় নৌকা-বাইচের গান শোনার আশাও বিড়ম্বনা বিশেষ।

## ( পাঁচ )

কৈশোরে রামায়ণ, মহাভারত, শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার সময় এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তকে কবিতা পড়তে পড়তে অদৃশ্য কবিদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে পড়তাম। গ্রামদেশে যখন দেখতাম কেউ নৌকা বেয়ে লোক পারাপার করছে, জাল ফেলে মাছ ধরছে, ঝাঁপ তুলে দাঁড়িপাল্লায় তৈজসপত্র মাপছে, কিংবা পঞ্জিকা হাতে বাড়ি বাড়ি কর কোষ্ঠী গণনা করে বেড়াচ্ছে—আবার সময় মতো ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরে আসরে সুরে ছন্দে মিলিয়ে ছড়া-পাঁচালী গাইছে, তখন আর বিস্ময়ের অবধি থাকতো না। তখন তাদের কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস-এর স্বগোত্র বলে মনে হতো।

এই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থেকেই কবিয়াল ও কবিগান সম্পর্কে মনে অদম্য কৌতূহল জাগে এবং পূর্ববঙ্গের কবিয়াল ও কবিগান নিয়ে পি, এইচ, ডি, গবেষণা কার্যোপলক্ষে কবিয়ালদের জীবনী ও সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। গবেষণা কর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে "পূর্ববঙ্গের কবিগান" নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গবেষণা পত্রের অপরাংশ, অর্থাৎ কবিয়ালদের জীবনী ও সংগৃহীত

বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের নমুনা নিয়ে 'পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' প্রকাশিত হল। আরো অজস্র গান জবাব টপ্পা ইত্যাদি অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

যদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে তিন শতাধিক কবিয়ালের নামধাম সংগ্রহ করেছিলাম, কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা গেল মাত্র আশি জনের মতো কবিয়ালের। বাকিরা শুধু নামধামেই পরিচিত রয়ে গেলেন। এই অক্ষমতার কারণ কারো অজানা নয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, আন্দামান, দণ্ডকারণ্য তথা সারা ভারতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এঁদের পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণ এঁদের সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি জানালে ভবিষ্যতে তা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। পরিশিষ্টে কবিদের নাম-ধামের এক জেলা-ওয়ারী তালিকা দেওয়া গেল।

বাংলা গানের মধ্যে কবিগানগুলি অবয়বে দীর্ঘতম; সুরে ছন্দে তাল-মাত্রায় বিচিত্র, রচনায় পরিবেশনায় অভিনব। গাইবার সময়সীমার মাপকাঠিতেও এই গান দীর্ঘস্থায়ী। এক পালা কবিগানের ন্যূনতম সময়সীমা অন্তত বার ঘণ্টা। আর সবচেয়ে বড় কথা,—পূর্ববঙ্গের নয় দশটি জেলান্তর্গত বিস্তীর্ণ এলাকায় কবিগান প্রায় একই ছন্দে গাঁথা এবং একই সুরে গাওয়া হতো। এ যেন সেই 'একই সুরে বাঁধিয়াছে সহস্রটি মন।' অন্য কোন সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতিপদ্ধতির প্রতি এমন একনিষ্ঠ আনুগত্য লক্ষ্য করা যায় না। এ প্রসঙ্গেই সুরের সংস্পর্শহীন মুদ্রিত গান সম্পর্কে গানের গুরু রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

"সুর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহীন প্রদীপের মত—আমার মতে প্রকাশযোগ্য নয়-- শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হতে পারে না" (ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জীকে লিখিত পত্র)। কিন্তু সুর ও সঙ্গীতগুরুর সদুপদেশ শিরোধার্য করেও সুরের সংস্পর্শহীন কবি-সঙ্গীত প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর কি-ই বা আছে।

কবিগান বিতর্কিত গানও বটে। গানে দুই পক্ষের মধ্যেই যে বাক্‌যুদ্ধ সীমাবদ্ধ তা নয়। এই গান নিয়ে সারস্বত সমাজেও চলেছে দীর্ঘকাল ব্যাপী মসীযুদ্ধ; আলোচনা সমালোচনার ঝড়; রয়েছে মতভেদ মতদ্বৈধতার স্বাক্ষর। কবিগান ব্যতীত আর কোন গানের সৃষ্টি পুষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে সাহিত্যজগতে এমন বাদবিতণ্ডার সঞ্চার হয় নি। এমন ভালমন্দ মিশ্রিত, সু ও কু বলে নন্দিত ও নিন্দিত লোক-সঙ্গীত দ্বিতীয় আর নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আধুনিক বাঙালী সমাজের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে কবিগানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে বলে পণ্ডিতগণের অভিমত। কবিগানের ইতিহাস ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এবং বাঙালী কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রের কথা স্মরণে রেখেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিগানকে বাংলা এম, এ, পাঠ্যসূচীতে বিশেষ পত্ররূপে গীতিসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। গ্রন্থের ফোলিও-তে অনবধানতাবশতঃ 'পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত' ছাপা হয়েছে; কিন্তু 'পূর্ব বঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' ছিল

পরিকল্পিত নাম। আর কবিগানকে 'কবি-সঙ্গীত' বলারও একটু ইতিহাস আছে। প্রায় শত বৎসর হতে চলল রবীন্দ্রনাথ 'কবি-সঙ্গীত' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন; তাতে সাহিত্যশাস্ত্রে হেন কুবাক্য নেই যা তিনি কবি-সঙ্গীতের উপর প্রয়োগ করেন নি। প্রাণভরে নিন্দামন্দ করার পর তিনি কবিগানের মৃত্যু সনদ ( 'ডেথ্ সার্টিফিকেট' ) প্রদান করে বলেছিলেন—"একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ একসময়ে বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না" ( লোক সাহিত্য )। কবিয়াল ও কবিগান সম্পর্কে কবিগুরুর এই গুরুতর মন্তব্য কতটুকু অভ্রান্ত, সে সিদ্ধান্ত করবেন এই গ্রন্থের পাঠকবৃন্দ। উক্ত প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রন্থের নামকরণে সঙ্গীত শব্দটি জুড়েছি; না হলে কবিগানকে কবি-সঙ্গীত বলে ভদ্রস্থ করার কোন ইচ্ছা ছিল না, বা উদ্দেশ্য নেই।

যারা একনাগাড়ে বার ঘণ্টা বন্দি হয়ে বসে কাব্যরসের গান শুনত, সেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের শান্ত সুখী ও নিরুপদ্রব জীবনের সাক্ষী এই কবিগান। সংগৃহীত গানগুলির গায়ে জড়িয়ে রয়েছে পূর্ব বঙ্গের অজস্র গ্রামগঞ্জের জলমাটির গন্ধ, মানুষের স্পর্শ; লুকিয়ে আছে অনেক হাসি কান্না অশ্রুবেদনার ইতিহাস। শতসহস্র আসরে ঢোল কাঁসী বেহালা সানাই সহযোগে সুমধুর কণ্ঠে এ সকল গান গীত হয়েছে। গান শুনে শ্রোতারা আনন্দে আবেগে হরিধ্বনি উলুধ্বনি দিয়েছে; জবাবের মুন্সীয়ানায় বাহবা দিয়েছে। এই গানের আকর্ষণী শক্তি ছোট বড়, ধনী নির্ধন সবাইকে একসাথে আসরে হাজির করত। স্বয়ং কবিগুরু কবিগানকে এ মর্যাদাটুকু দিতে কার্পণ্য করেন নি—

"ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় কবিয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। * * * এই নষ্টপরমায়ু ( ? ) কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক" ( কবি-সংগীত—লোক সাহিত্য )।

আজ সে সব গ্রামগঞ্জ হাটবাজার হয়তো বর্তমান আছে; কিন্তু বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বনেদী পরিবার ও সম্পন্ন গৃহস্থের আঙিনা থেকে শত সহস্র দুর্গাবাড়ি, কালীতলা, হরিবাসর, বারোয়ারীতলা, নাটমন্দির, আটচালা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কবির ঝঙ্কারও চিরতরে নিস্তব্ধ। যেমন এককালে পূর্ববঙ্গের মাটি কাঁপিয়ে দাপিয়ে পদ্মা মেঘনার বুক চিরে চিরে ধাবমান ঢাকা মেল, চিটাগাং মেল, বরিশাল এক্সপ্রেস প্রভৃতি জলযান স্থলযান পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের মনে আজ অপসৃয়মান ধূসর স্মৃতিমাত্র, তেমনি

# কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য (ঢাকা)

পূর্ব বঙ্গে কবিগানের নবরূপকার হরিচরণ আচার্য ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত নরসিংদী গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৬৮) কার্তিক সংক্রান্তি দিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মও উক্ত ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। তাঁর পিতার নাম বিষ্ণুমোহন আচার্য। বিষ্ণুমোহনের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গুরুচরণ বিখ্যাত জ্যোতিষী ও বিশিষ্ট মৃৎ-শিল্পী ছিলেন। কনিষ্ঠ হরিচরণ বাল্যে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে সাটিরপাড়া নিবাসী রঘুনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট চতুষ্টয় বৃত্তি পর্যন্ত পড়েন।

চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে অর্থাৎ আনুমানিক ১২৮৩ সালে তিনি রামায়ণ গাইতে আরম্ভ করেন। রামায়ণ গানে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রামায়ণ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিগান সম্পর্কেও তালিম নিতে থাকেন। আল্‌গী নিবাসী রামকানাই আচার্য ছিলেন তাঁর কবিগানের গুরু। কবিতা ও গান রচনাকালে তিনি মহেশ্বরদী পরগণার ডোকাদী নিবাসী বিগত শতাব্দীর বিশিষ্ট কবিয়াল হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করতেন। তা ছাড়া পারুলিয়া নিবাসী 'প্রচ্ছন্ন' কবি বৈকুন্ঠনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাব্য-ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে সাটিরপাড়ার স্বরূপ কবিরাজের দলে গান বলে দিতেন, অর্থাৎ 'ডাক-সরকারী' করতেন। সে সময় পারুলিয়া নিবাসী জয়হরি সরকার একজন দিগ্‌বিজয়ী কবিয়াল ছিলেন। এক দিন গানের আসরে তাঁর বিপক্ষ সরকার শিবচন্দ্র দাস ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে হরিচরণকে তাঁর স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। জয়হবি সরকারের বিরুদ্ধে হরিচরণ আশ্চর্যজনক জয়লাভ করেন। অবশেষে তিনি বামায়ণ গানের দল ভেঙ্গে দিয়ে কবি'র দল গঠন করেন। তার পর থেকে তাঁর অপ্রতিহত জয়যাত্রা।

প্রথম জীবন থেকেই হরিচরণ "কবিগান, কবির জবাব টপ্পা শুনিয়া ভাবিত—এর কি উন্নতি করা যায় না, কবিওয়ালাদের সেই কানে তালি লাগা কর্কশ কেঁকি রাগিনীকে মিষ্টি ও মোলায়েম করা যায় কি না, জবাব টপ্পাগুলা একান্তভাবে মেছোহাট্টার অশ্লীলতা মুক্ত করা কি উচিত নয়,—আর সর্বোপরি কবির দলের গান শুনিতে দেশেব ছেলে ছোকরাদের টানিয়া আনা সম্ভবপর নয় কি? কবির দল গানের আসরে বিছানা পায় না – ভূঁয়ে দাঁড়াইয়া গান গায়, বসিয়া পাঁচালীর দোহারি করে—এই ব্যবস্থাটা কি একেবারেই অপরিবর্তনীয়? নবীন যুবক হরিচরণ কবিগানকে ভদ্রসমাজের চিত্তাকর্ষক, যুবক যুবতীর শ্রাব্য এবং সর্বসাধারণের আনন্দদায়করূপে গঠন করিতে লাগিলেন।**

আদরমণি ও বালক মদন প্রভৃতিকে লইয়া তান-লয়-সুসঙ্গত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিলেন। ঢোলের সেই বিকট ধ্বনির বদলে তাহা হইতে তবলের মধুর ধ্বনি বাহির হইল—আদরমণি বা বালক মদনের পেছনে গোবিন্দের সুমধুর কণ্ঠ ও বেহালা যোগদান করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিল, আর দলে দলে শ্রোতৃবৃন্দ আসিয়া আসর ভরিয়া শুনিতে লাগিলেন। এর মাঝে কোন সময় যে হরিচরণ কবিগানের বিছানা পাইয়া বসিয়াছেন—কেউ তাহার তথ্য লইতেও চাহিল না। হরিচরণ কবিগানকে বিবিধ সুরে ও লয়ে সুমধুর করিয়া তুলিলেন। দুইজন করিয়া গান, একজন করিয়া গান ইত্যাদিতে শ্রুতিসুখকর কবিগান দেশে প্রচুর সম্ভ্রম লাভ করিল। দেশে হরিচরণের জয়ধ্বনি উঠিল।" ( বঙ্গের কবির লড়াই—ভূমিকা, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য )

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং নাগরিক জীবনে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার দ্রুত বিকাশের ফলে শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায় দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সঙ্গীতাদির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কবিগান দ্রুত অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আর গ্রাম-প্রধান পূর্ব বঙ্গে এই গান অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজিত থাকলেও ক্রমেই তা অশিক্ষিত সাধারণ সম্প্রদায়ের বিকৃত মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত থেকে অশ্লীলতা দোষদুষ্টিবশতঃ ভদ্র সমাজে পরিত্যক্ত ও অচ্ছ্যুৎ অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছিল। বঙ্গ সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ, বাংলার নিজস্ব সম্পদ কবিগানের এই উপেক্ষিত ধিকৃত কালেই কবিগানের আসরে হরিচরণের আবির্ভাব। "তিনি এই গানকে আবিলতা মুক্ত করিয়া নিজ প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া কালোপযোগী আভরণে ভূষিতকরত আসরে উপস্থিত করিলেন। ইহার নবরূপে লোক মুগ্ধ হইল। * * * তিনি স্বীয় প্রতিভার যাদুমন্ত্রে নবভাবে কবিগানকে মার্জিত ও সংস্কৃত করিয়া নব নব রাগরাগিণীর অপূর্ব সংযোগে সুসজ্জিত করিলেন। গান, ছড়া প্রভৃতি সমস্তকেই তিনি অশ্লীলতা ও আবিলতা মুক্ত করিলেন।

হরিচরণ আচার্যের গানে বঙ্গদেশ মুগ্ধ; ছড়ার বাক্‌চাতুর্যে ও গানের উত্তর প্রত্যুত্তরের কৌশলে লোক চমৎকৃত; তাঁহার ভগবৎ প্রেমে লোক শ্রদ্ধান্বিত এবং প্রাণের উদারতায় সকলে আকৃষ্ট। তিনি কবিগানকে নবরূপ দান করিয়াছেন। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া তিনি গানের পসরা লইয়া বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দ যোগাইয়াছেন। তাঁহার রসের পসরা হইতে কৌতুক যৌতুক দেশবাসী অপর্যাপ্ত পরিমানেই পাইয়াছে; সামাজিক ও দেশাত্মবোধক গান তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ কম পায় নাই। হাসির ও ব্যঙ্গ কবিতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য তাঁহার বহুবিধ ব্যঙ্গ ও হাসির গানে এই অর্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশবাসীকে কত হাসাইয়াছেন ছড়া কাটিয়া, মাল ফুকার করিয়া মুগ্ধ ও পুলকিত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বহু কবিওয়ালাকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে পরাস্ত

হইয়াছেন।" তাঁহার সে সব বাক্যুদ্ধের বিবরণ 'বঙ্গের কবির লড়াই' পুস্তিকায় তিনি নিজেই কিছু কিছু উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অনেক কবিয়ালের পরিচয় পাওয়া যায় উপরোক্ত পুস্তিকায়—তা না হলে তাঁরা চিরদিনই বিস্মৃতির অন্তরালে থেকে যেতেন।

হরিচরণ প্রবর্তিত কবিগানের রচনা ও পরিবেশনা সম্পর্কে সমসাময়িক অনেক কবিরসিক ও বিদগ্ধ শ্রোতার মতামত থেকে নবযুগের কবিগানের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র সুস্পষ্ট হবে—

"ঢাকা নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য একজন বিখ্যাত কবি গায়ক। বর্তমান সময় তাঁহার ন্যায় দ্রুত লহর রচনার ক্ষমতা পূর্ব বঙ্গে আর কাহারও আছে বলিয়া শুনা যায় না। রাধাকৃষ্ণলীলায় নূতন নূতন ভাব ফলাইয়া তিনি অনেকগুলি সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দলের সুকণ্ঠ গায়কদিগের মুখে ঐ সকল গান এবং অন্যান্য গীতলহরী যাহারা শ্রবণ করিতেছেন তাহারাই মুগ্ধ হইতেছেন। * * *

সাধারণতঃ অস্পষ্টতার জন্য কবিগান কেহ ভালবাসে না। অনেকগুলি ভগ্ন কণ্ঠের নাকা নাকা উচ্চস্বর গানের ভিতর কি যে কথা হইতেছে বুঝিতে না পারায় কবি'র প্রতি সকলেই বীতশ্রদ্ধ। * * * গান নয়, শ্রোতারা ছড়া পাঁচালীর সময় 'সরকার'দের লঘু ব্যঙ্গ রসিকতার দিক দিয়াই কবিগান শুনার সাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ফলে কবিগানও যে শ্রুতিমধুর একথা বিশ্বাস করিবার লোক·· বিরল। এখনকার অধিকাংশ লোকই মনে করে কবিগান অর্থে সমবেত একটা বিকট কণ্ঠ নির্ঘোষ।

কবি হরিচরণ কবিগানের এ অপবাদ সম্পূর্ণ রকমে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কয়টি স্ত্রীলোক এবং বালকের সাহায্যে বেহালা হারমোনিয়াম সংযোগে অপূর্ব সুরে লয়ে কবি গাহিয়া থাকেন। ঢোল কাঁসির সঙ্গতও অপূর্ব।·· লহর রচনায় তিনি অদ্বিতীয়, প্রতিপক্ষ দলে যে ভাবেরই চাপান গাহুক না কেন, এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টার মধ্যে তিনি অতি সুনিপুণ শব্দ বিন্যাসে রসোচ্ছলভাবে তাহার উত্তর করিয়া থাকেন। আমরা স্তাবকভাবে একথা লেখিতেছিনা, বস্তুতই কবিগান একটা রসের বস্তু ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষগণ উহা শ্রদ্ধার সহিতই উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুপরিচালনার অভাবে এখন তার অস্তিত্বই বিলোপের মধ্যে। যদি কেহ কবিগানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে হরিচরণ দাদার দলের গান কোন সুযোগে শুনিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, ছড়া-পাঁচালী নয়, কবি'র প্রাণ হইয়াছে, সখীসংবাদ, 'কবি' আর টপ্পা।"
( মহেশচন্দ্র কবিভূষণ, সৌরভ, পৌষ, ১৩৩৫ )

দুর্বোধ্য কণ্ঠনির্ঘোষ বলে পরিগণিত কবিগানকে কিভাবে আচার্য কর্তা শ্রুতি সুখকর করে তুলেছেন সে সম্পর্কে রসিক শ্রোতার মন্তব্য—

"ইদানীং কবিতে 'একানী' (একক) গানের প্রচলন হওয়ায় গান শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য হইয়াছে। চিতানে গান শুরু করিয়া দিয়াই সকল গায়ক বসিয়া পড়ে—সর্বোত্তম গায়ক একখানি বেহালা ও ঢোলের তালে বেশ 'মাজাঘষা' সুরে গানটি গাহিয়া যায়। এই ভাবে চারিদিকে চারিজন দাঁড়াইয়া একে একে গানটি আদায় করে। এই প্রথার স্রষ্টা ঢাকা জেলার নরসিংদী নিবাসী কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য মহাশয়। আজ ৮১ বৎসর পাড়ি দিয়া তিনি অন্তিম শ্বাসরোধের প্রতীক্ষা করিতেছেন।" (কবিগান—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ শে আষাঢ়, ১৩৪৬)

হরিচরণ-পূর্ববর্তী কবিগান ও তাঁর হাতে কবিগানের সংস্কার সম্পর্কে সম্প্রতি প্রয়াত এবং আচার্য কর্তার অন্যতম শিষ্য বরিশাল ঝালকাটির নকুলেশ্বর সরকার বলেছেন :

ওমা বাগ্বাদিনী বাগেশ্বরী তুমি মা বাক্যের ঈশ্ববী
তোমার পদে প্রণাম করি আমি লক্ষ বার।
তুমি করে কৃপা দৃষ্টি কাব্য জগৎ করলে সৃষ্টি
সুরের কম্পন স্বরের মিষ্টি তোমারই তৈয়ার ॥
তোমার কৃপায় ওমা বাণী মূকের মুখে ফোটে বাণী
ষড় রাগ ছত্রিশ রাগিনী তোমাতে উদ্ভব।
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র তাল মান লয় স্বতন্ত্র
প্রণবাদি মন্ত্র তন্ত্র তুমিই তো সব ॥
পূর্ববঙ্গে কবির ক্ষেত্র তোমার যত বরপুত্র
কবিগানে দিবারাত্র মজায় সবার মন।
তার ভিতরে সর্বপূজ্য নরসিংদীর হরি আচার্য
অভিনব কবির রাজ্য করেছেন পত্তন ॥
পূর্ববর্তী কবি যারা আদি রসের ভক্ত তারা
শ-কার ব-কার বাক্য ছাড়া চায় না তাদের প্রাণ।
মায়ে ঝিয়ে পিতাপুত্রে সকলে মিলে একত্রে
যেত না সে কবির ক্ষেত্রে শুনতে কবিগান ॥
ছাড়া ভিটায় বটের তলা নয়তো কোন শ্মশানখোলা
বসাত এই কবির মেলা ধনীরা সকল।
বিছানা দেয় না কবিরে ধূলা কাদা মাটির পরে
বসে পড়তো পাছা গেড়ে খেউড় কবির দল ॥
কবির যখন এই অবস্থা করতে তাহার সুব্যবস্থা
নিলেন একটা সরল রাস্তা আচার্য রতন।

ছিঁড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা ভারত পুরাণ চন্ডী গীতা
গৌর কথা কৃষ্ণ কথা জুড়িলেন কীর্তন ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে রসাল কণ্ঠে রসাল সুরে
রসাল কথা কীর্তন করে মজায় সবার মন।
মিষ্টি মধুর সন্ধান পেলে মন যায় কি বাঘা তেঁতুলে
খেউড় কবি গেল ভুলে যত শ্রোতাগণ ॥
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাক্যে দাঁড়িয়ে কবির স্বপক্ষে
আচার্যদেব শ্মশান বক্ষে পারিজাত ফোটায়।
ঘৃণ্য কবি সসম্মানে স্থান পেল উচ্চ আসনে
মাটির কবি টেনে এনে পাটিতে ওঠায় ॥

ভদ্র সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, সঙ্গীত জগতে জ্যাতিচ্যুত কবিগাণের নবজন্মদাতা "হরিচরণ আচার্য একজন রূপদক্ষ স্বভাব শিল্পী, আজন্মসিদ্ধ গায়ক। তাঁহার পদ-লালিত্য, বর্ণনার চাতুর্য, সহজ অনুভূতি, মনোহর অলঙ্কারের সমাবেশ বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। ছড়াতে তাঁহার অপূর্ব বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি ভক্ত ও প্রেমিক ; বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবময় আবেগ তাঁহার অন্যান্য ক্ষুদ্র গানে বিদ্যমান। তিনি একজন কবি। কবিওয়ালার চেয়ে কবি হিসাবে তিনি অনেক বড়। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ বহু গান আছে। সেই সব গানে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই সব গান পূর্ববঙ্গের পল্লীতে সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। কি কবিগানে, কি ক্ষুদ্র বিবিধ গানে, কি ছড়া কাটান সর্বত্রই তাঁহার মৌলিকত্ব বিদ্যমান। কি স্বদেশী কবিতায়, কি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহার সমান হাত।" ( ভূমিকা, কবির ঝংকার—বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় )

কবিগানের চিরাচরিত রচনা রীতি পদ্ধতি অনুসারী এবং বিভিন্ন ভাব রসাশ্রিত সে সব বৃহদাকার সঙ্গীতের রসোপলব্ধি গানের আসরেই সম্ভব। গান বা গান সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ে সে রসাস্বাদনের আশা দুরাশামাত্র। তাই যাঁরা আচার্য কর্তার গান শুনেছেন, তাঁর গানের রসাস্বাদন করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সাহচর্যে এসেছেন, তাঁর গান নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা করেছেন, তাঁদের অভিমতের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই এই প্রবন্ধ রচিত।

নিজস্ব কবি'র দল গঠনের কয়েক বছর মধ্যে তিনি ত্রিপুরা ( কুমিল্লা ) জেলার ত্রিশ গ্রামনিবাসী শ্রীবসন্ত সাধুর ( মা-দাদা সম্প্রদায়খ্যাত ) সংস্পর্শে আসেন। শ্রীমা ও শ্রীদাদার সাহচর্যে হরিচরণের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তার কিছু কিছু বিবরণ তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীবসন্তলীলামৃত' গ্রন্থে লিখিত রয়েছে।

বসন্ত সাধু প্রবর্তিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বসন্ত সাধুর শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পূর্ববঙ্গে গৌরপ্রেমকথা প্রচারে হরিচরণ অগ্রণী ভূমিকা

গ্রহণ করেন। এই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতি অর্জনে আর যে মহাজনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন গৌরধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ। তাঁর রচিত 'অমিয় নিমাই চরিত' পাঠে বাঙ্গালী ভাবগঙ্গায় অবগাহন করেছে। "কৃষ্ণদাস কবিরাজের দার্শনিক-তত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থের কবাট খুলিয়া গৌরলীলার মানবিক গুণের পরিচয় দান শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু আচার্য কর্তা গৌরাঙ্গ সাগরে ডুবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে কন্যারূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গৌরকথা কবিগানের পাল্লায় জুড়িয়া দিয়া জনচিত্ত গৌরমুখী করিয়াছিলেন।" ( ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী ) স্বরচিত বহু গানের ভণিতায় তিনি তাঁর দীক্ষাগুরু ভগবান গোঁসাই, শ্রীমা ও বসন্ত দাদার সঙ্গে শিশিরকুমারের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, যেমন—

ক) গোঁসাই ভগবানের তরী, শ্রীমা কাণ্ডারী, শিশির বসন্ত দাঁড়.বায়।
জয় জয় রাধা নামে বাদাম তুলে, হরিচরণ যারে চলে,—
সুবাতাস তোর বয়ে যায় ॥

(খ) রাখ গুরুপদে নত শির, সাধন ভজন হবে স্থির,
শিশির-বসন্তের কৃপায়।
তোরে নদীয়া নাগরীর সাজে সাজাবে শ্রীমায় ॥

মানুষ হরিচরণ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহের ভূমিকা লেখক ব'লেন—"তিনি একজন কবি। কবিওয়ালার চেয়ে কবি হিসাবে তিনি অনেক বড়। সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর ভগবৎ ভক্তি। তিনি নিজে বৈষ্ণব—গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমে বিভোর। নিজের বাড়ীতে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপিত : নিত্য পূজা ভোগ হয়। কবির দলে তাঁর প্রচুর আয়; কিন্তু সমস্তই গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন। কবিওয়ালা, গায়ক ও কবি হইতে মানুষ হিসাবে তিনি অনেক বড়। যিনি একবার তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তাঁহার কবিগান ও কবিতায় সর্বত্রই বিদ্যমান। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ এবং ইহাও তাঁহার সাফল্যের অন্যতম কারণ।"

১৩৩৬ সন নাগাদ আচার্য কর্তা কবিগান থেকে অবসর গ্রহণ করে—"নিজবাড়ীকে আশ্রমে পরিণত করিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। দিবারাত্র তিনি এখন গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমেই বিভোর। বৈষ্ণব সঙ্গ ও ধর্মালোচনাই এখন তাঁহার একমাত্র কাজ। যৌবনের সেই কূটতর্কের বিচার মীমাংসার চেষ্টা বা ইচ্ছা কিছুই নাই। ভগবৎ প্রেমেই সর্বদা বিভোর।" ( ভূমিকা, কবির ঝঙ্কার—বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় )

হরিচরণ বসন্ত সাধুর অনুপ্রেরণায় এক কাল্পনিক বিবাহানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে

মহাসমারোহে নরসিংদীতে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বিয়ে' দিয়ে তাঁদের 'সংসারী' করেছিলেন। এই কার্যের কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"রামের বামে সীতা আছে, শ্যামের বামে রাই।
গৌর কেন একা রবে, যুগল দেখতে চাই ॥"

শাক্ত-শৈব-গাণপত্য-সৌর-বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা ধর্মমত ও পথ থাকা সত্ত্বেও তিনি গৌরাঙ্গ ভজন পূজনে কেন আত্মনিয়োগ করলেন তার কৈফিয়ৎ তিনি এক গানের মাধ্যমে দিয়েছেন—

"সখী! দীনেশ গণেশ মহেশ বিষ্ণু—
যার মনে যা সে তারে ভজে;
আমার কাজ কি তা খুঁজে।
আমি ভজব অহরহ, গৌরাঙ্গ রসবিগ্রহ,
প্রাণ গেলে পর আমার দেহ,
মিশে যেন নদীয়া-রজে ॥"

হরিচরণ কবিগানকে শুধুমাত্র সুসংস্কৃতই করেন নি। একদল উপযুক্ত ছাত্র-শিষ্য দ্বারা তার ভবিষ্যৎও অনেকটা নিরাপদ করে গেছেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা-নরসিংদীর প্রহ্লাদ সরকার, ভৈরবের দ্বারিকা সরকার, বেণুপুরের অম্বিকা পাটনী, জিনারদির হরেন্দ্র চক্রবর্তী, সাধারচরের সর্বানন্দ আচার্য, মধুসূদন সাহা, মাসাব'র শ্রীতারিণীচরণ সরকার প্রধান। ত্রিপুরা জেলার আন্দিকুটের অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ, চালতাতলির কালীকুমার দে, হেমকুমার দে, বৈষ্ণবচরণ দাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালি জেলার শিবপুরের রমেশচন্দ্র আচার্য, খুলনা জেলার চুনখোলার স্বনামধন্য কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার সর্বজন পরিচিত। বরিশাল-ঝালকাটির কবিপ্রবর নকুলেশ্বর সরকার আচার্য মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য। তাঁর প্রভাবে নকুলেশ্বরের সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। কবি জীবনের প্রারম্ভকালে নরসিংদী বাজারে, কবিগানের পাল্লায় সেই প্রথমবার আচার্য কর্তার মুখনিঃসৃত অভিনব ধরনের ছড়া-পাঁচালী শোনার উদ্দীপনা ও অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নকুলেশ্বর সরকার বলেন—"টপ্পার লহরখানা শেষ করে আচার্য কর্তা যখন পাঁচালীর ডাক-ছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী ছন্দে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, নকুলেশ্বর হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জেরা লেখার কলম ধরার শক্তি তাঁর রইল না। এর আগে নকুলেশ্বর দাশরথি রায়ের পাঁচালীখানা পড়েছেন; অংশবিশেষ মুখস্থও করেছেন। কিন্তু আচার্য কর্তার উপস্থিত পাঁচালী ও ছন্দ দাশরথিকেও যেন হার মানিয়েছে। দাশরথি লেখ্য কবি। তিনি ভেবেচিন্তে পদের যোজনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু কবিয়ালদের তো চিন্তা করে বলার অবসর নেই; উপস্থিত মতে

আসরে দাঁড়িয়ে সুর ছন্দ ও যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বলতে হবে। আচার্য মহাশয়ের ছন্দ রচনা, ভাববিন্যাস ও বাক্যের পারিপাট্য শুনে নকুলেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে কবি দাশরথি হতে এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব শতগুণে বেশী।

রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ( সে দিনের কবির লড়াই'র বিষয়বস্তু ) প্রতিপন্ন করবার জন্য রাধাতন্ত্রের যেসব প্রমাণ আচার্য কর্তা প্রয়োগ করতে লাগলেন, নকুলেশ্বর আজ পর্যন্ত কোন কবির মুখে তা শোনেন নি। জেরা লেখার জন্য কলম ধরার ক্ষমতা হারিয়ে যাদুমন্ত্রে বশীভূত পুতুলের মতো তিনি বসে রইলেন।

ডাক ছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী বক্তৃতা শেষ করে আচার্য কর্তা ধুয়া ধরে সুরেছন্দে গাইতে লাগলেন—

আমার মন বাঁধা রাধা চরণে ॥
আমার ধ্যানেতে রাধিকা, জ্ঞানেতে রাধিকা,
রাধিকা জীয়নে মরণে ॥ মন বাঁধা ··
নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি,
সম্মোহিনী সুরে মুরলী আলাপি,
সংলাপে বিলাপে রাধা মন্ত্র জপি—
থাকি রাধা নাম স্মরণে ॥ মন বাঁধা ··
ষড়জ ছেড়ে যবে গান্ধারেতে যাই,
ঋষভেতে 'রা' আর ধৈবতে 'ধা' পাই,
এই দু'টি অক্ষরে রাধা মন্ত্র গাই—
বিশ্বের সন্তাপ হরণে ॥ মন বাঁধা···
লোকে বলে, আমায় সচ্চিদানন্দ,
সৎ সত্যানন্দ, চিৎ জ্ঞানানন্দ,
আনন্দ স্বরূপে হ্লাদিনীর আনন্দ—
শ্রীগোবিন্দের নাম পুরাণে ॥ মন বাঁধা ···

এই ভাবে অনর্গল পদ বলতে বলতে হঠাৎ সুরের পরিবর্তন করে কীর্তন সুর দিয়ে জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ, চণ্ডিদাসের কিশোরী ভজন, পরকিয়া প্রেমের সাধন-রহস্য এমন সু-রসালঙ্কারে বর্ণনা করতে লাগলেন যে চতুর্দিক উলুধ্বনি হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

কবির পাঁচালীর ভিতরে কীর্তনের সুরে এইভাবে রসাল ভাবাত্মক বক্তৃতা নকুলেশ্বর আজ আচার্য কর্তার মুখেই প্রথম শুনলেন এবং স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাঁচালীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখার মতো শক্তি নকুলেশ্বরের হল না। শুধু নকুলেশ্বরই বা বলি কেন, সে উপস্থিত বক্তৃতার ছন্দ বাণী শুনে শুনে লিখে রাখার শক্তি স্বয়ং ব্যাসদেবের পক্ষেও সম্ভব হতো কিনা জানি না। কলম বন্ধ

রেখে নকুলেশ্বর শ্রবণানন্দেই বিভোর হয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক ধরে পাঁচালী বলে আচার্য কর্তা গান শেষ করে চলে গেলেন।" (কবিয়াল ঃ কবিগান—দীনেশচন্দ্র সিংহ।)

সারা জীবন ধরে আচার্য কর্তা বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি যেহেতু চিরদিনই আত্ম ভোলা, সুতরাং প্রয়োজন মতো গান রচনা করে গাইতেন ; লিখে রাখার তাগিদ অনুভব করতেন না। তাঁর রচিত গান পূর্ববঙ্গের গ্রাম গ্রামান্তরে বিক্ষিপ্ত রয়েছিল। শেষ জীবনে তার কিয়দংশ সংগৃহীত হয়ে তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী-মণ্ডলী কর্তৃক ১৩৩৬ সনে "কবির ঝংকার" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে অমিয় লহরী, বসন্ত লীলামৃত, নবদ্বীপ সুধা, নদীয়া মঙ্গল বঙ্গের কবির লড়াই প্রভৃতি প্রধান। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ মসুয়া গ্রাম নিবাসী পণ্ডিতবর্গ আচার্য কর্তার কবিগানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে "কবিগুণাকর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৩৪৮ সনের ১৩জৈষ্ঠ পূর্ব বাংলার সকল কবিয়ালের কাছে রবি-তুল্য কবির গুরু হরিচরণ আচার্যের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ আরো দুই মাস পরে ২২শে শ্রাবণ।

হরিচরণের মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর হাতে নবসৃষ্ট কবিগানের কি করুণ পরিণতি ঘটে পাঠক তার প্রমাণ পরিচয় মুখবন্ধেই পেয়েছেন।

## কবিরত্নরাজ তারকচন্দ্র কাড়ার (যশোহর)

যশোহব জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে ১২৫২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ এক বিশিষ্ট কাড়ার পরিবারে তারকচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। "কবি তারকের জন্মধাম, যশোহরে জয়পুর গ্রাম, লক্ষ্মীপাশা কালীমায়ের বাড়ির পাশাপাশি।" তাঁর পিতার নাম কাশীনাথ কাড়ার (সরকার)। মাতার নাম অন্নপূর্ণা। কাশীনাথ নিজে কবির সরকার ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তারক ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না ; কিন্তু তিনি 'দেখে শেখার গুণে' গুণী ছিলেন। পনের বছর বয়সে পিতা কাশীনাথ সরকার পরলোক গমন করেন। অনন্যোপায় হয়ে তারকচন্দ্র কিছুদিন পর পিতার কবির দল পরিচালনা করতে মনস্থ করেন।

তারকের দীক্ষাগুরু ছিলেন কালীনগরের মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাই। তিনি তারককে বললেন— তোমার গান ভাল নয়। ভাল করতে হলে ওড়াকান্দি (ফরিদপুর) শ্রীশ্রীহরি-চাঁদ ঠাকুরের শরণাপন্ন হও। হরিচাঁদ ও তৎপুত্র গুরুচাঁদ উচ্চস্তরের সাধক ও কর্মী

পুরুষ ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ধর্ম ও কর্ম জীবনের নিয়ামক বলে পূজিত ও বন্দিত হন। ওড়াকান্দিতেই তাঁদের সাধন পীঠ। হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপা-ধন্য তারকচন্দ্রের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি মহাসাধক বলে পরিগণিত হন। তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। অতি সামান্য লেখাপড়া জানা তারকচন্দ্রের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিপুল অধিকার জন্মে। তাঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর মধুর ও সুরেলা হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে তিনি ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে প্রমাণিত হলেন। কালক্রমে তিনি তারক সাধু বা তারক গোঁসাই বলে পরিচিত হলেন সাধারণের কাছে। হিন্দু সমাজের উচ্চ নীচ বহু লোক তাঁর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

সাধন ভজনে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত হলেও তারকচন্দ্র কবিগান গাওয়া ছাড়েন নি। তাঁর প্রেমরসমধুর কবিগান বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত গ্রাম ও আসরে বিশেষ সমাদরে শ্রুত হতো। কালক্রমে তিনি কবিরসরাজ বলে স্বীকৃতি পান। তারকচন্দ্রের জীবনে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন ও পরিণতি হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপা-বলেই সম্ভব হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। সাবলীল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এই গ্রন্থ পাঠে অদ্যাপি ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী বিমোহিত হন। তাঁকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর শিষ্য-সাকদের নিয়ে যশোহর খুলনা ফরিদপুর অঞ্চলে এক বিরাট কবিগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ফরিদপুরের হরিবর সরকার ও মনোহর সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির শিষ্য ছাড়াও তাঁর অনেক মন্ত্র-শিষ্য ছিল। তাঁর জন্ম ভিটায় এখনো প্রতি বছর প্রচুর লোক সমাগম ও মেলা হয়। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবি তারকচন্দ্রের গানের মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

কবি রসরাজ তারককৃত, শ্রীহরিলীলামৃত,<br>
নৃসিংহরূপ গোলোক গোঁসাইর আদেশে,<br>
ও সেই তারকের ন্যায়, গানে প্রেম দেয়,<br>
এমন কেউ নাই দেশে। হায় গো—<br>
শুনি গোপালগঞ্জ মহকুমায় বাজুনিয়া গাঁয়,<br>
তারক যে বসন্ত গাওয়ায়,<br>
শুনে পিক শুকসারী প্রেমের হাওয়ায়—<br>
প্রেমাকুল পাখিকুল, ফাঁকে ফাঁকে আসরে প্রবেশে ॥

তাঁর কবিগানে মুগ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তি ও আসর থেকে তিনি নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত হন। যেমন—

"মৃত্যুঞ্জয় বলে তুমি শুন মোর সোনা।<br>
উপাধি দিয়াছি তোরে তারক রসনা ॥

কবি গাও কালিয়া'র পন্ডিত সমাজ ॥
উপাধি দিয়াছে তোরে কবিরসরাজ ॥
ইতিনা'র ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান।
সুকবি বলিয়া তোরে দিয়াছে আখ্যান" ॥ ( শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত )

তাঁর রচিত কবি সঙ্গীতের তেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধন ও কীর্তন সঙ্গীত রচনার প্রমান "শ্রীশ্রীমহা-সংকীর্তন" গ্রন্থ। এই পুস্তকে তারক সরকার রচিত বিভিন্ন ধরনের, যেমন নগরকীর্তন, সখিউক্তি, শ্রীদাম বিচ্ছেদ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ, শ্রীগৌরাঙ্গের আক্ষেপোক্তি, ভাবাঙ্গ সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক গান আছে। নিচের সখি-উক্তি সঙ্গীতটি থেকেই তারক সরকারের রচনার সাবলীলতা প্রমাণিত হবে—

তোরা কেন গৌর বলিস, কেঁদে ফিরিস
পুড়ে মরিস প্রেমের পোড়া।
ও নামে লোভ মেটে না, ক্ষোভ ছোটে না,
গৌর প্রেমের এম্নি ধারা ॥
জানিস না ঐ যে গৌর ছিল
মধুর বৃন্দাবনের কাল ছোঁড়া।
নারীর মন করে চুরি, সাধু ভারী,
হয়েছে বৈরাগীর গোড়া ॥
ছিল ও ব্রজের বালক, রাধার খাতক
রাই পদে।বিক্রিত সারা।
দাসখতে নাম লিখিয়ে, দাইক হয়ে
শোধ দিল কই তার এক কড়া ॥
চিরকাল জানি ওটা, স্বভাব শঠা
শিকলী কাটা, না লয় পড়া।
চাউল ছোলা খেয়ে মিঠে, ঠোঁটে ঠোঁটে,
উড়ে পালায় না যায় ধরা ॥
গোকুলের শ্যাম-শুকপাখি, সুখের পাখি
পায় ছিল প্রেম-শিকলী পরা।
শিকলের কল খসায়ে এল ধেয়ে
আর গেল না গোয়ালপাড়া ॥
সইরে গোলোকের চাঁদ, এই হরিচাঁদ
গোলোকচাঁদের দুঃখপাশরা।

চাঁদে চাঁদে মিশে গেল, তারক হল
সে চাঁদ বিনে ছন্নছাড়া ॥

সেকালে কবিগানে তারকের টপ্পা, আনন্দের পাঁচালী ও ষষ্ঠীর ধুয়ার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। একদা কাশীপুর গ্রামে তিনি ও নবীন তাঁতীর মধ্যে গান হচ্ছিল। তিনি এক টপ্পায় নবীনকে বললেন—

শুন হে নবীন তোমায় করি নিবেদন,
বহু শাস্ত্র আদ্যোপান্ত করেছ পঠন।
দেখিয়াছ কোথাও কি বিধান বিধির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর নবীন তাঁতীর জানা ছিল না। শিবনাথ ভট্টাচার্য (ফুকুরো গ্রামবাসী) নামে জনৈক শ্রোতা নবীনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং প্রস্রাবের অছিলায় নবীনকে বাইবে যাবার ইঙ্গিত করলেন। নবীন বাইরে এলে তাকে উত্তরের সঙ্কেত জানিয়ে দিলেন। তখন নবীন তাঁতি আসরে গিয়ে জবাব দিলেন—

বারোয়ারী মাতা ফেটে হলেন চৌচির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥

তারক সরকার নবীন তাঁতীর জবাবের উৎস জানতে পেরে পরবর্তী আসরে খোঁচা দিলেন—

ওরে বেটা নবনে তাঁতী,
এ যাত্রা তুই বেঁচে গেলি—শিব ঠাকুরের মুতি।

কথিত আছে একবার ঢাকা জিলায় গান করতে গেলে তাঁর 'জাতি' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তব দিয়েছিলেন—

জলে ও স্থলেতে বাস আছে গোদা ঠ্যাং,
চিংড়ী নয় কূর্ম সম হয় পীঠস্থান।
মানুষ দেখিলে পরে কামড়াতে আসে,
মধ্যাক্ষর বাদ দিয়ে 'র' যোগ কর শেষে।

অর্থাৎ কাঁকড়ার মধ্য 'ক' বাদ দিয়ে 'র' যোগ করলে যে 'কাড়ার' শব্দ হয়, তাই তাঁর জাতি।

এই ভক্ত ও সাধক কবি ১৩২১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করেন ॥

(সূত্র : শ্রীননীগোপাল দাশ - পূর্ব বঙ্গের অধুনালুপ্তপ্রায় কাড়ার জাতির ইতিহাস, কবি রসরাজ তারক গোঁসাই, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ইত্যাদি)

# রামকুমার সরকার ( ঢাকা )

ঢাকা জয়দেবপুরের ( ভাওয়াল ) রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী পূর্ববঙ্গে কবিগানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নিজস্ব এক সখের কবির দল ছিল। পূর্ব বঙ্গের প্রধান প্রধান দোহারদের নিয়ে তিনি এই বিশিষ্ট দল গঠন করেন। জয়দেবপুর নিবাসী কবিয়াল রামকুমার সরকার রাজাবাহাদুরের দলের গান রচনা ও জবাব টপ্পা করে দিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজায় কলিকাতার সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও মাধব ময়রা রাজবাড়ীতে কবিগান গাইতে যান। প্রথম দিন কলিকাতার দুই দলের গান হলো। পরদিন পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে রাজা বাহাদুর সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের বিরুদ্ধে নিজের দল নামিয়ে দিলেন। রামকুমার সরকার সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর চাপান দিয়েছিলেন—

এক সীতানাথ ত্রেতা যুগে, সীতায় হলেন বাম,
এক সীতানাথ রাজা ছিলেন, কলিকাতাতে ধাম।
এক সীতানাথ করতেছে আজ, পাটনীর দলে কোট্‌নামী,
বল দেখি মুখার্জী গো—
সীতানাথের মধ্যে কোন্‌ সীতানাথ হও তুমি ॥

ঐ আসরে রাজা বাহাদুরের বংশ পরিচয় দানকালে রূপকভাবে মুখার্জী মহাশয় বলেন—

তাঁতী ছিল বাবু হল ঢাকার-মুন্সী নন্দলাল,
ভাওয়ালের জঙ্গলে উদয় হল বজ্রযোগিনীর পুশীলাল।

আর রাজবাড়ির পশ্চিম থেকে উত্তর পর্যন্ত 'গাঙ্গিনা' নামে যে বিস্তীর্ণ জলাশয় আছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুখার্জী মহাশয় গাইলেন—

দেখে যাই কীর্তি চমৎকার
ভাওয়ালের রাজা যিনি, জলাশয় দিলেন তিনি,
ওটা নয় দীঘি নয় পুষ্করিণী,—কিম্ভূত কিমাকার ॥

রামকুমার সরকার চমৎকার সখী-সংবাদ ও বসন্তগান রচনা করতেন। তাঁর রচিত একটি বসন্তগানে বিরহিনী রাই কোকিলকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

কোকিলে! এ সুখ বসন্তকালে,
তুই অমঙ্গল ধ্বনি করিস কেন?

বিপক্ষ দলের কবিয়াল কবির রীতি অনুসারে বিপরীত ভাবাত্মক উত্তরে বললেন—

ইহা আমার অমঙ্গল ধ্বনি নহে;
আমি ঋতুরাজ বসন্তের অনুচর,
সুখবসন্ত সুখের সময় মঙ্গল ধ্বনিই করিতেছি।

রামকুমার সরকার পরের আসরে প্রত্যুত্তরে গাওয়ালেন—

রেখে দে তোর মঙ্গল ধ্বনি রে কোকিল,
ডেকে শত্রু আনিস্ কি লেগে ?
আমার আর মঙ্গল কিসে, আছি কুব্জা-শনির শেষে,
বিরহচিন্তা-ধূমকেতু উদয় হল হৃদ আকাশে।
কষ্ট অষ্টম বৃহস্পতি, দুর্দশায় হয়েছে স্থিতি,
মঙ্গল এখন করলে গতি, সেও যাবে পঞ্চম ভাগে ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকলে এই পদের রসাস্বাদন করা সুকঠিন। সেকালে কবির দলে একপ্রকার বিরহ গান প্রচলিত ছিল। কোথাও গানে বিপক্ষ দল রামকুমার সরকারকে মালঠেস্ করে গান করল—

প্রাণ ! আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি।

রামকুমার সরকারও মালঠেস্ করে জবাব দিলেন—তোমায় আমায় কেমন ভালবাসা একটু শুন—

যেমন চোরে আর কামারে পিরীত, সোনা চুরির দিনে,
অতি সস্তা দরে কিনে।
চোর যখন ধরা পড়ে, দারোগায় বাঁধিলে পরে,
তখন কামারে কয় চোর শালারে—
কোন্ শালায় কারে চিনে ॥

রামকুমার সরকার যদিও নিজে ভাল গাইতে পারতেন না, কিন্তু সঙ্গীত রচনাতে ও ছড়া কাটায় তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেন। অনেক বিখ্যাত কবিয়ালকে তিনি বাক্যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তাঁর রচিত গান ভাওয়াল রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেই গ্রন্থের কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। ( সূত্র—কবির ঝঙ্কার ও বঙ্গের কবির লড়াই )

## লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমাধীন কাশীপুর গ্রামে কবিয়াল লোকনাথ চক্রবর্তীর নিবাস ছিল। কবিগানের প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তৎকালীন অশ্লীলতা দোষদুষ্ট কবিগানে জড়িত থাকলেও তিনি মর্যাদা হানির ভয়ে স্বয়ং আসরে উঠে ছড়া-পাঁচালী গাইতেন না। বাসা ঘরে বসে তাঁর দলের লোকজনদিগকে পরামর্শ ও মন্ত্রণা দিতেন। চক্রবর্তী মশাই'র একটি অতি উৎকৃষ্ট কবির দল ছিল। সে দলে দয়া ধুপী ও অর্জুন ধুপী ছড়া-পাঁচালী গাইত।

একবার বাঙ্গলা গ্রামের হাটখোলায় অন্য জেলা থেকে আগত কবিয়াল বিশ্বম্ভর ঠাকুরের দলের সঙ্গে লোকনাথ চক্রবর্তীর দলের গান হয়। ঠাকুরমশাই'র স্ত্রীলোকের দল। দলে শ্যামা নাম্নী এক গায়িকাকে অর্জুন ধুপী অশালীন ভাষায় গালাগালি দিলে বিশ্বম্ভর ঠাকুর টপ্পায় অর্জুন ধুপীকে বললেন—

দলের কর্তা ঠাকুরজী, গোমস্তা ধুবা বাবাজী,
এমন পাজি মিলে অতি কম।
শ্যামাকে কেন্ বল্লি মন্দ, হারামজাদা বেসরম ॥

উক্ত টপ্পার জবাব দেওয়ার জন্য চক্রবর্তী মশাই অর্জুন ধুপীকে নিম্নোক্ত টপ্পাটি রচনা করে দিয়েছিলেন—

বল্লে নাকি আমায় তুমি, আমি বেসরম্ !
লয়ে বাজারের সব পেশাকার, কবিগানের দল তোমার,
জাতের বিচার নাই ত আর একদম ॥
তুই যে ব্রহ্মকুলে জন্ম নিলে—
রাখলে কই আর কুলমান ;
মৈলে কি তুই মুক্তি পাবি—
হবি তুই···কুকুরের সন্তান।
আগে ডাকলে বাবাজী, তারপরে বল্লে পাজি,
আন্দাজী করিস কবিগান।
( এখন ) তুই পাজি না আমি পাজি—
বুঝে শে পাজি শয়তান ॥

নেত্রকোনার কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য তাঁর কবি জীবনের প্রারম্ভকালে লোকনাথ চক্রবর্তী মশাই-র নিকট থেকে অনেক উপদেশ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে গুরুস্থানীয় মনে করতেন। লোকনাথ চক্রবর্তী অকৃতদার ছিলেন। আনুমানিক ১৩০২ সালে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে পরলোকগমন করেন। ( সূত্র—সৌরভ, মাঘ, ১৩২৮ )

## গোবিন্দ ঠাকুর ও কিঙ্কর শীল ( ময়মনসিংহ )

গোবিন্দ ঠাকুর ( আচার্য ) ও কিঙ্কর শীল নেত্রকোনা থেকে (ময়মনসিংহ) আট/নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রামেশ্বরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই উভয় কবি গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন বলে উভয়ের কবি-জীবনী এক সঙ্গে আলোচনা না করে পারা যায় না।

গীতবাদ্যে গোবিন্দ ঠাকুরের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সেকালের কবিয়ালদের মধ্যে কণ্ঠস্বরে তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। রাগরাগিণীর উচ্চতায় ও মধুরতায় তার মতো সুকণ্ঠ গায়ক বিরল ছিল। বেহালা, সারিন্দা, সানাই, এস্রাজ, খোল, ঢোল, ঢোলক, খমক, খঞ্জরী, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তার সম্পূর্ণ দখল ছিল। রাগিণীর গুণে তাঁর ছড়া-পাঁচালী এমন মধুর হতো যে তা শ্রবণে শ্রোতৃ-মণ্ডলী অতুলানন্দ উপভোগ করতেন। তাঁর মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রামু মালী, রামগতি শীল, রামদয়াল নাথ ও বিজয় নারায়ণ আচার্য অন্যতম ছিলেন। গীতবাদ্যে পারদর্শিতা ও সচ্চরিত্রতার গুণে সমাজে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। কবিগান গেয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও "তালের কড়ি ফালে যায়"—অর্থাৎ যা আয় করতেন সবই ব্যয় করতেন।

গোবিন্দ ঠাকুরের কাব্য জগতের বন্ধু কিঙ্কর শীল। সাংসারিক কাজকর্মের অবসরে উভয়ে একটি ঘরে বসে প্রায়শঃ কাব্যালোচনা ও অনুশীলন করতেন। কিঙ্কর কোন দিন আসরে উঠে গান করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকীভাবে টপ্পা কাটাকাটি সমস্যা পূরণ করতেন। কবি বিজয়নারায়ণের মতে কিঙ্কর "একমাত্র আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন অংশে গোবিন্দ ঠাকুর অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং অনেকস্থলে কিঙ্করের গীতে টপ্পায় কবিত্বের ঝঙ্কার অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হইত।"

নিচে উভয়ের সঙ্গীত রচনা শক্তির কিছু নমুনা দেওয়া গেল—

### টপ্পা ( হনুমানরূপী গোবিন্দ ঠাকুর )

হনুমন্ত নামটি আমার পবন নন্দন।
শক্তিশেলের আঘাতে, লক্ষ্মণ পড়লেন লঙ্কাতে,
আমি আইলাম ঔষধের কারণ ॥
আপনার দর্শনেতে যাত্রা সিদ্ধি,—সিদ্ধি হবে মনস্কাম।
জিজ্ঞাসি তপস্বী ঠাকুর, আপনার কিবা নাম ?
অতিথি জেনে মোরে, বলতেছেন সমাদরে,
কিছুকাল করিতে বিশ্রাম।
আমি বিশ্রাম কল্লে পরে, নষ্ট হবে রামের কাম ॥

### উক্ত টপ্পার জবাব ( কিঙ্কার শীল—রামগিরি ছদ্মবেশী কালনেমি )

রামগিরি নামটি ধরি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
যদিও তুমি বানর হও, আমার পক্ষে কমি নও,
অতিথিরূপে তুমি নারায়ণ।

(আমার) সর্বধর্ম নষ্ট হবে তুমি গেলে অভুক্ত,
দোহাই তোমার, ফল খেয়ে যাও হনুমান ভক্ত।
দৈবে আমার শুভযোগ, না করিলে জলযোগ,
থাকে না নিজের মাহাত্ম্য।
তোমার কার্য নষ্ট হইতে পারে
মন হইলে মোর বিরক্ত ॥

এবারে মন্দোদরী-রূপী কিঙ্কর শীলের একটি টপ্পা এবং সূর্পনখা-রূপী গোবিন্দ ঠাকুরের জবাব দেওয়া গেল—

মন্দোদরী নামটি আমার দানব দুহিতা।
তুমি মহারাজের ভগিনী, সম্বন্ধে হও ননদিনী,
দিন রজনী কই তোমার কথা ॥
তোমার মত গুণের গুণের ননদ, অনেক তপস্যাতে পাই।
বল শুনিগো ঠাকুর কন্যে, কি জন্যে তোর নাকের আগা নাই ॥
জিনি রম্ভা উর্বশী, তুমি এমন রূপসী,
লঙ্কাপতি রাবণ তোমার ভাই।
দেখে তোমার এ দুর্দশা, লজ্জা রাখার পাই না ঠাঁই ॥

(জবাব)

বল্‌ব কি দুঃখের কথা, শুভাশুভ কর্মের ফল।
পঞ্চবটি কাননে, শ্রীরামের ভাই লক্ষ্মণে,
আমার প্রতি করেছিল বল।
আমি সতীত্ব রেছি রক্ষা, তার বদলে দিছি নাক।
রাঙ বদলে সোনা পাইলে, বাজুক না কলঙ্কের ঢাক ॥
কর্ব বলে দেবার্চন, কর্তে পুষ্প আহরণ,
গিয়াছিলাম, দুষ্টে পাইল ফাঁক।
তুমি মাঝ ঘরে বসিয়া থাকো,
তাইতে তোমার এত জাঁক ॥

এই পল্লী কবিদ্বয় অবসর সময়ে পদ-পূরণ করে আনন্দ পেতেন। একজন একটি শেষ পদ বলতেন, আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে পদ যোজনা করে শেষ পদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন। যেমন, গোবিন্দ ঠাকুর বললেন—"মাণিক পীরের পুঁথি"; কিঙ্কর পূর্বাংশ যোগ করে নিম্নোক্ত ছড়া তৈরী করলেন—

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গীতা
যার মধ্যে স্ত্রী—সাবিত্রী, লক্ষ্মী, দুর্গা সীতা।

কবি গাইতে তাই চাই, আর চাই থুঁথি, ( মুখ )
চাঙ্গে তুল্যা থও নিয়া তোমার মাণিক পীরের পুঁথি ॥

কিঙ্কর শেষ পদ দিলেন, "সিধা সাদা দুই আনা"—গোবিন্দ ঠাকুর পদ-পূরণ করলেন—

কোন বাড়ী শ্রাদ্ধ হইলে নিমন্ত্রণে যাই।
দধি চিড়া চিনি সন্দেশ পেট ভরিয়া খাই ॥
বিদায় হইয়া আসার কালে পাই কিছু দক্ষিণা।
বেশী কিছু না পাইলেও সিধা সাদা দুই আনা ॥

আবার গোবিন্দ ঠাকুর শেষ পদ বললেন—"ইকড়তলী বাষ্যা।" কিঙ্কর ছড়া পূর্ণ করলেন—

পঞ্জী লইয়া গণক ঠাকুর যান বাড়ী বাড়ী।
পাছে পাছে ধাইয়া ছুটে পাড়ার পুলাবুড়ী ॥
কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরের ঠাঁই।
এবার কেমন বর্ষা হবে—ঠাকুর বলেন চাই ॥
বুড়া ঠাকুর উত্তর করেন, কিছু কাশ্যা কাশ্যা।
পঞ্জীর মাঝে লেখে এবার—"ইকড়তলী বাষ্যা ॥"

আবার কিঙ্কর শীল শেষ পদে বললেন—"তারাই বটে সাধু লোক।" গোবিন্দ ঠাকুর ছড়া বাঁধলেন—

সকলে সমান জ্ঞান নাহি আত্মপর,
অহঙ্কার অভিমান শূন্য কলেবর।
দীনহীন দরিদ্রের বুঝে মনের দুখ,
সংসারের মাঝে—তারাই বটে সাধু লোক।

আনুমানিক ১৩২০ সালে গোবিন্দ ঠাকুর পরলোক গমন করেন। কিঙ্কর শীলের মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছ জানা যায় নি। ( সূত্র—সৌরভ, কার্তিক, ১৩২৯ )

## হারাইল বিশ্বাস ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহের নেত্রকোনা মহকুমার চাইরগাতিয়া গ্রামে বিশ্বাস বংশে কবিয়াল হারাইল বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। গতানুগতিক ধারায় শিক্ষিত না হলেও তিনি স্বভাব কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কবিগান, ঘাঁটুগান, বাউলগান ইত্যাদি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

( সূত্র—সৌরভ, চৈত্র ১৩২৬

# লোচন কর্মকার ( ময়মনসিংহ )

কবি লোচন কর্মকার ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অধীন আমতলা গ্রামে জন্মেছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন কবি। নেত্রকোনার ভক্তকবি বিজয়নারায়ণ আচার্য, হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক ছিলেন। তিনিও লোচন কর্মকারকে দেখেন নি। তার অনেক আগেই তিনি লোকান্তরিত হন। সুতরাং লোচন কর্মকার সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তার জন্য কবি বিজয়নারায়ণ আচার্যের প্রবন্ধের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি লিখেছেন—"পল্লীকবি লোচনের কবিত্ব কৌমুদীর অপূর্বচ্ছটায় পল্লীস্থ পল্লী সাহিত্যের পর্ণকুটীর বিলক্ষণ প্রদীপ্ত। লোচন কোন পুস্তকাদি রচনা করিয়া যান নাই। কেবল তাঁহার রচিত কতকগুলি ছড়া ও গীতি কবিতা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। * * * কবি লোচন কর্মকারের অতি সুন্দর একটি কবিগানের দল ছিল। তিনি স্থানে স্থানে এই দল লইয়া স্বরচিত মান, যোগী, সন্ন্যাস, গোষ্ঠ, সখী সংবাদ, প্রভাস-মিলন, মালসী, বিজয়া ও কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে অতুলানন্দ দান করিতেন।

*　　*　　*　　*

আমাদের এই কর্মকার কবির রচিত ছড়াগুলি অতি সুন্দর হইত বলিয়া অনেকে তাহা লিখিয়া শিখিয়া লইত। এতদঞ্চলের অধিকাংশ ছড়াই "লোচনের ছড়া" বলিয়া প্রবাদিত। * * *

আমি বহুদিন যাবত লোচন কর্মকারের গীত ও ছড়া সংগ্রহে ব্রতী হইয়াও বিশেষ রূপে সাফল্যলাভে সমর্থ হইতে পারি নাই। কারণ, অঙ্গহীনাবস্থায় ভিন্ন এখন আর একজনের মুখেও একটি ছড়া বা গান সম্পূর্ণরূপে শুনা যায় না।

ময়মনসিংহের দাশু রায় রামগতিশীল ও নিরক্ষর কবি রামু মালীর মুখে কবি লোচন কর্মকারকৃত ছড়া ও গান সময় সময় শুনিয়া সুখী হইতাম। সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু তখন মনোযোগের সহিত সেগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করি নাই। তবে যে দু'চারটি ছড়া কি গান খুব ভাল লাগিত তাহাই লিখিয়া লইয়া মুখস্থ করিতাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমালোচনার বাহিরে থাকাতে সেই মুখস্থ করা কবিতা-গুলিরও অনেকগুলি এবং অনেকগুলির অনেকাঙ্গ বিস্মৃতির বিবরে প্রবিষ্ট হইযা গিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাই অদ্য সৌরভের কৃপাময় পাঠক পাঠিকা-গণের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কবি লোচন কর্মকারের কবিত্ব শক্তির কিঞ্চিদাভাষ প্রদান করিতেছি।"

এক আসরে বিপক্ষ সরকার কবির ভাবে "রাবণ" হয়ে লোচনকে হনুমান উল্লেখ করে "মুখপোড়া বান্দর" বলে অভিহিত করলে লোচন ছড়াতে উত্তর দিলেন—

আমার মুখ ত আমি পুড়লাম, লেজের আগুন দিয়া,
তোর কি বিশেষ লাভ হইবে এই কথাটি কইয়া।

জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র আমি তাঁহার দাস,
ব্রহ্মাণ্ড হইলেও ধ্বংস আমার নাই বিনাশ।
নর-বানরে রাক্ষস গোষ্ঠী সব করিবে ক্ষয়,
দুই চাইর দিনের মধ্যে দেখবি তোর দশা কি হয় ॥
তুই আমারে গালি দিলে মুখপোড়া বান্দর ;
এই বান্দরে দখল করবে রাক্ষসের আন্দর।
আমার গেছে মুখটা পোড়া, তোরও ত মুখপোড়া,
সূর্পনখার নাক্ কাটিল, কেমনে লাগবে জোড়া।
পরপুরুষে নাক কাটিল তোর ভইনেরে ধরে,
মুখপোড়া তোর বাকি কিরে, দেখত বিচার করে,
তোর ভইনের নাই নাকের আগা, দেখে হাসে লোক,
কেমন করে লোকের কাছে দেখাস পোড়া মুখ।
বোচা নাকে বেসর দিতে পারে না তোর ভইনে,
লজ্জা পাবে বইলে তোরে বেশী কিছু কইনে ॥

লোচন কর্মকার বৃন্দাদূতীর জবানীতে মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে আর্জি পেশ করেছিলেন তা পূর্ববঙ্গীয় কবিগানে সখী সংবাদ গানের নতুন রীতির পদক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে—

রাধার দাসী বৃন্দা নাম, শ্রীপদে করি প্রণাম,
গুণধাম চিন কি আমারে ?
বহুদিন পরে দেখা, সেই যে ব্রজে ছিল দেখা,
প্রাণসখা মনে কি তা পড়ে ?
তোমার সাধের রাই-কিশোরী, ধরাতলে আছে পড়ি
হরি হরি কি দুর্দশা তার !
স্বর্ণ বর্ণ দেহ ছিল, বিবর্ণ হইয়া গেল
চিকন কালা—রাখ সমাচার ?
কালো ভেবে হৈল কালী, কালী যেমন শ্মশানকালী
বনমালী বলি তোমার ঠাঁই।
তুমি বিনে শ্যামরায়, নিকুঞ্জ শ্মশানের প্রায়
তাহে হায় পড়ে আছেন রাই ॥
ব্রজের দুঃখের কথা, কব কি তোমার হেথা
আর কথা না সরে বদনে
ধরি বন্ধু তব পায়, রাধার জীবন যায়,
শ্যামরায় চল বৃন্দাবনে ॥

কবি লোচন কর্মকারের সময় কবিগানের মাঝে মাঝে অন্য ধরনের ছড়াও আসরে বলার রেওয়াজ ছিল। নিম্নে লোচনকৃত সে রকম দু'টি ছড়া দেওয়া গেল—এগুলিতে পল্লীগীতির সুস্পষ্ট রেশ এবং আধুনিক গানের ছায়া পাওয়া যায় ঃ

ছড়া—১

জল ভরিতে যমুনাতে চলছে ব্রজনারী।
জটিলা কুটিলা পাছে—আগে বড়াই বুড়ী॥
মাঝখানেতে চান্দের মালা বৌ সারি সারি।
বাউটী হাতে, পিন্ধনেতে, নানা রঙ্গের শাড়ী।
মাথায় খোপা, ফুলের ঝোপা, দেখতে পরিপাটি।
চাপার কলি অঙ্গুলেতে হীরামণির আংটী॥
সর্ব অঙ্গ ভরা কত স্বর্ণ অলঙ্কার।
ঢল ঢল করে কিবা যৌবনের বাহার॥
লিলুয়া বাতাসে তুলে শাড়ীর মাঝে ঢেউ
লোচন বলে নয়ান ভুলে যদি দেখে কেউ॥

ছড়া—২

সকাল বেলা কদমতলা নন্দের কালাচান,
বাঁশী হাতে দাঁড়ায়েছে পাত্যা প্রেমের ফান।
সখী সঙ্গে মনোরঙ্গে রাধিকা যায় জলে,
মেঘ বরণ মদন মোহন দেখল কদম তলে।
মন-ময়ূরী নাইচা উঠল বুকের ভিতর তার,
কলসী কাঁখে দাঁড়াইল, চলতে নারে আর।
কুটিলার কটুবাক্যে ধীরে ধীরে যায়,
আড় নয়ানে ঘুমটা টাইনে কালার পানে চায়॥
তাই দেইখে কুটিলা কয় থাকলো মাগী থাক,
দাদার কাছে কইয়া তোর কাটাইব নাক।
গোপের কুলে কালী দিলে ছিনাল মাগী তুই,
সকল ঘরে পানি পড়ে উদাস থাকলে টুই॥
ঘরের বাহির কর্বো তোরে কৈলাম খাঁটি খাঁটি,
লোচন বলে কৃষ্ণে প্রেম ত বড়ই লটখটী॥

(সৌরভ—আশ্বিন. ১৩২৬)

## জয়চন্দ্র মজুমদার ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার পাইকপাড়া গ্রামে ৺জয়চন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব-বঙ্গের প্রাচীন কবিয়ালদের মধ্যে ইনি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। কবিয়াল জয়চন্দ্র ও ত্রিপুরার আর এক কবি গৌর সরকার-এর কাল ও কবিত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক হরিচরণ আচার্যের নিম্নোক্ত ফুকারটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

মেঘনার পূর্ব পারে, জয়চন্দ্র আর গৌর সরকারে,
"সরকার" হয় আদি
তারা পেল কবি'র গভর্ণরী গদী।
এখন দেখি দর্শোবিশে,
"সরকার" হয় ঘোড়ার সৈসে, ( সহিসে )
কোলা ব্যাঙে বলে হেসে, লঙ্ঘিবে নদী ॥

মৃত কবিয়ালদের নিয়ে রচিত একটি ডাক-গানেও হরিচরণ "জয়চন্দ্র নাই কবির তরঙ্গ" বলে আক্ষেপ করেছেন।

একবার কোন এক আসরে ৺মজুমদার বিপক্ষ সরকারের দৈহিক খর্বত্ব ও কোটরগত চক্ষু কটাক্ষ করে "বাইশ আঙ্গুল খোরইল্যা" পেঁচা বলে অভিহিত করেন। উত্তরে বিপক্ষ সরকার গাইলেন—

বললে আমায় জয়চাঁদ বাছা
বাইশ আঙ্গুল খোরইল্যা পেঁচা,
স্বীকার মেনে যাই।
আমি পেঁচা হয়ে গাছে উঠে,
উড়ে পড়বো বদনকোটে ( জয়চন্দ্রের শ্বশুরবাড়ী )
ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোঁট মিলায়ে
করবো খ-ও কারে রল ॥

আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষার আড়ালে পদটিতে যথেষ্ট আদিরস ও গ্রাম্যরসিকতা লুক্কায়িত আছে।

৺মজুমদারের শিষ্যদের মধ্যে পাইকপাড়ার জগবন্ধু দত্ত, ত্রিপুরা হুসেনপুরের হরকুমার শীল এবং নোয়াখালী বচের গ্রামের কালীকুমার মাষ্টারের ( দে ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক এবং কবিগানের স্বর্ণযুগের নোয়াখালী ত্রিপুরা অঞ্চলের অন্যতম যোগ্য প্রতিনিধি বলে গণ্য হতেন।

শোনা যায় জয়চন্দ্র তীর্থ ধর্ম করতে একবার পশ্চিমে যান এবং ফিরতি পথে কলিকাতায় নামেন। একদিন কালীঘাটে মন্দিরে তিনি স্বরচিত স্তোত্র কবিতায় কালীবন্দনা করছিলেন। জয়চন্দ্রের উচ্চ কণ্ঠের মধুর আবৃত্তি শুনে চারপাশে

লোক জড় হয়ে যায়, এবং রচনার মাধুর্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তখনো কলিকাতায় কবিগানের প্রদীপ টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল। এই বাঙ্গাল কবিয়ালের আশ্চর্য সঙ্গীত প্রতিভার কথা কলিকাতার কবি-রসিকদের কর্ণগোচর হয়। তিনি তাঁর সঙ্গী দোহার দইয়া (দয়ারাম) সহ কয়েক পালা কবিগান গেয়ে রসিকজনের মনোরঞ্জন করেন।

কলিকাতা থেকে ফিরে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে জয়চন্দ্রের জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। রোগাক্রান্ত অবস্থায় রচিত নিম্নোক্ত সঙ্গীতাংশে তার মৃত্যুর কারণ উল্লেখ রয়েছে—

কালী! ভয় পেয়ে ডাকি কালী গো
মা শীতলা একান্ত নিতান্ত করলো আক্রমণ।
বাইশে জ্যৈষ্ঠ নিশির শেষে,
দিব্য এক বালিকার বেশে,
শিয়রে দাঁড়াল এসে, বোবেরি মতন।
তখন বুঝেছি সার জয়চাঁন মজুমদার—
এবার মানবলীলা করবে সম্বরণ॥

(সূত্র ঃ কবির ঝঙ্কার, সন্দ্বীপের ইতিহাস, বঙ্গের কবির লড়াই এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

## ভুবন বৈরাগী ও বড় হরি সরকার (ঢাকা)

এই দুইজন কবিয়াল ঢাকা জেলার অধিবাসী এবং হরিচরণ আচার্যের পূর্ববর্তী কবিয়ালদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ছিলেন। এদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। কেবলমাত্র হরিচরণ আচার্যের প্রদত্ত নিম্নোক্ত ঘটনা ছাড়া—

"একবার সোনারগাঁ বৈদ্যের বাজারে ৺ভুবন বৈরাগী ও বড় হরি সরকারের কবিগান হয়। ভুবন বৈরাগীকে দূর হইতে আসিতে হইয়াছিল। এজন্য বড় হরি সরকার অপেক্ষা ভুবন বৈরাগীর বায়না ১০ টাকা বেশী হইয়াছিল।

ছড়া পাঁচালিতে ভুবন বৈরাগী প্রতিপক্ষ বড় হরি সরকারকে বলিয়াছিলেন যে "কে কেমন সরকার টাকা চুক্তিতেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" প্রত্যুত্তরে বড় হরি সরকার মহাশয় আসরে আসিয়া ছড়া কাটিলেন—"বর্ত্তমান সময়ে তাস খেলায় একটা বিন্তি খেলা বাহির হইয়াছে। ইহাতে সবই বিপরীত দেখা যায়। সাহেবকে তিন ফোটা ধরিতে হয়। সাহেবদের সামাজিক নিয়মে বিবির সম্মান সাহেব হইতে

অনেক বেশী—কিন্তু সেই বিবিকে দুই ফোটা ধরিয়া থাকে, গোলাম একটা তুচ্ছ তাস বৈ আর কিছুই নহে, তথাপি এক গোলামেই কুড়ি ফোঁটা।" এই কবিত্ব শুনিয়া সভ্য লোকেরা খুব আনন্দ পাইয়াছিলেন।

ঢাকা শাঁখারি বাজারে বড় হরি সরকারের সঙ্গে এক শাঁখারি সরকারের গান হয়। শাঁখারি সরকার বড় হরি সরকারকে প্রশ্ন করিলেন ঃ

'কি কারণে গগনেতে ধূমকেতুর উদয়।"

উত্তরে বড় হরি সরকার বলিলেন—

শঙ্খের বাদ্যে দেবতা তুষ্ট তারে ঘসে করলি ক্ষয়।
সেই পাপেতে গগনেতে ধূমকেতুর উদয়॥

( সূত্র—বঙ্গের কবির লড়াই )

## ভৈরব মজুমদার ( ঢাকা )

হরিচরণ আচার্যের পূর্ববর্তী কবিয়ালদের মধ্যে ভৈরব মজুমদারও বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। ইনি ঢাকা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ভৈরব মজুমদার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা গেল না। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন রাইচরণ সূত্রধর।

( বঙ্গের কবির লড়াই )

## রাইচরণ সূত্রধর ( ঢাকা )

ভৈরব মজুমদারের শিষ্য রাইচরণ সূত্রধর ঢাকা জেলার কালিয়াকুড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি হরিচরণ আচার্যের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার ভক্তকবি বিজয়নারায়ণ আচার্যের সঙ্গে একবার নেত্রকোনা সহরে কবিগান হয়েছিল। রাইচরণ দীনতাসূচক ছড়াতে বলেছিলেন, "লোহা যেমন কাষ্ঠের সঙ্গগুণে জলে ভাসিতে পারে, তেমনি আমিও ৺ভৈরব মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গগুণে লৌহ হইয়াও কবিত্বরূপ জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।" প্রত্যুত্তরে বিজয়নারায়ণ—"লৌহ কাষ্ঠের সঙ্গে জলে ভাসিতে পারে বটে, আবার ভাল কারিকর ভালরূপ গঠন করিলে লৌহ কাষ্ঠের সঙ্গ ছাড়াও জলে ভাসিতে পারে। তার সাক্ষী কড়াই।" রাইচরণ আবার বলেছিলেন—

"বিনা বাতাসে নদী লড়িতে পারে না।"

বিজয় আচার্য—"কেন, নদীতে জাহাজ আসিলেও বিনা বাতাসে নদী লড়িয়া উঠে।"

রাইচরণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানা গেল না। তবে কবিগানে রাইচরণের দান নিম্নোক্ত মন্তব্যে স্বীকৃত—"রাই সূত্রধর সম্বন্ধে একটু না বলিলে কিছুতেই চলে না। রাইচরণের ছড়াতে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি ছড়াকে আবিলতা ও অশ্লীলতা মুক্ত করিয়া বর্তমান রূপ প্রদান করিতে অগ্রণী।" রাইচরণ সূত্রধরের পুত্র পূর্ণচন্দ্র সূত্রধরও কবিগানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।

( সূত্র—বঙ্গের কবির লড়াই )

## কানাই মালী ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার কুকুটিয়া গ্রামবাসী কানাই মালীও প্রাচীন সরকারদের মধ্যে একজন যশস্বী কবিয়াল। জয়চন্দ্র মজুমদার, চন্ডী ঠাকুর প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী কবিয়ালের সঙ্গে তিনি প্রায়ই কবিত্বের লড়াই করতেন। একবার কোন আসরে গানের সূত্রে জয়চন্দ্র মজুমদার কানাই মালীকে "শালী" সম্বোধনে বলেছিলেন—

"শালী মুখ সামালিয়া কথা বলিস,—
নতুবা ধরিয়া মারিব।"

উত্তরে কানাই মালী বলেছিলেন—

শালী বলে দিচ্ছিস গালি, তাই শুনে প্রাণে ব্যথা পাই,
দুঃখ বলব কার ঠাঁই।
শুনেছি লোকে বলে,
দরবারে ঠাঁই না পেলে,
এসে ঘরের মাউগের ধরে চুলে—
তুই নাকি তাই করবি বোনাই॥

আর একবার বিক্রমপুরের কোন এক বাজারে চন্ডী ঠাকুর ও কানাই মালীর কবিগান হয়। থানার এক দারোগাবাবু সেই আসরে গান শুনতে এসেছিলেন। চন্ডী ঠাকুর এক রঙ কুকার করলেন—

শুনরে শুন, কানাই হতভাগা!
কি জন্যে হয়না পালিশ, কুকথা কেন বলিস,
একটু সমজে আসরেতে চলিস,
বসেছেন থানার দারোগা।

তৎক্ষণাৎ কানাই মালী উত্তরে গান করালেন—

আর, থানার এই দারোগাবাবু আসরেতে হয়েছেন উদয়।
একস্থানে রান্না করি, যথার্থ বলতে পারি,
ঐ দলে কাল করেছে লাক্‌ড়ি চুরি,—
তাতেই দারোগার আছে ভয়॥
(বঙ্গের কবির লড়াই)

## রামকানাই ভুঁইমালী (ঢাকা)

প্রাচীন কবিদের মধ্যে রামকানাই ভুঁইমালীও বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই কবিয়াল সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। হরিচরণ আচার্য রচিত "বঙ্গের কবির লড়াই" পুস্তকে রামকানাই'র উল্লেখ দেখা যায়। হাসারা (বিক্রমপুর) নিবাসী কবিয়াল দেবেন্দ্র দাস রামকানাই সরকারের প্রিয় ছাত্র ছিলেন।
(বঙ্গের কবির লড়াই)

## হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী (ঢাকা)

ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার ডোকাদী গ্রামের হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী (মাষ্টার / ভট্টাচার্য) কবিতে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। হরিচরণ-পূর্ববর্তী কবিয়াল-দের মধ্যে ইনি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। "তিনি অনেক রসপূর্ণ কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু ভাল গাহিতে পারিতেন না। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও যশঃ ছিল।" (কবির ঝঙ্কার, ২য় খন্ড, ভূমিকা)। মাষ্টার মহাশয়ের কবি জীবনের শেষ প্রান্তে এবং হরিচরণ আচার্যের কবি-জীবনের প্রারম্ভকালে উভয়ের মধ্যে দু' চার বার কবির পাল্লা হয়েছিল। রূপগঞ্জ থানায় একবার হরিশচন্দ্র হরিচরণের উপর এক কৌতুক ফুকার করেন—

"কেবল দুখের নিশায় হরিচরণ দেশবিদেশে বেড়ায়।"

জবাবে হরিচরণ গাইলেন—

বল্লে, দুখের নিশায় সদায় আমি, দেশবিদেশ ভ্রমিয়ে বেড়াই;
ওটা কেন স্বীকার পাই।

রাষ্ট্র তাই এই সংসারে, দুই ভাইয়ে ঝগড়া করে,
যে-জন ঘরজামাইয়া বিয়া করে—
তার বুঝি দুখের নিশা নাই ॥

হরিশচন্দ্রের অনেক কবিত্বপূর্ণ কবিগান ছিল। কিন্তু হরিচরণ নিজেই বলে গেছেন যে তিনি সেকালে খোঁজ করেও একটি পুরো গানও পান নি। তবু হরিচরণ হরিশচন্দ্রের গানের কয়েকটি কলির যেসব জবাব করেছিলেন তার কিছুটা স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

হরিশচন্দ্র— "রাই রাজ্য স্বর্ণভূমি, আছে তায় পতিত জমি,
আমি ছিলাম আবাদকার।

হরিচরণ— বললে, রাই রাজ্যেতে স্বর্ণভূমি, আছে তাতে পতিত জমি,
তুমি নাকি আবাদকার,
এই কথা শুনালে চমৎকার।
রাই রাজ্যেতে ওচে খোচে
অনেক পতিত জমি পড়ে আছে,
চাষ বিনে যে ঘাস হয়েছে—
কি আবাদ করেছ তার ?

আর একটি গানের মর্মার্থ এইরূপ—

"নিধুবনে রাই রাজা, শ্রীকৃষ্ণ কোটাল," কোটাল বেশে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নিকট দরখাস্ত করে—তোমার চৌদ্দ পোয়া ভূমি। আয়ানের সঙ্গে আমার বিবাদ। এখন উক্ত ভূমি আমাকে বন্টন করে দাও।

হরিচরণ শ্রীমতীর ভাব ধারণ করে উত্তর করলেন—

আমি নিধুবনে হলেম রাজা, অষ্টসখী আমার প্রজা,
আমি তো হলেম হুজুর,
তুমি কোটাল থাকবে করজোড়।.
ভূমির চাও স্বত্ব সাব্যস্ত, ভাব দেখে হই শশব্যস্ত,
তুমি চৌকিদারের এই দরখাস্ত, আমি করি না মঞ্জুর ॥

হরিশচন্দ্র— "আমি উক্ত ভূমির তালুকদার বটি।"

হরিচরণ— তুমি কর চৌকিদারী তালুকদারী নাহি হে কপালে।
চৌদ্দ পোয়া ভূমি আমার করতে চাও বন্টক,
নদীনালা খাল খাড়ি আর ঝাড় জঙ্গল কন্টক,
ভূমির মালিক আয়ান ঘোষে, কর দিতেছে মাসে মাসে,
তুমি মালিক হবে কিসে—নাম জারি নাই দলিলে ॥

হরিশচন্দ্র— আমার লপ্ত মতে ( নিকটে, পাশাপাশি ) আমি ছাম চাই।

হরিচরণ— তুমি ছাম নিতে চাও লপ্ত মতে, কথা শুনে ভাবি চিতে,
এত কেন অভিলাষ ? শুনলে লোকে করবে উপহাস।
ভূমির আশা কর মিছে, আয়ানের খামারে গেছে,
তোমরা রাখালের এক স্বত্ব আছে,
নিতে পার গরুর ঘাস ॥

প্রথম গানের প্রশ্নোত্তর এভাবে সমাপ্ত হলে, দোসরা গানে মাষ্টার মহাশয় আবার গাইলেন—

হরিশচন্দ্র— "তোমার চৌদ্দ পোয়া ভূমির চরণ-খাতায়—আমার নাম আছে।"
হরিচরণ— চৌদ্দ পোয়া ভূমি আমার, চরণ-খাতায় নামটি তোমার,
মুখের জোরে কথা কও ;
তুমি তালুকদারের যোগ্য নও।
পায়ের মধ্যে নাম থাকিলে,
ধুয়ে যায় পা ধোয়া জলে,
আছে আয়ানের নাম মূল দলিলে,—
সহি মোহরের নকল লও ॥

হরিশচন্দ্র- "দোল রাস ঝুলন ইত্যাদি
প্রত্যেক কিস্তিতে আমি কর দিতেছি,
দপ্তরখানায় তার প্রমাণ আছে।"

হরিচরণ বললে, দোলের কিস্তি, ঝুলন কিস্তি,
রথের কিস্তি, রাসের কিস্তি,
সব কিস্তির কর কর দান,
আছে দপ্তরখানায় তার প্রমাণ।
দপ্তরী নাই রঙমহলে, সে গিয়েছে মফঃস্বলে,
আমি নিজে দেখলেম দপ্তর খুলে,
লেপাপোছা কাগজখান ॥

এই কবি-প্রবরের বিশিষ্ট সঙ্গীতগুলি কিছুই পাওয়া যায় নি। সংগ্রহের চেষ্টা করে হরিচরণ বিফল হয়েছেন। হরিচরণের ভাষায়—"বনের কোকিল বনে বনেই ডাকাডাকি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।" এই সামান্য নিদর্শন ছাড়া এই স্বনামধন্য কবিগান রচয়িতার আর কোন গান পাওয়া যায় নি। চক্রবর্তী মহাশয় কবিগান থেকে অবসর নিলে হরিচরণ আচার্য গাইলেন—

"ছিলেন হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, করিতে যাঁর অতুল কীর্তি
এখন আর নাই যে স্ফূর্তি, নাও বাঁধা ঘাটে"

( কবির ঝঙ্কার, বঙ্গের কবির লড়াই )

## চণ্ডী ঠাকুর ( ঢাকা )

হরিচরণ আচার্যের পূর্ববর্তী কবিয়ালদের মধ্যে চণ্ডী ঠাকুর ( গণক/আচার্য ) আর একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। হরিচরণের সঙ্গে চণ্ডী ঠাকুরের অনেকবার গান হয়েছে। জবাব, টপ্পা, ছড়া পাঁচালী ছাড়াও, রঙ ফুকার ও সঙ্গীত রচনায় তাঁর যথেষ্ট চাতুর্য ও মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার সদাশিবদি বাবুদের বাড়ীতে দুর্গা পূজায় চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক কবি গান গেয়ে থাকেন। আর রঘুনাথ পাল নামে একজন রুদ্রপালও প্রতি বৎসর ঐ বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা গড়তেন। চণ্ডী ঠাকুর ও রঘুনাথ পালের গাত্রবর্ণ দৈহিক গঠনে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। একবার বিদায়ের দিন তাই লক্ষ্য করে হরিচরণ আচার্য এক রঙ ফুকার করলেন—

চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেল,—
আর পেল কুমার রঘুনাথ ;
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ী,
মাইল দশেক তফাৎ।
এক বরণ একাকৃতি, এক বয়স এক প্রকৃতি ;
কেবল হামানদিস্তায় গুঁতাগুতি—
এ দুইটার একটারও নাই দাঁত ॥

এই ফুকার শুনে চণ্ডী ঠাকুর দৌড়ে আসরে উপস্থিত হলেন এবং হরিচরণের দোহার দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে লাগল—

চণ্ডী ঠাকুর—মোদের হামানদিস্তার গুঁতাগুঁতি—
এই কথা তুমি গেয়ে যাও।
আমার ত বৃদ্ধাবস্থা, তোমার কি থাকবে আস্তা,
তোমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা,
তথা গিয়া পান ছেঁচিয়া খাও ॥

হরিচরণ— আমার নৌকায় আছে হামানদিস্তা—
এই কথা আমি শুনতে পাই।
সময়ে সকলই হয়, আমার ত খিলির সময়,
( তবে ) এখন যত পান ছেঁচা হয়,—
সকল এই বুড়াকে খাওয়াই ॥

চণ্ডী— ছেঁচা পান আমাকে খাওয়ায়—
এই কথা দূরে সরে থাক ;
এখন ওসব কথা যাক।
হায় আমি কি করিলাম, না জেনে খেয়েছিলাম,
বড় ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিলাম—
এখন গা সেখ তুরুকে খাক ॥

হরিচরণ— ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিল—
আমার দাদার হল রাগ ;
তিনি ত জুইতের সময় বাঘ।
কি ঘৃণা লাগল ওটা, ছি নাকি নুনে কটা,
কিন্তু এই জন্মে যাবে না খোঁটা—
ঠোঁটেতে চুন খয়েরের দাগ ॥
চণ্ডী— চুন খয়েরের দাগ লেগেছে—
কি কথা বললি হরি ভাই।
তোর দলের ডাইনের ধারে, তীর্থ মাগী নাচনা করে,
একটু অগ্রসর হতে দাও ঐ মাগীরে—
আমি ওর গালে মুছে যাই ॥
হরিচরণ— তুমি তীর্থের গালে দাগ মুছিবে—
ইহাতে কথায় হয়না তাও, দাদা আর করোনা রাও।
এই তীর্থের তলে তলে, জল উঠে বোম্বা কলে,
তুমি শেষ কালে এই তীর্থের জলে—
বেশ করে মুখ ধুয়ে ফেলাও ॥ ইত্যাদি

চণ্ডী ঠাকুর মহাশয় প্রশংসনীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। একবার ঢাকা জেলার আড়াই হাজার দেবীপুরা গ্রামে পালবাবুদের বাড়ীতে গানে হরিচরণ ও চণ্ডী ঠাকুর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। হরিচরণ চণ্ডী ঠাকুরকে দেবরাজ ইন্দ্র অর্থাৎ সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে টপ্পা করেছিলেন—

"আমি হরির বাহন গরুড় পাখি দিলেম পরিচয়।"

টপ্পায় গরুড় পাখির ভূমিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী ঠাকুর টপ্পার মুখবন্ধটিও আটাআটি করিয়া কাটাকাটি করলেন। তিনি উত্তরে বললেন—

ও তুই হরির বাহন গরুড় পাখি, বললি আমার ঠাঁই।
হলি শ্রীহরির ভয়ে কাতর, তোর মত কেহ নাই ইতর,
এত দিনের পরে তোর—পাখ গজাইল ভাই ॥

হরিচরণ এই জবাবকে 'ধন্য কবিত্ব' বলে বাহবা দিয়েছেন।

চণ্ডী ঠাকুর ও হরিচরণ আচার্যের মধ্যে কবি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে দু' একটি নমুনা পাওয়া যায়, তা থেকেই টপ্পার রীতিতে যে বিরাট পরিবর্তন তারা করেছেন তাঁর পরিচয় মেলে। একবার হরিচরণ চণ্ডী ঠাকুরের বিরুদ্ধে টপ্পা করেন ঃ—

আমি অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষ চিনে সব লোকে।
তুমি সেবার ঠাকুর গোপীনাথ, চরণে করি প্রণিপাত,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—আমার মস্তকে ॥

তুমি বাক্য দিলে গৌররূপে—
এই বাড়ী থাক্‌বে গোপীনাথ রূপে ;
তোমার বাক্যে বিবাহ—করে রই অগ্রদ্বীপে।
যখন সেবায় দিলেম মনোযোগ, তখন আমার স্ত্রী বিয়োগ,
সেবার কাজ চলে কিরূপে।
আমার কৃষ্ণভক্ত পুত্র ছিল—
কও আমার পুত্র মরল কোন্ পাপে ?

চণ্ডী ঠাকুর—
তুমি অগ্রদ্বীপে বসত কর নাম গোবিন্দ ঘোষ।
জীবে ঠেকিয়ে ভব রোগে, আমাকে চিনেনা আগে,
দেখি যার যা কর্ম সেই ভোগে, আমারে দেয় দোষ।
আর, পুত্র কন্যা পরিবার, তুমি বা কার, কে তোমার,
তরিবার হবে রে কোন জন।
অ তোর মায়ার বন্ধন, করলেম ছেদন—
আনন্দে কর হরি সংকীর্তন ॥

হরিচরণ— আমার মায়ার বন্ধন করলে ছেদন, বললে কি মধুর।
তুমি আগে বিবাহ করাও, পুত্র দাও, সংসারটি বাড়াও,
শেষে শ্রাদ্ধের চিড়া খাও, নির্বংশা ঠাকুর ॥
তোমার অদ্বৈত গোসাইর পাঁচটি ছেলে,
শান্তিপুরে শান্তি বই অশান্তি কই ;
শিবানন্দ তিন পুত্রের গুণে হলো সাধনজয়ী।
তোমার ভবানন্দের পাঁচ ছেলে, সবংশে তোমায় পেলে,
কি ব'লে আমি দোষী হই।
কর কারও বেলায় বেজেস্টরী—
আবার কি কার বেলায় নিশান সই ॥

চণ্ডী— তুমি পুত্রের জন্য রোদন কেন কর অকারণ।
আছে পিণ্ডার্থে পুত্রের প্রয়োজন—
শাস্ত্রের এই বিধান।
আমি তোমার পুত্র হব, তোমাকে বাবা ডাকিব,
তুমি মলে পিণ্ড দিব,
পুন্নাম নরকে করব ত্রাণ ॥

হরিচরণ— তোমার বাবা হওয়া মাটি খাওয়া—
স্বহস্তে শিব করেছে দস্তখত ;

নন্দ বাপ তোর হয়েছে কেঁদে কেঁদে মৃতবৎ।
অ তোর বাসুদেব হয় আর এক বাপ, কংসালয় পায় মনস্তাপ,
দিল তোর মামার কাছে খত।
আর এক বাপ তোর ত্রেতাযুগে—হয়েছে বাসিমরা দশরথ ॥

আবার কোন এক আসরে হরিচরণ ও চন্ডী ঠাকুর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেবার চন্ডী ঠাকুর হরিচরণের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

আমি গান্ধারী নাম ধরি হরি মিনতি জানাই।
আমি শত পুত্রের ছিলেম মা, সেই সুখের ছিলনা সীমা,
এখন আমায় ডাকে মা, এমন লক্ষ্য নাই ॥
তুমি কারে হাসাও, কারে কাঁদাও—
তোমার তো অপার লীলা জগতে ;
মধুসূদন নিবেদন করি তোমার সাক্ষাতে।
শুনহে কমলাক্ষ, তুমি ছিলে কোন্ পক্ষ—
কুরু পান্ডবের যুদ্ধেতে
আমার শত পুত্র যুদ্ধে মরল,
কৃষ্ণ হে, কোন্ পাপে কার চক্রেতে ॥

হরিচরণ— গান্ধারী নাম ধর তুমি পেলেম পরিচয়।
তোমার মরেছে শতপুত্র, মা বলতে নাই একটিমাত্র,
কালের গতি বিচিত্র—কার ভাগ্যে কি হয় ॥
বললে শত পুত্র যুদ্ধে মরল—
কৃষ্ণ হে কোন্ পাপে কার চক্রেতে, ;
সতী সাধ্বী কেঁদ না পুত্র শোকেতে।
যথা ধর্ম তথা জয়, নাস্তি ধর্ম পরাজয়—
আমি রই ধর্মের পক্ষেতে
তোমার শতপুত্র যুদ্ধে মরল—কেবল অধর্মের চক্রেতে ॥

চন্ডী ঠাকুর— এই যে যথা ধর্মস্তথা জয়, নাস্তি ধর্ম পরাজয়,
এই কথা কয় অনেক লোকে।
এই যে ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম—
কও শুনি করায় কে আর করে কে ?

হরিচরণ— সুমতি কুমতি দুই, প্রতি জীবনের দেহে থুই,
এই কথার নয়গো অন্যথা।
কর্ম মনে করাই, জীবে করে—
সংসারে আমি কর্মের ফলদাতা ॥

উল্লিখিত গোবিন্দ ঘোষ-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং গান্ধারী-শ্রীকৃষ্ণ টপ্পাদুটি থেকেই বোঝা যায়, এককালের অশ্লীলতা দোষদুষ্ট টপ্পা-পাঁচালীকে কোন্ উন্নত ও ভাবগম্ভীর স্তরে হরিচরণ আচার্য উন্নীত করেছিলেন। হরিচরণ আচার্যের পূর্বেও কবিগানে গান্ধারী-শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়া নিয়ে কবিগান গাওয়া হতো। তার কিছু নমুনাও নিচে দেওয়া গেল। তুলনামূলক দুটি টপ্পাকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই দোষ গুণ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে; এবং গান্ধারী ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে, যে কোন নীচজাতীয় গ্রাম্য স্ত্রীলোকও লজ্জায় অধোবদন হবে—

১। আমার অন্ধে কেন পাহারা দিবে—
আমার ত ছাড় দেওয়াল ঘেরা বাড়ী।
একশ' পোলার একশ' বৌ—
একশ' আর কটা রাঁড়ী;
কৃষ্ণের বংশ ছাপ্পান্ন কোটি, ছাপ্পান্ন কোটি বেটি,
এক যোগে যদি হয় রাঁড়ী;
বসবে অন্দরেতে রাঁড়ীর বাজার—
কই পাবি এত রাঁড়ীর খেসারী॥

২। আমার বাড়ী ভরা রাঁড়ীর পাল,
গালি দেয় সকাল বিকাল,
সুখ শান্তি হল তমাদি।
যে জন কুচক্রে করেছে রাঁড়ী—
আমরা তার বাপের মুখে * * *॥

( বঙ্গের কবির লড়াই এবং সংগ্রহ )

## মহেশচন্দ্র সেন ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কুষ্ঠিয়া সেনবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ১২৬১ সালের ৯ই পৌষ মহেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ভূম্যধিকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কবিগান সংস্কারে, কবির দলের পোষাক পরিচ্ছদ রুচিসম্মত করণে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বিভিন্ন জেলার সুপ্রসিদ্ধ দল ও কবিয়ালকে নিজ ভবনে আহ্বান করে তিনি কবিগান

শুনতেন। কবিগান সম্বন্ধে অনবরত চর্চা এবং কবিয়ালদের সাহচর্যের দরুণ তাঁর নিজের মধ্যেও রচনা শক্তি ও বাক্‌দ্বন্দ্বের ক্ষমতার স্ফুরণ ঘটে। তিনি অনেক সময় কবিগানের উত্তর প্রত্যুত্তর রচনা করে দিতেন। সকল প্রকার সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ থাকলেও, কবিগানের প্রতি মহেশচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। কবিগান ও উত্তর প্রত্যুত্তর রচনায় তাঁর দক্ষতা দর্শনে অনেক কবিয়ালও আশ্চর্য হতেন।

১২৯৫ সালে প্রকাশিত "আদর্শ কবি" পুস্তকখানি তাঁর কবি-প্রেমের অন্যতম নিদর্শন। তাছাড়া 'সঙ্গীত প্রেমাঞ্জলি' নামেও তাঁর একখানি গ্রন্থ ছিল। ১৩২০ সালের ১৭ ফাল্গুন তিনি পরলোক গমন করেন। (সৌরভ, চৈত্র ১৩২০, মাঘ, ১৩৩২)

## কবি বলাই নাথ ও কানাই নাথ (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত হোসেনপুরের নিকটবর্তী দগদ্‌গা গ্রামে বলাই নাথ ও কানাই নাথ নামে দুই সহোদর কবি ছিলেন। তাঁদের পিতার নাম আশারাম নাথ। বলাই ও কানাই দুই ভ্রাতাই পরম ভক্ত ও কবি ছিলেন। তাঁরা অসংখ্য গান রচনা করে গেছেন। পঞ্চাশ বৎসরাধিক পূর্বেও তাঁদের রচিত গান ময়মনসিংহ ছাড়াও ঢাকা শ্রীহট্ট, পাবনা ও ফরিদপুরে গাওয়া হতো; যদিও তারা দুইজনেই অতি বৃদ্ধাবস্থায় পরলোক গমন করেছেন। (সৌরভ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

## কানকড়ি পণ্ডিত (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের নেত্রকোনা থেকে দশ এগার মাইল পূর্বদিকে কংস নদীর কূলে আস্‌মা নামক প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে পণ্ডিত কানকড়ি বিগত শতাব্দীর প্রথমপাদে জন্ম-গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু কিছু কবিগান ও হোলিগান গেয়ে প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রায় শত বর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

(সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৪)

## হরচন্দ্র আচার্য ও রামসুন্দর আচার্য ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহ জেলার বাহাদিয়া গ্রামের কবি হরচন্দ্র আচার্য তাঁর কবি প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হরচন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষেই তিরোধান ঘটে।

রামসুন্দর আচার্য পূর্ব ময়মনসিংহের রামমালী ও রামগতি শীলের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের কবিয়াল। শব্দবিন্যাস পরিপাট্যে তিনি বিশেষ চতুর ছিলেন। ১৩৩২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ( সৌরভ, আশ্বিন, ১৩৩৪ )

## তারাচাঁদ দে ( ময়মনসিংহ )

বঙ্গাব্দ ১২৪৭ কি ১২৪৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার রামপুরের নন্দীবংশীয় গোলকচন্দ্র চৌধুরীদের বাড়িতে তারাচাঁদের জন্ম। তাঁর পিতার নাম বলরাম দে। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর সামান্য অক্ষর পরিচয় ঘটে। ষোল-সতের বৎসর বয়সে তিনি দারুন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তিনি প্রাণে বাঁচলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারালেন। বহিদৃষ্টি বঞ্চিত কবির অন্তর্দৃষ্টি উদ্ভাসিত হলো এবার। মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি গাইলেন—

( ভবানী-বন্দনা )

মা গো, আমারে আনিয়া ভবে—
    করলে আমার কি সর্বনাশ!
[illegible]বের হাটে, এ সঙ্কটে দিলে পাঠাইয়ে
    করব বলে সুখের গৃহবাস।
তাতে অন্ধ হ'য়ে বন্ধ থাকায় চিন্তা হইয়াছে,
    ধরায় সুহৃৎ কে আছে, মা আমার গো—
কেবল নামে মাত্র হই তারাচান
    দিবারাত্র রাখছ সমান
তা'তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান
    মগো, প্রাণ কেমনে বাঁচে?
দিবানিশি থাকি বসি, কর্ম জানি না,
নাই সুহৃৎ একজন, বাঁচায় এ জীবন
    ঐ চিন্তায় নিদ্রা হয় না।
দুর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ
    আমার দুঃখ যে মা চক্ষু দিলে না॥

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আত্মবিলাপ করেছিলেন—

"সব ঘুচাইলে বিধি হরে নিয়ে চক্ষুনিধি
মানবের অধম করিলে।"

কবি তারাচাঁদের গানেও হেমচন্দ্রের মতোই ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। আরো একটি গানে তারাচাঁদের অন্ধত্বের বেদনা পরিস্ফুট হয়েছে—

লক্ষ টাকা কর্জ কইরে ভবের হাটে আই। হায় গো—
পরে হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মাগো
আসলে নব্বই হাজার নাই।
আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে
দেনা হ'তে মুক্তি পাই ?
তারিণী, দীনতারিণী গো, অধীনের গতি কেমনে পাই ?
হল না আমার হাট বাজার,
আসতে পথে দিন কাবার,
আমার বিকিকিনি নাই
আছি বন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে
পথ দেখনের চক্ষু নাই।

সে সময় ময়মনসিংহে গ্রামে গ্রামে সখের কবির দলের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় অনেক ভদ্রলোক ঐসব দলের নেতারূপে নিজেরাই আসরে অবতীর্ণ হতেন; কেহবা কবিদের কবির দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ; কিংবা উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক টপ্পা ছড়া তৈরী করে দিয়ে কবির লড়াইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর করে তুলতেন। এ রকম দুই সৌখীন কবিয়াল চন্দনকান্দী গ্রামের আনন্দকিশোর চক্রবর্তী এবং ভবানীপুর নিবাসী জীবন মজুমদারের কবিগান শুনেই তারাচাঁদের কবিগানে আসক্তি ও আগ্রহ জন্মে। তিনি জন্মভূমি রামপুর ত্যাগ করে চন্দনকান্দী গ্রামের সূর্যকান্ত নন্দীচৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন।

কবিগানকে পেশারূপে গ্রহণ করার পর তারাচাঁদ প্রথম জীবনে সুসঙ্গ রাজের বংশধরগণের পূর্ব-ধলাস্থ রাজবাড়িতে একাদিক্রমে সাত বৎসর শারদীয় পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কবির সরকারের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন। ময়মনসিংহের কবিশ্রেষ্ঠ রামু ও রামগতির সঙ্গেও অন্ধ কবি তারাচাঁদ কাব্য যুদ্ধে লড়েছেন।

কুমুরউড়া গ্রামে কবিয়াল গোবিন্দ আচার্যের সঙ্গে তারাচাঁদের একবার গান হয়। তারাচাঁদ কুটিলার ভূমিকা এবং গোবিন্দ আচার্য রাধিকার ভূমিকা নিয়েছিলেন। কুটিলা ( তারাচাঁদ ) রাধিকাকে বলছেন—

বউ তোমারে নিষেধ করি, যাসনে যমুনায়।
আছে গোপের এক পোলা, সেই কদমতলা,
দুই বেলা থাকে ভাঙ্গা নায়।
আমি কাল শুনেছি নন্দের ছেলে—
জল ছিটাইল বৌ তোর গায়।
বউ ঠাকরুন লো এমন হলে—
তোরে কি আর ঘরে রাখা যায়?
আমি বল্লাম বউ তোরে,—
কলস রাখলো মধ্য ঘরে
বউলো তুই ফিরে ঘরে আয়।
এমন বউ হায়, কার ঘরে লো—
দিনেতে তিনবার পলায়?

অভিমানাহত রাধিকা (গোবিন্দ আচার্য) প্রত্যুত্তরে বললেন—

"আমার নামে যদি এই বদনাম, তবে আর
কখনোই যমুনায় যাইব না—ঘরে বসিয়া থাকিব,
কোন কাজই করিব না, দেখি কেমন করিয়া কাজ চলে?"

কুটিলা-রূপী তারাচাঁদ তখন আবার বললেন—

বউ, তোমারে আন্‌ছি অবধি—
(তুমি) আমার কথার অবাধ্য।
যদি কর পরের ঘর, কাজ করবে বরাবর,
'না' করে কার বাপের সাধ্য॥
নন্দের ছেলে মন মজাল, মোহন বাঁশী বাজায়ে,
গোকুলে কার বউ চলে, এককালে ঘোমটা ফালায়ে।
আমি যাই না আর পাড়াঘরে, লোকে মন্দ কয় তোরে,
আসি মাথা নোয়ায়ে;
আজ অপমানী করব তোরে, দাদার কাছে সব কয়ে।
গোকুলে কার বউ চলে, এককালে ঘোমটা ফালায়ে॥

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাধারণ দেশবাসীর দুরবস্থা বর্ণনা করে সঙ্গীত রচনাতেও তারাচাঁদের কৃতিত্ব ছিল। তিনি হাস্যরসিকতায়ও পটু ছিলেন। কোন আসরে কুটীশ্বর পাল নামক জনৈক তেলি কবি গানের মাঝখানে তারাচাঁদকে লোটা-গামছা বহনকারী শূদ্র বলে বিদ্রূপ করলে তারাচাঁদও উল্টে পাল মশাই'র জাতিগত ব্যবসার বর্ণনা দিয়ে গান তৈরী করে কড়া জবাব শুনিয়ে দিলেন—

আমের গুঁড়ি বেলের মুথাড়ি ( গোড়া )
উপরে তার জড়ি মাকড়ি,
লম্বা তক্তা উপরে পাথর
ঘুরছে ঘুরঘুরি।
পালের পুত বড়াই কর কি ?
এক ছটাক তেল কম হইলে
বুড়া তেলী-এ চোখ ঘুরায়,
হইল না টাক, পনরো ছটাক,
পালের পুত আর চারটা পাক ঘুয়িয়া আয়।
ফাটা চঙ্গীর মধ্য দিয়া, ঝিরঝিরাইয়া তেল চুয়ায় ॥

একবার কার্যোপলক্ষ্যে কবি তারাচাঁদ ফরিদপুর গিয়েছিলেন। পথভ্রমণে মলিন বস্ত্র পরিহিত কবি তারাচাঁদ ও তাঁর সঙ্গীকে দেখে থানার মুন্সী ও কনেষ্টবল তাদের "জংলী" বলে ঠাট্টা করে। তারাচাঁদ তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত রচনা শুনিয়ে দিয়ে তাদের থেকে কিছু বখশিস্ আদায় করে নেন—

বঙ্গদেশে বাড়ি আমার,
আমি জংলী কেমনে হই ?
বলেন মুন্সী মহাশয়, আবার কনেষ্টবলেও কয়,
এই দেশে মানুষ পাই না কই !
যেমন রাম গেছিলেন বনবাসে, ঠাট্টা করেছিল রাক্ষসে,
সেই দশাই ঘটছে আমার এ দেশে।
থানার এক কনেষ্টবল, বুদ্ধি রাখে তিন ডবল,
মরি আফশোষে।
রাং কি সোনা চিনতে পায় না—চিনবেই কেম্‌নে বেহুঁসে।

যুদ্ধ ও অকাল-বৃষ্টির দরুণ কৃষককুলের দুরবস্থার চিত্র তারাচাঁদ জারী গানের সুরে এঁকেছেন। সমাজ-চিত্র অঙ্কনে তিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ।

( সৌরভ, শ্রাবণ ১৩২২ )

## জয়হরি গোপ ( ঢাকা )

বিশিষ্ট কবি ভগবান আচার্য মহাশয়ের কবিগানের গুরু ছিলেন ঢাকা জেলার গোলকান্দাইল গ্রাম নিবাসী জয়হরি গোপ। গুরু-শিষ্য সমসাময়িক কবি ছিলেন। জয়হরি সরকারের সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল। জবাব ও টপ্পা উত্তমরূপে কাটাকাটি

করতেন। তিনি ছড়া গান করে ভুলতা নিবাসী নীলমণি চক্রবর্তীর দলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর পাঁচালী সর্বজন প্রিয় ছিল বলে হরিচরণ আচার্য মহাশয় উল্লেখ করে গেছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে তাঁর কবিগান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জয়হরি সরকারের কবি ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু লিপিবন্ধ করতে পারেন নি। ( বঙ্গের কবির লড়াই )

## নীলমণি চক্রবর্তী ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার ভূলতা নিবাসী নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয় গোলকান্দাইলবাসী জয়কৃষ্ণ ( হরি ? ) গোপ মহাশয়ের দলে ছড়া পাঁচালী গান করতেন। পরে নিজে যখন দল গঠন করেন তখন গোপ মহাশয় চক্রবর্তী মহাশয়ের দলে ছড়া গান করে দলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। গোপ মহাশয়েয় কৃতিত্বে সে সময় চক্রবর্তী মহাশয়ের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ( বঙ্গের কবির লড়াই )

## পঞ্চানন আচার্য ও রামকানাই আচার্য ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার আলগী গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন আচার্য মহাশয় হরিচরণ আচার্যের কবি জীবন আরম্ভ কালে কবিত্ব রসে দেশ ভাসিয়ে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই আচার্য ছিলেন হরিচরণ আচার্যের কবির গুরু। তিনি একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কবির সরকার ছিলেন বলে আচার্য মহাশয় উল্লেখ করে গেছেন। একবার হাজীপুর কাছারীতে গুরু-শিষ্যের মধ্যে কবির লড়াই ঘটে। রামকানাই আচার্য হরিচরণের উপর নিম্নোক্ত টপ্পা চাপান দেন—

আমি কবির ভাবে বিশ্বামিত্র
তোমার কবির গুরু এলেম এই দেশে।
জনম দুঃখিনী সীতার জন্ম যায় বনবাসে ॥
আবার তপোবন হতে এই আযাধ্যা ভবনে—
আনলে কি পরীক্ষার দোষে ?
তোমার বাম ভাগেতে স্থান পেল না—
কেন দাঁড়িয়ে কান্দে এক পাশে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে হরিচরণ আচার্য যা বললেন তার মর্মার্থ এই ঃ—

"আমি আমার পিতৃ আয়ু ভোগ করিয়া পিতা দশরথের তুল্য হইয়াছি। অতএব সীতাকে আমার বামে বসাইতে পারি না।"

উক্ত জবাবের উত্তরে পঞ্চানন আচার্য গান করালেন—

বাছারাম হরিচরণ হে! তুমি বিলক্ষণ শাশুড়িয়া হইলে।
তুমি পিতৃ আয়ু কর ভোগ,
এই কথায় সীতা বিয়োগ,
এই ভোগটা যথার্থ হইলে।
তবে কৌশল্যাদির শঙ্খ সিন্দুর—
রইল না কোন্ দলিলে।

(বঙ্গের কবির লড়াই)

## ভগবান আচার্য (ঢাকা)

ঢাকা জেলার পলাশ গ্রামের ভগবান আচার্য একজন স্বনাম খ্যাত কবি ছিলেন। উক্ত জেলার গরেশপুর জমিদার বাবুদের বাড়িতে একবার ভগবান আচার্যের সঙ্গে হরিচরণ আচার্যের কবিগান হয়। জমিদার বাবুদের বাড়ির সন্নিকট দক্ষিণের বাড়ীতে ভগবান আচার্য মহাশয় বিবাহ করেছিলেন। তারই কয়েক বাড়ি দক্ষিণেই হরিচরণ আচার্য বিবাহ করেন। গানের আসরে ভগবান আচার্য মহাশয় বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী কৃত একটি টপ্পা হরিচরণ আচার্যের উপর চাপান দেন। টপ্পাটির বক্তব্য বিষয় মোটামুটি এই—

"আমি প্রাচীন মুনি অগস্ত্য। তোমার দাতা নাম শুনিয়া শেষকালে তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাকে একখণ্ড জমি দান কর।"

হরিচরণ আচার্য উত্তরে বললেন—

অযোধ্যাতে জমি দিলে, হবে তোমার পক্ষে বহুদূরে—
বাড়ীর লপ্তমতে নেও মুনি ঠাকুর।
তোমায় জমি দিলেম তিন পাখী—
দেই না ফাঁকি চিন্তা কর দূর।
দিলেম ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে—
ঢাকা জিলায় গয়েশপুর॥

ভগবান আচার্য মহাশয় এই জবাবের ঘোর প্রতিবাদ করে বললেন—"তখন অর্থাৎ ত্রেতাযুগে ঢাকা জিলাও ছিল না, গয়েশপুরও ছিল না। তোমার রূপক অশুদ্ধ।

হরিচরণ বললেন—আমার রূপক অশুদ্ধ হয় নাই। কারণ, তোমার বৃদ্ধ দশায় বিষ্ণু পাদপদ্মেই আশ্রয় নেওয়া উচিত। অতএব এই গয়েশপুরেই তোমাকে জমি দান করিলাম। ইহার অর্থ এই ( গয়া + ঈশ = গয়েশ ) আর এই গয়ার ঈশ্বর সর্বদাই ঢাকা থাকে। কেবল পিন্ডদানের সময় খুলিয়া দেওয়া হয়। অতএব ঢাকা জিলা নাম রাখিলাম।”

এই জবাবের পর ভগবান আচার্য মহাশয় বৈকুণ্ঠবাবুর তৈরী প্রাসঙ্গিক টপ্পা আবার গাইলেন—

দিলে তুমি, পেলেম আমি—
বেশ দিলে অভাগীর জামাই ;
এ যে ঘাসে ভরা ঠাঁই।
যখন জোয়ার আসে মাসে মাসে,
আস্ত এক বরাক বাঁশে পায়না ঠাঁই ॥

তদুত্তরে হরিচরণ বললেন—

অগস্ত্যদেব ! একবার সাত সমুদ্রের জল খেয়ে—
করে ছিলে পেট মোটা
এত অধিক জল খেয়ে—
এমন অল্প জলের ভয় করে কেটা।

( বঙ্গের কবির লড়াই )

## রামগতি শীল ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহ জেলার স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল ছিলেন রামগতি শীল। আনুমানিক ১২৪৭ সালে গাঙ্গাইল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উক্ত জেলার অনক্ষর কবিদের অন্যতম। ছোটবেলা থেকে কথায় কথায় মিল দিয়ে ছড়া তৈরীতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। খেলা ও গোচারণের সাথীদের স্বরচিত কবিতা ও গানে মুগ্ধ করতেন। যৌবনে এক গ্রাম্য মহিলার কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে ছড়া রচনা করলে গ্রামবাসীদের ক্রোধ ও বিরক্তির তীব্রতায় তিনি গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেন। সে সময় ঢাকা জেলা থেকে আগত এক ঝুমুরওয়ালীর দলে রামগতি স্থান পেলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কবিত্বের অধিকারী রামগতিকে বেশী দিন শিক্ষানবিশী করতে হয় নি। অচিরে তাঁর প্রতিভার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি স্বশক্তিতে কবির আসরে অবতীর্ণ হলেন।

ময়মনসিংহের সুসঙ্গ, দুর্গাপুর, গৌরীপুর, আঠারবাড়ী প্রভৃতি জমিদার বাড়িতে

রামগতির কবিগানের বড় সমাদর ছিল। একদিন ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়িতে ঢাকা বিক্রমপুরের দুই প্রসিদ্ধ কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা করে রামগতি সমজদারগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। এবং সুসঙ্গ রাজবাড়িতে আহুত হলেন। দারুণ মাঘের শীতে ক্লিষ্ট কবি একটি শীতের টপ্পা গেয়ে এক জোড়া শাল পেলেন। গৌরীপুর রাজবাড়িতেও একবার পুজায় বাড়ির কর্তা থেকে ঘোড়ার সহিস পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে এক গান বেঁধে একশত টাকা পুরস্কার পান।

অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করলেও কবির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অবস্থার বিপাকে তিনি প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্তন করতেন। তিনি কিছুকাল সুকুন্দি গ্রামে বাস করেন। সেখান থেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে কৈলাটী-ফতেপুর গ্রামে দাগু বিশ্বাসের অধিকারে আসেন। দাগু বিশ্বাস কিছু জমি জোতস্বত্বে দিয়ে রামগতিকে প্রজা করে নিলেন। কিন্তু অনুর্বরা জমিতে ফসল না হওয়াতে তাঁর দুর্দশার কোন সুরাহা হল না। এইসব ঘটনা বর্ণনা করে ,এক গান বেঁধে তিনি আঠারবাড়ীর জমিদার মহিমবাবুকে শোনালেন—

মহিমা সাগর বর ধর্ম অবতার।
হতভাগ্য রামগতি, দিল দরখাস্ত পাতি,
ধর্মপতি কর সুবিচার ॥
অন্নকষ্টে দুরদৃষ্টে মরেছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই,
বাবুজী গো! এ বিপদে রক্ষাকর্তা কেহ নাই।
পাঁচ শ' টাকার দায়বন্দী, হয়েছিলাম সুকুন্দি,
ভিটা ছেড়ে ফতেপুরে যাই।
দেইখে দাগু বিশ্বাস জমি দিল,—
বুনলে হয় না মাষকলাই ॥

উক্ত টপ্পা শুনে দয়ালু মহিমবাবু আজীবন ভোগ-দখলের জন্য রামগতি সরকারকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন।

রামগতি সরকারকে সেই জেলাবাসীগণ ময়মনসিংহের "দাশুরায়", "নিধুবাবু" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। সমকালীন সরকার রামু'র সঙ্গেই তাঁর বেশীর ভাগ লড়াই বাঁধত। দ্রুত ছড়া-পাঁচালীতে রামু পারদর্শী হলেও, রামগতির মতো এমন যখন তখন টপ্পা রচনা কারো সাধ্যে কুলাত না। তাঁর জিহ্বাগ্রে যেন সরস্বতী অটল আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গানের সময় কোন বিষয় নিয়েই তাঁকে ভাবনা চিন্তা করতে দেখা যায় নি। "রামগতির টপ্পা" লোকের মুখে মুখে ফিরত।

এক আষাঢ় মাসে কবিয়াল শম্ভু ঝালো (জেলে) আর রামগতির মধ্যে গান হচ্ছিল। শম্ভুর দলের দোহারগণ সবাই জেলে। রামগতি তখন শম্ভুর দলের সঙ্গে আষাঢ় মাসের ঢলে নামা বিভিন্ন মাছের নাম দিয়ে এক টপ্পা গেয়েছিলেন—

আজগবী এক কাব্য কথা, মন দিয়া শুন সে সকল।
মরি হায় রে, আষাঢ়ে নূতন ঢলে,
সিঙ্‌ মাগুর কৈ কাতলে, বেঁধেছে এক দল ॥
ঘন্যা পুঁটা, খাদে দুটা,
গজার আর ঘাগটে গায় মূলতানে,—
চান্দা, চেলা, ইচা, ঘুঙ্গীয়া,
মলা খৈলা আর চিতল চিতানে।
বোওয়াল, লাড়ী, বাইম, লেড়ী পাব্যা
এই কয়টা মৈল ভাব্যা, ধরবে কোন স্থানে,
দলের নটুয়া কড়ি কাটুয়া, মড়ার চাটুয়া কাছিম মাঝখানে ॥

একদা বায়ড়া-উড়া গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ কর্মকার ও বিজয়নারায়ণ আচার্য গান গাইছিলেন। হঠাৎ রামগতি সরকার সেখানে উপস্থিত হলে সভাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ছড়া-পাঁচালী গাইতে লাগলেন; এবং পরাণ ও বিজয় সরকারের গান গাওয়ার তেমন যোগ্যতা নেই বলে মত প্রকাশ করলেন। অনর্থক এই নিন্দাবাদে অসন্তুষ্ট হয়ে বিজয় সরকার রামগতিকে লক্ষ্য করে বললেন—"আমরা অযোগ্য হলেও তো বায়না পেয়ে গান গাইছি; আর আপনি যদি এমন উত্তম সরকার তবে আপনার বায়না নাই কেন?" এ কথার উত্তরে রামগতি সঙ্গে সঙ্গে টপ্পায় গাইলেন—

তুমি বল্লে নাকি বিজয় ঠাকুর
আমার বায়না নাই।
তুমি বিজয় ঠাকুর গুণবান, কর্তে পার কবিগান,
স্বীকার পাইলাম রঙ্গ সভার ঠাঁই ॥
উকিল মোক্তার বায়না করে, ব্যারিস্টারে বসে খায়—
বিজয় ঠাকুর সেইজন্য কি ব্যারিস্টারের মান্য যায়?
দ্বন্দ্ব করে দুই ভেড়ী,
ঘৃণা করে কেশরী, বসে রঙ্গ চায়।
লজ্জা করে মানের ডরে,—
সাধু যায় না চোরের নায় ॥

একবার পুরাকান্দিয়া গ্রামে দয়াচান সাহার বাড়ীতে দুর্গা পূজায় বিজয় ও রামগতি সরকারের গানের বায়না হয়। তিন দিনের গানে যিনি আগে আসরে দল পাঠাবেন, তিনিই দাঁড়া ধরা অর্থাৎ প্রশ্ন করার অধিকারী। আবার গানের আসর কোন কবির বাসস্থানের নিকটবর্তী হ'লে তিনি দূরাগত কবিকে আগে আসর নেওয়ার অনুরোধ করবেন--এটাই কবিয়ালদের রেওয়াজ। কিন্তু রামগতির ভয়ে এবং উত্তর দেওয়ার চেয়ে প্রশ্ন করা সহজ বিবেচনায় বিজয় সরকার এই সৌজন্য ও প্রথার ব্যতিক্রম

করে দূরাগত রামগতিকে আগে দল পাঠাবার অনুরোধ না করেই নিজ দল আসরে পাঠিয়ে দিলেন। রীতিভঙ্গে বিরক্ত রামগতি তখন এক টপ্পা বেঁধে গাইলেন—

পুরাকান্দার বায়না লইয়া আইলাম দুইজনে।
আমরা উভয়েতে করবো গান,
উভয়ে রাখিব উভয়ের সম্মান,
তাইতে কিছু ভিন্ন জ্ঞান, নাই কারো মনে॥
তুমি কোন বিচারে সন্ধ্যা পরে,
আসরে বাজালে ঢোল ?
ভাবছি তোর খাপছি ( আস্ফালন ) দেখে
সম্মুখে করবে নাকি গণ্ডগোল।
গ্রামে কিংবা নিকটে,—কবি যারা গায় বটে,
জানি তাদের মূল,—
ভিন্ন দেশী কেহ হৈলে, ( তারে ) আগে করে অনুকূল।
ভাবছি তোর খাপছি দেখে—
সম্মুখে করবে নাকি গণ্ডগোল॥

উক্ত পুরাকান্দিয়ার গান সমাপনান্তে দুই কবিয়াল সুগন্দিয়া গ্রামে এক পালা গান গাইতে এলেন। আহারান্তে দিবানিদ্রার ফাঁকে রামগতির গাটুরী খুলে কোন দুষ্ট লোক নয় পয়সা চুরি করে নেয়। রামগতি গান আরম্ভ হলেই এই ঘটনা অবলম্বনে এক টপ্পা গাইলেন—

পুরাকান্দা গান করিয়া আইলাম সুগন্দিয়া।
মোদের মনে ছিল বাসনা,
এখানে কবিগান করবো দুইজনা,
বিধির কিবা ঘটনা, দিল বেগুন দিয়া॥
আমরা এবার গেলে কোন কালে—
ফিরে হবে না আসা,
দুঃখেতে বুক ফেটে যায়—
সুগন্দিয়া হৈল কি চোরের বাসা ?
( আছেন ) ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মজুমদার,
তবে কেন অবিচার, আজব তামাসা।
আমার নিদ্রা কালে, গাট্টি খুলে,
চোরে নিল নয় পয়সা॥

আর একবার রামেশ্বরপুর নামক এক ভদ্র ও বাঁধক্ষু গ্রামে রামগতি এবং রামু সরকার গান গাইতে যান। রাত্রে রামগতি সরকারের নূতন জুতা জোড়া চুরি হয়ে

যায়। দুঃখে তিনি গান আরম্ভেই সেই বৃত্তান্ত একটি টপ্পা গানের মাধ্যমে সভাস্থ শ্রোতাদের জানালেন—

কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল।
রামু মালীর সঙ্গেতে কবি সঙ্গীত গাইতে,
এথা এসে পেয়েছি তার ফল ॥
অকস্মাতে এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়ল কুঁড় ;
এখন আর সাবেক ধরণ নাই সে রামেশ্বরপুর।
ভদ্রলোক কয়েকজন, বুদ্ধে সাধ্যে বিলক্ষণ,
যাঁদের করি জোড়।
সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে, কয়েক শালা জুতা চোর ॥

রামু মালী কিছু তালুক খরিদ করেছিলেন। কাটিহালী গ্রামে রামগতিসহ গান করতে গেলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ রামুকে ভাগ্যবান বলে খুব প্রশংসা করেন। রামগতির তালুক নাই সুতরাং প্রশংসাও পেলেন না। তিনি তখন রামুর তালুকের অবস্থা জ্ঞাপন করে এক টপ্পায় গাইলেন—

রামু বড় ভাগ্যবান কর্তারা শুনছেন।
বল্লে আমি দোষী হই,
আসল কথা কই কৈ ( কোথায় ),
একশ' টাকার তালুক কিন্যা,—
তিনশ' টাকা দেন ॥

*  *  *  *

হ  লাত করে কাওয়ালা লয়,
নিজের নামে দলিল হয়,
মা-জনে রে দেয় রেন্,
দখল পায় না পচা মালী—
এমন তালুক করল কেন্ ?

উক্ত টপ্পায় বিরক্ত হয়ে রামু মালী রামগতির বসন্তের দাগ চিহ্নিত মুখকে ব্যঙ্গ করে বললেন—

তোমার মুখখান যেমন 'ডায়মন কাটা'।

তখন রামগতি আবার রামুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় নিম্নোক্ত টপ্পা রচনা করেন—

আচ্ছা ঢকের পুরুষ,
নাই কোন দোষ, দেখতে চমৎকার।
কবি গাই,—কত দেশ বিদেশে যাই,

এমনঢকের পুরুষ দেখি নাই কো আর ॥
ঘাড়টা মোটা, চোক্‌টি ছোট,
মাথাটা বানরের হুল ;
রামু মালী, কেওয়া বনে ফুটেছে গোলাপের ফুল।
হাড়গিলার মত দু'টা পাও,
পেটটা যেমন কুন্দা নাও
কপালের দুই দিকে নাই চুল।
* * * বুকটা যেমন হুক্কার খোল ॥

এক সূত্রধর সরকার রামগতিকে নাপিত বলে নিন্দা করলে রামগতি গাইলেন—

* * * *

নাপিত ধোবা, সভার শোভা
মর্ম কে না জানে তার,
গোয়াল বাণ্যা, কামারের নিচ্ছুন, কাঠ-কাটা ছুতার ॥
গোয়াল বাণ্যা কামারে,
চাইর-আনি চুরি করে, ব্যক্ত ত্রিসংসার।
ছুতার বাড়ী কাষ্ঠ দিলে—
তুলে মূলে পায় না আর ॥

কবি রামকানাই নাথ সরকারকে তাঁত বোনার ভাঁজ দিয়ে এক টপ্পা শুনিয়েছিলেন একবার—

কত যুগী-জোলা, ঝুমুরওয়ালা
দেখার বাকী কি আছে ?
হরি সরকার, পীতাম্বর,
যারা ছিল কবিবর,
তারা সবে দেখে গিয়াছে ॥
কত মন্দ বা'দুর ( বাহাদুর ) হন্দ হৈল,
বাকী রৈল জোলার পো ;
কবি তো নয় রে কানাই—
হানাদপ্তীর ( যুগীদের বস্ত্রবয়ন যন্ত্র ) যো।
যুগী গাতে ( গর্তে ) থাকে চিরকাল,
অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক শিয়াল,
লাকুর ভাই মাকু ;—ইত্যাদি

এক দোলযাত্রার দিন হাসনপুর গ্রামে বিজয় আচার্য, রামগতি শীল, কালীচরণ দে ও পরাণ কর্মকার এই চারজন দুই দলে ভাগ হয়ে হোলী গান করেন। হঠাৎ উভয়

দলে বিবাদ বেধে যায় এবং বিজয়ের দলের একজনের লাঠির আঘাতে পরাণ সরকারের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। হাঙ্গামা নিবৃত্ত হলে, নিরপেক্ষ রামগতি স্বদলীয় পরাণকে হাঙ্গামার জন্য দায়ী করে টপ্পা করলেন—

হাসনপুরে সালোকবাড়ী হুলি গাওয়া হয়।
কালী সরকার পরাণ চান, রামগতি বাঁধছে হুলী গান,
'সরকারী'তে পরাণ আর বিজয় ॥
শেষে বিজয়ের সঙ্গে কাজ্যা করিয়া—
পরাণের যায় দাঁত ভাঙ্গা ;
কামার কিসে ভদ্র হবে, আসলে পোঙ্গা। ইত্যাদি।

রামগতির রচিত অসংখ্য টপ্পা ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিল। তার অতি ক্ষুদ্রাংশই 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরগঞ্জে গান গেয়ে বিদায়ের টাকা না পেয়ে দলের লোকজন নিয়ে বসে বসে খাচ্ছেন। অবশেষে বায়নাদার নাজির মহিমবাবুকে সম্বোধন করে টপ্পা শোনালেন—

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বাবুজী নাজির।
বাবুর আজ্ঞা পেয়ে কবির দল,
দুইখানা করিয়ে সম্বল,
হুজুরেতে হয়েছি হাজির ॥
এখন লভ্য করা দূরে থাকুক, দায় ঠেকেছে খোরাকী
বিদায় দিলে দুর্গা বলে—বাড়ি যেয়ে হই সুখী ॥

রামগতি নিরক্ষর হলেও কেমন সুললিত রচয়িতা ছিলেন একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। সুকণ্ঠ রামগতির মুখে রামায়ণ শোনার মানসে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পড়তে দিলে, তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—"সরস্বতী আমার প্রতি সে কৃপা করেন নাই। রামায়ণ শুনিতে চান, আমি অমনি শুনাইব"—এই বলে স্বরচিত রামায়ণ শোনাতে লাগলেন—

সুন্দর সরযূ তটে অযোধ্যানগর,
দশরথ নামে তথা এক নৃপবর।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী,
পরাক্রান্ত নৃপতির তিন পাটেশ্বরী।
···ইত্যাদি

জনৈক কবিয়াল একদা রামগতিকে প্রশ্ন করেছিলেন—"কলিতে জগন্নাথ কে ?" রামগতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

যার ঘরে আছে সতী নারী, গোলায় আছে ধান,
গোয়ালেতে দুগ্ধবতী দুগ্ধ করে দান।

পুত্র যারে মেরে মাছ, অর্জে খাওয়ায় ভাত,
যার পুকুরে স্বাদু জল, সেই তো জগন্নাথ।

কবি রামগতি উপমা উত্থাপনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে একটি কথার পিঠে অসংখ্য উপমা দিতে পারতেন। নমুনা থেকে সত্যতা প্রমাণ হবে—

১। যেমন সুগৃহী আর সবিতা।
সুরভি আর সুমাতা
কুলের কন্যা কমলে
সৎপুত্র আর বেলফুলে ॥

২। কুপুত্র আর বলদে
কুগৃহ আর গারদে
কুভৃত্য আর কুকুরে
কুসঙ্গী আর শূকরে
অসৎ নারী বদ্ধ জল
হাটের বেশ্যা মাকাল ফল।

৩। যেমন জলের শোভা কমলে
চক্ষের শোভা কাজলে
ওষ্ঠের শোভা তাম্বুলে
সতী নারীর পতি শোভা
কোলের শোভা ছাওয়ালে ॥

৪। যেমন জলের শোভা কমলিনী
পদ্মের শোভা ভানু
তেমনি কুমুদিনীর চন্দ্র শোভা
রাধার শোভা কানু।

এই স্বাভাব কবির শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটে। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বড়াইল বাজারের নিকটবর্তী নদীতীরে কুটীর বেঁধে বাস করতে থাকেন। অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে এলে কবি মহামায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করে গাইলেন—

জলবিম্ব জলে যেমন—
আছে দেহের মাঝে জীবন তেমন—
রবে না মা কখন;
অন্তে রাখিস মা তব পদে এই নিবেদন।
যেমন ধারা নিশির শেষে পদ্মপত্রের জল,

জীবন তেমনি হল চঞ্চল।
মা মাগো, ঘন ঘন বহে নিঃশ্বাস,
এ জীবনে নাই গো বিশ্বাস,
অনিত্য জীবনের আশ—
আমার সকলি বিফল ॥

শেষ দিনের আর বিলম্ব নেই বুঝে কবি গাইলেন—

আমার বাকি কি আর গমনে,
যেদিন বাঁধবে এসে শমনে।
আমার দিনের নাই বাকি,
তাইতে মা ডাকি, তারা তারা বলে বদনে ॥
মাগো, দীন বেশেতে যাব যেদিন,
নিকট হলো বিকট সেদিন,
সে দিনের আর বাকী ক'দিন,
আমার দিন শেষ হয়ে এলো ॥

ষাট বৎসরাধিক বয়সে আনুমানিক ১৩০৮ সালে এক গভীর রাত্রে প্রায় নিঃসঙ্গ এই প্রতিভাবান কবির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। (সৌরভ—বিভিন্ন সংখ্যা)

## লাল মামুদ (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার নারায়ণ ডহরের নিকটবর্তী বাগুইডহর গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান গৃহে লাল মামুদ জন্মগ্রহণ করেন। লালু ও কালু দুই ভাই ছিলেন। বয়সে লালু ছোট, কালু বড়। এই লালুই কবি লাল মামুদ।

আমাদের দেশের দরিদ্র ঘরের ছেলেদের লেখাপড়ার কথা কারো মনে আসে না। কিন্তু শিশুকাল থেকেই লালুর লেখাপড়ার দিকে টান ছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়ে তিনি সাধারণ বাংলা লেখাপড়া শিখলেন। আস্তে আস্তে বাংলা বইপত্রাদি পড়ে পড়ে তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নেন।

লালু প্রথমে গাজির গান গাইতেন। অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত,শ্রীমদ্ভাগবতাদি হিন্দু শাস্ত্র ও পৌরাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করে কবিগান গাইতে শুরু করেন। ক্রমেই তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতে করতে লালু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়লেন। নিজ গৃহ সমীপবর্তী নদী তীরে বটবৃক্ষমূলে তুলসী মঞ্চ স্থাপন করে

নিত্য সেবাপূজা শুরু করলেন। এবং সেখানেই স্বহস্তে পাক করে খেতেন। খোল করতাল সহ দু'বেলা কীর্তন, আরতি ও নামগানের মধ্যেই ভক্ত কবি লাল মামুদের দিন কাটতো।

লালু সমস্ত রকম আমিষ খাদ্য ত্যাগ করে সাত্ত্বিক আহার আরম্ভ করলেন। তাঁর হরিভক্তি পরায়ণতা ও মধুর নামকীর্তনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে সাধু বৈষ্ণবের সমাগম হতে লাগলো। লালু তাঁদের সেবা যত্নের ত্রুটি করতেন না। লালুর মা এবং বড় ভাই কালু লালুর পবিত্র জীবন যাপনে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। আশপাশের মুসলমানগণ অবশ্য লালুকে পাগল বলে মনে করতো। হরি সংকীর্তন ও কৃষ্ণ কথায় লালুর ভজন বাটি সব সময় আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকতো। সাধু বৈষ্ণবদের তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করতেন। নিজেকে দীন হতে দীন নীচ হতে নীচে মনে করতেন। কায়মনোবাক্যে তিনি বৈষ্ণবোচিত জীবন যাপন করতেন। ভাবাবেগাপ্লুত কণ্ঠে যখন ভগবৎলীলামাধুর্য বর্ণনা করতেন তখন তাঁকে গৌরাঙ্গ পার্ষদ যবন হরিদাসের দ্বিতীয় অবতার মনে হতো। ময়মনসিংহের শ্রীপাট বড়তলা নিবাসী শ্রীলবৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী ঠাকুর লালুর সাধন ধামে এসে তাঁর আত্মবিস্মৃত ভগবৎভক্তিতে আত্মহারা হয়ে তাঁকে সস্নেহ প্রেমালিঙ্গন দান করেন। বিশিষ্ট ভক্ত কবি বিজয়নারায়ণ আচার্যও মাঝেমাঝে সদানন্দ লালুর সঙ্গলোভে তাঁর আশ্রমে হাজির হয়ে নামকীর্তন ও ভক্তি কথা শুনতেন। তিনি লাল মামুদের সঙ্গে দু'তিনবার কবিগানও গেয়েছিলেন। সেদিন লালু তাঁর রচিত গানের খাতা থেকে নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে গোস্বামী প্রভু ও তাঁর সঙ্গী কবি বিজয়নারায়ণ আচার্যকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন—

দয়াল হরি কৈ আমার।
আমি পড়েছি ভব কারাগারে,
    আমায় কে করে উদ্ধার॥
ষড় রিপুর জ্বালা প্রাণে সহ্য হয় না আর।
শত দোষের দোষী বলে, জনম দিলে যবন কুলে,
    বিফলে গেল দিন আমার।
আমি কুল ধর্মে পরম-ধর্ম ভুলে,—
    কত কল্লেম কদাচার॥
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষ্মী তুমি সারদা,
    সত্ত্ব রজঃ ত্রিগুণের আধার।
তবু হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,—
    ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার॥
দীনহীন লাল মামুদে, ঠেকিয়ে সংসার গারদে,

মনের খেদে বলতেছে এবার।
জীবনান্তকালে হরি বলে, প্রাণ যায় যেন আমার ॥

কবি লাল মামুদ রচিত ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে "নির্মল চিত্তের বিমল ভাব ও কবিত্ব শক্তির" সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। এই ভক্ত কবি যৌবনেই আনুমানিক ১৩০২ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন। ফলে তাঁর কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে নি।

( সৌরভ, বৈশাখ ১৩২৩ )

## রামু মালী সরকার ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৭ সালের চৈত্রমাসে রামু সরকার জন্মগ্রহণ করেন। রামু জাতিতে ভুঁইমালী। তাই রামু মালী বা কবিয়ালদের সাধারণ উপাধি "সরকার" যোগে রামু সরকার নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। রামুর পিতার নাম রামপ্রসাদ ও মাতার নাম নারায়ণী।

রামু সরকার একজন অনক্ষর কবি ছিলেন। বাল্যাবধি সঙ্গীত সুধায় মোহিত রামুর লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। আউটপাড়া নিবাসী অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য বালক রামুর বুদ্ধিপ্রাখর্য ও সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করে তাকে সাগ্রহে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিক্ষায় ও যত্নে অত্যল্পকালের মধ্যে রামু গীতবাদ্য ও শাস্ত্র জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। অক্ষর জ্ঞানহীন অথচ গুরু মুখে শুনে শুনে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চন্ডী, ভাগবত, পুরাণাদির সার বুঝে নিলেন। তাঁর স্মরণ শক্তি প্রবাদ বাক্যের মতো ছিল। বোধ শক্তিও ছিল অসাধারণ। যা কিছু শুনতেন তা থেকে অনায়াসে ভাব গ্রহণে সমর্থ ছিলেন। শাস্ত্রাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে মৌখিক ছড়া-পাঁচালী বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করে কুড়ি বাইশ বৎসর বয়সে একজন বিখ্যাত কবির "সরকার" হয়ে উঠলেন।

রামু সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রামগতি, রামকানাই, বিজয়নারায়ণ আচার্য, শক্তিরাম, বড়হরি, মিঞা জান, নবু সরকার, গোবিন্দ মালী, বিশ্বম্ভর ঠাকুর প্রভৃতি নিজ জেলা ও অন্যান্য জেলার কবিয়ালগণের নাম প্রসিদ্ধ।

অতি দ্রুত ছড়া বলা, এবং সুর সংযোগে সুললিত পাঁচালী কীর্তন দ্বারা সভা জয় করা রামুর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার ছিল। গানে তিনি সভাকে হাসাতে কাঁদাতে সক্ষম ছিলেন। হাস্য করুণাদি যে কোন রস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমক অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর ছড়া পাঁচালী সর্বহৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো। তাঁর সুললিত কণ্ঠ-স্বরেও আসর মোহিত থাকতো। রামু নিরক্ষর ছিলেন বলে রচিত সঙ্গীতাদি কিছুই লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি। তাই তাঁর রচনার সামান্য অংশই রক্ষা পেয়েছে।

একদা নেত্রকোনায় শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বিজয়নারায়ণ আচার্যের সঙ্গে ঢাকা রাজখাড়াবাসী মদন শীলের গান হচ্ছিল। রামুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতী পূজা হলেও মদন সরকার 'হরি' বিষয়ক ডাক গান গাইলেন। ইতিমধ্যে বিজয় সরকারের ঢুলী আসরে গেল। রামু বিজয়কে কি ডাক-গান গাইবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে কালী বিষয়ক একটা ডাক-মালসী গাইবেন। রামু সরকার তাতে অসম্মত হয়ে তৎক্ষণাৎ ঢুলীর কয়েক মুহূর্ত আখড়াই বাজাবার ফাঁকেই নিম্নোক্ত সরস্বতী বিষয়ক ডাক-বন্দনা গানটি রচনা করে গাওয়ালেন—

ভারতি ! তুমি কৃপাবতী, দীনের প্রতি কর কৃপা দান।
তোমার কৃপা হলে, মূকে, সুখে করে শ্রুতি গান ॥
তুমি কৃপা কর যারে, তাঁর মত কে এ সংসারে,
করে যে কবিত্ব সুধা পান।
তোমার কৃপা বিনে, দিনে দিনে, শুকায়ে গেল প্রাণ ॥

অন্তরা

মা তোমার বীণার ধ্বনি, মধুর ধ্বনি
সে ধ্বনি পশেছে যার কানে।
তার প্রাণে যে কি আনন্দ,—
সে বিনে তা আর কে জানে ॥
সাহিত্য সঙ্গীত সুধা, পান করে সে নিশিদিনে।
চায়না সে আর ভবের বিভব,—
কেবল তোমার চরণ বিনে ॥

একবার মদন শীলের সঙ্গে বিজয় সরকারের বসন্ত গীতের পাল্লা চলছিল। বিজয়-নারায়ণ দুই দিন কোন মতে চালিয়ে তৃতীয় দিন দেখেন তাঁর বসন্ত গানের ভান্ডার শূন্য। তিনি রামু সরকারকে এ কথা জানালে, তিনি তৎক্ষণাৎ বসন্ত গান এবং তারপর লহর কবি রচনা করে দিলেন। তাছাড়া তিনি "বংশীহরণ" সম্বন্ধেও যে গানটি লিখে দত্তগ্রামের আসরে গাইয়েছিলেন তাও সংগৃহীত হলো।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজারা চার ভাই ছিলেন (রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ)। তখন রামু সরকার রাজা ও রাজবাড়ীর বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত লহর কবি গানটি রচনা করে যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছিলেন—

চিতান— রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম অবতার।
পারান— বড় বাঞ্ছা করে, এসেছি চরণ দেখবার তরে,
বর্ণিবারে সাধ্য কি আমার ॥
লহর— যেমন ইন্দ্রপুরী, তেমনি মহারাজের বাড়ী, অমরা সমান।

কত নৃত্য, গীত গান, হচ্ছে অবিরাম।
স্থাপিত আছেন দশভূজা, বাহির বাড়ী দুর্গা পূজা,
ত্রেতায় যেমন শ্রীরামের পূজা, এমনি হয় মোর জ্ঞান ॥

মিল— ধর্মেতে যুধিষ্ঠির তুল্য, চন্দ্র তুল্য রূপ,
আমি মূঢ় কি বলিব রূপগুণের নাই তুলনা।

মহড়া— গোলকের নাথ গোলক ছেড়ে, রাজকুলেতে দুর্গাপুরে,
এক অংশে জন্মিলেন চারিজনা।
দানে বটেন মহাদানী, মানে বটেন মহামানী,
এ জগতে নৃপমণি, আমি আর এমন হেরি না।

খাদ— পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে করেন মন্ত্রণা।

লহর— আছে নবত ( নহবত ) খানা, আর দক্ষিণে নায়েবের থানা,
বাগানের কাছে, আনন্দবাজার আছে।
বড় পুষ্করিণীর উত্তরপাড়ে, আমলা পট্টি শোভা করে,
বাঘের দালান পশ্চিমপাড়ে, আজব কারখানা ॥

কোন এক স্থানে গানে বিজয় আচার্য কবির দাঁড়ায় রাবণ হয়ে রামু সরকারকে মহাদেব কল্পনা করে জিজ্ঞাসা করলেন—

"প্রভো! আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় আমাব শরীরে অমিত বল। তবে মিথিলায় গিয়া আপনার ধনুখানা তুলিতে পারিলাম না কেন? আমি সীতা লোভে হরধনু তুলিতে গিয়া লজ্জা পাইয়া আসিয়াছি। এক দিন তো এই ধনু সহ কৈলাস পর্বত বাম হস্তে উত্তোলন করিয়া এই বিশ্ব সংসারকে চমৎকৃত করিয়াছিলাম। তবে অদ্য আমার এমন দশা হইল কেন?"

রামু সরকার মহাদেবের জবানীতে উত্তর দিয়েছিলেন—

বল্লে তুমি আমাব কাছে রাবণ মহারাজ।
হরধনু তুলিতে, পাল্লে না কোন মতে,
মিথিলাতে পেয়ে এলে লাজ ॥
এ সব কার্যে যেতে হলে, জানতে হয় তার পূর্বাপর,
ধনু তুলতে গেলে কেন—না জেনে খবর?
জনকের জানকী, তাঁরে জান কি, তুমি নিতান্ত বর্বর।
সেই সে ধনু তুলতে পারে, যে হয় সীতার যোগ্য বর ॥

কবির আসরে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বে শাক্ত-পক্ষাবলম্বী কবিগণ বৈষ্ণবদের আচার আচরণ সাজপোষাক নিয়ে খুব রঙ তামাশা করে থাকেন। তখন মনে হয় ঐ কবিয়ালকে বৈষ্ণবের ভূমিকায় দিলে তিনি মোটেই সুবিধা করতে পারবেন না। কিন্তু

এ ধারণা যে কত ভুল তা নিম্নোক্ত ঘটনায় বোঝা যাবে। রামু সরকার প্রায়শঃ শাক্ত-পক্ষ নিয়ে বিজয় আচার্যকে বৈষ্ণব পক্ষে রেখে আসরে হাস্য পরিহাসের বান ডাকতেন। একদিন বিজয় সরকার দাঁড়া উলটে নিলেন। তিনি "কালী বাড়ীর পান্ডা" অর্থাৎ শাক্ত হয়ে রামু সরকারকে সনাতন গোস্বামীর ভূমিকায় দাঁড় করালেন এবং "জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী" বলে উপহাস করলেন। রামু সরকার টপ্পায় এই কথার কি সুন্দর তাত্ত্বিক জবাব দিয়েছেন দেখুন—

তুমি বল্লে নাকি জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী।
জাতিকুল, সে তো স্থূলের দেশের গোল,
কুল কি মানে প্রেমানুরাগী?
( আমরা ) রাধাকৃষ্ণ প্রেম-সাগরে ডুবায়েছি জাতিকুল,—
পান্ডা ঠাকুর ! কুল থাকতে আর অকূলেতে
কেউ পাবে না কূল।
শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, জীব মাত্র তার সন্ততি,
সম্প্রতি বুঝ জাতির মূল ;
তুমি দেখতে ভাল মাকালের ফল—অথবা মান্দারের ফুল ॥

নেত্রকোনা মহকুমার চন্দনকান্দী নিবাসী ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল গিরীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর শ্বশুরালয় রায়পুরে রামগতি, রামু ও বিজয় সরকার এই তিনজন কবিয়ালকে আনয়ন করে একবার কবিগানের ব্যবস্থা করেন। যথারীতি গান শেষে পাল্লার উপসংহারে গিরীশবাবু তিনজন কবিকে এক ফরমাইশ করলেন—"এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রী পূজা সমাগত দেখে একখানা নূতন শাড়ীর জন্য তার স্বামীর সঙ্গে কোন্দল করছে"—এই ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে রামগতি, রামু ও বিজয় যেন তিনটি টপ্পা গেয়ে যান। রামগতি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে টপ্পা ধরলেন—

আশ্বিন মাসে বঙ্গ দেশে, এসেছে আনন্দের জোয়ার।
মরি হায়রে, যত ধনী লোকে,
করতেছে মনের সুখে, সাজসজ্জা সম্ভার ॥
তাই দেখে এক নূতন বামনী
বামনের কাছে শাড়ী চায় ;
কড়ার কাঙ্গাল, ( ছিল ) বামন বাঙাল,
জঞ্জাল ঘটাল বিধাতায়।
দিন গেল কন্দল করে, ব্রাহ্মণ তো ক্ষুধায় মরে—
রাঁধতে কেটা যায়।
( ব্রাহ্মণ ) সন্ধ্যাবেলা পাক চড়াইল—
বামনী গে জল ঢেলে আগুন নিবায় ॥

রামু মালী উক্ত টপ্পা গাওয়ার ফাঁকটুকুতে নিম্নোক্ত টপ্পা বেঁধে নিয়ে গাওয়ালেন—

পূজা এলো, ধুম লাগিল বাঙ্গালীর ঘরে।
সকলে, যার যেমন ভাগ্যেতে মিলে,
তেমনি বেশ ভূষণ করে॥
ছিল মধু ঠাকুর দক্ষিণ পাড়া—ভিক্ষা করে দিন কাটায়।
বিলাসিনী তার ব্রাহ্মণী, অমনি নূতন শাড়ী চায়।
ঠাকুরানী রাগ করে, ঠাকুরের চুলে ধরে
—ঠাকুর ধরে পায়।
মাঝে পড়ে রামু মালী—দু'জনার বিবাদ ভাঙ্গায়॥

সব চেয়ে বেশী সময় পেয়েছিলেন বিজয় সরকার। তিনি যে টপ্পা গাওয়ালেন তা নিম্নরূপ—

পূজার বেলা, কুলবালা সকলে করেছে নূতন সাজ।
মরি হায়রে, একটি গরীব ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণীর শাড়ীর কারণ, পেলেন বড় লাজ॥
শাড়ীর লেগে উঠেছে রেগে, ব্রাহ্মণী বাঘিনীর প্রায়।
গরীব ব্রাহ্মণ, মরে ভাতের কারণ॥
বামনী ঠেকালো তারে দায়॥
( হৈল ) বকাবকি কতক্ষণ,
তারপরে বাধিল রণ, অম্‌নি দুজনায়।
( ঠাকুরের ) কাছায় ধরে গায়ের জোরে,
ঠাক্‌রানে শাড়ী করতে চায় আদায়॥

উদ্ধৃত তিনটি টপ্পার ক্রমানুগতিকতার মাপকাঠিতেই এই ত্রয়ীর কবিত্ব শক্তির পরিমাপ করা যায়।

১৩২০ সালের ৩০ ফাল্গুন ৭২ বছর বয়সে রামু মালী পরলোক গমন করেন।

( সৌরভ, বিভিন্ন সংখ্যা )

## রামকানাই নাথ ( ময়মনসিংহ )

রামকানাই নাথ ময়মনসিংহ জেলায় একজন বিশিষ্ট কবির সরকার ছিলেন। তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য মহাশয় প্রদত্ত নিম্নোক্ত বিবরণীটি উল্লেখযোগ্য।

"আমার সহিত তাঁহার গান হয় নাই। একবার কটিয়াদী বাজারে ভগবান আচার্য

মহাশয়ের সহিত তাঁহার পাল্লা হইয়াছিল। আমি রামায়ণের দল নিয়া তাহাদের গান শুনিয়াছিলাম। জবাব টপ্পার কাটাকাটি তাহাদের বড় হয় নাই; কেবল ছড়া কাটাকাটি হইতে লাগিল। ভগবান আচার্য মহাশয়ের একটি জবাব শুনিয়া আমি বিশেষ সুখী হইয়াছিলাম। গানে ছিল কুটিলার প্রতি আয়ানের উক্তি—

"কৈ গো কুটিলে! বনে শ্রীনন্দের নন্দন কৈ?
কালা দেখতে এসেছিলেম, এ যে কালী ব্রহ্মময়ী।"

ভগবান আচার্য মহাশয় ইহার সুন্দর উত্তর করিয়াছিলেন—

সোনা বউ তোর বনান্তরে কালার সঙ্গে বিরাজ করে
তুই তো "বাথানে" র'বি।
মূর্খতা তোর চিরকালই, তুই বলিস দক্ষিণাকালী,
দাদা! এই কালী তোর কুলের কালী—
এখন তা টের পাবি ॥"

ভগবান আচার্য মহাশয় কিছু মোটা কথায় ছড়া কাটিলেন। তিনি নাথ মহাশয়কে বলিলেন,—

"যোগী জাতের মরণ বড় নটখাটি;
এই যোগী জাত মরলে পরে—
তেছরা করে দেয় মাটী।"

রামকানাই নাথ মহাশয় এই ছড়ার বড় সুন্দর উত্তর করিয়া ছিলেন। উত্তরটি এই—"ঠাকুর, দুই বৎসরের কম বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেলে গর্ত করিয়া মাটি দিয়ে থাকে। সেই ছেলের জন্মদাতা কি আমাদের যোগী না তোমাদের ব্রাহ্মণ।" বলিহারী উত্তর। ভগবান আচার্য ইহার সন্তোষজনক উত্তর করিতে পারেন নাই।

( বঙ্গের কবির লড়াই )

## সূর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী ( ময়মনসিংহ )

চন্দনকান্দী গ্রামের ( নেত্রকোনা ময়মনসিংহ ) নন্দী বংশের খ্যাতনামা পুরুষ, সূর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী মহাশয়কে ঠিক আক্ষরিক অর্থে কবিয়াল বলা চলে না। কিন্তু তিনি অনেক কবির আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন! কবি রামগতি সরকার ও অন্ধকবি তারাচাঁদ দীর্ঘকাল তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। স্বয়ং কবিসঙ্গীত ও কীর্তন গীতি রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গান কবির দলে ও হরিসংকীর্তনে

গীত হতো। সূর্যকান্তের সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের উকিল গিরীশচন্দ্র চৌধুরীও কবিয়ালদের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কবি রামু মালী, রামগতি শীল সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত হলেও কায়স্থ প্রধান সূর্যকান্ত তাঁদের গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। স্বরচিত একটি কবিসঙ্গীতে তিনি উভয় কবির গুণপণা ব্যাখ্যা করে গেছেন—

গোবরেতে পদ্ম ফোটে সে তো মিথ্যা কথা না।
তা সাক্ষাতে সব সাক্ষ্য পেলাম—রামু, রামগতি দু'জনা ॥
তারা জন্মকুলের ধর্ম ছেড়ে করেছে উত্তমেরি কাজ।
বাগ্‌দেবীর কৃপা বলে, অনর্গল শাস্ত্র বলে,
মাথাতে দিচ্ছে তুলে, সাচ্চা জরীর তাজ ॥
যেমন, আমড়া গাছে আম ধরেছে, নিম গাছে বাদাম,
যেমন, ফণীর মাথায় মণি আছে, ঝিনুকেতেও মোতি হয়।
ঐ রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয় ॥
লয়না সে চামড়া হাতে—
বেড়ায়না বড় বাজারের পথে পথে দিনে রাতে
আবার গৌরবচনের মতে মতে—
পাঁচালীতেই ছড়া কয়।
সকলেই তাই জানে, দুজনে দিচ্ছে পরিচয়,
যেমন ডুমুর গাছে ফুল ফোটেনা—
কেবল কথা মাত্রই হয়।
রামু-ডুমুরের গাছে ভুঁইচাপা ফুল ফুটিয়াছে,
রামগতি প্রতিপদে চন্দ্রেরই উদয়।
যেমন পাশাপাশি দু'টি তারা, কালিদাস বররুচ,
এসে বাংলাদেশে জংলাতে ভাই
করে গেল দিক্‌বিজয়।
রামগতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয় ॥

একবার রামগতি ও রামুর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। তখন উভয় সরকারের গুণগত পার্থক্য অবলম্বন করে সুরসিক সূর্যকান্ত নিম্নোক্ত মীমাংসাত্মক ছড়া রচনা করেছিলেন—

হায়, আমোদে প্রমাদ ঘটায়ে বসেছি,
দেখ দেখিরে ভাই,
রামগতি আর রামুচাঁদে
পাঁচালীর ছড়াতে লড়াই।

যেমন শান দিয়ে ক্ষুর প্রাণে হানে,
(নাপিত) রামগতি করছে হালবেহাল
রামু (মালী) তাই শান্ দিয়ে চলে, ঝাঁঝটের কাটা খাল,
রামগতির মাঝ কপালে বসাবে কোদাল।
কেমন নরসুন্দর ভূমিসুন্দরে বিবাদ—
যেমন রাক্ষসে বানরে যুদ্ধ, কেউ হতে কেউ নয়রে কম।
রামুচাঁদ ভাবছ কি হে, রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম।
ইত্যাদি।

যায় জাঁকজমকে ধুয়া গেয়ে—
ছড়া কয় চোটপাটে ভ্রূকুটি দিয়ে কাঁপছে হিয়ে,
আবার তোর পানে চায় মিটমিটায়ে,
ঠিক যেন কালনেমির যম।
রামুচাঁদ ভাবছ কি হে, রামগতি আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম ॥
এখন ঝকমারি কাজ গেছে,
হয়েছে সরকারি 'ইন্‌কম'।
আবার দেখ না চেয়ে যাচ্ছে গেয়ে
রামগতির মুখে ক্ষুরের ধার,
যায় আবার ছড়া গেয়ে, চাম্‌টি দেয় রয়ে রয়ে,
আড়া চৌতাল বাজায়ে উড়াচ্ছে বাহার।
এ তো মাটি কাটা নয়রে রামু, এক কাটায় কাজ হয়,
তুমি পড়েছ চুল কাটার হাতে, খসাবে তোর খাসা লোম।
রামুচাঁদ ভাবছ কি হে·······ইত্যাদি।

আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক সূর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী পরলোক গমনে ব্যথিত কবি তারাচাঁদ গেয়েছিলেন—

"বাবু সূর্যকান্তের জীবনান্তে,
এককালে ডুবল কবির জাহাজ,
ইচ্ছা আমিও মরে যাই,
ভবে রাখলে কেন ধর্মরাজ।"

(সৌরভ)

# হরিবর সরকার ( ফরিদপুর )

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমাধীন দুর্গাপুর গ্রাম পূর্ববঙ্গে কবিগানের অন্যতম পীঠস্থান ছিল। সেখানে কবি আনন্দচন্দ্র সরকারের পিতামহ রামজীবন বসতি স্থাপন করেন। আনন্দচন্দ্র আনুমানিক ১৮৩৩ খৃঃ উক্ত দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোহরের কবি-রসরাজ তারক সরকারের সমসাময়িক। এবং স্বয়ং খ্যাতনামা কবিয়াল বলে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর কবিগানের গুরু ছিলেন বেচারাম সরকার ; কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ফরিদপুরের ওড়াকান্দির শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী নমঃশূদ্র সমাজের অবিসংবাদিত ধর্মগুরু। আনন্দচন্দ্র ছিলেন ৺হরি ঠাকুরের কৃপাধন্য। বলা হয়ে থাকে—

'ও সেই হরি ঠাকুরের কৃপায়, রবির আগে কবি গায়,
আনন্দ আর তারক কবি-রসরাজ।'

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় নমঃশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ( পি, আর, ঠাকুর ) ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র ।

সে যাক। আনন্দচন্দ্র দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পরে ৺ঠাকুরের বরে পুত্র লাভ করেন বলে নাম রাখেন হরিবর। হরিবর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দচন্দ্রের ভাইপো কবি মনোহর সরকার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ খৃঃ। স্বয়ং আনন্দচন্দ্র, পুত্র হরিবর এবং ভাইপো মনোহর ও আনন্দচন্দ্রের নাতি খুলনার কবি রাজেন্দ্রনাথ এবং এঁদের শিষ্য উপশিষ্য, আত্মীয বন্ধু সমাগমে, অবিরাম কবি গানের চর্চা ও শাস্ত্রালোচনায় আনন্দচন্দ্রের বাড়ি প্রকৃতই এক আনন্দ নিকেতনে পরিণত হয়েছিল। দুর্গাপুর মেঘনা-পদ্মার পশ্চিম পারে অন্যতম কবি-কেন্দ্র বলে পরিচিত হয়। আনন্দচন্দ্র ৯৩ বছর বয়সে ১৯২৬ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

হরিবর সরকার গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদেশে তারক সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অন্যতম 'মতুয়া' রূপে হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কবিগানে সরস ও হৃদয়গ্রাহী পাঁচালী কথনে তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এবং বিভিন্ন কবির আসরে ও পণ্ডিত সমাজে কবিরত্ন, কবিরঞ্জন, কবিচূড়ামণি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন।

কবি রসরাজ তারক সরকার কৃত বৃহৎ 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর তাঁরই সম্পাদনায় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয। মহা-সংকীর্তন নামে আর একখানা পুস্তকেও তিনি তারক সরকারের গানের সঙ্গে নিজের কয়টা গান দিয়ে প্রকাশ করেন। তাঁর আরো তিন খানা বই হলো—দ্বাদশ আজ্ঞা, অষ্টাধিক শতনাম এবং মহাবারুণী।

তাঁর রচিত গানের নমুনা উদ্ধৃত হলো—

এল গোলক ত্যজে ভবপারের কর্ণধার,
তরবি যদি ভব নদী ওড়াকান্দী চল এবার,

বৃন্দাবন নবদ্বীপ গোলোক শতাংশের তুল্য নয় যার।
মুখে হরি হরি বলে, নেচে নেচে বাহু তুলে,
হও রে আগুসার,
ব্রজেশ্বরী প্রেমধার শুধিতে এবার ওড়াকান্দী অবতার ॥
নদীয়ায় হয়ে গৌরাঙ্গ, শুধিতে ঋণ কত রঙ্গ,
করছে অনিবার,
তবু নিরন্তর দহিছে অন্তর
বুঝি তাই এল প্রাণ জুড়াবার ॥
ব্রহ্ম, ইন্দ্র, পশুপতি, ভেবে পায় না দিবারাতি
পদারবিন্দ যার,
জীবের ভাগ্যবশে সেজন এসে
হরিনাম করছে প্রচার ॥
বিষয় ত্যজে যে বৈরাগ্য, জন্ম মৃত্যু জরারোগ্য
হয়েছে সেই নর,
একবার যে গিয়াছে সেই পেয়েছে
ভবরোগের প্রতিকার ॥
মহানন্দ বারে বারে, ডেকে বলে ওরে হরে—
তুই ত দুরচার,
যদি যাবি পারে চরণ ধরে
গুরুচাঁদকে সহায় কর ॥

হরিবর সরকারের সহোদরা মন্দাকিনীর পুত্র খুলনা চুনখোলার দিগ্বিজয়ী কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার। মাতুল হরিবর সরকারের কাছেই তিনি প্রথমে কবিগানে তালিম নেন। এবং পরবর্তী কালে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল বলে স্বীকৃতি পান। হরিবর সরকারের গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে হরিচরণ আচার্য বলেন—"হরিবর সরকার একজন সুললিত রচয়িতা। আমার সহিত একবার গড় কাশিমপুর তাহার গান হইয়াছিল। তিনি একটী কবি গান রচনা করিয়াছিলেন।

"শ্যাম নগর 'আর রাই নাগরী নাগরদোলায় দোলে।"

এই গানটি সম্পূর্ণ মনে হইতেছে না। উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া অংশ বিশেষ মাত্র উল্লেখ করিলাম।" হরিবর সরকার ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

( সূত্র—কবির দৌহিত্র শ্রীঅনিলকুমার সরকার, ভাগ্নেয় নাতি শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, 'বঙ্গের কবির লড়াই' প্রভৃতি )

## মনোহর সরকার ( ফরিদপুর )

হরিবর সরকারের খুড়তুতো ভাই মনোহর সরকারও একজন নামজাদা কবির সরকার ছিলেন। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নাগরচাঁদ সরকার। মনোহর সরকারও তারকচন্দ্র সরকারের শিষ্য ছিলেন। এ সম্পর্কে তারক সরকার শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—

"দুর্গাপুরে মাতে হরিবর মনোহর
তারকের শিষ্য তারা ভক্ত প্রিয়তর
মহাকবি দুই ভাই ভক্ত চূড়ামণি
উভয়ের কবি আখ্যা কবি চূড়ামণি"

সুবক্তা বলে পাঁচালীতে মনোহর সরকারের খুব সুনাম ছিল। তাঁর শিষ্য ও স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট তিনি 'রাঙা কর্তা' বলে পরিচিত ছিলেন।

একবার খুলনা জেলার ন'পাড়া পীলজং আসরে নকুলেশ্বর সরকার তার বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

তুমি কল্পনাতে দ্রুপদ, আমি ধৌম্য পুরোহিত।
অদ্য এলেম তোমার বাড়ীতে, বিবাহের মন্ত্র পড়িতে,
খাঁটি বর নির্বাচন কবিতে, ঘটল বিপরীত ॥
তোমার একটি কন্যা যাজ্ঞসেনী—
অদ্য তার করলে বিয়ের আয়োজন ;
বরের আসনে দেখি,—বর বসে আছে পঞ্চজন।
তোমার এক কন্যা পঞ্চবরে,
দান করবে কেমন করে,
কে তারে করিবে গ্রহণ ?
ওরা কে কার পুত্র, কে কোন্ গোত্র,
কোন্ নামে করব মন্ত্র উচ্চারণ ?

মনোহর সরকার মহাশয় উক্ত টপ্পার নিম্নরূপ জবাব দিয়েছিলেন—

তুমি কল্পনাতে ধৌম্য মুনি, আমি হই দ্রুপদ
অদ্য দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, প্রকাশ্য সভার ভিতরে,
লক্ষ্যভেদের পণ করে, ঘটালাম বিপদ ॥
যখন লক্ষ্য বিঁধে পার্থ বীরে—
দ্রৌপদী নিয়ে মায়ের কাছে যায় ;
পাঁচজনে ভাগ করে খাও—
ফলজ্ঞানে আদেশ দিলেন মায়।
আবার পতিং দেহি পঞ্চবার,

শিবের কাছে মাগে বর—
সেই বরে পঞ্চপতি পায়।
ওরা পান্ডুপুত্র সুপবিত্র—
সেই সূত্রে দ্রৌপদী বসেছে বাঁয় ॥

মনোহর সরকার মহাশয়ের নিকট অনেকেই কবিগানে দীক্ষা নেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যশোহরের বিজয় সরকার এবং ফরিদপুরের নিশিকান্ত সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনোহর সরকারের ছড়া পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিষ্য বিজয় সরকার বলেন—"টপ্পার পরে কর্তা দাঁড়ালেন ছড়া বা পাঁচালী বলার মানসে। প্রথমেই মাতৃ বন্দনার পরে আরম্ভ হল উপস্থিত বক্তৃতা। বাবা—সে কি আনুপ্রাসিক শব্দ সংযোজন, আর কি চমৎকার সাবলীল ছন্দ প্রয়োগ; তুলনাবিরল উপমাহীন পাঁচালী। শুনলে মনে হয় যেন বাগ্‌দেবী তাঁর মাথাব পরে বসে অবিরল ধারায় শব্দ কুসুম ছড়িয়ে যাচ্ছে।" ( রাজেন্দ্র মেলা—সম্পাদনা শ্রীঅনাদি সবকাব )

মনোহর সরকার ১৯৩৯ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

## মথুরদেব সরকার ( খুলনা )

খুলনায় ফকিরহাট থানার অধীন লালচন্দ্রপুর গ্রামে ৺মথুর সরকার ( মথুর দেব সরকার ) একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। একবার মৌভোগ গ্রামের পার্শ্ববর্তী ঘাটভোগ গ্রামে যশোহর জেলার জয়পুরের তারক সরকারের সঙ্গে তাঁর গান হয়। তারক সরকারের গানে কিছু অসংলগ্নতার প্রতি কটাক্ষ করে মথুর সরকার গেয়েছিলেন—

তারক দাদা বাংলা বাহাদুর—
সরকারের মধ্যে চতুর,
মথুর কি আর আঁটে তার কাছে;
বেত বাগানে ঢুকে দাদা কাঁচি হারায়ে ফেলেছে।
টপ্পার জবাব দিতে আর বাকি কি আছে।
দাদার কথায় মোটে নাইকো মিল,
ধানের খেতে বুনলো তিল,
যেমন মাছ না পেয়ে মাইটে চিল—
শামুক ধরে খায় ॥

বয়সে প্রবীণ তারক সরকারকে মথুর সরকার দাদা বলতেন।

আর একবার উক্ত আসরে মনোহর সরকার সনক ঋষি ( সর্বগুণে গুণান্বিত ) হয়ে মথুর সরকারকে যমরাজ ( সর্বদোষে দোষী ) উল্লেখ করে টপ্পা করেছিলেন। মনোহর সরকার তারক সরকারের শিষ্য। তিনিই পেছনে থেকে মনোহর সরকারকে যুক্তি পরামর্শ দিচ্ছেন জানতে পেরে মথুর সরকার গেয়েছিলেন—

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে মহাবীর ভীষ্মের হল যদ্রুপপ্রায় :
শিখণ্ডীরে সামনে রাখি, পিছে বাণ মারেন ধনঞ্জয়।
প্রতিজ্ঞা আছে অটল, দেখিলে অমঙ্গল,
সেদিন আর যাইনা যুদ্ধেতে।
তোর যা ইচ্ছা হয়, কর মনোহব—
ধনুঃশর ত্যাজলাম সভাব সাক্ষাতে ॥ ( সংগৃহীত )

## বিধুভূষণ দেব সরকার ( খুলনা )

মথুর সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধুভূষণ দেব সবকারও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। যৌবনে হরিচরণ আচার্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সুতরাং তাঁরা যে সমসাময়িক তা স্বীকার করে নেওয়া যায়। একবার বালাগঞ্জে হরিচরণ আচার্য ও বিধুভূষণ দেব সরকারের মধ্যে কবিগান হয়। সেই আসরে হরিচরণ শ্রীদাম এবং বিধুভূষণ গৌরাঙ্গরূপে নিম্নোক্ত টপ্পা কাটাকাটি করেছিলেন—

হরিচরণ—আমি শ্রীধামের সেই শ্রীদাম সখা হয়েছি শ্রীহীন।
হইল সেই দেখা আর এই দেখা,
বহুদিন হতে নাই দেখা,
ভাইবে! হয়েছিল শেষ দেখা,
লুকালুকির দিন ॥
তোরে পূর্বের ভাবে যায় না চিনা—
বাঁকা দুই নয়ন দেখে চিনতে পাই ;
আমায় ফেলে কি কারণ—
নদীয়ায় এলি গুণের ভাই।
সাজলি কার ভাবেতে দীনহীন,
অঙ্গে পরলি ডোর কৌপীন,
কেন তোর কালরূপটি নাই।
আবার বিষ্ণুপ্রিয়া ত্যাগ করিয়ে—
কি জন্য সন্ন্যাসী হলি নিমাই ॥

বিধুভূষণ—ও তুই শ্রীধামে বসতি করিস আমার গুণের ভাই।
যেদিন লুকালুকি খেলিতে, লুকালি গিরি গুহাতে,
ভাইরে সেদিন হতে তোর সাথে,—
আর ত দেখা নাই॥
আমার পূর্বের সেরূপ নাই রে সখা—
অন্তরে লুকালেম কাল অঙ্গ।
রাধার ভাবে নদীয়ায় উঠালেম প্রেমের তরঙ্গ॥
সাজলেম হাল্‌সে বেহাল দীনহীন,
অঙ্গে পরলেম ডোর কৌপীন,
করেতে নিলেম করঙ্গ।
করতে ঋণ পরিশোধ জীবের উদ্ধার—
কলিতে নাম ধরেছি গৌরাঙ্গ॥

হরিচরণ আচার্য বিধুভূষণ সরকারের জবাবের উত্তরে সাময়িক ভাব যোগ করে পুনরায় টপ্পা করলেন—

দ্বাপর যুগে খত দিয়েছিস কলিতে তাই অবিধি।
রেজেস্টরী খতের ম্যাদ বার বৎসর অবধি॥
করে স্বহস্তেতে দস্তখত, রাধাকে দিয়েছিস্‌ খত,
নাই সে খত নাই সে ফরিয়াদী।
ভাইরে! একটা যুগ হয়েছে গত—
আইন মত খত্‌ হইয়াছে তমাদি॥
বিধুভূষণ—আমার শত কল্প গত হলেও—
প্রেম-খতের তমাদি নাই।
হরিচরণ—প্রেম শব্দেতে বস্তু কি নিলি—
আদায় করবি কি?
এসব চালাকি করিস না কানাই।
ভাইরে। যে খতে তোর বাবার নাম নাই—
এমন খত আইনতঃ হয় না বিশ্বাস;
সম্পত্তিহীন ছল করে নিলি কৌপীন বহির্বাস।
ভাইরে! মহাজন নাই স্বতন্ত্র, তুই করে ষড়যন্ত্র,
নিলি তার ভাবকান্তি বিলাস।
এখন মহাজন তুই, খাতকও তুই—
বল দেখি কে করবে কার খত খালাস?

বিধুভূষণ সরকারের সঙ্গে হরিচরণ আচার্যের একবার গান হয়েছিল ঢাকা জেলার বগাদি গ্রামে। সেখানে হরিচরণ আচার্য তাঁর বন্ধু মহাশয় বিধুভূষণ সরকারকে দশরথ এবং নিজে লোমপাদ রাজা হয়ে টপ্পা করেছিলেন—

লোমপাদ নাম ধরে আমি দিলেম পরিচয়।
তুমি রামকে দিবে সিংহাসন,
দেশ বিদেশে করলে নিমন্ত্রণ,
নিমন্ত্রণ পেয়ে আজ এখন—
হলেম অযোধ্যায় উদয়॥
জানি আজ তোমার রাম রাজা হবে—
অধিবাস গতকল্য হয়েছে ;
সত্য বল বন্ধু মহাশয়—
কেন রাম-লক্ষ্মণ জটাবাকল পরেছে ?
আমার বড় বন্ধাইন কৌশল্যা, অতি পুত্র বৎসলা,—
নয়নের জলে ভাসতেছে।
আমার ছোট বন্ধাইন কৈকেয়ী রানী—
কি জন্য মুচকি মুচকি হাসতেছে ?

বিধুভূষণ প্রত্যুত্তরে বললেন—

রাম রাজা না হইয়া যাচ্ছে বনবাসে।
সে কারণে কৌশল্যা রানী নয়নের জলে ভাসে।
তা দেখিয়া কৈকেয়ী রানী মনোসুখে হাসে।
আমার বাৎসল্যের ধন রাম সীতা লক্ষণ,
তাদের প্রতি নিরীক্ষণ, করে তোমার মনে হয় না কষ্ট।
ইস্কাবনের মোন্নার মতো কৈকেয়ী রানীর প্রতি
তোমার মন মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট !

হরিচরণ আচার্যের জবাব—

বললে তোমাব 'ইস্কার' মোন্না দেখতে আমাকে।
ইস্কার মোন্নায় দিল যে ধাক্কা
অনেকের হয়েছে শিক্ষা
কৌশল্যা হরতনের টেক্কা, পড়ল বিপাকে।
তুমি শেষকালে বেশ তাস খেলাতে রস পেয়ে—
যশ করেছ এ ভূমে ;

ইস্কার মোন্নার মান্য নাই হে এখন—
চিড়া রং হয়েছে তোমার অদৃষ্টক্রমে।
হাতের সাহেব বিবি দিলে পাস, চৌদ্দ বৎসর বনবাস,
ভরত নাই অযোধ্যা ধামে।
তোমার ইস্কাবনের মোন্না নিবে—
শেষকালে চিড়া রং এর গোলামে ॥
(বঙ্গের কবির লড়াই)

## বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের কবিগানের শেষ যুগের সার্থক প্রতিনিধি বিজয়নারায়ণ আচার্য নেত্রকোনা মহকুমার নিকটবর্তী সমৃদ্ধশালী বাঙ্গলা গ্রামে ১২৭৫ সনের ২৭শে মাঘ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামলোচন আচার্য এবং মাতার নাম বিশাখা দেবী। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য পড়াশোনা শেষ করে পরে তিনি নেত্রকোনা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তৎপর মোক্তারী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কিন্তু কোর্টকাছারীর কূট কৌশলী আবহাওয়ায় তাঁর কবিচিত্ত বসল না। বাঙ্গলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী কাশীপুর গ্রামে লোকনাথ চক্রবর্তী নামে একজন কবিয়াল ছিলেন। বিজয়নারায়ণ অনেক সময় চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট কবিগানের অনুশীলন করতেন। ক্রমে তাঁর রচনা শক্তির উন্মেষ ঘটতে থাকে। মোক্তারী ছেড়ে কবিগানে যোগ দেওয়ায় রামগতি সরকার পরবর্তীকালে বিজয় আচার্যকে ঠেস দিয়ে টপ্পা গেয়েছিলেন—

শুনিলাম আচার্য বিজয়,
তুমি করলে বাংলা জয় ;
হুতুম পুইড়া খাইত যদি—
কোকিল হইত পরাজয়।
মোক্তারীতে হইয়া ফেল,
মোচে দিয়ে কেরোসিন তেল,
কবি গাইতে কয় ;
বাংলাতে সরকার হইয়াছে আচার্য বিজয় ॥

রামেশ্বরপুর নিবাসী রাজকিশোর আচার্যের সহিত বিজয়নারায়ণ প্রথম কবিগান করেন ধারিয়া গ্রামে। সেখানে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ /

পঁচিশ। প্রথম গানেই তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি ময়মনসিংহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল রামু মালী, রামগতি শীল, পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হরিচরণ আচার্য, বিরুনিয়ার হরিহর আচার্য, ঢাকার মদন শীল প্রভৃতি কবিয়ালদের সঙ্গে কাব্যদ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যশ অর্জন করেন।

গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এবং কাশিমবাজাররাধিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় বিজয়নারাণের গানে ও ভগবৎভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্যের চর্চাতেও তাঁর অনুরাগ গভীর। তিনি "বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার" "বৈষ্ণব সঙ্গিনী" "আনন্দ" "সৌরভ" প্রভৃতিতে নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখেছেন। "সৌরভে" দীর্ঘদিন তিনি ময়মনসিংহের অজ্ঞাতনামা কবিয়ালদের জীবনী ও কাব্যালোচনা করে অনেক দুষ্প্রাপ্য গান ও তথ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন। বস্তুতঃ চন্দ্রকুমার দে'র হাতে যার সূত্রপাত তা অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বিজয়নারায়ণের হাতে। "সৌরভে" নিয়মিত ময়মনসিংহের কবিকাহিনী প্রকাশিত না হলে ময়মনসিংহের কবিয়ালদের কথা ও কাহিনী ষোল আনা লুপ্ত হয়ে যেত। "ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী" খণ্ডাকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিজয়নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তা যদি পূর্ণাঙ্গরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতো তা হলে বাংলার কবিগানের অন্ততঃ একটা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ তথ্য কালগ্রাস থেকে রক্ষা পেত। বস্তুতঃ গত শতাব্দীতে সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত যে শুভ সূচনা করেছিলেন, তারই দ্বিতীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "সৌরভে" বিজয়নারায়ণের আন্তরিক প্রয়াস।

কবির রচিত "শ্রীশ্রীগৌর গীতাবলী" "উপদেশামৃত" "প্রার্থনা শতক" গ্রন্থ পাঠে কবির রচনা শক্তির সম্যক পরিচয় মেলে।

'গৌরগীতাবলী' ও 'উপদেশামৃত'র আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো—

"সইরে !

কে আঁকিল গোরা ? রসের মুরতি
সারাটা বিশ্বের গায়।
যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
শুধু গৌর দেখা যায়।
সূর্য শশধরে তারার ভিতরে
সারাটা আকাশময়
কাননে কুসুমে স্থলে কি জীবনে
গৌর বই কিছু নয় ॥
মানব নয়নে তারায় তারায়
গৌরাঙ্গ মুরতি খানি

*কে রাখিল আঁকি কহ প্রাণ সখি*
*স্বরূপ কাহিনী শুনি।*
যদি বা নয়ন মুদিয়া নির্জনে
একাকিনী শুয়ে থাকি
তবু নহে ছাড়া পরাণ পিয়ারা
মনচোরা গোরা দেখি।
দেখিতে দেখিতে ভাবিতে ভাবিতে
কি কব মনের খেদ
গোরাতে আমাতে আর কোন মতে
থাকে না কিছুই ভেদ ॥ ...ইত্যাদি

ওরে মন! বলিতে হৃদয় ফাটে দুঃখে!
লয়ে পুত্র-কন্যা নারী সুজনের সঙ্গ ছাড়ি
সময় কাটিছে মহাসুখে।
অনিত্য এ ধন জনে তুমি কিনা নিত্য জ্ঞানে
নিরন্তর করিছ রক্ষণ
যখন দশার শেষে শমন ধরিবে কেশে
নিত্যানিত্য বুঝিবে তখন
তুমি যদি নিত্য ধনে সুখী হতে কর মনে
এক মনে ভজ নিত্যানন্দ
গৌর গৌর গৌর বলি ঊর্ধ্বে দুই বাহু তুলি
সাধু সঙ্গে করহ আনন্দ!
বৈষ্ণব দাসানুদাস হয়ে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পেয়ে
হরি বলি নাচ মহারঙ্গে
সংসার হইবে ক্ষয় হবে মহা সুখোদয়
ভাসিবে রে! প্রেমের তরঙ্গে।
প্রভু বৃন্দাবন প্রতি যদি কর নিষ্ঠারতি
সুমতির সঙ্গে কর বাস
তোমার স্বভাব দেখি বিজয় হইবে সুখী
ছিন্ন হয়ে যাবে অষ্টপাশ।

(উপদেশামৃত)

সখি-সংবাদ, আগমনী, বিজয়া, বসন্ত গান রচনায় বিজয়নারায়ণের আশ্চর্য দক্ষতা

ছিল। সাময়িক বিষয় নিয়েও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ ভঙ্গের সময় তিনি রচনা করেছিলেন—

"কালীকে ভবপালিকে বাঙ্গালীকে নিও না আসাম !"

এই জাতীয় গান সেকালে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। স্বগ্রাম বাঙ্গালায় তিনি শ্রীশ্রীহরিসভা স্থাপন, কীর্তন, মহোৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। ময়মনসিংহ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর কবিগানের বিশেষ সুনাম ছিল।

মৃত্যুকালে তাঁর দুই কন্যা বর্তমান ছিলেন। কয়েকজন কবির সরকার তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে বেতাটী গ্রামের কালীকুমার ধর সরকার, কবি মহম্মদ সাধু সরকার, রামসুন্দর গোপ সরকার তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম।

( সৌরভ বিভিন্ন সংখ্যা )

## উমেশ শীল ( বরিশাল )

বরিশাল জেলার নবগ্রামে ( গরঙ্গা ) গত শতাব্দীর শেষ দশকে উমেশ শীলের জন্ম। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ শীল। তাঁর মাতুল ভারত শীল বরিশালের একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। উমেশ শীল মাতুল ভারত শীলের কাছেই কবিগান শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে একজন যশস্বী কবিয়াল বলে গণ্য হন। তিনি ঝালকাটির কালা যামিনীর দলে দীর্ঘদিন সরকার ছিলেন। ঐ দল উমেশ-যামিনীর দল বলে পরিচিত ছিল। উমেশ শীল সরল সোজা লোক ছিলেন। তাঁর গানেও সেই সরলতা ও আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক যেসব গান রচনা করেছেন, যেমন বাঁশী, পাশাখেলা ইত্যাদি. সেগুলি এক সময় গানের আসরে খুবই সমাদৃত হয়েছে। একবার ঢাকা রিকাববাজারে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে উমেশ শীল ঐ ঝালকাটিরই কুঞ্জ দত্তের বিরুদ্ধে কবিগান গাইতে গেলে কুঞ্জবাবুর শিষ্য নকুলেশ্বর সরকাব টপ্পা করেন—

আমি কল্পনায় সাবিত্রী সতী, তুমি কাল শমন।
এসে পতির সনে জঙ্গলে, পড়েছি ঘোর অমঙ্গলে,
অদ্য কি আছে মোর কপালে, জানেন নারায়ণ ॥
অদ্য শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে—
পতি মোর কোলের পরে মূর্চ্ছা যান ;
ভূমিতে আঁচল পেতে, রেখেছি তাঁহার তনুখান।

নিয়ে করেতে চর্মডুরি, মহিষের পৃষ্ঠে চড়ি
তুমি আজ হয়ে আগুয়ান ;
কেন করজোড়ে আমার কাছে—
কাতরে ভিক্ষা চাও মোর পতির প্রাণ ?

উমেশ শীল এই টপ্পার জবাবে বলেন—

তুমি কল্পনায় সাবিত্রী, আমি কাল শমন।
তোমার প্রাণের পতি সত্যবান,
অদ্য তার জীবন অবসান,
তাইতে গ্রহণ করতে তাহার প্রাণ, দিলাম দরশন ॥
আমি চর্মডোরে বন্দী করে—
জীবাত্মা নিয়ে জম্বু দ্বীপে যাই।
পাপ পুণ্যের বিচার করে—
পুনর্বার সংসারে পাঠাই।
ভূমিতে আঁচল পাতি, রেখেছ আপন পতি,
আমি তার জীবন ভিক্ষা চাই
কারণ সতীর অঙ্গ স্পর্শ করতে—
দুরন্ত কৃতান্তেরও শক্তি নাই ॥

একবার নোয়াখালির কোন আসরে মাতুল ভারত শীল ও ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবিয়াল হরকুমার শীলের তুলনায় উমেশ শীলের কাব্য প্রতিভা যে ন্যূন তার প্রতি ইঙ্গিত করে বিপক্ষ কবিয়াল নিম্নোক্ত রং ফুকার করেছিলেন—

ভারত শীল ওপারে বাড়ি,
ওজনে হয় মনের ভারী,
হরকুমার শীল ছয় পসুরী,—
উমেশ শীল হয় পাচ সেরা।

## বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী ( ঢাকা )

পেশাদারী কবিয়াল না হয়েও যে সকল কবি রসজ্ঞ ব্যক্তি কবিগানের আসরে রসের বান ছুটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঢাকা জেলার পারুলিয়া নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী অন্যতম। তিনি রায়পুরা পাদ্রী সাহেবের এস্টেটে নায়েবের কাজ করতেন আর অবসর সময়ে সঙ্গীত রচনা করে, কবিগানের আসরের বাইরে আড়ালে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী

কবিয়ালদের প্রশ্নোত্তর জুগিয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করতেন। তিনি 'পাগল দ্বিজদাস' ছদ্মনামে বহু গান রচনা করেন এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। "তাঁহার এই সকল মনোরম গান সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। ভাবুক, প্রেমিক, রসিক, তাহার এই গানের বহিখানি পাঠ করিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যান। কবির টপ্পা-চাপান সম্বন্ধে চক্রবর্তী মহাশয়ের ন্যায় কবি এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচিত "শিবলিঙ্গের টপ্পা", "অগ্নিদেবের ঘরজামাইয়ার টপ্পা" "বসুমতীর টপ্পা" "শ্রীকৃষ্ণের মাথুর লীলায় চন্দন দানের টপ্পা" শুনিলে কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না।"

হরিচরণ আচার্য তাঁর কবি-নবিশীকালে চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট থেকে প্রায়শঃ উপদেশ গ্রহণ করতেন। "বঙ্গের কবির লড়াই" পুস্তিকার উৎসর্গ পত্রে পিতৃতুল্য চক্রবর্তী মহাশয়ের ঋণ অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করে হরিচরণ লিখেছেন—"দেব! আপনি দেশবিশ্রুত পরম রসজ্ঞ কবি। আপনার ছদ্মনামের "দ্বিজদাসের গান" কাব্য জগতের অমূল্য সম্পদ। আপনার মর্মস্পর্শী রচনা-কৌশল অতুলনীয়। আপনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। কবিগান আপনার চিরপ্রিয়—কাব্য সাহিত্যে আমার যা কিছু সুকৃতি তা আপনারই প্রতিভা-প্রভাবের ফল।"

যে রসাল টপ্পা-চাপান রচনার জন্য চক্রবর্তী মশাই'র দেশজোড়া খ্যাতি তার একটি নমুনা নিম্নরূপ—

আমি যদুকুলের কুল পরোহিত উদয় মথুবায়।
আমি ধৌম্য ঠাকুর নাম ধরি, সর্বদা আশীর্বাদ করি,
এলেম অনেক দিন পরে হরি, দেখিতে তোমায়॥
গোকুল হতে আসি কালশশী,
　　বাঁচালে মথুরা নিবাসীকে,
স্বদেশী আর বিদেশী—শ্যাম তুমি ভাল কও কাকে?
তুমি যখন ছিলে বৃন্দাবন, করলে লীলা বিলক্ষণ,
　　বামভাগে নিয়ে রাধিকে।
এখন কুব্জা ধনী, বামে রানী—
　　কও শুনি দুইয়ের মধ্যে ভাল কে?
ছিল অঙ্গেতে পীতধড়া, মস্তকে মোহন চূড়া,
　　বেষ্টিত গোপবালকে;
এখন জামাজোড়া অঙ্গে পরা—
　　চেহারা দেখে ভয় করে লোকে॥

"দ্বিজলাল" ছদ্মনামে বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী যেসব বাউল ভাবাপন্ন সঙ্গীত রচনা করেন, নমুনাস্বরূপ তার একটি উদ্ধৃত হল :—

মিছে গরিমা তোমার ছাড় রে ছাড়।
আজ ম'লে কাল দুদিন হবে, নিদান ঘোরতর ॥
দেখলি কত শুনলি কত, জ্ঞান হইল না তবু
মুদলে নয়ন দু'টি, আসলে শেষকালের খাটই,
শ্মশানের ছাই পোড়া মাটি—
কে কার অধীন, কে কার প্রভু ॥
কেবল দিন দুই চারি, আমার আমার ঝকমারি,
শমন দিলে মাথায় বাড়ি,
কার বাড়ি কার ঘর ॥
গাড়ি চড় ঘোড়ায় চড়, চড় হাতি পালকী।
সদা কর আমার আমার, মন তুমি কার কেবা তোমার,
মায়ায় দেখায় চাঁদের বাজার—
ভোজের বাজিকরের ভেলকি ॥
এই আছি এই নাই, বৃথা এই দেহের বড়াই,
পাখি করে পালাই পালাই,
খাঁচার আদর কর ॥
যাদেরে কও আপন আপন, তারা আপন হলে
থাকে না কেন অনুগত, কেন বা যায় জন্মের মত,
গেলে ফিরে আসে না ত—
শুধায় না আর কোন কালে ॥
দেখিয়াছ স্বপন, তাই কও আপন আপন,
পরের কারণে প্রাণপণ—
বেগার খেটে মর ॥
চক্ষু গেল কর্ণ গেল, গেল পরমায়ু।
তবু র'ল ষোল আনা, আমার আমার কুকল্পনা,
কোন মতে দূর হল নু—
দুরাশা দুর্বায়ু ॥
মিলে ছয় দশে, মন রেখে আপন বশে,
দ্বিজদাসের কপাল দোষে—
হাত ছোট আম বড় ॥

( বঙ্গের কবির লড়াই ও সংগ্রহ )

## কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার তন্তুর গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৫৫-৫৬ সালে কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম শান্তমণি দেবী। গ্রাম্য পাঠশালা ও বঙ্গ বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। তাঁর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি অনেক পাঁচালী ও সঙ্গীত রচনা করেছেন বলে প্রকাশ। সখী সংবাদ, গোষ্ঠ, রাম বনবাস, নিমাই সন্ন্যাস ও শ্যামা সঙ্গীত রচনায় কৈলাসচন্দ্রের কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। তিনি সখের কবির দল ও হোলিগানের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াতেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং জমিদার বাড়ীতে তাঁর গানের বিশেষ সমাদর ছিল। সে সময়ে বিক্রমপুরে অনেক খ্যাতনামা কবিয়াল ছিলেন। চিত্র বিদ্যাতেও তিনি কুশলী ছিলেন। তন্তুর গ্রামের বিখ্যাত 'গলইয়া' মেলায় নানা ছবি ও বিচিত্র প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তিনি সকলকে আনন্দ দান করতেন। তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীতের নিদর্শন ঃ

আর কতদিন আছে গো মা, কায়া বদল হবে কিনা ?
ভেঙ্গে চুরে গেল দেহ, সদাই ভাবি এ ভাবনা।
আমি জানি না সাধন-ভজন, শমন দমন মায়ের চরণ
নিজগুণে ক্ষমা ক'রে, ত্রাণ করিও মা কৈলাসেরে।

১৩০৬ সালের ৫ই পৌষ কৈলাসচন্দ্র জন্মভূমি তন্তুর গ্রামেই দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

( বিক্রমপুরের কবিগান, দেশ-৫ আশ্বিন, ১৩৪৭ )

## কালীচরণ দে ( ময়মনসিংহ )

ময়মনসিংহ জেলার বে-দুয়া থানার অধীন আইথর গ্রামে কবি কালীচরণের বাড়ী ছিল। ১৩২৭ সালের মাঘ মাসের সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশিত কবি কালীচরণ দে সম্পর্কীয় এক প্রবন্ধে জানা যায় তিনি তার কয়েক বৎসর পূর্বে কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন। কালীচরণ খুবই স্বল্প শিক্ষিত ছিসেন। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সঙ্গ এবং চর্চার, ফলে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত এবং পুরাণাদিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ময়মনসিংহের নিরক্ষর কবি রামু মালী, রামগতি শীল-এর সাহচর্য্য ও অনুকম্পায় মাঝবয়সে কালীচরণের কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ ঘটে। রামু ও রামগতির সঙ্গে কালীচরণ অনেক গান করেন। কবি বিজয় নারায়ণ আচার্য মুক্তকণ্ঠে কালীর কবিত্ব সম্পর্কে বলে গেছেন—"আমার সঙ্গেও ইনি অনেকদিন কবিগান গাইয়াছেন। তুলনায় আমি কালীর নীচে ছিলাম। কৌশল পূর্বক কথা কাটাকাটি করিয়া কালীর সঙ্গে আমি পারিতাম না। তাহার যেমন গীত রচনার শক্তি ছিল, ছড়া পাঁচালীর মুখ ছিল তদপেক্ষা অধিক প্রখর॥"

অন্যান্য সরকারের সঙ্গে গান গাইলেও হাসনপুরের শম্ভু জেলের সঙ্গেই তাঁর প্রায় স্থায়ী জোট ছিল। শম্ভু ও কালীর মধ্যে গুণে গরিমায় কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে এক কবির আসরে অনুসন্ধিৎসু শ্রোতারা প্রখ্যাত কবি রামু সরকারের মতামত জানতে চায়। সেদিন সে আসরে রামু ও বিজয়নারায়ণের মধ্যে গান হচ্ছিল। রামু নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন—"শম্ভু কালীর ছোট বড় সম্বন্ধে আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া মণ্ডপের দিকে চাহিলেই ত বুঝিতে পারেন।" অর্থাৎ রামু মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির দিকে প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে শম্ভু (শিব) নীচে পড়ে আছেন আর কালী (দেবী) তাঁর বুকের উপর খাড়া। এক কথায় কালী কবিত্ব শক্তিতে শম্ভুর উপরে। ডাক, মালসী, মাথুর, টপ্পা-পাঁচালীতে কালীচরণের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বর্তমান।

একদিন কালীচরণ কবির ভাবে 'বৃন্দা' হয়ে প্রতিপক্ষ শম্ভু জেলেকে "কৃষ্ণ" করে নিম্নোক্ত টপ্পা-চাপান করেছিলেন—

কালীচরণ—বৃন্দা আমার নামটি বটে—বসতি করি বৃন্দাবন।
একটি মর্মকথা জানিতে,—এসেছি তোমার সাক্ষাতে,
জোড় হাতে জানাই নিবেদন ॥
তুমি কাইল বলে যে এসেছিলে—
বাকি তাহার কতদিন
মথুরাতে তুমি নাকি হৈলে কুবজার প্রেমাধীন ?
কংসের দাসী কুবজায়—তোমায় বুঝি কু-বুঝায়
নিকটে বসে নিশিদিন—
তুমি ছিলে রাখাল, হইলে ভূপাল,—
সেই একদিন আর এই একদিন ॥

শম্ভু— "তুমি কে ? কি বলিতেছ ?
আমি ত তোমাকে চিনিই না।"

কালীচরণ—এখন আমায় চিনবে কেনে, বেশ কথা বল্লে জলধর।
(বন্ধো) এখন নাই সে চিনার দিন।
সেই একদিন আর এই একদিন,
দু'দিন মধ্যেই চিনলাম আপন পর ॥
চিনা মানুষ চিনা যায় না, নূতন চিনার খাতিরে।
চিনবে কিসে চিন্তামণি,—তুমি যে বাঁচনা ডরে ॥
শ্রীরাধিকার মানের দায়,—
কাঁদতে যখন শ্যামরায়—চরণে প'ড়ে,
তখন আমরা আপনা ছিলাম,—এখন কি মনে পড়ে ?

শম্ভু— হুঁ, তোমায় যেন চিনি চিনি লাগে।"
কালীচরণ—বল্লে তুমি চিন্তামণি,—চিনি চিনি লাগে।
যখন ছিলে বৃন্দাবন, মিঠা ছিল গোপীগণ
চিনির মতন লাগিতাম আগে ॥
এখন চিটা খেয়ে চিনির মিঠা—
মনে কি আছে তোমার ?
মুখের কথা চিনি চিনি—
অন্তরে চিটাই তোমার সার।
পদ্মের ভ্রমর শিমুলে, এমন করে রয় ভুলে,
জীবনে শুনি নাই তো আর,—
( দিলে ) চোরের গলায় তুলসী মালা,
অভ্যাসের দোষ যায় না তার।"

এছাড়া মাথুর, সখি সংবাদাদি সঙ্গীত রচনাতেও কালিচরণের কৃতিত্ব ছিল।

( সৌরভ, মাঘ ১৩২৩ )

## হরকুমার শীল ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ সীমান্তে হোসেনপুর গ্রামে হরকুমার শীল জন্মগ্রহণ করেন। হরিচরণ আচার্যের সমসাময়িক কালের ইনি একজন বিখ্যাত কবি। মালসী, সখীসংবাদ "কবি" প্রভৃতি গান রচনা না করেও যে কয়জন সরকার শুধুমাত্র জবাব, টপ্পা, পাঁচালী গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন হরকুমার শীল তাদের অন্যতম ছিলেন। ছড়া কাটায় ও গানের উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সরল ভাষায়, সাধারণ উপমা ও রূপকের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে শ্রোতাদের অধিগম্য করে তুলতে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন বলে শোনা যায়। মেঘনার পূর্বপারে সেকালের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের সঙ্গেই তিনি কাব্যদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একবার পাঁচগাছিয়ার ( ত্রিপুরা ) জমিদার মাধব নন্দীর বাড়ীতে হরকুমার শীল ও হরিচরণ আচার্যের কবিগান হয়। হরকুমার শীল জমিদারবাবুর দলের পক্ষে সরকার। দৈবক্রমে কবিগানের আগের রাতে জমিদারবাবুর দলের ধর্তার পিতৃবিয়োগ হয়। তাই হরকুমার শীল আসরে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—

"দলের ধর্তার হল পিতৃবিয়োগ
তাইতে হরিচরণের ঘটল শুভযোগ।" ইত্যাদি

তদুত্তরে হরিচরণ আচার্য বললেন ঃ—

বললে, ধর্তার হল পিতৃবিয়োগ,
তাইতে আমার হয় শুভযোগ,—
—এ কথাটি অসম্ভব।
হর্তা ধর্তা কর্তা প্রভু, দলের কর্তা মাধববাবু,
শত দোষ থাকিলে তবু,—সর্ব কার্যেষু মাধব ॥

হরকুমার পরের আসরে এসে উত্তর দিলেন—

"বিনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম,
মাধব কিসে করবে যুদ্ধ।"

তার উত্তরে হরিচরণ গান করালেন—

বললে, বিনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম,
কিসে হয় মাধবের যুদ্ধ,
এ কথাটি কত মিছে ;
দেখ পুরাণে প্রমাণ আছে।
চড়ে অক্রুর মুনির রথে, মাধব গিয়ে মথুরাতে,
তখন অস্ত্র ছাড়া শুধু হাতে, রজক মুণ্ড কেটেছে ॥

হরকুমার এবং হরিচরণের মধ্যে একবার চাঁদপুর পুরাণ বাজারে কবিগান হয়। হরিচরণ সেই আসরে গৌর-বিচ্ছেদ-বিষাদিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তিতে গান করালেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সখী কাঞ্চনাকে সম্বোধন করে বলছেন—

কাঞ্চনা! প্রভু বিহনে সোনার নবদ্বীপের
প্রদীপ নির্বাণ হইল।

হরকুমার সরকার মহাশয় এই পদের ভাবরস সমৃদ্ধ জবাবে বললেন—

বলেছিস প্রভু বিহনে, প্রদীপ নির্বাণ এতদিনে,
আঁধার ধরার সপ্তদ্বীপ।
ঐ দেখ গৌর ভক্ত দলে দলে,
নৃত্য করে হরি ব'লে,
এক প্রদীপের গুণে জ্বলে, অনন্ত প্রদীপ ॥

একবার নোয়াখালী জেলায় সোনাইমুড়ী বাজারে হরিচরণ ও হরকুমারের কবির লড়াই চলে। নোয়াখালীর ভগবতী ভূঁইয়ার রচিত 'কুম্ভ ও কঙ্কনের কবি' নামক গানটি হরকুমার শীলের দল গেয়েছিল। ঐ গানটির মর্মার্থ এইরূপ—

"শ্রীমতী রাধিকা স্বর্ণ কঙ্কন করে পরিয়া—স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া অম্বু আনিতে যমুনায় যাইতেছেন। ইহাতে কঙ্কন এবং কুম্ভে কন্‌কন্ শব্দ হইতেছে। তখন কুম্ভ বলিতেছে রে কঙ্কন! তুই কন্ কন্ শব্দ ত্যাগ করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।"

হরিচরণ এই গানের উত্তরে বললেন—

"আমি কলঙ্কিনী রাধিকার করের কঙ্কন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিলে, আমার গুপ্ত পীরিত ব্যক্ত হয়। অতএব আমি কৃষ্ণ নামের 'ক' এবং নমস্কারের 'ন' লইয়া কন্‌কন্‌ করি।"

উক্ত গানের আর একটি ফুকারে কুম্ভ বলছে—

"কঙ্কন! পতির মৃত্যু হইলে সতী অমনি তোকে পরিত্যাগ করে। আমি চিরকালই রমণীদের কক্ষে বিলাস করি। এমনকি মরিলেও শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যাই।"

হরিচরণ জবাব দিলেন—

"কুম্ভ তোর মহত্ব বটে, মইলেও যাইস শ্মশান ঘাটে—
তুই অতি দয়াবান।
ভাঙ্গা কুলা দিয়ে গলায়, যখন থাকিস শ্মশানখলায়,
অ তোর ছবি দেখলে মানুষ পলায়—
ছুঁইলে পরে গঙ্গাস্নান॥

ছড়া পাঁচালী গাওয়ার সময় পূর্ববঙ্গের কবিয়ালগণ বক্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল ও সাধারণ শ্রোতার সহজবোধ্য করতে অনেক গ্রাম্য প্রবাদ ছড়া ও শ্লোকের আশ্রয় নিতেন বা নিজেরাও অনেক গল্প ও শ্লোক তৈরী করতেন। এরকম ক্ষেত্রে হরকুমার শীলের বিশেষ কতিত্ব ছিল। একবার আসরে তিনি এক স্বরচিত উপমা প্রয়োগ করলেন—

"হরি-হুরি তথৈবচ, কোরাণ কোদালশ্চৈব" অর্থাৎ হরি (শ্রীহরি) ও হুরি (শুঁটকী মাছ) যেমন, কোরাণ আর কোদালও তেমন। শ্রীহরির সঙ্গে শুঁটকী মাছের তুলনায় হিন্দু শ্রোতারা মজা পেলেন, কিন্তু কোরাণের সঙ্গে কোদালের তুলনায় মুসলমান শ্রো. .রা ক্ষেপে আগুন। কবিয়ালের উপর আক্রমণ এবং আসর ভেঙ্গে যাবার উপক্রম। তখন হরকুমার সরকার মুসলমান শ্রোতাদের নিকট আবেদন করলেন—আপনারা স্থির হয়ে বসুন, আমার কথা শেষ করতে দিন, তারপরও যদি আপনাদের রাগ না কমে, তখন আমাকে মারপিট, যা খুসী করবেন। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন—দেখুন আমরা সুসময়ে শ্রীহরি ভগবানকে কখনো স্মরণ করি না। বিপদে পড়লেই ভগবানের শরণাপন্ন হই। যেমন যখন ভাল মাছ পাওয়া যায়, তখন কেহ 'হুরি' (শুঁটকী মাছ) খায় না। কিন্তু, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন চারদিক জলপূর্ণ হয়ে ওঠে, বাজারে ভাল মাছ মেলে না, তখন বাধ্য হয়ে কিছু কিছু শুঁটকী মাছ খেতে বাধ্য হই। সুতরাং হরি ও হুরি উভয়কে অসময়ে আমাদের মনে পড়ে।

তারপর দেখুন, কোন জায়গায় যদি ময়লা থাকে, তার উপর ভগবানের আসন তো দূরের কথা, মানুষকে আসন দিলেও সে বসবে না। কিন্তু কোদাল দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে দিলে মানুষ কেন, সেখানে ঠাকুর পূজার আসনও দেওয়া যায়। তেমনি

দেখুন, ছনুয়ার মৌলানা সাহেব (নোয়াখালীর ছনুয়া গ্রাম নিবাসী পরম ধার্মিক পীর সাহেব ) যা মুখে বলেন তাই ফলে। কিন্তু আপনারা সাধারণ মুসলমানগণ যা বলেন তা ফলে না কেন? কারণ হলো আপনাদের 'দিলে' ( হৃদয়ে ) হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি ইত্যাদি বদ চিন্তা ও কামের দরুণ অনেক ময়লা জমে আছে। খোদাতালাহকে ডাকলে কি হবে, তিনি ত ঐ ময়লা 'দিলে' আসবেন না। কিন্তু মৌলানা সাহেব কোরাণ পড়ে পড়ে তার মনের সমস্ত ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলেছেন। তাই তাঁর 'দিলে' ( হৃদয়ে ) খোদাতালা বাস করেন। তিনি যা বলেন তাই ফলে। আপনারারাও যদি অনবরত কোরাণ পড়ে পড়ে মনের ময়লা সাফ্ করতে পারেন, তা হলে ঐ কোদাল দিয়ে মাটির ময়লা পরিষ্কাবের মতো আপনাদের মনের ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যাবে, খোদাতালার বাসস্থানের উপযুক্ত হবে।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শ্রোতাগণ "ইন্‌শাল্লাহ, দেইখছনি নাপ্‌তের বেডার মাথায় কি বুদ্ধি!"—বলে তারিফ করতে লাগল। বক্তব্য বিষয়কে সর্বজনবোধ্য করতে হরকুমার শীল এরকম বাচনভঙ্গীই অবলম্বন করতেন। নিজের গানের ধারা সম্পর্কে হরকুমার সরকার নিজেই বলে গেছেন—

অন্য অন্য কবি যারা সত্য মিথ্যা বলে তারা
আসর জয়ের করে অভিনয় ;
কিন্তু আমি এ জীবনে যা দেখি নাই নিজ নয়নে
মিথ্যা বলে নিতে চাই না জয়।
প্রাচীন প্রাচীন কবি যারা ধর্মকথা দিয়ে তারা
মুগ্ধ করেন ভক্ত শ্রোতাগণ ;
জানা বিষয়ের ভিতরে কে কেমন রস সৃষ্টি করে
শ্রোতারা তাই করিত গ্রহণ ॥
আমিও সেই প্রাচীন দলে অচিন কথা কারে বলে
এ জীবনে আমার জানা নাই।
কৃষ্ণ কথা বলে বলে ভেসে ভেসে নয়ন জলে
পাই যেন সেই যুগল কানু রাই ॥"

হরকুমার শীল একবার গানের বায়না নিয়ে কোন কারণবশতঃ আসরে উপস্থিত হতে না পেরে দেবেন্দ্র শীল নামে এক সরকারকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে পাঠান। হরকুমারের তুলনায় দেবেন্দ্রের প্রতিভার তুচ্ছতা জ্ঞাপন করে বিপক্ষ কবিয়াল নিচের রঙ-ফুকারটি করেন—

বলি, বায়না নিল হরকুমার শীল
সে এল না হল মুস্কিল,
দেখি দেবেন্দ্র শীল তার জায়গায় ;

সে তো কোন মতে কাম চালায়।
যে শীল যেখানে খাটে,
কোন শীল দালানে ওঠে, ( শালগ্রাম )
আবার কোন শীলে মরিচ বাটে, ( শিল নোড়া )
কোন শীল হয় পানসেরা ॥ ( বাটখারা )

নোয়াখালী জেলার কৃষ্ণরামপুর গ্রামে গান উপলক্ষ্যে কবি হরকুমার শীল তারিণী সরকারের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

আমি স্বর্গবাসী গর্গ ঋষি তুমি কৃষ্ণধন।
কিছু ধর্মকর্ম জানিতে, বাসনা করে মনেতে,
অদ্য তোমার সনেতে করব আলাপণ ॥
শুনি ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম কৃষ্ণ হে তুমি সর্বমূলাধার ;
কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্তে, তীর্থে যায় দাদা হলধর।
বল গো হত্যে আর স্ত্রী হত্যে, কেউ যদি করে মর্ত্যে,
পড়তে হয় কোন্ নরকে তার।
বল কি নরকে পড়তে হবে—
কেউ যদি হরণ করে পরদার ॥

তদুত্তরে তারিণী সরকার টপ্পা করলেন—

তুমি স্বর্গবাসী গর্গ ঋষি কাব্যের ভূমিকায়।
পেয়ে নাম প্রেমের মকরন্দ, মনভ্রমর রেখেছ বন্ধ,
তোমার চিত্তে নিত্য আনন্দ, প্রেমের গন্ধ গায় ॥
জানি ধর্মস্থাপন কর্ম নিয়ে—
সংসারে জন্ম নিতে হয় আমার ;
ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তে, তীর্থে যায় দাদা হলধর।
করলে স্ত্রী হত্যে আর গো হত্যে,
স্থল বিশেষে এই মর্তে—
পাপ হয় না, হয় পুণ্যের সঞ্চার।
আগে আমার কাছে নামটা বল—
সংসারে কে হরেছে পর দার ॥

দ্বিতীয় আসরে হরকুমার শীল এই জবাবের উপর আবার প্রশ্ন করলেন—

বললে, ধর্মস্থাপন কর্ম করতে জন্ম হয় তোমার।
এলে হরণ করতে ধরার ভার, নিজেই করলে ধরা ভার,
তোমার জবানীতে গুণাধার, বুঝলেম পরিষ্কার ॥
মেরে বৃষাসুরে ব্রজপুরে, গো হত্যা করলে তুমি জানতে পাই ;

পূতনাকে করে বধ, স্ত্রী হত্যা করেছ কানাই।
ব্রজে আয়ান ঘোষের গৃহিনী, হরণ করেছ শুনি,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা সরম নাই।
শেষে তুলসী সতীর গুঁতো খেয়ে
তুমি তো হলে পূতারাম গোঁসাই॥

তারিণী সরকার পুনরায় জবাবে গাওয়ালেন—

বললে, তুলসী সতীর গুঁতোয় হলেম পূতারাম গোঁসাই।
আমি উদ্ধার করলেম ভাই শ্রীদাম, তুলসীর পুরাই মনস্কাম,
তবু হলেম পূজোর শালগ্রাম, আমার দাম তো কমে নাই॥
আমায় দোষী লোকে বলে দোষী,—
নির্দোষী ভক্তে কয় আমি নির্দোষ;
যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ
কেহ চাউল কেহ বলে তুষ।
দেখ একই মাটির ভিতরে, নানা বীজ বপন করে,
গাছ বাঁচে খেযে মাটির জুস্।
তবে কেহ তিতা, কেহ মিঠা—
এটা কি মাটির দোষ, না গাছের দোষ॥
( বঙ্গের কবির লড়াই, কবিয়াল ঃ কবিগান, সংগ্রহ )

## জগবন্ধু দত্ত ( ত্রিপুরা )

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কবিয়ালদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী জয়চন্দ্র মজুমদারের সুযোগ্য শিষ্য ত্রিপুরা জেলার পাইকপাড়া গ্রামের জগবন্ধু দত্ত। হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক বিশিষ্ট কবিয়ালদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জগবন্ধু সরকারের রচিত তেমন কোন গান পাওয়া যায়নি; কিন্তু টপ্পা ও ছড়া পাঁচালীতে তার পারদর্শিতা প্রবাদ বাক্যের মতো ছিল। সেকালে প্রচলিত নিম্নোক্ত ছড়াটিই তার কাব্য-শক্তির জন-স্বীকৃতি বলা চলে ঃ—

মেঘনার পূর্বপারে জগবন্ধু
তিনি ছিলেন কবির সিন্ধু
পান করলে এক বিন্দু,
তরে যাবে ভবসিন্ধু।

জগবন্ধু দত্ত অত্যন্ত চতুর সরকার ছিলেন। হঠাৎ কোন বিষয়বস্তু নিয়ে রঙ তামাসামূলক ফুকার চাপানে তাঁর ওস্তাদী সর্বজন স্বীকৃত। একবার চাঁদপুরে সুযোগ্য কবি জগবন্ধু দত্তের সঙ্গে হরি আচার্যের গান হয়। শ্রীপঞ্চমী দিনের গানে হরি আচার্যের দল 'বসন্ত' গান না গাইয়ে শারদ গান গাওয়াতে দত্ত মহাশয় আচার্য কর্তাকে খোঁচা দিয়ে মালফুকার বা রঙ ফুকার করলেন—

বাবু গো! শ্রীপঞ্চমীর নিয়ম মতে,
বসন্ত গায় আসরেতে,
তার ব্যতিক্রম কি কারণ?
যাত্রা করে এসে হরি,
বসন্ত গান করলো চুরি—
ব্রজের ননী চুরি, মাখন চুরি,
এই চুরিও সেই মতন ॥

হরি আচার্য মহাশয়—এই ফুকারের জবাব দিলেন—

বললে, যাত্রা করে এসে হরি,
বসন্ত গান করলে চুরি,
চুরির বলিহারি যাই।
হরির জন্ম চুরির জন্য,
চুরি বিদ্যায় হরি ধন্য।
কিন্তু, জগবন্ধুর হাত পা শূন্য,—
চুরি করতে কায়দা নাই ॥

এই ফুকারটি ও তার জবাব দীর্ঘ দিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল।

আচার্য মহাশয়ের দলে, প্যারী মাল নামে একটি ছেলে ছিল। সে মেয়ে সেজে নাচত গাইত। তাকে লক্ষ্য করে সেই আসরে দত্ত মহাশয় এক ফুকার করলেন—

মাথায় কবরি ঘাগ্‌ড়ি পরা,
মেয়ের সাজে একটি ছোকরা,
নাচিতেছে দেখতে পাই ॥

জবাবে আচার্য মহাশয় গাওয়ালেন—

বললে, মাথায় কবরি ঘাগ্‌ড়ি পরে,
মেয়ের মূর্তি ধারণ করে, পুরুষ নাচে দেখ্‌তে পাই;
ইথে নূতনত্ব কিছু নাই।
শোন নাই ক্ষীরোদের পারে, সুধা বণ্টন করবার তরে
মাথায় কবরি বেঁধে, ঘাগড়ি পরে,—
নীরদবরণ ক্ষীরোদশায়ী ॥

ঐ আসরে দত্ত মহাশয় নিজে জটিলার ভাব নিয়ে বিপক্ষকে শ্রীমতী রাধার ভূমিকায় রেখে একটি ফুকার গাওয়ালেন—

'বধূর রাঙ্গা চামড়ার চক্‌মকিতে
পুত্র আমার থাকে মেতে।" ইত্যাদি

হরি আচার্য মহাশয় তদুত্তরে রাধার জবানীতে শ্বাশুড়ী জটিলাকে বলছেন—

বললে, রাঙ্গা চামড়ার চক্‌মকিতে
পুত্র তোমার থাকে মেতে,
খেতে শুতে দিচ্ছ ধিক ;
ঠাকরুণ ! পুত্র তোমার যে কার্তিক।
পতিব্রতা ধর্মের ভয়ে, মাটির দিকে থাকি চেয়ে,
নইলে মুন্দা শূন্য পুরুষ পেয়ে—
কোন্ অভাগী থাকে ঠিক ॥

নোয়াখালীর কোন এক স্থানে জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে হরকুমার সরকার মহাশয়ের গান হয়। দত্ত মহাশয় সেই আসরে একটি 'কবি'তে গান করালেন—

যুবতী এই নবীন বয়সে, একাকিনী কোন্ সাহসে,
বনে বনে করতেছ ভ্রমণ,
কাকে বকে ঠোকর দিবে, তোমার এ নবযৌবন।॥

হরকুমার সরকার এই গানের জবাব দিয়েছিলেন—

আমি পতির পদে রেখে মতি—
সতী যাই বনেতে নির্ভয়,
অ তোর কথা বিপর্যয়।
হাসতেছে সকল লোকে, আমি যাই মনের সুখে,
বলিস ঠোকর দিবে কাকে বকে—
যৌবন ত লোনা ইলিশ নয় ॥

একবার নোয়াখালীর তারিণীচরণ নট্ট সরকারের সঙ্গে গানে 'শ্রীদাম শাপ-কণ্টকের কাঁটা' বলে উপমা দিলে জগবন্ধু সরকার তাকে খোঁটা দিয়ে ফুকার করেন—

বললে, শ্রীদাম শাপ কণ্টকের কাঁটা,
মনকাঁটা না খেজুর কাঁটা,
কি বললি রে নট্টের বেটা,
তুমি বা ফুটেছ কয়টা—
কয়টা বাকী রয়েছে ॥

জগবন্ধু দত্ত মারা গেলে কবি-সম্রাট হরিচরণ আচার্য "কবিদের বিচ্ছেদ মালসী" গানে আক্ষেপ করে গেয়েছেন—

"ছিলেন কবিত্বে গুণসিন্ধু, পাইকপাড়ার জগবন্ধু,
তার অভাবে কবির সর্বনাশ।"

( বঙ্গের কবির লড়াই ও সংগ্রহ )

## কালীকুমার দে মাষ্টার ( নোয়াখালী )

নোয়াখালী জেলার বচৈর বা বচুরা গ্রামের কালীকুমার মাষ্টার জয়চন্দ্র মজুমদারের তিন প্রিয় ও প্রখ্যাত শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। গান রচনায় তাঁর বিশিষ্টতা সর্বজনবিদিত।

কালীকুমার সরকারের সঙ্গে কবি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে হরি আচার্য মহাশয় বলেন,—

"নোয়াখালীর কালীকুমার মাষ্টার একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা ; গান রচনায় ও গাহিতে উভয়েই তিনি দক্ষ। তাঁহার রচিত গান লইয়া অনেক কবিওয়ালা স্বীয় দলে গাহিয়া থাকেন।"

"আমি চাঁদপুরে অনেকদিন কবিগান করিয়াছি। সেখানে নোয়াখালীর বচুরা গ্রামের শ্রীযুত কালীকুমার মাষ্টার নামে একজন বিখ্যাত কবি উপানন্দ গোপ হইয়া আমাকে কৃষ্ণ উল্লেখে আমার উপর একটি টপ্পা চাপান দিলেন, যথা— কৃষ্ণ! এই প্রভাসকূলে নন্দ ও বাসুদেব নামে তোর দুই বাপ তোকে নিয়া ঝগড়া করিতেছে ; তুই কাহাকে বাবা বলবি ?"

এ কি দেখিলাম অতুল কাণ্ড, প্রভাস যজ্ঞেতে প্রচণ্ড,
একটা লণ্ডভণ্ড কুকাণ্ড বিশেষ।
বুকের দুগ্ধ দিয়ে তোমায় পেয়ে—
একজনে ডিংলা চুয়ে যেতেছে,
গিয়েছে মায়ের সম্বন্ধ, গোবিন্দ ভাল হইয়েছে।
আর বাসুদেব নন্দরাজা, দুই জনে খেয়ে গাঁজা,
বাবা আজ হতে বসেছে।
তোমার বাপের ঠিকনা, কেন কর না,
দেখ না দুইজনে কোমর কাছে॥

আমি উত্তর করিলাম—

বাসুদেব আমার জন্মদাতা,
নন্দ আমার পালক পিতা,
আমি উভয়ের সম্মানই রক্ষা করিব।

কালীকুমার মাষ্টার তদুত্তরে গান করাইলেন—

ইহা হইবে না। নারদ মুনি মধ্যস্থ হইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, "প্রভাস নদীর এক তীরে তোর দুই মা দাঁড়াইবেন, তুই অপর তীরে দাঁড়াইবি। তোর দুই মা বুকে টিপ দিয়া তোকে দুগ্ধ দিবে, যার দুগ্ধ তোর মুখে পড়িবে, তার স্বামীই তোব আসল বাবা হইবে। দুগ্ধের হিসাবে বোধ হয় গোয়াল বাবাই তোকে আজ নিয়া যাইবে।

আমি ইহার রহস্যপূর্ণ উত্তর করিলাম—

দেব দানব নর গন্ধর্বের সভা,
কেবল দুধের জোরে গোয়াল বাবা, নিবে আমাকে।
বলে দুর্গা কালী শিব, মায় যখন দেয় দুধে টিপ,
তোমরা ত আছ সম্মুখে ;
আমার বাপ খুড়া সব যাও দূরে—
না জানি কার দুধ পড়ে কার মুখে॥

আমার এই উত্তর শুনিয়া সভাস্থ সভ্যগণ খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গানও শেষ হইয়া গেল।"

আর একবার লাকসাম স্টেশনের নিকটবর্তী দৌলতগঞ্জ বাজারে কালীকুমার মাষ্টারের সহিত আমার গান হয়। কালীকুমার সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি আমাকে খুড়া মহাশয় বলিয়া থাকেন। তিনি একটি "মাল ফুকার" করিলেন, যথা—

"হরিচরণ খুড়া আমার রঙ্গ বাজারের রঙ্গ দুলাল।"

ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, যথা—

আমি রঙ্গ বাজারের রঙ্গ দুলাল হই,
স্বীকার করে এই কথা কই,
রঙ্গের বলিহারি যাই।
ও তোর শ্বাশুড়ীকে দে আনিয়ে,
দুজনে একত্র হয়ে,
একটা রঙ্গের দোকান খুলতে চাই॥

কালীকুমার মাষ্টার মহাশয় ইহার উত্তর করিলেন, যথা—

আমার শ্বাশুড়ীকে আনিয়া দিতে পারি।
আমার শ্বাশুড়ীকে আনিয়া দিলে,
রঙ্গের বেচাকিনা করবার কালে,
এই রঙ্গ মাপিতে আশির ফেরে পড়ে গেলে,
তোমার চৌরাশিতে যেতে হবে।

হরিচরণ—পড়লে পরে আশির ফেরে, চৌরাশিতে যাব পড়ে,
চৌরাশির ভয় করি কৈ ;
যদি প্রত্যেক মাপে লাভে রাম কই।
পাল্লায় ধরব জিনিষ চেপে,
ভুল হবে না কোন রূপে,
মাপব বিরাশি দশ আনার মাপে,—
যদি থাকে ডান্ডি সই ॥

সঙ্গীত রচনায় এমন কৃতিত্বের অধিকারী হলেও এবং বহু সঙ্গীত রচনা করলেও দুঃখের বিষয় কালীকুমারের রচিত মাত্র একটি সঙ্গীত হস্তগত হয়েছে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত হলেও গানটিতে কবির রচনাশৈলীর কিছুটা নিদর্শন রয়েছে।

কালীকুমার ভাবতাত্ত্বিক কবি, আর তার গুরুভাই জগবন্ধু ছিলেন চতুর বাক্য-বিশারদ। একবার উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ রঙ রহস্যমূলক কথা কাটাকাটি হয় ঃ—

কালীকুমার—জগবন্ধু রঙিন সরকার
রঙে রসে মজায় মন।
জগবন্ধু—আমার বায়ান্ন বছরের কালে,
রঙীন বলে কোন্ পাগলে,
কালীর শ্বশুর বাড়ী গেলে,
রঙীন কয় তার শাশুড়ী।
কালী—তুমি বিদ্যায় রঙীন, বুদ্ধি রঙীন,
আরো একটা চক্ষু রঙীন,
সেই জন্য যে বলছি রঙীন,
ইথে এমন দোষ হয় নাই।
জগ—আমি যখন যাই কালীর শ্বশুর বাড়ীর ভিতরে
রঙীন চোখ পাছ দুয়ারে,
মজাইলাম তোর শাশুড়ীরে,
আজ পর্যন্ত ভুলে নাই।

কালী—মোর শ্বশুরে করে ক্ষমতা,
মেরেছে বল্লমের গুতা,
সেই অবধি এই ক্ষমতায়—
তোমার ট্যারা দৃষ্টি হয়েছে।
জগ—আমি যেমনি মেরেছি মজা,
তেমনি পেয়েছি সাজা,
তোর শ্বশুরের মাছের ভাজা,
আমি শেষ কবি।
কালী—বিড়ালের স্বভাবের দোষে
ফিরে ভাজার আশে পাশে
ধরা পড়ে অবশেষে—
কেবল পিছার বাড়ি খায়॥

( বঙ্গের কবির লড়াই ও সংগ্রহ )

## অম্বিকা পাটনী সরকার ( ঢাকা )

হরিচরণ আচার্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য অম্বিকা সরকার ঢাকা জেলার অন্তর্গত কালিয়াকুড় থানার অধীন বেণুপুর গ্রামে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য কর্তার পুত্রের নামে নাম ছিল বলে তিনি অম্বিকা সরকারকে খুব স্নেহ করতেন। অনেক দিন তিনি হরিচরণ আচার্যের সঙ্গে জোটে গান করেন। তারপর তিনি আলাদা দল গঠন করে অন্যান্য সরকারের সঙ্গে গান করেন। তিনি ৫।৬ বৎসর বরিশাল জেলার ঝালকাটিতে বড় মনোমোহিনী নামে জনৈক মহিলার কবিগানের দল পরিচালনা করেন এবং কবিত্বে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তিনি ডাক, মালসী, সখি-সংবাদ 'কবি' প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উপস্থিত টপ্পা পাঁচালীতেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত এবং আচার্য কর্তা কর্তৃক অভিনন্দিত।

অম্বিকা সরকার রাধারানীকে তরী, চন্দ্রাবলীকে স্টীমার এবং কুব্জাকে রেলগাড়ী কল্পনা করে ব্রজলীলার একটি 'কবি' গান রচনা করেন। সেই গানের পদে, অয়েলম্যান, ড্রাইভার, স্টীমার, অফিসার, জংশন ইত্যাদি ইংরেজী রূপক ছিল। বস্তুতঃ ব্রজলীলার কোনও গানে এতাদৃশ ইংরেজী রূপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা নেই। তথাপি কবি যখন বৃন্দার ভূমিকা নিয়ে সেই ভাব অবলম্বন করে গান রচনা করে গেয়েছেন, তখন বিপক্ষকেও ঐ কল্পনা বজায় রেখে উত্তর দিতে হবে।

অম্বিকা সরকারের গানের পদে ছিল—

ছিল প্রেম-সাগরে রাধা তরী,
ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি, চন্দ্রা ত ছিল ইস্টিমার ;
যারে কাম নদীতে চালাইতে সারেং হয়ে তার।
হেথায় শিখে ড্রাইভারী, চালাও কুব্জা রেলগাড়ী,
বল, জলপথে স্থলপথে হরি—
এই তিনটার কোনটায় বেশী সুখ তোমার ॥

হরিচরণ আচার্যও কৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে সাজানি ফুকারের হাস্য পরিহাসাত্মক জবাব দিলেন—

তুমি নৌকা স্টীমার রেলের গাড়ী,
কল্পনায় সাজালে এবার, ধন্য কবিত্ব তোমার।
শুনতে হয়েছ "রেডি", শুন গোয়ালের "লেডি",
প'ড়ে কোন্ ইস্কুলে এ, বি, সি, ডি—
ইংলিশে এত অধিকার ?

একবার ঢাকা নরসিংদিতে হরিচরণ আচার্য ও অম্বিকা সরকারের মধ্যে গানে হরিচরণ কল্পনায় দারুক সারথী এবং অম্বিকা সরকার শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যে টপ্পা-জবাব করেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

হরিচরণ— হলেম কল্পনাতে আমি দারুক, তুমি শ্রীহরি।
ব্রজে মধুর লীলা করে শেষ,
দ্বারকায় করেছ প্রবেশ,
তোমার লীলা সবিশেষ, বুঝতে নারি।
তোমায় কেউ বলত 'লাউরা গোপাল'·
কেউ বলত পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান ;
শ্রীকৃষ্ণ হে যথার্থ তত্ত্ব বলে জুড়াও প্রাণ।
বল, কোন্ পুণ্যেতে গোকুলেতে—
আয়ানকে লক্ষ্মীভার্যা করলে দান ॥
অম্বিকা— করে তপস্যা শত বৎসর, নিক্ষেপিয়ে ভক্তি-শর,
যখনে প্রাণ ধরে দেয় টান।
তাইতে নিজের ভার্যা দিলেম তারে—
জগতে বাড়াতে ভক্তের মান ॥
হরিচরণ— বললে, ভক্তিগুণে বৃন্দাবনে আয়ান পেল রাই।
আছে অন্নদান আর বস্ত্রদান,

স্বর্ণদান ভূমিদান গোদান,
রাজ্য ছাড়া ভার্যা দান—
আর তো শুনি নাই।
বড় দান করেছ দাতার বেটা—
এমন দান সাজে না আর তোমা বই ;
শ্রীকৃষ্ণ হে এই দানের গুণে হলে জগজ্জয়ী।
তুমি বাড়াতে ভক্তের মান,
নিজের ভার্যা করে দান—
আয়ানকে রাখলে নিশানসই।
তারে বাক্স দিলে তালা দিলে—
কও দেখি খোলার চাবি দিলে কই ?

অম্বিকা— বললে, বাক্স দিলেম তালা দিলেম, চাবি দিলেম কই।
দেই নাই আয়ানকে বাক্সের চাবি,
সেই চাবি তুই নাকি চা'বি,
চিৎশক্তির চিন্ময় চাবি—জীবে পাবে কই।
এই যে ভাবের তালার উল্টা কল,
অটলে জানে কৌশল,
টলের হয় মাথা ঘুরানি।
দিবে কামের মোড়া কপাড়পোড়া—
সেই জন্য দেই না তারে ছোড়ানি ॥

এই জবাবটি শুনে হরিচরণ আচার্যের মন্তব্য—

"অম্বিকার এই উত্তরটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। ভাব ও সাধন রাজ্যের পরাকাষ্ঠা। বলিহারি কবিত্ব।"

নোয়াখালী জেলার কল্যাণদি বাজারে অম্বিকা সরকারের সহিত হরিচরণ আচার্যের কবিগান হয়। সেখানে উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ টপ্পা চাপান-উতোর হয়েছিল—

হরিচরণ— ঐ জনক রাজার বন্ধু আমি নামটি সর্বজ্ঞ।
তুমি সম্পর্কেতে জামাতা, বাৎসল্যে করি মমতা,
দেখতে এলেম আজ হেথা, অশ্বমেধ যজ্ঞ।
করলে তপোবনে সীতা উদ্ধার—
শুনে সে লব-কুশের রামায়ণ গান।
পরীক্ষার ভয় জানকীর দুঃখে পাতালে প্রয়াণ ॥
সীতা কেঁদেছে মা মা বলে, বসুধায় নিয়ে কোলে,
করেছে পাতালে প্রস্থান।

তুমি কারে মারতে পৃথিবীতে—
ধরেছ জানু পেতে ধনুর্বাণ !
অম্বিকা— সর্বজ্ঞদেব আজ আমার ভাগ্যেতে বড় নিদান।
আমার অতি সাধের গৃহবাস,
আজ হতে হল নিরাশ,
সে দুঃখে কাঁদতেছে মোর প্রাণ।
তাইতে বসুধারে মারব বলে—
ধরেছি জানু পেতে ধনুর্বাণ ॥
হরিচরণ— বললে, বসুধারে মারবে ব'লে ধরলে ধনুর্বাণ।
পেয়ে যৎ সামান্য কসুরি, সম্পর্ক গেলে পাসরি,
কেট্‌কে বুড়ি শ্বাশুড়ী, জামাই ত জোয়ান ॥
তোমার এই আশ্চর্য কার্য দেখি—
সভার সবে আছে চোখ বুঁজে ;
সীতাপতি ছি ছি ছি, এ কাজ কি তোমার সাজে ?
দেখ মায়ের ঘরে মেয়ে যায়, তাতে কিবা আসে যায়,
এত রাগ কর কি বুঝে।
মারবে জামাই হয়ে শ্বাশুড়ীকে—
সমাজে মুখ দেখাবে কোন্‌ লাজে ?
অম্বিকা— বসুধা এখন আমার শ্বাশুড়ী নয়।
আমি বর্তমানে পিতৃ আয়ু ভোগ করিতেছি ;
অতএব বসুধা আমার বিহাইন হয়।
হরিচরণ— বললে, পিতৃ আয়ু ভোগ করতেছিস বসুধা বিহাইন।
বাছা ! বুঝেছি তোর বুদ্ধিটুক, কোন্‌ লাজে দেখাবি মুখ,
বিচার করুক সভার লোক, আইন কি বে-আইন।
বলে পিতৃ আয়ু ভোগের কথা—
এককালে বাজালি কলঙ্কের ঢাক,
রাম জামাতা অন্যায কথা দূরে রাখ।
যদি বসুধা তোর বিহাইন হয়, বুঝেছি বিপর্যয়,
ধরেছিস্‌ পিতৃ আয়ুর ফাঁক।
তবে লব-কুশেরে নাতি ডেকে—
সকালে জনকেরে বিহাই ডাক ॥

( বঙ্গের কবির লড়াই )

## মহিম সরকার ( খুলনা )

মহিমাচরণ বা মহিম সরকার খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অধীন কাটাদুরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন প্রেমিক ও রসিক কবি বলে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁর রচিত সঙ্গীতে ভাবতন্ময়তার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। যেমন—

মহাভাবের তরঙ্গে অকূল দরিয়ায়—
কুলমান দিয়েছি ডারিয়া।
দিলেম প্রেমের সাগরে দেহতরীখানি ছাড়িয়া ॥
তরী ডুবে যাক নইলে ভেসে যাক,
যেন আর আসে না কিনারায় ফিরিয়া।
আর্য বৈদিক ধর্মসূতে, কুলের ফুল অষ্টপাশের এক মালা গেঁথে,
সুখে ছিলেম গলে পরিয়া।
ও তার করুণা দিঠি সিঁদ কাটিয়া, ঘরে আসি ধরম নাশিয়া,
( প্রাণ সই সইরে ! ) আমার মালাটি নিয়েছে হরিয়া ॥ ইত্যাদি

মহিম সরকার রচিত আরও একটি গানের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

সে জানি কি করল রে আমায় কি জানি কি দিয়ে।
আমি কইতে নারি, সইতে নারি গো—
সে আমার কি গিয়েছে নিয়ে ॥
ব্যথার ব্যথিত কে আর আছে.
সে আমায় কি দিয়ে কি নিয়ে গেছে—
কে দিবে বুঝাইয়ে—
আমি বিষ খেলেম না সুধা খেলেম গো—
কি ছিলেম কি হলেম কি পেয়ে ॥
অতৃপ্ত নয়নের আশা, আমার লজ্জা ভয় রমণীর ভূষা,
সব বিসর্জন দিয়ে।
ঘরে গুরু গঞ্জন, সমাজ বন্ধন গো—
রই আমি আর কতকাল সয়ে ॥
যে যন্ত্রণা সয়ে থাকি,
আমি মইলে জ্বালা জুড়ায় না কি—
কে দিবে তা ক'য়ে।
আমার মরণ অধিক স্মরণ জ্বালা গো—
যাব রাই রসরাজকে থুয়ে ॥

( বঙ্গের কবির লড়াই )

# কুঞ্জবিহারী দত্ত ( বরিশাল )

কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্ত শতাধিক বৎসর পূর্বে বরিশাল জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে কালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলোদ্ভব ব্যক্তিদের কবিগানে অংশগ্রহণ সমাজের চোখে নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল সে সময় যে কয়জন কবি সাহস করে কবিগানে যোগদান করেন কুঞ্জ দত্ত তাদের মধ্যে একজন। তিনি খুলনার বিধু সরকারের দলে প্রথমে দোহার হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু নিজ কবিত্ব প্রতিভাবলে অত্যল্প কালের মধ্যে "সরকারী" শিক্ষা করে নিজস্ব দল গঠন করে পুরোপুরি কবি'র ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ঝালকাটি বন্দরে "বীণাপাণি কবি পার্টি" নামে তাঁর দলের স্থায়ী গদী ছিল। গানের বায়না নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতেন। গান রচনার চেয়েও জবাব ও টপ্পা পাঁচালীতে তিনি দক্ষ ছিলেন।

বরিশাল শহরে ছ' আনি কাছারীতে গানে একবার কবিয়াল শরৎ বৈরাগী সখী-সংবাদ গানের তিনটি ফুকারে গাইয়েছিলেন—এবং কুঞ্জ দত্ত তার যে জবাব দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ—

১। দেখি চামচিকায় ধরেছে পেখম।
কুব্জা হল বাদশার বেগম,
কুজীর কি জোরের কপাল,
তুমি রাজা হলে গো রাখাল ॥

( জবাব )—বললি, কুব্জা হল বাদশার বেগম
চামচিকায় ধরেছে পেখম
কুব্জার জোরের কপাল
হল সে রানী আমি ভূপাল।
কালে কালে কি না খাটে
গঙ্গাস্নান পাতকুয়ার ঘাটে
দূতী! ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে
ছাগে চাটে বাঘের গাল ॥

২। হল কংসের দাসী পাটেশ্বরী,
রাই কিশোরী রাসেশ্বরী,
আজ দেখি তার মান্য যায়
তুমি কুজীরে বসালে বাঁয় ॥

( জবাব )—বললি, দাসী হল পাটেশ্বরী,
রাই কিশোরী রাসেশ্বরী
আজ নাকি তার মান্য যায়
আমি রাধার কোটাল শ্যাম রায়।

কোটাল, পতি পেয়ে কুজী,
কত আর সম্মানের পুঁজি,
দূতী ! জোনাকীর আলোকে বুঝি,
পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায় ॥

৩। তুমি পেয়ে সে পরের নৈবেদ্য,
তুলসী দিয়ে করে শুদ্ধ,
নিজের রাজভোগে লাগাও ॥

( জবাব )—বললি, পাই যদি পরের নৈবেদ্য
তুলসী দিয়ে করি শুদ্ধ
বললি কি গো বৃন্দে সই
আমি পরের বস্তুর প্রিয় নই।
ভক্তি চন্দনে কুবুজা,
করে আমার চরণ পূজা,
তাইতে কুজারে বানায়ে সোজা—
ভোগের যোগ্য করে লই ॥

কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের শিষ্য-ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন বলা যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দাস ও হরিচরণ নাথ ডাকসাঁইটে কবিয়াল ছিলেন। অশ্বিনী সরকার এবং অনন্ত সরকার ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অপর শিষ্য নকুলেশ্বর সরকার তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল এবং পূর্ববঙ্গে ধ্রুপদী কবিগানের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

( কবিয়াল ঃ কবিগান )

## শরৎ বৈরাগী ( বরিশাল )

গত শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করে যে সব কবিয়াল প্রভূত নাম যশ অর্জন করে গেছেন, শরৎ বৈরাগী তাদের মধ্যে অন্যতম। বরিশাল জেলার ঝালকাটিতে তিনি দীর্ঘদিন রাঙা যামিনী নামে জনৈক মহিলার সহযোগে "আদর্শ কবি" নামে দল পরিচালনা করেন। পরবর্তী কালে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের দরুণ শরৎচন্দ্র নতুন দল গড়েন। রাঙা যামিনীও আবার দল গঠন করে কুঞ্জ দত্তের শিষ্য নকুলেশ্বর সরকারকে 'কবিয়াল' রূপে নিযুক্ত করেন। ১৩২২ সালের দুর্গা পূজার প্রথম গানেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ীতে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এই দল ভাঙাভাঙির বিষয়কে কেন্দ্র করে নকুলেশ্বর সরকার এক রঙ ফুকার করেছিলেন—

আগে লোকের মুখে তত্ত্ব শুনি,
শরৎ আর রাঙা যামিনী, দল করেছেন বহুদিন ;
এখন আত্মদ্বন্দ্বে হল ভিন্ ।
দারুণ বিচ্ছেদ রবি করে, নিষ্প্রভ চাঁদ পুড়ে মরে,
হল যামিনীর অভাবে পড়ে ;—
শরৎচন্দ্র জ্যোতিহীন ॥

শরৎ বৈরাগী দলীয় কলহ ভিত্তিক এই রঙ ফুকারের নিম্নরূপ জবাব দেন—

দেখি ঐ দলের রাঙা যামিনী,
নূতন দল করেছেন তিনি, পুরাতন লাগে না ভাল ;
তাইতে নূতন সরকার জোটাল ।
দলে দুইটা ছুক্‌রী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে,
থাকে ছোক্‌রা সরকার পাছে পাছে,
সভাটা করেছে আলো ॥

বরিশাল শহরে ছ' আনির জমিদার কাছারীতে বিশিষ্ট কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্ত তাঁর বিপক্ষে টপ্পা করেন—

আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হরি শর্মা নাম ।
ভেবে বিষয় বিদ্যা অনিত্য, পড়েছি বৈষ্ণব সাহিত্য,
জানতে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, শ্রীক্ষেত্রে এলাম ॥
আমি লোকের মুখে শুনলেম যেমন—
প্রত্যক্ষ স্বচক্ষেও দেখলাম তাই ;
জগবন্ধু আজ তোমার একবিন্দু করুণা চাই ।
শুনি নন্দের নন্দন যেই, শচী-সুত হল সেই
বলরাম হয়েছেন নিতাই ।
তবে শ্রীক্ষেত্রের এই শ্রীমন্দিরে—
কে তোমরা বিরাজ কর দুটি ভাই ?
আর আছে সুভদ্রা সতী, অর্জুন ছিল তার পতি,
এখন সে প্রাণে বেঁচে নাই ।
তবে কি কারণে বল শুনি—
সুভদ্রার শঙ্খ সিন্দুর দেখতে পাই ?

শরৎ বৈরাগী জগন্নাথ লীলা ভিত্তিক এই টপ্পার নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছিলেন—

তুমি কৃতকর্মা হরি শর্মা করলে প্রণিপাত ।

আমি জাতির কর্তা জগন্নাথ,
আমার বাজারে বিকায় ভাত,
জাত কুলীনের মেরে জাত, করি আত্মসাৎ ॥
ব্রজের নন্দ নন্দন মাধুর্যের ধন—
নদীয়ায় হয়েছেন শচীর নিমাই,
যুগধর্ম হরিনাম দিতেছেন অবধূত নিতাই।
রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের তপস্যায়, ঠেকে ভক্তি সমস্যায়,
উড়িষ্যায় এসে কাল কাটাই।
আমি ঐশ্বর্যের ধন লক্ষ্মীকান্ত—
নারায়ণ হলেম জগন্নাথ গোঁসাই ॥
আর অর্জুন হয় নর নারায়ণ,
নর-দেহের হল মরণ,
নারায়ণ অংশের মরণ নাই।
তাইতে সুভদ্রা সধবা সাজে—
দুই পার্শ্বে আছি আমরা দুটি ভাই ॥

শরৎ সরকার গণিকার ঘরে জন্মেছেন বলে লোক জানাজানি ছিল। একবার এক আসরে আলোচনা প্রসঙ্গে হরিচরণ আচার্য শরৎ সরকারকে প্রশ্ন করেন "তুমি কার ছেলে?" উত্তরে শরৎ সরকার রহস্যচ্ছলে বললেন—

কথা শুনে মনে পেলেম মনস্তাপ,
মন জানে পাপ, মা'য় চিনে বাপ,
মা বলেছেন বাপ হরি আচার্য ॥

( কবিয়াল ঃ কবিগান ও সংগ্রহ )

## অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার আন্দিকুট গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কবির সরকার অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ হরিচরণ আচার্যের কবি-জীবনের প্রারম্ভিক কালের একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক, মালসী, কবি, সখী সংবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গান রচনায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। গুরু-শিষ্যের মধ্যে নানা স্থানে কাব্যদ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেসব গানে অর্জুন সরকারের নিজস্বতার ছাপ পাওয়া যায়।

একবার কুমিল্লা শহরস্থিত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রাঙ্গনে হরিচরণ আচার্য ও অর্জুন দেবনাথের মধ্যে গান হয়। অর্জুন সরকার "উচিতরাম" এই কাল্পনিক নাম নিয়ে হরিচরণকে 'বাল্মিকী'র ভূমিকায় রেখে এক টপ্পা চাপান দেন। তার ভাবার্থ এইরূপ—"বাল্মিকী মুনি! তোমার রচিত রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের এত গরমিল কেন?"

হরিচরণ আচার্য উত্তর করলেন "কৃত্তিবাস পন্ডিতের সংস্কৃত জ্ঞান কম থাকায় সে আমার রামায়ণের প্রকৃত অনুবাদ করতে না পেরে কৃত্রিম অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং আমি কেন তার রচিত কৃত্রিম রামায়ণের জন্য দায়ী হব?"

তারপর টপ্পার ভাবে বললেন—

বাছা! আমি যে রামায়ণ লিখি—
রাম জন্মের ষাইট হাজার বৎসর অগ্রীম;
কৃত্তিবাসের কীর্তিতে অনেক রয়েছে কৃত্রিম।
কথা রাষ্ট্র আছে চিরকাল,
চিনির শিরায় দিলে জ্বাল,
মিষ্টি গুণ কভু পায় না নিম।
তুমি "উচিতরাম" যে নামটি ধর—
তুমি কি উচিত বোঝ ঘোড়ার ডিম॥

শ্রীহট্ট জেলার মাধবপুর কাছারীতে একবার হরিচরণ আচার্য ও অর্জুন সরকারের সঙ্গে টপ্পায় নিম্নরূপ বাকযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ঃ

হরিচরণ— "এই যে পার্থিব নাম ছিল আমার রাজা যুধিষ্ঠির।
লাগলো শোকের আগুন গাত্রেতে, অশ্রুজল বহে নেত্রেতে,
মৈল কুরুক্ষেত্রেতে, সুহৃদ বন্ধু বীর॥
আসতে স্বর্গপথে যাজ্ঞসেনী—আর চার ভাইয়ের হল মরণ;
সত্য তত্ত্ব আমাকে বল হে বিপদবারণ।
ছিলেম পৃথিবীতে যত দিন, দুঃখে সুখে গত দিন,
শেষে এই স্বর্গ আরোহণ।
আসতে স্বর্গপথে কোন পাপেতে—
হ'ল মোর নরককুন্ড দরশন?

অর্জুন— কবির কল্পনাতে হলে অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির।
কবির কল্পনা করতে রক্ষে, থেকে আজ তোমার বিপক্ষে,
এসে রত্নসভার সমক্ষে, হলেম যদুবীর॥
দাদা, আমার কার্যে বিচার বুদ্ধি জানেনা—
ভক্তের প্রাণে কোন দিন।

আমার উপর দাদাগো - তোমার নির্ভরতাহীন।
এই যে কুরুক্ষেত্র সমরে, পরীক্ষায় যাও ফেল্‌পাড়,
তাই হল নরক দেখার চিন্‌।
কেন অশ্বত্থামা হত ইতি—এক বাক্যে কও নাই দ্রোণ বধের দিন॥

হরিচরণ— সত্য ঠাকুর কি জন্য মিথ্যা শিখাও আমাকে ?
এই যে অশ্বত্থামা হত গজ, সরল প্রাণে খুব সহজ—
বলেছি গুরুর সম্মুখে।
আমার গজ শব্দ ঢাক্‌বে বলে
কও শুনি শঙ্খধ্বনি করল কে ?

অর্জুন— বললে, গজ শব্দ ঢাক্‌তে শঙ্খের ধ্বনি করল কে ?
আমি শঙ্খের শব্দ করেছি, শব্দে লোক স্তব্ধ রেখেছি,
দাদা তোমার কাছে বলতেছি, ভয় কি আশ্রিতকে।
করি সাধুর সঙ্গে সাধুগিরি—
আমি তো ছলের সঙ্গে করি ছল।
দর্পহারী আমার নাম—ভক্তে কয় ভক্ত বাৎসল॥
সাধি এক চক্রে বহু কার্য, আমার লীলা আশ্চর্য,
রসিকে বোঝে সে কৌশল।
দাদা, নুনের পুতুল হয়ে তুমি—
কি জন্য মাপতে চাও সাগরের জল॥

হরিচরণ— ঠাকুর তুমি সূর্য, জীব হয় তেজ,
তুমি বানর, জীব তার লেজ,
জীব ঢেঁকি, তুমি তার মুষল।
ঠাকুর, তুমি হয়ে কর্মকর্তা—
কি জন্য জীবকে ভোগাও কর্মফল॥

অর্জুন— জীবে আমি আমি, আমি করি—
আমাতে ঠিক রাখে না একতা।
জীবে ভাবে এই ভবে সকলি নিজের ক্ষমতা॥
এই যে সুমতি কুমতি দুই, সকল জীবের দেহে থুই,
একথা নয়কো অন্যথা।
কর্ম মনে করাই জীবে করে—
একমাত্র আমি কর্মের ফলদাতা॥

রায়পুরা দীননাথ সাহার বাড়ীতে কবিগানে হরিচরণ অর্জুন সরকারের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

সুবাহু গন্ধর্ব আমি কবির ভাবে হই।
এখন চেদিরাজ্যে আগমন, বহুদেশ করিয়ে ভ্রমণ,
উচিত কথা আজ এখন, যখন তখন কই ॥
চলছে হৃদ্য মুদ্য খাদ্য খাওয়া—
আনন্দের সীমা নাই আর রাজবাড়ী ;
বিয়ে করে এনেছে ভীষ্মক রাজার কুমারী।
তাইতে পাড়ার যত নারীলোক, দেখতে নূতন বউ-এর মুখ.
দাঁড়াইল সব সারি সারি।
আইলি কেমন বউ তুই দোলার ভিতর—
বউগো ! তোর মুখে দেখি মোছ দাড়ি ॥

অর্জুন সরকার জবাব দিলেন—

চেদিরাজ শিশুপাল আমি কবির কল্পনায়।
আমি পেয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ, ভীষ্মক আলয় আগমন,
কত ছবি করি অঙ্কন, মনের আলপনায় ॥
আমি রুক্মিনীরে বিয়ে করে—
সাড়ম্বরে নিয়ে যাব নিজ নিকেতন।
হেথা এসে দেখি কৃষ্ণ, করেছে রুক্মিণী হরণ ॥
নিয়ে নারদ মুনির উপদেশ,
দোলায় চড়ে ফিরলেম দেশ,
র  সভায় পেয়ে বড় লাজ।
আমি নিজ গৃহে ফিরে এলেম, অঙ্গে পরা বিয়ের সাজ ॥
আমার হয় নাই যখন বিবাহ, আমোদ প্রমোদ সমূহ,
গানবাজনার প্রয়োজন আর নাই।
অনেক প্রাপ্তি আশা করেছিলে, গন্ধর্বের পো—
তোমার সে আশাতে পড়ল ছাই ॥

হরিচরণ আচার্য এই জবাবের রহস্যপূর্ণ প্রতি-জবাব করলেন—

আমার প্রাপ্য নষ্ট হবে, কোন কথার কারণ ?
আ তোর না হল নাই বিবাহ,
আমোদ প্রমোদ সমূহ,
গান বাদ্য বন্ধ রউক এখন
আমি পাঁচ দশ টাকা নিয়ে যাব,—
যেদিন তোর শ্রাদ্ধে গা'ব রামায়ণ ॥

ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর গ্রামে ঢাকার তারিণী সরকার টপ্পা করেছিলেন—

আমি কল্পনাতে মিঃ এস, এম, ভট্টাচার্যাখ্যা।
তুমি বঙ্কিম চাঁদ চট্টোপাধ্যায়, পারদর্শী সর্ববিদ্যায়,
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়, করেছ ব্যাখ্যা ॥
ছিল গীতাতে সংস্থাপনার্থায়—
সংরক্ষণ তুমি দিয়েছ লিখি,
সংস্থাপন আর সংরক্ষণ - এই দুই কথার অর্থ কি ?
আবার বলিলা কৃষ্ণচরিতে, নির্মল কৃষ্ণচরিতে,
কি জন্য কলঙ্ক দেখি।
আবার কৃষ্ণকে লিখেছ মানুষ—
কও শুনি এই লিখার মাহাত্ম্য কি ॥

উত্তরে অর্জুন সরকার টপ্পা করেছেন—

করলে, অর্ধেক বাংলা কিছু ইংলিশ, কবিত্বের বিধান।
রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিধি,
ইংলিশ নাম কও গুণনিধি,—
বুঝলেম শুনে তোমার উপাধি—ব্রাহ্মণের সন্তান ॥
শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলে, কি জন্য আমি করেছি লিখন ;
করেছে কত রঙ্গ, উলঙ্গ করে গোপীগণ।
নিযে মানুষের গর্ভে জন্ম, কবে মানুষেব কর্ম,
সবই তার মানুষ আচবণ।
করে মানুষ লীলা, মানুষ খেলা,
তাই তারে মানুষ করেছি লিখন ॥

দ্বিতীয় আসরে তারিণী সরকার আবার টপ্পা করলেন—

করে মানুষলীলা তাইতে মানুষ, লিখলে কৃষ্ণেরে।
গেল বিষ খেয়ে রাখালের প্রাণ, বাঁচাইল কৃষ্ণ ভগবান,
বল মরার করতে জীবন দান, মানুষ কি পাবে ॥
আরো অস্ত্র ছাড়া শুধু হাতে, মথুরায় রজক কেটে করে খুন ;
মানুষ হলে গোকুলে কেমনে খায় দাবাগুন।
ধরে বাম করেতে গোবর্ধন, রক্ষা করে গো ব্রাহ্মণ,
ইন্দ্রের গালেতে কালিচুন।
এসব কাজে কর্মে বুঝা গেল—
শ্রীকৃষ্ণের রয়েছে ঐশ্বরিক গুণ ॥

( বঙ্গের কবির লড়াই, সংগ্রহ )

# হরিহর আচার্য ( ময়মনসিংহ )

হরিহর আচার্য সম্পর্কে কবি গুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয় বলেন—ময়মনসিংহ জিলার বিরুনিয়া গ্রামের হরিহর আচার্য মহাশয় একজন খ্যাতনামা কবি। কবিগানে তাঁহার সহিত আমার বহু পাল্লা হইয়াছে। জবাব ও টপ্পা কাটাকাটির চেয়ে ছড়া কাটাকাটিই তাঁহার সহিত অধিক হইত। ধলার জমিদার বাড়ীর বারোয়ারী পূজায় তাঁহার সহিত গানের সময় তিনি ছড়া গান করিয়াছিলেন। যথা :—

"এসেছেন হরি আচার্য কবিতে উত্তম
আমার ভাগ্যে আস্‌ল বুঝি দক্ষিণ দেশী যম।"

এই ছড়া গানে সুন্দর একটু কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, আমার বাড়ী তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় ৩ দিনের পথ দক্ষিণ দিকে।

আমি তদুত্তরে বলিলাম। "উত্তর দেশীয় লোকের নিকট দক্ষিণ দেশীয় যম সর্বদাই পরাভব পাইতেছে।"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলাম :—"একবার দক্ষিণ দেশীয় যম শিশু মার্কণ্ডেয়কে অন্তিমকালে গ্রেপ্তার করিতেছিলেন। মার্কণ্ডেয় নিরুপায় হইয়া শিবলিঙ্গকে জড়াইয়া ধরিলেন। শিবলিঙ্গ হইতে শিব স্বয়ং বাহির হইয়া দক্ষিণ দেশীয় যমকে বিশেষরূপে অপদস্থ করিলেন। দক্ষিণ দেশীয় যমও উত্তর দেশীয় কৈলাসবাসী মহাদেবকে স্তব-স্তুতি করিয়া দক্ষিণ দেশে পলাইয়া আসিল।"

আরও বলিলাম—"ময়মনসিংহ জিলায় তোমার বাড়ী; এই জিলায় রাজা জমিদার সিংহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সিংহ, যাত্রার দলের অধিকারী সিংহ, কবির দলের সরকারও সিংহ। ইহার মধ্যে তুমি একটী বিশেষ সিংহ। "তুমি" সিংহের কবিত্ব হইয়াছে তোমার 'কেশর'—তোমার কবিত্বের তেজ হইয়াছে 'লেজ'—কবিত্বে প্রতিপক্ষকে চর্ব্বণ করিবার জন্য ভাষা হইয়াছে দুপাটি 'দন্ত'—ভূত ভবিষ্যৎ হইয়াছে দুটী 'কর্ণ"—বর্তমান হইয়াছে তোমার 'মুখ'—বিদ্যা, মেধা, শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়াছে চারিটী 'চরণ'—তাড়াতাড়ি ছড়া বলিতে পার ইহা তোমার 'জিহ্বা'—বিপক্ষকে ভয় প্রদর্শন করা তোমার শরীরের 'লোম'—ইত্যাদি আরও কত কিছু বলিয়া আচার্য মহাশয়কে 'সিংহ' বানাইয়া আমি সেই সভায় সবিশেষ প্রশংসা পাইলাম।

আরও একবার বাজিতপুর মুন্সেফী আদালতে হরিহর আচার্য মহাশয়ের সহিত আমার গান হয়। সেই আসরে আচার্য মহাশয় আমাকে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখে নিজে বৃন্দাদূতি রূপে টপ্পা করিলেন। টপ্পাটি এই :—

"কৃষ্ণ! তোমাকে কুব্জা কোন্ গুণে কি দান করিয়া প্রাপ্ত হইল ?"
আমি তদুত্তরে বলিলাম :—
"পূর্ব জন্মের সাধন ছিল, উপলক্ষ চন্দন দান ইত্যাদি।"
তিনি ইহার উত্তর করিলেন :—

"ব্রজগোপীরা কি তোমাকে চন্দন দান করিত না ? শ্রীদাম শাপে বরং রাধিকার *চন্দন দোষী হইতে পারে। অন্যান্য ব্রজগোপিগণের তাহাতে দুঃখ হইল কেন ?"*

*আমি তাহার উত্তরে বলিলাম ঃ—*

"যখন সমুদ্রেতে ভাটা লাগে, শাখা নদী তার আগেতে শুকায়।

তেম্‌নি রাধাসাগর দ্বাপর যুগে, দূতিগো ! তোমরা শাখানদীর প্রায়।"

তিনি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার উত্তরটি এই ঃ—

"কেমন রঙ্গের কথা বল্‌লে ওহে ত্রিভঙ্গ কানাই।

আছে শাখা নদীর জোয়ার ভাটা, সমুদ্রেরতো ভাটা নাই।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—সমুদ্রের ভাটার সত্যতা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তথাপি কবিস্বভাব সুলভ কবিত্ব নিয়া ইহার উত্তর দেওয়ার জন্য আসরে দাঁড়াইতে হইল। গান করাইলাম, যথা ঃ—

"আছে প্রেম-সাগরে বিচ্ছেদ-ভাটা।" ইত্যাদি।

সমুদ্রের ভাটা সম্বন্ধে আমার এই উত্তরটি কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।"

হরিহর আচার্য হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পর ময়মনসিংহে আর তেমন প্রতিভাশালী কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে নি।

( বঙ্গের কবির লড়াই )

## দেবেন্দ্রনাথ দাস ( ঢাকা )

এই কবিয়াল সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য বলেছেন, "বিক্রমপুর ষোলঘরের নিকটবর্তী হাসারা গ্রামে কবি দেবেন্দ্র সরকারের বাড়ী ছিল। আমি তাহাকে ভাই সম্বোধন করিতাম। সে রামকানাই সরকারের প্রিয় ছাত্র ছিল। তাহার সহিত আমার নানা স্থানে গান হইয়াছে। প্রত্যেক গানের দিন সে আমার বাসায় বসিয়া থাকিত। জবাব, টপ্পা, ছড়া কাটাকাটিতে সে প্রায় উদাসীন ছিল। কাজেই ঐসব জবাব, টপ্পা ও ছড়া রচনার ভার আমার উপরই থাকিত। আমার পরামর্শানুসারে ঐসব রচনা হইত।" সাধারণ চাষীঘরে জন্মগ্রহণ করলেও গানের জবাবে তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন বলে জানা যায়। ঢাকা চুড়াইন বাজারে নকুলেশ্বর সরকারের সঙ্গে গানে তিনি এক রঙ ফুকার করেন—

দেখি নকুল সরকার সুকৌশলে,
কয়টা নটী আনল দলে, যাদুযন্ত্র শিখায়ে ;
ওরা নাচে মাজা নাচায়ে।

সবাই বলে নকুল নকুল,
কেউ ধরে না নকুলের ভুল,
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল—
নটীর নাচনা দেখায়ে।

এই রঙ ফুকারের জবাবে নকুলেশ্বর বলেছিলেন—

মিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে,
ঠাট্টা করে গেলি মোরে,
নটী নিয়ে কবি-গায় ;
আছে নটীর মান্য এ ধরায়।
ব্রজরসের পরিপাটি, কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী,
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী মাথাকুটি,
প্রণাম দেয় সেই নটীর পায় ॥

ঐ গানের পালাতেই নকুলেশ্বর দেবেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন-

তুমি স্বর্গের রাজা হও দেবেন্দ্র, আমি তপোধন।
নিয়ে কোন্ পাপের কি প্রসঙ্গ,
কার সঙ্গে করিয়ে রঙ্গ,
তোমার সর্ব অঙ্গ ভগাঙ্গ হল কি কারণ ?
তুমি সহস্র বৎসর লুকায়ে—
কি জন্য ছিলে পদ্মের মৃণালে ;
অনিদ্রা আর অনাহার—
কও তোমার কোন্ পাপের ফলে।
অদ্য পড়লে আর এক সমস্যায়,
কাটা মুণ্ড পাছে ধায়,
তোমাকে গ্রাস করবে বলে।
হাতে বজ্র থাকতে কি নিমিত্তে,
ডুব দিলে সরস্বতীর সলিলে ॥

দেবেন্দ্র সরকার জবাবে বলেছিলেন—

বললে, কও তোমার ভগাঙ্গ হলো, করে কি রঙ্গ।
আমি অজ্ঞানে করেছি পাপ,
গৌতম দিয়েছেন অভিশাপ,
তাইতে ভোগ করি এ মনস্তাপ, হয়ে ভগাঙ্গ ॥
জীবের মন হলো ইন্দ্রিয়ের কর্তা—

জীবাত্মা মনের প্রেরণায় ভোলে ;
মন হলে বিপথগামী, জীবাত্মা কুপথে চলে।
আমি বৃত্রাসুরকে করে ক্ষয়, ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়,
লুকালেম পদ্মের মৃণালে ;
অদ্য নমুচি দানবের ডরে—
ডুব দিলেম সরস্বতীর সলিলে ॥

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তারকেশ্বর তীর্থে নবীন সেন নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী এলোকেশীর সঙ্গে মোহন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হলে নবীন সেন এলোকেশীকে কুপিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনা অবলম্বন করে দেবেন্দ্র দাস "নবীন সেনের কবি" নামে গান বাঁধেন। হরিচরণ আচার্যের বিপক্ষে সেই গান গাইলে তিনি গানের বিভিন্ন অংশের নিম্নরূপ জবাব করেছিলেন—

দেবেন্দ্র— তুমি স্ত্রী হত্যা করতে গেলে কেন ?

হরিচরণ— আমার ঘরের নারী এলোকেশী,
সতীত্ব বিচারে সে হল দোষী, আসিয়ে তারকেশ্বরে ;
তার পিতায় টাকা খেয়ে দিল, মোহন্তের ঘরে।
শরীরে রক্ত লইয়া, কার শক্তি থাকে সইয়া,
ভবে কুলটার সুশিক্ষা দিয়া,—
ফাঁসে যাই তাতে আমার ক্ষতি নাই।

দেবেন্দ্র— পিঠমোড়া বান্ধিয়া তোমায় রেখেছে কেন কাছারীর কোণে ?

হরিচরণ— বললে, পিঠমোড়া বান্ধিয়া কেন—
রেখেছে কাছারীর কোণে ;
এই সব আইনের বিধানে।
স্ত্রী হলো অধোগামী, তারে বধ করলেম আমি,
বেটা, যারা হয় খুনের আসামী—
তাদের কি পাল্‌কীতে আনে ?

দেবেন্দ্র— পুলিশে মাঝে মাঝে রুলের গুঁতা মারে কেন ?

হরিচরণ— বললে, মাঝে মাঝে রুলের গুঁতা—
পুলিশে মারে অনিবার ;
এইসব বে-আইনী কারবার।
গোপনে দেই না অর্থ, পুলিশের হয় না স্বার্থ,
তাদের স্বার্থের আশা দেখে ব্যর্থ—
অনর্থক করে অত্যাচার ॥

একদা দেবেন্দ্র সরকারের সঙ্গে গানের আসরে এক কৌতুকাবহ ঘটনার সৃষ্টি

হয়েছিল। আচার্য কর্তা স্বয়ং ঐ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—"কোনও এক সময় চাঁদপুর পুরাণ বাজারে আমার ও দেবেন্দ্রের গান হয়। তাহার রচিত কোন একটি গানের জবাব করিয়া এবং টপ্পা চাপান দিয়া আমি সেই পাঁচালী গাইতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় একজন শিক্ষিত ও বিশিষ্ট সভ্য আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—আচার্য মহাশয়! ষোল সতর বৎসর যাবত এই বাজারে আপনার কবিগান শুনিয়া বড়ই আনন্দের সহিত তাহা আমরা উপভোগ করিয়া আসিতেছি। আপনার ভাব ও রসযুক্ত কবিত্বে আমরা একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমি অদ্য আপনাকে একটি বিষয় ফরমাইস করিতেছি। আপনি তাল ও রাগিনী সহযোগে আমার ফরমাইসটি রক্ষা করুন। "আকাশেতে শিবা ডাকে হুয়া হুয়া রবে"—ইহা কবে কোন স্থানে হইয়াছিল, তাহা এখনই বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে সুখী ও আনন্দ দান করুন।

আমিও তৎক্ষণাৎ বসন্তদাদাকে স্মরণ করিয়া গানে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। যথা ঃ

"সদা হুয়া হুয়া বলে মুখে, আকাশেতে শিবা ডাকে,
বাঁচাইতে লক্ষ্মণের প্রাণ, নিয়ে গন্ধমাদন হনুমান ;
বায়ুপুত্র বায়ুভরে, আকাশপথে যাত্রা করে,
তখন হুয়া রবে উচ্চৈঃস্বরে, শিবাতে করেছে গান ॥"

আবার—

"যেদিন হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহন, শূন্যপথে হল স্থাপন,
নারদ মুনির চক্রেতে, কথা লিখা আছে শাস্ত্রেতে ॥
শৃগাল কুকুর সঙ্গে রেখে, হরিশ্চন্দ্র শূন্যে থাকে,
তখন আকাশেতে শিবায় ডাকে, হুয়া হুয়া রবেতে ॥

এই গান করিয়া সেই আসরে আমি একটি 'স্বর্ণপদক' পুরস্কার পাইয়াছিলাম।"

( বঙ্গের কবির লড়াই, কবিয়াল ঃ কবিগান, সংগ্রহ )

## প্রহ্লাদ সরকার ( ঢাকা )

ঢাকার নরসিংদি গ্রামে প্রহ্লাদ নামে হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের এক প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি আচার্য মহাশয়ের কবি-জীবনের প্রথম পর্বের ছাত্রদের অন্যতম। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সুললিত রচনায় দেশের লোক বিমোহিত হতো। আচার্য কর্তার সঙ্গে অনেক স্থানেই তার টপ্পা ও ছড়া কাটাকাটি হতো এবং সকল স্থানেই তিনি যশ লাভ করতেন। একবার কবিগানের আসরে আচার্য মহাশয় একটি গান রচনা করে গাইয়েছিলেন ; তার ভাবার্থ এই ঃ

"শ্রীমতী রাধিকা মানের দায়ে শ্রীকৃষ্ণের যোগী সাজ দেখিয়া সখী বৃন্দার প্রতি কাতরে বলিতেছেন—দূতি ! যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গঙ্গার জন্ম সেই গঙ্গাকে মস্তকে দিয়া যোগী সাজাইয়া তুই বড়ই কুকর্ম করিয়াছিস্ ।"

প্রহ্লাদ সরকার এই পদের জবাব করেছিলেন—

বললে, জগৎবাসী জানে মর্ম, যে কৃষ্ণের পায় গঙ্গার জন্ম,
সে গঙ্গা দিলেম মাথায় ;
রাধে ইথে কিগো ধর্ম যায় ।
কৃষ্ণ ভক্ত লোক সকলে, কৃষ্ণ পূজা করবার কালে,
কৃষ্ণের পায়ের গঙ্গা মাথায় ঢেলে—
প্রাণ কৃষ্ণকে স্নান করায় ॥

একদিন আচার্য কর্তা প্রহ্লাদ সরকারসহ হাসিমপুর চৌধুরী বাড়ী থেকে গান শেষ করে নৌকাযোগে নরসিংদি ফিরছিলেন। রায়পুরা পাদ্রী সাহেবের স্টেটের নায়েব কবিবর বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ও বৈকুণ্ঠনগর কাছারী থেকে নৌকাযোগে নিজগ্রাম পারুলিয়া ফিরছিলেন। দৈবক্রমে নদীতে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন কবি বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী মহাশয় আচার্য কর্তার সঙ্গী ছাত্র প্রহ্লাদকে বললেন– প্রহ্লাদ, তুই নাকি বড় সরকার হইয়াছিস ? আমার একটি গানের জবাব কর দেখি।—এই বলে তিনি বললেন—

"মানে শ্রীকৃষ্ণ যোগী সাজে ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি বলিয়া মানকুঞ্জে দাঁড়াইয়াছে।
তখন শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন, হে যোগীশ্রেষ্ঠ ! তুমি মান ভিক্ষার জন্য আমার কাছে কেন এসেছ ? তুমি কি জান না যে নারীর মান পুরুষের হাতে থাকে ?"

প্রহ্লাদ সরকার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন—

বল্‌লে, মান থাকে পুরুষের হাতে,
এই কথা কও কোন্ বিধিতে,
ইহা কেহ বিশ্বাস করত না।
মান থাকলে পুরুষের হাতে, ত্রেতা যুগে দশরথে,
কভু কৈকেয়ী রানীর মান ভাঙ্গিতে,
নারীর হাত ধরত না ॥

প্রহ্লাদ সরকারের এই তাৎক্ষণিক জবাবে হৃষ্টচিত্ত কবিবর বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁকে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

এক সময় রায়পুরা কুঠীর নিকটবর্তী গুণসাগর গ্রামে প্রহ্লাদ ও অর্জুন সরকার

এক দলে থেকে "লব-কুশ" রূপে এবং হরিচরণ আচার্য মহাশয়কে "রাম" উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিল—

"মহারাজ ! অদ্য তুমি যুদ্ধ করিতে আসিয়া
আমাদের দু' ভাইকে দেখিয়া রোদন করিতেছ কেন ?"

হরিচরণ আচার্য তদুত্তরে বলেছিলেন—

"তোমরা দু'টি ছেলে—তোমাদের দেহের বরণ এবং গঠন আমার ন্যায় দেখিতে পাইয়া অনুভব হইল, তোমরা উভয়ে আমারই পুত্র। অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বাবা বলিয়া আমার কোলে আয়।"

প্রত্যুত্তরে প্রহ্লাদ সরকার বলেছিলেন—

"মহারাজ ! গতকল্য ভরত নামে এক রাজা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। সেও তোমার বরণ, তোমার গঠন। সে তোমার পুত্র নাকি ? তাই সত্য করে বল।"

আচার্য মহাশয় এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন নি। কাজেই প্রহ্লাদ সরকারেরই জয় হয়েছিল।

সরাইল পরগণার লাকপুরের নিকট দামচাইল গ্রাম। সেখানে আচার্য কর্তার প্রিয় ছাত্র প্রহ্লাদের সঙ্গে তাঁর গান হয়। প্রহ্লাদ যেহেতু তাঁর ছাত্র ; সুতরাং তিনি 'বিশ্বশ্রবা' হয়ে, প্রহ্লাদ সরকারকে "দশানন" উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন—

গাছ গাথরে সমুদ্র বন্ধন করে কে ?
লঙ্কাপুরীর দক্ষিণ দ্বারে—
কি জন্য নর-বানর কিল্লা করে রয়েছে ?
অশোক বনে অসুখ মনে কে এক নারী কাঁদতেছে ?

প্রহ্লাদ সরকার— রাম অনুজ লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাশা কর্ণ কেটেছে।
এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য
আমি রামের সীতা চুরি করে অশোক বনে রেখেছি।
রাম সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত
নল নীল প্রভৃতি বানরের সাহায্যে
সাগর বন্ধন করে লঙ্কায় এসে কিল্লা করে রয়েছে।

হরিচরণ আচার্য— রাম জগৎ পিতা, সীতা জগন্মাতা।
অতএব রামের সীতা রাম চরণে ফিরিয়ে দাও।

প্রহ্লাদ সরকার— পিতঃ ! আপনার কথার মূল্য কি ?
সীতা যদি জগৎ মাতা, তবে তো
সীতা রামেরও মাতা। রাম কি
জগতের বাহিরে ? রাম যদি
জগৎ পিতা, তবে তো রাম সীতারও পিতা ॥

হরিচরণ আচার্য রুক্ষ ভাষায় উত্তর দিলেন—

যেমন ছাগীর পেটে পাঠার জন্ম —
দুধ খেয়ে * * *।
আমার পুত্র রাবণ তুইও তদ্রূপপ্রায় ॥

প্রহ্লাদ সরকার— ছাগীর পেটে পাঠা হয়, ভেবে দেখুন মহাশয়,
বাবায় তো ফাঁকে থাকতে চায়।
ছাগীর পেটে পাঠা হয় কি ভদ্রের প্রেমের দায়,
যৎ বীর্য তৎ পরাক্রম শাস্ত্রে লিখা যায় ॥

প্রহ্লাদ সরকারের উপরিউক্ত জবাব শুনে শ্রোতৃবর্গ তাকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। এবং এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আচার্য কর্তাকে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হয়েছিল। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি উত্তর করলেন—

ছাগীর পেটে পাঠা হয় কি ভদ্রের প্রেমের দায়।
ওরে কি করিবে বীর্যেতে, খর্ব হয় গর্ভ দোষেতে,
হীরার ধার ভেড়ার শৃঙ্গেতে, যেমন নষ্ট হয়ে যায় ॥
বরে তিনটা পুত্র জন্ম দিলাম—
দু'টা চোর একটা সাধু হয়েছে ;
ব্রাহ্মণের বর অগ্নি-অবতার—
ওরে অগ্নির বাহন ছাগল তো তার সঙ্গেতে আছে।
গেল ছাগল চড়ে বৈশ্বানর,
তোর মায়ের পেটের ভিতর,
তিন পুত্রের কায়দা করেছে।
তোর মায় উপরে তুলে নীচের পুত্র—
উল্টাইয়া ডুলা ঝাড়া দিয়াছে ॥

প্রহ্লাদ সরকার অকালে কালকবলে পতিত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর কথা লিখতে বসে আচার্য কর্তা মন্তব্য করেছিলেন—"তাহার রচিত জবাব, টপ্পা, ছড়া ইত্যাদি সবিশেষ আমার স্মরণ হইতেছে না। তাহার কবিত্ব যথাযথ প্রচার করিতে অক্ষম। এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। দু'-একটি যাহা স্মরণ আছে তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।" প্রহ্লাদ সরকারের অকাল মৃত্যুতে আচার্য কর্তা কেমন ব্যথিত হয়েছিলেন তা তাঁর রচিত পদটিতে পরিস্ফুট—

বড় দুঃখের উপর দুঃখ দিলি দুঃখহরা ভবদারা—
ভবে আর কতদিন মরার মত থাকি।
ভবে আমায় ফেলে একা, প্রহ্লাদ ও দ্বারিকা,
অকালে মুদিল আঁখি ॥
এখন কবির দলের আদর গেল—
কার আদরে জীবন রাখি ॥ ( বঙ্গের কবির লড়াই )

## দ্বারিকা সরকার ( ময়মনসিংহ )

পূর্বোক্ত পদে যে দ্বারিকার কথা আছে, তিনি ময়মনসিংহ জেলার ভৈরবের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও আচার্য কর্তার কবি-জীবনের প্রথম দিক্‌কার ছাত্র। ইনিও অতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবু স্বল্প কবি-জীবনে নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এর রচিত কোন গান বা পদই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র আচার্য কর্তার আরো একটি গানের পদে এঁর অকাল মৃত্যুর উল্লেখ দেখা যায়—

কয়টি কবির দলের ছাত্র পেলেম—
অকালে সব কালে কৈল গ্রাস
গেল প্রহ্লাদ আর দ্বারিকা, বলাই দাস অম্বিকা,
আর গেল বৈষ্ণবচরণ দাস ॥

## চন্দ্রকান্ত দাস ( বরিশাল )

বরিশাল জেলার উত্তর সাহাবাজপুরে সৈদখালি গ্রামে আনুমানিক ১৩০৮ সালে চন্দ্রকান্ত দাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঝালকাটির প্রসিদ্ধ কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্তের শিষ্য ছিলেন। "চন্দ্রকান্ত দাস একজন দুর্জয়ী কবির দলের সরকার ছিলেন। অতি তরুণ বয়সেই তিনি বিগত ১৩৩৫ সনে মারা যান। তখন তাহাব বয়স মাত্র ২৬।২৭ বৎসর হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সেই তিনি এইরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন যে অতি বিখ্যাত কবিওয়ালাগণও তাহার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে ভয় পাইত। এমন কি স্বয়ং হরিচরণ আচার্যকে পর্যন্ত তাহার সহিত বাকযুদ্ধে একবার ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।" চন্দ্রকান্ত দাসের পরলোকগমনে হরিচরণ আচার্য আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

"হল কবির দলের প্রবীব পতন—
নূতন সরকার চন্দ্রকান্ত দাস।"

একদা ত্রিপুরা জেলার তিতারকান্দি গ্রামে তারিণীচরণ সরকার চন্দ্রকান্ত দাসের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত টপ্পা চাপান দেন—

আমি কমলাক্ষ চক্রবর্তী নিবাস শান্তিপুর।
গঙ্গায় তুলসী দিতেম পুলকে, জানে বালিকা বালকে,
যাতে জন্ম লয় এই ভূলোকে—গোলোকের ঠাকুর ॥
শুনি তিন দিন হল জন্ম নিল—
আমার সেই অসাধ্য সাধনের ধন।
নবদ্বীপে চলেছি দেখিতে শ্রীশচীনন্দন ॥

ঘটল অদ্ভুত কান্ড এই রাস্তায়,
কে তোমায় এই অবস্থায়, নিম গাছে করেছে বন্ধন ;
আবার শচী মাকে দীক্ষা দিতে—
কে তুমি বল আমায় কি কারণ ?

চন্দ্রকান্ত— কবির কল্পনায় সাজালে আমায় শ্রীশচীনন্দন।
তুমি কমলাক্ষ চক্রবর্তী, হৃদয়ে প্রেমভক্তির আর্তি,
দেখলে কি অদ্ভুত কীর্তি, নিমবৃক্ষে বন্ধন ॥
আমার অদীক্ষিতা শচীমাতা—
তাই আমি তার স্তন্য নেই না মুখে,
ধরেছে টাকুরা ব্যারাম—
ওঝা আর বৈদ্যে কয় ডেকে।
করতে সেই ব্যাধির প্রতিবিধান,
ওঝা বৈদ্যে দেয় বিধান,
নিম গাছে বাঁধতে আমাকে।
তুমি দীক্ষা দিলে শচীমাতায়—
আমি সুখে স্তন্য লই মুখে ॥

জবাবে তারিণী সরকার পুনরায় গাইয়েছিলেন—

বললে, অদীক্ষিতা শচীমাতা তাতে খাও না দুধ।
আছে অদীক্ষিতা শচীমায়, দুধ বুঝি খাও না সে কথায়,
ঠাকুর অবোধ বলে আজ আমায়—
বেশ দিলে প্রবোধ ॥
থেকে অদীক্ষিতা মায়ের গর্ভে, খেয়েছ তার নাড়ীর রস একমাত্র ;
এখন বল দীক্ষা বই শচী মা হয় না পবিত্র।
করলে দই খেয়ে ভান্ডের বিচার,
এখন হবে কি সুসার, সারাৎসার শুন মূল সূত্র।
ভবে দীক্ষা শিক্ষার দরকার কি তার—
সংসারে দীক্ষার কর্তা যার পুত্র ॥ (বঙ্গের কবির লড়াই সংগ্রহ,)

## ভগবতী ভূঁইয়া ( নোয়াখালী )

গানের আসরে নেমে 'সরকারী' না করেও শধু কবিগান রচনা করে যে কয়জন ব্যক্তি স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন, নোয়াখালী জেলার রামদি গ্রামের ভগবতী ভূঁইয়া তন্মধ্যে

অন্যতম। চলতি ভাব ও রূপক অলঙ্কার প্রয়োগে ডাক, মালসী ও সখীসংবাদ গান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিশ্বস্রষ্টার নিয়মের রাজত্বে ব্যতিক্রম সম্পর্কীয় এক মালসী গানে ভগবতী ভূঁইয়া লিখেছেন—

মা গো ফুল নাই যাহার পাতার বাহার
　　কাঁটার গাছে দিলে গোলাপ ফুল।
কারো চুল আলফেট কাটা, কারো বাবড়ি ছাঁটা,
　　কারো নেড়া মাথায় দাও নাই চুল॥
কৃপণকে করলে জমিদার, অতিথি এলে খবরদার,
　　পাঁচটি মাছ কিনে এক পয়সার, বেশী হলে মূল।
কারো রাজত্বপদ অতুল সম্পদ—
　　রোগ দিয়েছ পিত্তশূলে॥

তাঁর সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য মহাশয় বলেন—

"নোয়াখালীবাসী ভগবতীবাবু একজন ভাবুক, প্রেমিক ও রসিক কবি। তিনি শিক্ষিত, উৎকৃষ্ট কবিগান রচনায় তিনি সুদক্ষ। ভগবতীবাবুর একটি 'ফুলের গান' দেশ দেশান্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

অন্যান্য কবির দল ভগবতী ভূঁইয়ার রচিত গান গাইত। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি বাজারে একবার হরিচরণ আচার্য ও হরকুমার শীলের দলের মধ্যে গান হয়। ভগবতীবাবুর রচিত 'কুম্ভ ও কঙ্কণের কবি' গানটি হরকুমার শীলের দল থেকে গাওয়া হয়। ঐ গানের ফুকারে আছে—( ভাবাবলম্বনে রচিত )—

একদিন স্বর্ণকুম্ভে ভরে বারি,
জল নিয়ে যায় রাই কিশোরী,
　　করের কঙ্কন কলসীর ঘায় ;
　　তাতে কন্ কন্ শব্দ শোনা যায়।
কলসী বলে কঙ্কনেরে—
বল রে কঙ্কন বল আমারে,
মধুর কৃষ্ণ কথা দিয়ে ছেড়ে—
　　কন্ কন্ করিস কোন কথায় ?

হরিচরণ আচার্য প্রদত্ত জবাবের ভাবার্থকে নকুলেশ্বর সরকার ছন্দাকার দেন—

(ক) তখন কঙ্কন বলে ওরে কুম্ভ,
না বুঝে করিস না দম্ভ,
কৃষ্ণকথা মধুময় ;—
　　কিন্তু এখন বলার সময় নয়।

জল নিয়ে যায় রাধারানী,
কান পেতে রয় ননদিনী,
যদি আমি করি কৃষ্ণ ধ্বনি—
গুপ্ত পীরিত ব্যক্ত হয় ॥

(খ) আমি কৃষ্ণনাম বলিলে পরে,
শ্রীরাধার কলঙ্ক বাড়ে,
কুটিলা কৃষ্ণের অরি,
তাইতে সঙ্কেতে সে নাম স্মরি।
কৃষ্ণ নামের 'ক' অক্ষরে
নমস্কারের 'ন' যোগ করে
আমি 'কন্ কন্' করে শ্রীকৃষ্ণেরে
কৌশলে প্রণাম করি ॥

ভগবতী ভূঁইয়ার আরো একটি গানের কলি থেকে তাঁর গানের মাধুর্যের পরিচয় মিলবে—

গোলাপ ফুলের গাছে কাঁটা বলে—
তায় কি ভ্রমর নাহি যায়।
প্রেমের খোঁটা হবে বলে কি—
তায় প্রেমিকে ডরায় ॥
স্নান করবে না কুম্ভীরের ভয় জলে,
আগুনের ভয় রাঁধতে গেলে,
চন্দ্রের দাগ কলঙ্ক বলে,—
সে কি উদয় হতে লজ্জা পায় ॥

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার ভগবতী ভূঁইয়ার এমন সুললিত ভাবসমৃদ্ধ গানগুলির তেমন কিছুই সংগ্রহ করা যায় নি।

( সংগ্রহ )

## মদন শীল ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার রাজখাড়া গ্রামের মদন সরকারও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। গানের জবাবের চেয়েও টপ্পা বিশেষতঃ পাঁচালীতে তাঁর খুব সুনাম ছিল। একবার বালাপুর বাবুদের বাড়ীতে মদন শীল ও হরিচরণ আচার্যের গান হচ্ছিল। সপ্তমী হতে দশমীর গান পর্যন্ত মদন শীল হরিচরণ আচার্যের বিরুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে

পারেন নি। একাদশীর গানকে বিদায়ী গান বলে। পাইকারচর, মাধবদি, সাতগাঁ প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিজ নিজ বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সুস্থির চিত্তে এই বিদায়ী গান শুনতে আসেন। অনেকেই এসেই মদন শীলকে উত্তেজিত করতে থাকে—"তুমি গত কয়েকদিনের গানে হরি আচার্যকে কিছুই করতে পারলে না; আজ কঠিন প্রশ্ন করতে হবে।" মদন শীল তখন হরিচরণ আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে টপ্পায় প্রশ্ন করলেন; বিষয়বস্তু—কৃষ্ণ-পুত্র শাম্বের রূপলাবণ্য দর্শনে মাতা জাম্বুবতী ব্যতীত কৃষ্ণমহিষীগণের কামোদ্রেক ও শাম্বকে 'কুষ্ঠ হোক' বলে সত্যভামার অভিশাপ দান কাহিনী—

জাম্বুবানের নন্দিনী, সে হয় তোমার গৃহিনী,
শাম্ব হয় তাহারি নন্দন।
হরি! তোমার অংশে জন্ম নিয়ে—
হইল তার মহাব্যাধি কি কারণ?

হরিচরণ আচার্য কৃষ্ণের ভাবে উত্তর করলেন—

"আমি কৃষ্ণ এক লীলায় বহু কার্য সাধন করিয়া থাকি। আমার মহিষীগণ আমাকে পতিরূপে পাইয়া সতীত্বের অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলেন না, শাম্বও রূপবান বলিয়া সর্বত্রই রূপের গর্ব করিতেছে। মহিষীগণ ও শাম্বের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য আমিই নারদকে পাঠক রূপে নিয়োজিত করিয়াছি। সকলেরই এইরূপে দর্পচূর্ণ করিলাম।"

ফরিদপুর গোহালার নারায়ণ বালা সরকারের সঙ্গে একবার গানে এঁটে উঠতে না পেরে মদন সরকার কেমন কৌশলে জবাব এড়িয়ে গেলেন তা নিচের পদটি থেকেই বোঝা যাবে—

শুনবে বলে শুধাইলে, তাইতে এখন পরাণ খুলে,
তোমার কাছে বলে যাই।
ভাইরে মিথ্যা কিছু বল নাই॥
যে ভাবেতে যে ভাব ছিল,
গানের মধ্যে যে ভাব রইল,
সকলি ত বলা হ'ল—কিছু বাকী রাখি নাই।

মদন শীলের কোন কোন ধুয়া অনেক দিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছে—

ক) আমি চিরদিন তোর স্বভাব জানি মিট্‌মিটে শয়তান।

খ) ভাবতে পারিনা পরের ভাবনা রে—
পোড়া মন কেনে বুঝে না॥

গ) অবোধ মন আমার,
নিতাইর বাজারে হরি বল।
বলরে মন হরি হরি, ও তুই তরবি যদি ভববারি
ও তোর শ্রীগুরু হলে কান্ডারী
তবে পাবি পারের ফল ॥
( শ্রীশ্রীমা ও বসন্ত লীলামৃত, সংগ্রহ )

## কুমুদরঞ্জন সরকার ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার কুসুমুতি ( কাতিকপুর ) নিবাসী কুমুদরঞ্জন সরকারও কবিগানে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি মদন শীলের শিষ্য। খুলনা বাগেরহাট থানার অধীন পার-মধুদিয়া গ্রামে প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের বাড়িতে বরিশাল ঝালকাটির প্রথিতযশা কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বনাম কুমুদরঞ্জন সরকারের মধ্যে ১৩৩৮ কি '৩৯ বঙ্গাব্দে এক কবিগান অনুষ্ঠিত হয়। কুমুদ সরকার নকুলেশ্বর সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত টপ্পা করেন—

গোপী গোয়ালিনী নামটি ধরি, কবির কল্পনায়।
প্রভু তুমি হও জগন্নাথ, চরণে করি প্রণিপাত,
( হায় হায় ) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, হয়েছে মাথায় ॥
আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল—
বনেতে করতে গেল ফুল চয়ণ ;
কৃষ্ণপুজা করিতে মনেতে ছিল আকিঞ্চন।
আমার যৌবনে মৈল পতি, পুত্র ছিল সঙ্গীতি,
তাই নিয়ে করি কাল যাপন।
বল, কোন্ পাপে না কার চক্রেতে—
সেই পুত্রের সর্পাঘাতে হয় মরণ ?

এই টপ্পার জবাবে নকুলেশ্বর সরকার গাওয়ালেন—

হলে পুত্রশোকে গোয়ালিনী দুঃখিত অন্তর।
তুমি হয়েছিলে সংসারী, ভজবে বলে কংসারি,
সংসারের সে সঙ সারি, পাও না অবসর ॥
তুমি স্বামী পেয়ে পুত্র পেয়ে, হয়েছ আমার কথা বিস্মরণ ;
মুক্ত করে দিলাম আজ—তোমার সেই মায়ার আবরণ।
তোমার মরেছে স্নেহের পুত্র, চিত্ত রেখে পবিত্র,
দিনরাত্র কর সংকীর্তন।
তুমি মুক্ত না বিষয় আসক্ত—
দেখে লই নামেতে আসক্তি কেমন ॥ ( সংগ্রহ )

# কাশীনাথ নট্ট ( নোয়াখালী )

নোয়াখালী জেলার মধ্যযুগের সরকারদের মধ্যে অন্যতম কবি কাশীনাথ নট্টের জন্ম মহিষদিয়া গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের দলে থেকে দল পরিচালনা ও আচার্য কর্তার পক্ষে বিভিন্ন সরকারের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।

এই সম্পর্কে আচার্য কর্তা বলেন—"প্রায় ১০ বৎসর কাশীনাথ নট্ট আমার কবির দলে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। সে সময় সময় ভোর ও বসন্ত গান রচনা করিয়া দেয়। আমার পক্ষে সে গানের জবাব টপ্পা করিয়া থাকে। এমনকি সে উপস্থিত থাকিলে গানের আসরের জন্য আমি নিশ্চিন্ত থাকি। তাহার রচিত গানের জবাব ও টপ্পা গভীর ভাব ও রসে পূর্ণ।" সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও কাশীনাথ সরকার কিছু কিছু গান রচনা করেছেন।

একবার ঢাকা-নরাসংদী বাজারে এক কবিগানের আসরে আচার্য কর্তা ও বরিশালের কুঞ্জ দত্ত মশাই কাব্য-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। তখন আচার্য কর্তার সহকারী কাশীনাথ নট্ট এক রঙ ফুকার করেন—

ওদের দলে আছে দুইটা ছুঁড়ী,
ছুঁড়ী নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি,
ওদের মধ্যে ক্ষুর ধার ;
থাকবেন একটু হুঁশিযার।

কুঞ্জ দত্ত মশাই'র শিষ্য নকুলেশ্বর সরকার উক্ত রং ফুকারের জবাব দিলেন—

বললে, আমার দলে দুইটা ছুঁড়ী
ছুঁড়ী নয় তো তীক্ষ্ণ ছুরি,—
তোমার ভাগ্যে ঘটবেনা ;
খেলে দুধের তৃষ্ণা মিটবেনা।
তোমার দলে দুইটা বুড়ী,
বয়স হয়েছে দু'তিন কুড়ি,
এসব পাকা শ্রোতার পাকা দাড়ি—
ভোঁতা ক্ষুরে কাটবে না॥

কাশী নট্টের গাওয়া পাঁচালীর ছন্দ ও রচনার পারিপাট্য খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল বলে সমকালীন শ্রোতাদের মুখ থেকে জানা যায়।

কোন আসরে গানের সময় কাশীনাথ নট্ট ব্যঙ্গচ্ছলে বিপক্ষ কবিয়াল তারিণীচরণ নট্টকে "কাছা খোলা বাঁড়গা ( লেজহীন ) বলদ" বলে উপহাস করলে তারিণী সরকারের দোহার মাধব নন্দী জবাব দিলেন—

মাধব নন্দী—বললে কাছা খোলা বাঁড়গা বলদ,
এ কথাতে ঘটল বিপদ,
এমন কথা কোথা পাস্।

কৃষকে চাষ করতে হলে,
লেজ ধরতে হয়-কল কৌশলে,
এখন তুই কৃষকের ইচ্ছা হলে,
বাঁড়গা লেজে হাত দিয়ে চাষ ॥

কাশীনাথ সরকার তারিণী নট্টকে-বড় বলদ এবং দোহার মাধব নন্দীকে ছোট বলদ আখ্যা দিয়ে বললেন—

*অনুভবে বুঝলেম এটা বড় বলদের ছোট ভাই ॥*

আবার জবাবে মাধব নন্দী বললেন—

বললে, বড বলদের ছোট ভাই আমি,
খেয়ে এক মুখে শেষ করলে তুমি,
কথায় কথা বাড়ল অপ্রতুল।
দেশ বিদেশে লোকে বলে,
এই ছিল কাশীর কপালে,
থেকে থেকে মাগীর দলে,
উঠে গেছে তাউল্যার ( তালুর ) চুল ॥

বয়সের ভারে এবং আত্মিক সাধনার তাগিদে আচার্য কর্তা কবিগান গাওয়া ছেড়ে দিয়ে দল ভেঙ্গে দিলে, কাশীনাথ ঢাকা থেকে নোয়াখালীতে ফিরে এসে গান গাইতে লাগলেন। তখন কোন এক আসরে বিপক্ষ কবিয়াল তাকে ঠেস দিয়ে ফুকাব করলেন—

কর্তা, কাশীকে করেছেন বায়না,
গান শুনতে মনের বাসনা
শুনে দুঃখে মরে যাই।
হতো যদি সোনার কাশী,
মূল্য তার হতো বেশী,
ও যে ঢাকা-ফেরৎ ভাঙ্গা কাঁসী
বাড়ি দিলে বাজে না।

কাশীনাথ নট্ট রচিত মানযোগী, মান, নৌকাবিলাস প্রভৃতি গান প্রসিদ্ধ।

( বঙ্গের কবির লড়াই, সংগৃহীত )

## হরিচরণ নাথ ( বরিশাল )

১২৯৪ সালে বরিশাল জেলায় বরিশাল নদীর পূর্ব পাড়ে হিজলতলা গ্রামে হরিচরণ নাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নদীয়ারাম নাথ। পাঁচ

বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হলেও লেখাপড়ার দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই যে কোন স্থানে যে কোন গান হোক হরিচরণ সেখানেই হাজির হতেন। রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, জারিগান, গাজীর গান, ভূঁইয়াসারি ইত্যাদি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কোন গানই বাদ দিতেন না। তবে বিশেষ করে ভূঁইয়াসারি গানে—অর্থাৎ জমিদার, জোতদার ও বড় চাষীদের জমিতে বর্ষাকালে ক্ষেত মজুররা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যে গান করত তাতে ছিল তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। ঐ দুই দলে দুই জন 'সরকার' থাকত এবং তারা যে গান রচনা করে দিত অন্যরা দলবদ্ধ ভাবে তা সুর দিয়ে গাইত। গানের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর ও নানাবিধ ঠ্যাসঠিসারা থাকত। গান শেষ হলে সরকারগণ যে টপ্পা পাঁচালী বলত তার অধিকাংশই আদিরসাত্মক অশ্রাব্য গালাগালি!

হরিচরণ এক ভূঁইয়াসারি সরকারের অনুগত হয়ে তার কাছে নানাবিধ রঙ পাঁচালী শিক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কোন বিষয় একবার শুনলেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন ভূঁইয়াসারি সরকার বলে পরিচিত হলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঝালকাটির বিশিষ্ট কবিয়াল শরৎ বৈরাগীর দলে বছর খানেক তালিম নিলেন।

হরিচরণের এক আত্মীয় কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ (কেষ্ট ধরতা) ঝালকাটির প্রসিদ্ধ কবিয়াল কুঞ্জবিহারী দত্তের কবির দলে ধরতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি হরিচরণের মুখে ভূঁইয়াসারির টপ্পা পাঁচালী শুনে তাকে নিয়ে এলেন কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের কাছে। কেষ্ট ধরতা কুঞ্জবাবুকে বললেন—কর্তা, এই ছেলেটি আমার আত্মীয়। লেখাপড়ায় ওর মন নাই। ও গান পাগলা হয়ে গিয়েছে। মাঠে মাঠে ভূঁইয়াসারির দলে পাঁচালী বলে বেড়ায়। আপনি ওকে আশ্রয় দিলে ও মানুষ হতে পারবে।

কুঞ্জ দত্ত মহাশয় হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি পাঁচালী বলতে পার? হরিচরণ—হ্যাঁ, খুব পারি। বলেই অনর্গল ভূঁইয়াসারির পদ বলতে লাগলেন। অল্প বয়সী হরিচরণের উৎসাহ ও নির্ভীকতা দর্শনে প্রীত হয়ে কুঞ্জবাবু তাঁকে দলে নিলেন। একাদিক্রমে ছয় বৎসর তাঁর কাছে কবিগানের গান, জবাব, পাঁচালী শিক্ষা করে হরিচরণ খোদ সরকার হন।

'কবি' শিক্ষা ছাড়াও তিনি অনেক ওস্তাদের নিকট ওঝালী বৈদ্যালী শিক্ষা করে একজন বড় ওঝা বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

'কবি' শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ঝালকাটির বড় মনমোহিনীর কবির দলে খোদ সরকার হয়ে যোগ দেন এবং একাদিক্রমে সাত আট বৎসর সগৌরবে তার দল পরিচালনা করেন। তারপর কুঞ্জ দত্তের দলের হারমণিবাদক যামিনীকান্ত নন্দী কবির দল গঠন করলে হরিচরণ সে দলেও এগার বৎসর 'সরকারী' করেন এবং কালক্রমে একজন নামজাদা যশস্বী 'সরকার' বলে পরিচিত হন।

রঙ পাঁচালী রঙ ফুকারে কোন সরকার হরিচরণ নাথের কাছে এগোতে পারতেন া। তাঁর রঙ ফুকারের একটি নমুনা দেওয়া গেল। একবার ঝালকাটির উমেশ-ামিনীর দলের সঙ্গে বড় মনমোহিনীর বায়না হয়। মনমোহিনীর দলের সরকার ছলেন হরিচরণ। গানের আসরে গিয়ে বিপক্ষ দলকর্ত্রী কালা যামিনী, ঢুলী অশ্বিনী াট্ট এবং কবিয়াল উমেশ শীলকে জড়িয়ে হঠাৎ তিনি এক রঙ ফুকার করে বসলেন—

বাবু, ঐ দলের কালা যামিনী,
ঠিক যেন রূপের জামদানী,
বয়সে হয়েছে বুড়া ;
তবু হাউস কমে নাই রস পুরা।
ঢুলী থাকে পায়রার টোঙ্গে,
অশ্বিনী রয় খাট পালঙ্কে,
যত কেতরা লাংগে বেড়া ভাঙ্গে—
উমেশ বাজায় ডুম্বুরা ॥

শিক্ষানবিশীর পর থেকে হরিচরণ প্রায় ৬০ বৎসর কবিগান করেছেন। তাঁর নজের কোন দল ছিল না। যখন যে দল তাঁকে বায়না করতো তিনি সেই দলের হয়েই "সরকারী" করতেন। পূর্ববঙ্গে ব্যবসায়ী দল ছাড়াও গ্রামে গ্রামে সখের দল ছিল। তারা 'সরকার' ও ঢুলীকে টাকা দিয়ে এনে গান দিত, নিজেরা টাকা নিত না। ফলে অল্প খরচে গানের অনুষ্ঠান সম্ভব হতো। হরিচরণ ঐ রকম বহু সখের দলে মোটা টাকা নিয়েও গান করতেন। কথায় বলে—

নাইয়ার এক নাও,
নি-নাইয়ার শতেক নাও।

হরিচরণের অবস্থাও তাই। যখন যে দলে ডাক দিত, তিনি সে দলের কর্ণধার হয়ে হাল ধরতেন। তাঁর রচনা শক্তিও ছিল অসাধারণ। কম বেশী সকল প্রকার গানই তিনি রচনা করেছেন। তবে তাঁর রচনায় হাস্য পরিহাস ও রহস্যের আধিক্য দেখা যায়। তাঁর রচিত অনেক গানের মধ্যে কুব্জার মাথুর, চিনার মাথুর, সূর্পনখার কবি, শিখণ্ডীর বিয়ের কবি, খোকার কবি, পাঁঠার কবি, বৃক্ষের কবি ইত্যাদি গান বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যে রঙ পাঁচালীর জন্য হরিচরণ সরকারের এত সুনাম তার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

বাছা আয় রে আয়—
তোর মায় তোরে থুইয়া কলই ভাজা খায়। (ধুয়া)
আরে চাঁদের আলো ঢাকতে এল জুনীর মার্গের বাতি,
বাপ দাদার নাম জানে না, টেম গোলামের নাতি।

আম গাছে সুপারি ফলে, নারকেল গাছে তাল,
দৈয়াল পাখীর নাচন দেখে, ব্যাঙে মারে ফাল।
চিৎ হইয়া বাইল্যা পাখী আকাশ ঠেইল্যা ধরে,
মনে ভাবে ফিক্কা দিলাম, ভেঙ্গে যদি পড়ে।
বড়'র বড় বুদ্ধি শুইয়া ঘাস খায়,
মার্গের গুমানে ছাগল লড়বড়ি বায়।
জরুয়া রুগীর পথ্য দেয় বরৈর পাচন,
পানিকৌড়ির পেখম দেখে বুলবুলির নাচন।
আমড়া গাছে দামড়া হয়, গরু ওঠে গাছে,
প্রসবের বেদনাতে যেন তালই মারা গেছে।
কফের দোষে চিনি ডাব, মাথা ব্যথায় পাড়া,
নাভির নীচে শিরা ধরে মূর্খ বৈদ্য যারা।
জন্মাবধি ছাল নাই কুত্তার বাঘা থুইল নাম,
বাপের বয়সে ঘোড়া নাই, পুঁটকিতে লাগাম।
দেশ গুণে বেশ হয় সময় গুণে ফলে,
মোহনগঞ্জে তরমুজ দেখি চৌদ্দ জনে ঠেলে।
রাম গেল বনবাসে কাঁথা দিয়া গায়,
সেই শোকে কাইন্দা মরে জবানুল্লার মায়।
না বুঝিয়া না জানিয়া আমার ধরে দোষ,
বিনা দোষে পিঁপড়া এসে কামড়ায়···॥

এই হাল্কা সুরেই কবি গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে ছড়া রচনা করেছেন। হাস্যরসের আবরণে করুণ রসের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে সে সব রচনায়—

কাল কোকিলা তুই ডাকিস না তমালের ডালে॥ (ধুয়া)
বৃটিশেরে তাড়াইয়া ভাবিলাম সবাই
বহু দিনের কষ্টের ফলে স্বাধীনতা পাই।
তাতে হল পার্টিশন হিন্দু মুসলমান,
দুই রাজ্য হিন্দুস্থান আর হল পাকিস্থান।
আগে আমরা নিরাপদে পাকিস্থানে রই,
বিধাতা লিখেছে দুঃখ কার কাছে আর কই।
এক জনে মানুষ কিলাল হলুদপুরের মাঠে,
সেই কিলের শোধ দিতে লাগল পৌট্টাখালীর হাটে।
হিন্দুগণের ঘরে নাই বিড়াল মারবার লাঠি,
শহরে বন্দরে গ্রামে লাগল কাটাকাটি।

জানের ভয় মানের ভয় ছাড়লাম বসত বাটি,
আসবার সময় পথে কেড়ে রাখল ঘটি-বাটি।
ফিরে কথা বললে মারে দুই গালে থাপড়,
আনসারেরা কেড়ে রাখে প্রস্রাবের ডাবর।
স্ত্রীপুত্রকে ডেকে বলি বৃথা কেন ভাব,
হিন্দুস্থানে গেলে আমরা স্বাধীন হয়ে রব।
প্রাণ বাঁচাতে মান বাঁচাতে হিন্দুস্থানে আসি,
মাসের মধ্যে দশ বার দিন করি একাদশী।
সর্বস্ব হারায়ে যখন হইলাম নিপুঁজি,
আসা মাত্র লিষ্টির মধ্যে নাম রাখল রিফুজি।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, জল প্লাবন, অভাব অনটন, বাস্তুহারা সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও কবি হরিচরণ গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৩৫০ এর মন্বন্তরের গান থেকেও কয় পংক্তি উদ্ধৃত হলো—

ত্রিশ টাকা কাপড়ের জোড়া, লবণের দর লবণ পোড়া,
তৈল হরিদ্রা এক সাথের সাথী ;
থাকি কেরোসিন বিনে অন্ধকারে, কম দামে মিলে না মোমবাতি।
দৈনিক যার রোজগার আট আনা, খরচ লাগে দেড়াদুনা,
জাত দিলেও ভাত মিলেনা, এমন দুর্দিন ছিল কবে॥
কারো মহাজনের দেনার ডিক্রি, বিক্রি করে বাস্তুঘরের চাল,
একে দুর্ভিক্ষ বিশাল, চিন্তা যেন শিবের মহাকাল।
ক্ষুধায় অন্ন পায়না মুখে, পুত্র মরে মায়ের বুকে,
পিতায় বলে মনের দুঃখে, তিন জনের এক চিতার আগুন জ্বাল॥
পূর্ব বঙ্গে, তৈল লবণের সঙ্গে, বাজারেতে লাগল আগুন।
দেখে বাজার চড়া গরীব যারা, সংসার ছেড়ে সাজল বাউল॥
যখন লবণের সের তের আনা, দিনান্তে মিলে না খানা,
কত খেলেম লঙ্গর খানা, ঘাসের দানা বাজরার চাউল॥

১৯৫০ সালে বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে কবি পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; এবং এদেশেও কিছু কিছু কবিগান গেয়েছেন। ১৩৮৫ সালের ১লা মাঘ ৯১ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলার চাকদহে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার লিখেছেন—

হরিনাথের রঙ পাঁচালী, কথায় কথায় হাতে তালি,
কবির রাজ্য করে খালি, গেলেন লোকান্তরে।
যে হরিনাথ সভায় এসে, লোক মজাত হাস্যরসে,
তেমন কবি বাংলাদেশে, আর আসবে না ফিরে।

## নদীয়ারচাঁদ সরকার ( খুলনা )

১২৫৬ সালে খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অধীন বৈঝাকি গ্রামে নদীয়ার চাঁদ সরকারের জন্ম। সামান্য লেখাপড়ায় শিক্ষিত নদীয়ার চাঁদ স্বাভাবিক কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কবি, জারি, রামায়ণ গান ইত্যাদিতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর সময়ে অবশ্য কবিগানে অশ্লীলতার আধিক্য ছিল এবং তাঁর ভাষাও গ্রাম্যতা এবং আঞ্চলিকতা দোষ দুষ্ট ছিল। কিন্তু গানে তিনি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। "স্বদেশী হিতোপদেশ" নামক একখানা পুস্তিকায় ১৩২৭ সালের বাংলাদেশের এক নিখুঁত ছবি কবি অঙ্কন করেছেন—

বাকদেবির চরণেতে করিহে প্রণতি,
১৩২৭ সালের শুনহে ভারতী।
প্রথম ভেজাল স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে,
দ্বিতীয় ভেজাল লেখাপড়া স্কুল বন্ধ নিয়ে ;
তৃতীয়তে ভেজাল হল কাপড়ের দরে,
চতুর্থ ভেজাল লোকে চাউলের দরে মরে ;
এই দেশের রাজধানী ইংরাজেরা নিল,
হিন্দু আর মুসলমান বর্তমান ছিল ;
দুই জাতি কোট করল একত্র থেকে,
গোপনে গিয়ে হিন্দুরা ইংরাজী বিদ্যা শেখে ;
গবর্নমেন্ট সরকারেতে চাকরী যখন করে,
মুসলমানেরা টের পাইল ৪০ সন পরে ;

*　　　*　　　*

সুরেন বাড়ুয্যে মোদের পশ্চিমবঙ্গে স্থিতি,
গুণের সাগর বিদ্যার ডগর বুদ্ধে বৃহস্পতি ;
সুরেন বাবু গিয়াছিল লাট সাহেব হ'তি,
লাটগিরি না পাওয়াতে বাদ্‌লো গুতাগুতি ;
বিশ্বকর্মার শিষ্য হল ক্ষুদিরাম বোস
বোমা ক'রে বাড়াইয়াছে বাঙ্গালীর সাহস
গুজরাটি দেশে হল গান্ধিমোহন রাজ
কোন্ আইন জারী ক'রে, করে কোন্ কাজ।
যাহা করুক তাহা করুক মনের কল্পনা ;
প্রজার সুখ না হলে সে আইনে চলব না।

*　　　*　　　*

বালকেরা কামাই করলে চায় জরিমানা,
মাষ্টারেরা কামাই করে সে কথা ধরে না।
পণ্ডিতেরা বলে তবে ইনেস্পেক্টর বাবা,
এক বিদায় তিনটা বৈ নি পাঠ্য করে দিবা।
ইন্‌স্পেক্টর বলে যদি লাভ কিছু পাই,
ছাতা বালাই যাহা লেখ্‌বা সই করব তাই।

নদীয়ার চাঁদ সামাজিক সমস্যাদি নিয়ে এরকম আরো পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রিত করেছেন। তন্মধ্যে স্বদেশী সাত ভেজাল, স্বদেশী হিতোপদেশ, স্বদেশী হিতজ্ঞান, সদুপদেশ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর হস্ত লিখিত কিছু জারিগানের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

ওগো বিধি, বেটার শোকেরে আমার প্রাণ কাঁদে
ও দারুণ বিধি গো—
আহা নিদারুণ বিধি আমি কি বলিব কারে—
যা করে সময় করে কপালের ফেরে
আহারে দারুণ বিধি তোর এমনি-কল্পনা
দিয়ে বেটা কেড়ে নিলি—নাই বিবেচনা
মাছে চেনে গহিন গম্ভীর, পক্ষে চেনে ডাল
মায়ে জানে বেটার দরদ, যার বুকের শেল।
মুন্সিনদের চাঁদে বলে শোকের এমন জ্বালা
হিন্দু সভে হরি বলো, শেখে বলো আল্লা ॥

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমান গরীব, চাষী মজুরের দিন যাপন প্রাণ ধারণের গ্লানি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েও কবি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন, যেমন—( কবির নিজস্ব বানান অনুসৃত হলো )—

গান্ধি বেটার ফান্দ শুনে যুনিকে যালায় মার্গে বাতি।
ফড়িং নাচে তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে যায় আগুন খাতি।
উইপকা কয় সরাজ পাবো। উচকোরে ভিটে বাঁদবো
ইন্দ্রের সভায় যাবো যুদ্দ কোর্ত্তি।
আকাশের চাঁদ কেটে আনবো, ছেলের গলায় মেঠেল দিতি ॥
মসা বলে চাসার রক্ত, রোদি পোড়া বড়ো তিক্ত
গরু ঘোড়ার লেজ সক্ত পাইনে খাতি।
এবার গান্ধি যদি সরাজ পায় তো,
আমরা খাবো রাজার হাতি ॥

দেখো সরাজ চাচ্ছে যারা হা রে সরাজ নিবে যারা।
বড়োলোকে সরাজ পালি ছোটোলোকের দফা সারা ॥
বড়োলোক বড়ো আসা, ছোটোলোকের বুন্দিনাসা
বুজবে কি রতি মাসা জ্ঞান নাহি এক কড়া ;
ইংরাজ রাজার সাহাজ্জেতে শুখে আছি মরা।
এ রাজার বিরুদ্দে চলে নিতান্ত যার কপাল পোড়া ॥

নদীয়ার চাঁদ সরকার দুর্গাপুর ( ফরিদপুর ) গ্রামের কবি আনন্দ সরকারের কন্যা এবং হরিবর সরকারের ছোট বোন মন্দাকিনীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর মধ্যমপুত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগানে অতুল কীর্তি রেখে গেছেন। ১৩৪১ সালে কবি পরলোক গমন করেন। ( কবির দৌহিত্র শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার থেকে সংগৃহীত )

## রাজেন্দ্রনাথ সরকার ( খুলনা )

"বাপ আন্দাজ বেটা, গাছ আন্দাজ গোটা"—বলে বাংলার একটি চলতি কথা আছে। সংস্কৃতে আছে, "নরানাং মাতুলক্রমঃ" প্রবচন। আবার "যেমনি গুরু তেমনি চেলা" এই জনপ্রবাদও প্রচলিত রয়েছে। কোন ব্যক্তির জীবনে এই তিন সত্যের সমন্বয় কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু কবি রাজেন্দ্র নাথ সরকারের জীবনে এই তিনটি প্রবাদ বাক্যের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল।

বাংলা ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার বৈঝকি গ্রামে এক নমঃশূদ্র পরিবারে রাজেন্দ্র নাথের জন্ম। পিতার নাম নদীয়ারচাঁদ সরকার, মাতার নাম মন্দাকিনী দেবী। নদীয়ারচাঁদ প্রাচীন ধারার কবিগান, জারিগান, রামায়ণ গান ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। মন্দাকিনী দেবী ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমাধীন দুর্গাপুর গ্রামের প্রাচীন কবিয়াল আনন্দ সরকারের কন্যা এবং কবিবর হরিবর সরকারের ভগ্নী। সুতরাং মাতৃ ও পিতৃ এই উভয় কুলের কাব্য পরিমণ্ডলেই রাজেন্দ্রনাথের জীবনারম্ভ।

রাজেন্দ্রনাথের স্কুল পাঠশালার শিক্ষা খুবই সামান্য—সম্ভবতঃ উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানার্জন স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসার বলে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় যে দখল তিনি অর্জন করেছিলেন, তা প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি মাঠেঘাটে আপন মনে গান গেয়ে বেড়াতেন এবং পিতার তৈরী ধুয়া ধরে টান দিতেন—

কেদা খোচা ভেদা বেটা নাম কোলায় রয়না,
বিলির রাজা হয়ে ভেদা চিলির ভয় করে না।

বার তের বছর বয়সেই কবিগানের প্রতি রাজেন্দ্রনাথের আসক্তি জন্মে। গানের

প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে মা মন্দাকিনী দেবী রাজেন্দ্রকে কবির দলে নেওয়ার জন্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিবর সরকারকে বললে, তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গানে বের হতে লাগলেন এবং গান গাইতে ও মাঝে মাঝে আসরে পাঁচালী বলাতে অভ্যাস করালেন। ১৩১৫/১৬ সালে মাতুল হরিবর সরকারের সঙ্গে ঢাকায় গেলে "ছুট" সরকার হিসেবে এক কাঁসারী বাড়ীতে গান গাইতে যান। সেখানে আরো দুইজন 'সরকার' ছিলেন। গান শুনে বাড়ীর কর্তা তিন সরকারের মধ্যে রাজেন্দ্রকেই জয়ী বলে সাব্যস্ত করেন এবং রাজেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে একটি পিতলের কলসী পুরস্কার দেন। পরের বৎসর আবার ঢাকায় গেলেন। নরসিংদীর কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয় হরিবর সরকারের কাছে একজন 'কোল' সরকার চাইলে তিনি ভাগ্নে রাজেন্দ্রনাথকেই নেওয়ার জন্য বললেন; আচার্য কর্তা রাজী হলেন। পূর্ববঙ্গের কবিগানের নবরূপকার হরিচরণের চরণে আশ্রয় পেলেন রাজেন্দ্রনাথ।

আচার্য কর্তার এবং তাঁর দলের গান শুনে রাজেন্দ্রনাথ অবাক। বিবিধ যন্ত্র সংগতে বিভিন্ন সুর, তাল, রাগ রাগিনী সংযোগে এমন সুসংস্কৃত ও মনোহব কবিগান তিনি আর শোনেন নি। দেখে শুনে মনে মনে ভাবেন তাঁর দেশে অর্থাৎ খুলনা যশোহর ফরিদপুরে এমন গান কবে ব্যাপক প্রচার হবে। সেখানে গালাগালি প্রধান 'লাল কবি' ও নবমীর খেউড় এর প্রাধান্য; ভদ্র লোকালয়ে কেহ কবিগান দেয় না। ছাড়া ভিটায়, দূর্বাবনে করতালি দিয়ে কবিগান গায়—লোকে বলে 'শিয়াল তাড়ানো গান'। কবিগানের এ অপবাদ সে দেশ থেকে কিভাবে দূর করা যায় তাই হলো রাজেন্দ্রের চিন্তা ভাবনা।

একদিন আচার্য কর্তাকে বললেন—কি করে জীবনে বড় হতে পারি আমাকে বলুন। কর্তা বললেন—তুমি অতি সরল ও মেধাবী, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। দীক্ষার পর রাজেন্দ্রনাথ নাকি ২৪ ঘণ্টা অচৈতন্য ছিলেন। সেই থেকে রাজেন্দ্রনাথের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন আসে।

প্রথমে মাতুল হরিবর এবং পরে হরিচরণ আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর ১৩২০ ২১ সালে নিজ দল গঠন করেন। কয়েকজন বুড়া দোহার নিয়ে একদিন তাঁর 'আজা' আনন্দ সরকারকে গান শোনালেন। গান শুনে তিনি বললেন—

এরূপ গানে তোরে কে দিবে বায়না।  
তোর বাবার দোহার এরা গাইতে জানে না ॥

তখন রাজেন্দ্রনাথ ভাল দোহার বাদক খুঁজতে লাগলেন। মৌপুরার বেচারাম অধিকারীর জামাই নগেন মাষ্টার একজন সুগায়ক ছিলেন। তার কাছে গিযে কবিগানে যোগদানের প্রসঙ্গ তুলতেই—

শুনে রেগে বলেন মাষ্টার মহাশয়,  
কবিগান কখনো কি ভদ্রলোকে গায় ?

রাজেন্দ্রনাথ বললেন— আপনি আমাকে হারমনিয়াম এনে দেন। আপনাকে এমন গান শোনাব যা কখনো শোনেন নি। মাষ্টার তখন—

মনে ভাবে হারমনি কি বাজাতে জানে।
যাত্রা ভিন্ন ইহা লাগে না অন্য গানে॥
না জানি কেমন গান শুনিতে কেমন।
হারমনিতে কবিগান গাইতে কেমন।
রাজেন্দ্রনাথ হারমনিতে ধরিলেন তান।
হরি আচার্যের নিমাই সন্ন্যাস গান॥
দেখে শুনে মাষ্টারের লাগে চমৎকার।
আচার্যের আশ্চর্য গান শুনিতে বাহার॥
গান শুনে নগেন মাষ্টার মনে মনে ভাবে।
এ গান শুনে লোকে নিশ্চয় কাঁদিবে॥

সুতরাং নগেন মাষ্টার দলে যোগ দিতে রাজী হলেন। যে গান শুনে নগেন মাষ্টারের কবিগান সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর হয়েছে, মন গলেছে, তার আংশিক উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

শচী করে হাহাকার, কোথা রে চাঁদ নদীয়ার—
চাঁদ নিমাইচাঁদ আমার।
আর কি রে চাঁদ এ জীবনে, মা ডাকবি না চাঁদ বদনে,
চাঁদের বাজার এত দিনে, হল অন্ধকার॥

দল গঠনে রাঙা মামা মনোহর সরকার এবং গোলাবাড়ীর মামা ষষ্ঠীবর সরকার লোকজনের সন্ধান দিয়ে, ‘নিজেদের দল থেকে দু’ এক জন দোহার বাদককে ছেড়ে দিয়ে রাজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন। ঢোলে পবন, সানাইতে শীতল, বেহালায় ক্ষীরোদ, হারমনিতে সদানন্দ, কাঁসীতে অধর এবং হরি, মনা, মনোহর, সুধন্য প্রভৃতি দোহার ও চারটি কচিকণ্ঠ বালক নিয়ে খুব জমজমাট দল হলো। এখানে ওখানে কিছু কিছু বায়নাও হলো। কিন্তু সুসংহত দল হিসেবে বায়নার হার বেশী বলে প্রয়োজন মতো বায়না পাচ্ছেন না। প্রথম বিশিষ্ট আসরে গান গাইলেন বরিশালে—বিপক্ষে ছিলেন চন্দ্রকান্ত সরকার। রাজেন্দ্রনাথের ও তাঁর দলের গান শুনে লোক চমৎকৃত হলো। আস্তে আস্তে রাজেন্দ্রনাথের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

১৩২৫ সালে অনেক গানের বায়না পেলেন। ইতিমধ্যে দোহার ও বাদকদের মনে শয়তানি দেখা গেল। আগের ‘দশ আনা ছয় আনা’ হিস্যার বদলে তারা মাস মাহিনা দাবী করলো। ১৩২৬ সালে অনেক টাকা ধারকর্জ করে অগ্রিম দাদন দিয়ে দল গঠন করেন। কিন্তু ঢাকার পথে পদ্মার চরে ঝড় তুফানে কোন মতে রক্ষা পান। ঐ ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ব ভাগে দারুণ ক্ষয় ক্ষতি হলো। ফলে গান তেমন জমল না। এদিকে

দোহারগণ অগ্রিম দাদন নিয়ে দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গেলে তিতিবিরক্ত রাজেন্দ্রনাথ গান বাঁধলেন—

ষড় রিপু দিয়ে দল সাজায়ে, আমায় দিতেছ জ্বালা—
শোন মা গিরিবালা।
ক্রোধ ভরে সদানন্দ, সদা কিল খায় স্বভাব মন্দ,
মাৎসর্য অধর দেখায় কলা ॥
শীতল ধরে তাল, লোভে নগর লুটে নিতে চায় গোলা।
সব কাজের মূল পবনা শালা, নাড়ী কাটে ঐ—
ক্রোধেতে এমন বাক্য কই।
ঘাটে পথে দিনে রাতে কয় শালার কান মলে লই ॥

দল পত্তন গঠন ও পরিচালনায় অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক প্রাথমিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। ক্রমে সে সব সংকট কেটে গেল। শুরু হলো রাজেন্দ্রনাথের জয়যাত্রা। নিজদলের জন্য তিনি নিজেই গান রচনা করতে লাগলেন। রাগরাগিণী সম্পর্কে তাঁর মতো গভীর জ্ঞান কবির সরকারদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর রচিত গান ভাব-গভীরতা, শব্দচ্ছটা, ভাষা বিশুদ্ধি ও অলঙ্কার উপমাদির সুষ্ঠু প্রয়োগে অনবদ্য সুষমা মণ্ডিত। উদাহরণের অভাব নেই—

১। পূর্বরাগঃ

প্রথম দর্শনে রাই ডুবল শ্যাম প্রেম সাগরে।
কৃষ্ণ নাম কণ্ঠহার, পঞ্চ রসে আহার বিহার,
নানা ভাব-অলঙ্কার, ফুটল কিশোরীর শরীরে ॥
রাধে সর্ব্বত্র হেরিছে খেলা, নীল বরণ বিদ্যুন্মালা,
খেলিছে তুফান,—ছুটল রূপ সাগরে বান।
আকাশে সমীরে নীরে, অভিনব ছবি হেরে,
দ্বিপ্রহরের রবি করে, সুধাকরের করে করে স্নান ॥

২। বিচ্ছেদঃ এই গানের অন্তরা অংশটিতে রাধাতত্ত্ব, বাউল গীতি ও পল্লী-গীতির এক অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়—

সখী! শ্যাম প্রেম পরশমণি, বুকে পেলে জুড়াইত বুক।
আমি আর কবে হেরিব সে চাঁদ মুখ ॥
ভালবাসার বাসা দিলাম, যতনে পুষিয়াছিলাম,
হৃদয়-পিঞ্জর শ্যাম-শুক।
হৃদয়-পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুক গিয়েছে উড়ে,
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ ॥

জাতি বিদ্যা কুল মান, জীবন যৌবন মন প্রাণ,
সকলি দহিল সর্ব্বভুক।
একা মাত্র আমি আছি, এত পোড়ায় কেমনে বাঁচি,
আমার কেন বা পোড়ায় না— আমি-টুক ॥

৩। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গানের অন্তরা অংশটিতেও শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমে লীন হয়ে যাওয়ার আর্তি সুপ্রকট—

বন্ধুরে! আমারে কান্দায়ে যেন তুমি থাক সুখে।
তোমার যত রকম আগুন আছে—
দিয়ে যাওহে আমার বুকে ॥
বন্ধু! তোমার ভালবাসায় ভুলে,
কালা, কালি দিলাম কুলে,
লোক সমাজে বের হবো কোন মুখে!
আমি ডুব দিব অকূল পাথারে—
তোমার প্রেম পীরিতির দুখে ॥
তোমার যত দুঃখ রাশি,
আমার বক্ষে যা পরশে আসি,
যদি ভালবাসি দূরে থেকে।
আমি যাই যদি অকূলে মিশি—
যাব প্রীতির স্মৃতি রেখে ॥

ডাক, মালসী, আগমনী, সখী সংবাদ, বসন্ত, ভোর, গোষ্ঠ, কবি প্রভৃতি সকল ধরনের সঙ্গীত রচনাতেই রা. ন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। টপ্পা পাঁচালীর কথা বলাই বাহুল্য। গানের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমাজের ও দেশের অহিতকরী প্রথাগুলির বিলোপ সাধনের আহ্বান জানিয়ে রাজেন্দ্রনাথ শুধু একজন কবিয়াল নয়, প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যেমন—

১। দশ মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি ভক্তি মুক্তি দাত্রী।
বিপদে শ্রীপদে তব লইনু স্মরণ,
আমি ভজন বিহীন অতি অভাজন,—
অনন্ত পথের যাত্রী ॥
আমার দেহরাজ্য·ভারতভূমি হল পরাধীন,
দুঃখে কাঁদব কত দিন—মা মাগো
পুত্রকন্যার চক্ষের ধারা, ভারত-মাতার বক্ষ ভরা,
তবু রাজ্য স্বাধীন করা, তোমার নয় কি সমীচীন ॥

২। গান্ধী মহাত্মার সব বাক্যে, ছুটিছে ধরণী বক্ষে,
লক্ষগুণ শিক্ষাপ্রবাহ।
এমন আকাশ পাতাল পরিবর্তন মুহূর্তে,
আর কি এই মর্ত্যে, দেখেছে কেহ॥
লোকের স্বরাজ লাভের আশালতা—
দেখতেছি কি বলবতী—
হবে শীঘ্রই ফলবতী ;
এই দেশ উদ্ধারের কারণ, কেউ করে মরণ বরণ,
করে মহাত্মার পথ অনুসরণ,—
সব বিষয় অতি উন্নতি॥

৩। একজন গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে,
বাল্যকালে দিল বিয়ে, পৌগণ্ডে হল বিধবা।
নিয়ে যতিধর্ম মাছ মাংসাদি করে না আহার,
মনের ব্যথা তার, বুঝিবে কেবা॥
ও তার মনাগুনে চিত্তের মাঝে জ্বলিছে চিতা,
তখন সেই তাপে হয়ে তাপিতা,
পিতাকে বলে সেই পোড়ারমুখী।
আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্য বিধবা
বল এই নরকে থাকি॥
বাবা! যখন আমায় বিয়ে দিলে, বুঝি নাই বিয়ের কি দরকার,
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলঙ্কার।
এ যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশিতে,
হল যে বিবাহ তোমার মতে, সে বিয়ে তোমার না আমার ?

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বৃদ্ধকালে দারপরিগ্রহণের নির্লজ্জ প্রবণতা, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেছেন। খুলনা এলাকায় বর্ধিষ্ণু হিন্দু বাড়ী বা পাড়ায় পাড়ায় অনেক প্রাচীন কালীখোলা কালীতলা ছিল। সে সব ক্ষেত্রে প্রতি বছর মহাসহারোহে কালী পূজা, ছাগ মহিষ বলিদান ও কবিগান অনুষ্ঠিত হতো। মায়ের পূজোয় মায়ের চোখের সামনে অসহায় ছাগশিশুদের ম্যা ম্যা আর্তনাদে, মহিষের উপর প্রাক্ বলি নির্যাতনে রাজেন্দ্রনাথ কবি-কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত পেতেন। তিনি বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে অনেক গান রচনা করেন এবং বলি দেওয়া পূজামণ্ডপে গান গাইবেন না স্থির করেন। বলিদানকারীদের বিরুদ্ধে তিনি ধিক্কার দিয়ে গাইলেন—

বৃথা শক্তিপূজোয় পশু বলি আমাদের দেশে।

যদি মহিষ বলি কালী খায়, গরু খায় না কোন্ কথায়,
ভাব এ কথায় একতায় বসে ॥
যদি মুসলমানদিগের কাছে, হিন্দুরা গরু বেচে,
কোরবানিতে করলে খুন, মহাপাপ হয় সেই দরুণ ;
স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা তার দোষগুণ।
তাইতে হিন্দুগণকে ডেকে বলি, পূজায় দিতে গরু বলি,
বেঁচে থাকুক মহিষগুলি, তাতে কাজকর্মে পাইবে দ্বিগুণ ॥

তাঁর জেদের দরুণ বহু কালী বাড়িতেই বলিদান প্রথা রহিত হয়। গান্ধীজীর অহিংসা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হরিজন উন্নয়ন, নারী কল্যাণ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রভৃতি সমাজ ও জনহিতকর নীতি রাজেন্দ্রনাথের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অনেক গানেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। এ সব সঙ্গীত রচনায় তিনি তাঁর গুরু হরিচরণের আদর্শে বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে রাজেন্দ্রনাথ ভাবাত্মক কাব্যধারায় নিষিক্ত হয়েছেন তাঁর প্রথম গুরু মাতুল হরিবর সরকারের কাছে। দ্বিতীয় গুরু হরিচরণ আচার্যের সাহচর্যে তাঁর গানের মধ্যে ভাব ও যুক্তির গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটে। তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতে তাঁর এই দুই গুরুর প্রতি অটল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গেছেন। যেমন—

ক) আমার শিক্ষা দীক্ষা গুরু দুই জন, হরিবর আর হরিচরণ,
প্রেমাবেশে পড়িবে ঢলিয়ে।

খ) আমার গুরু হরি বলে ভেবে, আর জীব কোথা যাবে;
জগৎপিতা তারিবে সন্তান।

গ) প্রভু রাইচাঁদের উপদেশে, ভজ হরি মানুষ বেশে
এই মানুষও গুরু হরিবর।
গুরু হরিচরণ থাকলে স্মরণ, ধরিবে অধর ॥

ঘ) গুরু হরিবর শ্রীহরিচণ, চরণ শরণ তারণ কারণ,
স্বভক্তিতে ধারণ কর হৃদে।

কবি-জীবনের প্রথম পর্বে সমাজে নিজের স্থান করে নিতে রাজেন্দ্রনাথকে কম বেগ পেতে হয়নি। হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্মের চেয়ে জন্ম ও বংশ মর্যাদার স্থান উচ্চে। রাজেন্দ্রনাথের গানে ব্রাহ্মণ কায়স্থরা মুগ্ধ ; কিন্তু তাদের বাড়িতে কবি-অতিথি রাজেন্দ্রনাথ সামান্য সৌজন্যও প্রত্যাশা করতে পারেন না। কারণ তিনি নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ বাড়িতে আহারের পর রাজেন্দ্রনাথকে পাতা ফেলতে হবে। তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অনাচারী ব্রাহ্মণের লোক দেখানো শুচিতা ও শুদ্ধাচারের ভড়ং দেখে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গাইলেন—

মদের নেশায় বদের দশায়, ব্রাহ্মণে খায় বেশ্যাবাড়ীর ভাত,
তাতে হয় না জাতিপাত, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ ?
নটীর হুঁকায় তামাক খেয়ে, হুঁকার জল মরে নমঃ ছুঁয়ে,
এসব ব্রাহ্মণে না প্রণাম দিয়ে, নটীর পদে কোটী প্রণিপাত ॥

গানের জবাবেও তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয়। শাস্ত্রভিত্তিক গানের মাঝে মাঝেও প্রসঙ্গক্রমে সমাজ ও দেশের আচার বিচারের মিশ্রণ দিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়তেন না। কোন জমিদার বাড়ীতে বিপক্ষ সরকার নারায়ণ চন্দ্র বালা দে সরকার 'কালকেতুর কবি'তে একটি পদে গাওয়ালেন—

যদি নীচকুলে জন্ম বলে আমাদের বল পাতকী,
তবে বাবার বাহন, মায়ের বাহন, ভাইয়ের বাহন কি।
বৃষেতে শিবের গতি; মুষিকে গণপতি,
এসব সিংহ বিড়াল ইঁদুর হাতি,—
তোমাদের জ্ঞাতি ভাই নাকি ॥

জবাবে রাজেন্দ্রনাথ গাওয়ালেন—

বললে, বিড়াল কিসে কুলীন এমন,
চিরকাল মা ষষ্ঠীর বাহন, দেবতার পদে পেল স্থান।
যত দে দত্ত পাল বালার চেয়ে, আলাদা সম্মান ॥

অর্থাৎ তিনি জমিদার দত্তবাবু, তার জামাই দে বাবু, গোমস্তা পালবাবু এবং বিপক্ষ কবিয়াল বালা মশাই—এই চার জন উচ্চ শ্রেণীভুক্ত কুলীন হিন্দুকে গানের সঙ্গে জড়িয়ে খোঁচা দিলেন। আবার কোন এক আসরে বিপক্ষ সরকার তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রেখে তার ভগ্নী সুভদ্রাকে কটাক্ষ করে গাইলেন—

তোমার ভগ্নী সুভদ্রা সুন্দরী, আইবুড়ী ছিল এতদিন,
তোমরা পুরুষ কি কঠিন।
তোমরা চাওনা ছুঁড়ীর বদন পানে,
জ্বালা আর স'বে কত দিন ॥

সমাজ সচেতন রাজেন্দ্রনাথ সাময়িক ভাবের ছোঁয়া লাগিয়ে জবাব দিলেন—

বললে, আমার ভগ্নী হল কাঁচা ছুঁড়ী,
আইবুড়ী বল কোন্ কথায় ; শুনে বাঁচিনা লজ্জায়।
তুমি ত থাক ঘরে, দেখনা এই দেশে ঘুরে ;
আজকাল কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে –
এর চেয়েও বুড়ী পাওয়া যায় ॥

রাজেন্দ্রনাথের গানে হিন্দু মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলনের গভীর ছাপ দেখা যায়। স্বয়ং গুরুদেব হরিচরণ আচার্য ষাট বৎসরাধিক বৎসর

পূর্বে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য সম্পর্কে বলেছেন—'খুলনা জেলার চুণখোলা নিবাসী রাজেন্দ্র নামে আমার একজন ছাত্র আছে। বর্তমানে সে আদর্শ কবিরূপে পরিচিত। ছড়া ও টপ্পা কাটাকাটিতে এবং রাগিনী সংযোগে সে বিশেষ পটু। বহুবিধ শাস্ত্রেও তাহার অধিকার আছে। নানা স্থানে গান করিয়া খ্যাতি অর্জন করিতেছে।"

কবি গানের স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি এবং রাজেন্দ্রনাথের সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বলেন—"এই বিশিষ্ট কবিয়াল বড় রাজেন্দ্র বা 'পাগল' নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি হরি আচার্য মহাশয়ের খুব তেজী গোঁড়া ছাত্র। আচার্য কর্তা ওঁকে শঙ্করাচার্য বলে ডাকতেন। আচার্য কর্তার পরবর্তী যুগে যে সব সরকারের সঙ্গে আমার গান হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই রাজেন্দ্র সরকারই সর্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অগাধ শাস্ত্র জ্ঞান ছিল। অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর অধিকার ছিল। গানের জবাবে এবং গান রচনায় তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন, আর কোন সরকারের সে শক্তি ছিল না। খুলনা-যশোহর-ফরিদপুর এলাকায় এলে রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গেই আমার চৌদ্দ আনা গান হতো। যেখানেই আমার ও রাজেন দা'র মধ্যে গান হতো, সেখানেই কবিগান অত্যন্ত উচ্চস্তরে উন্নীত হতো।" (কবিয়াল কবিগান—দীনেশচন্দ্র সিংহ)। পুনশ্চ—"রাজেন্দ্রনাথ আমাদের কবি গগনের পূর্ণচন্দ্র ছিলেন। চন্দ্র যেমন প্রতিপদ হতে আরম্ভ করে পূর্ণিমা পর্যন্ত ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে পূর্ণ চন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়, কবিশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্রও তেমনি তালে মানে গানে রাগরাগিণীতে, সর্ববিধ তালযন্ত্রে, সুরযন্ত্রে অধিকার অর্জন করেছিলেন। অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে যে সব অমূল্য রত্ন আহরণ করেছিলেন, তা অবলম্বনে অমূল্য সঙ্গীতাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে এইসব গুণরাশির একত্র সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তিনি কবি গগনের পূর্ণচন্দ্র, কবিশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র।" (নকুলেশ্বর সরকার)

কবি সমালোচক ও রসবেত্তাদের মতে "তিনি ছিলেন তাঁর সহযোগী শিল্পীদের সকলের চেয়ে বড়; বড় তাঁর মননশীল সৃষ্টি ঐশ্বর্যে, বড় তাঁর অকথিত শব্দ সম্পদের লীলায়িত মাধুর্যে। বিস্তৃতির রসগৌরব ও যুক্তিনিষ্ঠায় তাঁর কবি-কর্ম মহিমান্বিত। গ্রাম-বাংলার শোষিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে তাঁর কবিগানে।" (অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ, কবিগান সাহিত্যপত্র, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫)।

রাজেন্দ্রনাথ ও নকুলেশ্বর সরকারের সঙ্গীত প্রতিভার তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন—"রাজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ক্লাসিক গঠন কৌশল ও গীত-প্রবণতা পূর্ববঙ্গে সর্বত্র সুবিদিত। ...তত্ত্ব বিশ্লেষণে, কাব্য সংশ্লেষণে, এমনকি নাটকীয় উপস্থাপনে রাজেন্দ্রনাথ গভীর জীবনরসের পরিচয় দিয়াছেন। · এই কবির শিল্পচাতুর্য পরিপক্ক আনারসের ন্যায় উপরিভাগ অমসৃণ কিন্তু ভিতরটা রসনিটোল মিষ্টত্বে ভরপুর...। আবার অন্যদিকে নকুলেশ্বরবাবু তত্ত্বের সহিত

তথ্যের, ভাবের সহিত যুক্তি বন্ধনের এবং সুর ঝঙ্কারের সহিত অলঙ্কার গঠনের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিগানে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নকুলেশ্বর বাবু অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে" ( পূর্ববাংলার কবিগান—অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী, শারদীয় ভারতবাণী—১৯৪৫ )।

শুধু কবিগান গাওয়া নয়,কবিগান প্রচারেও রাজেন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। "১৩৪২ সালে কলকাতা এলবার্ট হলে কবিগানের আসর বসে। এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন রাজেন্দ্র সরকার। ·· এ প্রসঙ্গে লোককবি রাজেন্দ্রনাথ সরকারের অর্থ-নৈতিক সাহায্যের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। চুণখোলার বাড়ি তৈরী করার জন্য যে ইঁট কিনেছিলেন, সেই সব ইঁট বিক্রি করে দিয়ে তিনি এলবার্ট হলের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।" ( অধ্যাপক মণি মণ্ডল—বিজয়গীতি )

রাজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি মেলে ১৯৩৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ হলে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক এবং কর্মচারীবৃন্দের সমক্ষে কবিসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সেই আসরে উপস্থিত অধ্যাপকগণের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুকুমার সেন প্রমুখ। রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলী এক প্রশংসাপত্রে তাঁকে এবং কবিগানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঐ প্রশংসাপত্র শুধুমাত্র রাজেন্দ্রনাথের কবিকৃতিরই ব্যক্তিগত জয়-পতাকা নয়, পূর্ববঙ্গের কবিগানেরই সুধীজন প্রদত্ত বিজয়কেতনও বটে। ঐ গানে তাঁর সহযোগী ছিলেন যশোহরের বিজয় সরকার।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে হিন্দু জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সুসংবদ্ধ পরিশ্রমী ও অত্যন্ত জেদী বলে পরিচিত ছিল। বরিশাল যশোহর খুলনা ফরিদপুরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি কারো অজানা নয়। হরিচরণ আচার্য এদের সম্পর্কে একটি ছড়ায় বলেছেন—

ব্রাহ্মণ আর নমঃশূদ্র, ঠিক যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র,
কেবা এ জাতিকে বলবে ক্ষুদ্র—
বরিশাল-খুলনা-ফরিদপুর ॥

এই সম্প্রদায়ের লোকদের কবিগানের প্রতি আসক্তি অবাক হবার মতো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেকে লেখাপড়া শিখে কবিগানের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন, কবিগানের নিন্দায় পঞ্চমুখ হন, কবিগানের নাম শুনলে নাক সিঁটকে নিজেদের ওসব গ্রাম্য অশ্লীলতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আত্মশ্লাঘা লাভ করেন। অথচ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নিরক্ষর চাষীভূষি দোকানদার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী এম. এ , পি. এইচ ডি. পর্যন্ত এক আসরে একাসনে বসে আত্মমগ্ন হয়ে কবিগান শোনেন। এই সমাজভুক্ত জনগণের মতো কবিগানের পৃষ্ঠপোষক বিরল। পূর্ব বঙ্গ তো বটেই

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে—এমন কি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনর্বসতি প্রাপ্ত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কবিগানের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন।

অধিকন্তু, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় থেকে যত কবিয়াল উদ্ভূত হয়েছেন, এমন আর কোন সম্প্রদায় থেকেই নয়। এ সম্পর্কে রাজেন্দ্র সরকার মশাইব একটি মালসী সঙ্গীতের আংশিক উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ—

যত নমঃশূদ্রে ভাব-সমুদ্রে করে সন্তরণ।
ইহার মূলতত্ত্বে হরি ঠাকুর, ওড়াকান্দি ফরিদপুর,
প্রচার করিল নাম সুমধুর, হরি সংকীর্তন ॥
ও সে হরি ঠাকুরের কৃপায়, রবির আগে কবি গায়,
আনন্দ আর তারক কবি-রসরাজ ;
কবিগানের জন্য জাগে ধন্য নমঃশূদ্র সমাজ।
কবি বেথড়িয়ার মহিম, বিষ্ণু জিকেবাড়ীর,
কবি নদেরচাঁদ বোড়াশির,
আর এক কবি নদেরচাঁদ গ্রাম বৈঝাকির—
খুলনা জেলায় মোল্লাহাট থানার পাশে করিতেন বিরাজ ॥
কবি হরিবর মনোহর ষষ্ঠী চন্দ্র আর নিবারণ,
গোপালগঞ্জের কাছে জন্মধারণ, ফরিদপুর জেলা নিবাসী।
ভবে ভাবীকালের কথা ভাবি, নমঃশূদ্রের মধ্যে গায়ক কবি,
সকল জাতির চেয়ে বেশী ॥

প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কবিয়াল বর্তমানে নেই বললেই চলে। যে কয়জন কবিয়াল এখনো কবিগান গেয়ে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া সবাই নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত।

"আধুনিক কবিগানের রাজ্যে রাজেন্দ্র সরকার একটি নাম, একটি ইতিহাস।··· ক্ষুরধার মেধার অধিকারী কি কবির আসরে কাব্যালোচনায়, কি নিভৃত অবকাশে সঙ্গীত রচনায় সর্বত্রই প্রজ্ঞাবান রস-স্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে। প্রচণ্ড আত্ম-প্রত্যয়ে ভাস্বর এই যশস্বী শিল্পী যুক্তি-নির্ভর আবেগের প্রেরণায় এক প্রাণময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাব্যচর্চায়। ভাব ও ভাষা, বিচার ও কবিত্বের ঐকান্তিক সমন্বয় সাধন করে কবিগান তৃষিত অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি।" (অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ—কবিগান সাহিত্যপত্র)

একথা একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে ফরিদপুর ওড়াকান্দির শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের কৃপাধন্য কবি-রসরাজ তারক সরকার এবং তাঁর শিষ্যদ্বয় হরিবর ও মনোহব সরকারকে আশ্রয় করে এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র সরকারকে কেন্দ্র করে খুলনা-যশোহর-ফরিদপুরে এক বিরাট কবি-সমাজ গড়ে ওঠে এবং এই বিস্তীর্ণ এলাকা পূর্ববঙ্গের কবিগানের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে গণ্য হয়।

দেশবিভাগ পর্যন্ত রাজেন্দ্রনাথ অপ্রতিহত প্রভাবে কবি গান গেয়েছেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক নাগাড়ে দেশ ত্যাগের ফলে বিশিষ্ট পূজা প্রাঙ্গন ও কবির আসরগুলি ক্রমান্বয়ে নীরব হয়ে পড়ে। খ্যাতনামা কবিয়ালগণ একে একে দেশ ছেড়ে চলে আসেন। কবিগানের পৃষ্ঠপোষকদের ক্রমাগত বাস্তুত্যাগের দরুণ এবং উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে ভগ্ন মনোরথ রাজেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে গান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এলেও তিনি পূর্ববঙ্গে তাঁর ভিটামাটি পরিত্যাগ করেন নি।

১৯৪৫ সালের ২৬শে মাঘ রাজেন্দ্রনাথেব গৌরবদীপ্ত জীবন দীপ নির্বাপিত হয়।

( কবির প্রথম জীবন সম্পর্কিত তথ্যাবলী তাঁর অনুজ শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার থেকে প্রাপ্ত। রচনাটি বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত অধুনালুপ্ত "নিখিল ভারত" পত্রিকা থেকে আংশিক পুনর্মুদ্রিত )

## নকুলেশ্বর সরকার ( বরিশাল )

পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেও নয়, কিংবা আর্থিক তাগিদেও নয়, শুধুমাত্র সুর ও ছন্দের মাদকতায় প্রলুব্ধ হয়ে যে কয়জন লোক কবিগানে যোগদান কবে চিরস্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সুস্থ কবিগানের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে বরিশাল—ঝালকাটির কবিয়াল নকুলেশ্বর সবকার অন্যতম। ৮৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত কবির আসরে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পূর্ববঙ্গের কবিগানের স্বর্ণ যুগের শেষ শিল্পী ও বটে।

১৩০১ সালের আশ্বিন মাসে বরিশাল জেলার সুয়াকাটি গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে নকুলেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ বেচারাম দাস; মাতার নাম কামিনী সুন্দরী। তাঁরা দুই ভাই ও তিন ভগ্নী ছিলেন। পরবর্তীকালে নকুলেশ্বর কবিয়াল কুঞ্জ দত্তের শিষ্য-পুত্র হিসেবে গৃহীত হলে এবং তাঁরই দলের নামে দল পরিচালনা করতেন বলে নকুল দত্ত নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাড়ি থেকে অদূরবর্তী কালীজিরা নদীর পরপারে আমিরাবাদ বন্দরে কালীপূজা উপলক্ষে কবিগান শুনতে গেলেন বালক নকুলেশ্বর। সখের দলের কবিয়াল নিবারণ বসুর সঙ্গে ঝালকাটির মহিলা কবিয়াল কুসুমকুমারীর প্রতিদ্বন্দিতা। সেখানেই নকুলেশ্বর কবিগানের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন। পাঠ্য জীবনেই তিনি শব্দ ও পদের মিল দিয়ে ছড়া রচনা করতে পারতেন। গ্রাম্য কীর্তনের আসরে স্বরচিত গান গেয়ে তিনি পল্লীবাসীদের আনন্দ দিতেন। কবিয়ালদের ভাবনা চিন্তা না

করে পদের মিল দিয়ে ছড়া পাঁচালী বলার ক্ষমতা নকুলেশ্বরের মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৩১৮ সালে বি, এম, কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হতে তিনি বরিশাল টাউনে এলেন। এসেই শুনলেন সেদিন রাতে ছয় আনির কাছারী প্রাঙ্গনে দুই খ্যাতনামা কবিয়াল কুঞ্জ দত্ত ও শরৎ বৈরাগীর 'বীণাপানি কবি পার্টি' ও 'আদর্শ কবি' দলের মধ্যে কবিগান হবে। সঙ্গীত পাগল নকুলেশ্বর কাল বিলম্ব না করে গানের আসরে হাজির হলেন। প্রথম শ্রেণীর গানের প্রথম রসাস্বাদনেই তিনি অভিভূত হলেন। লেখাপড়া শিকেয় উঠলো। স্কুলে ভর্তি না হয়ে তিনি পরদিন গান শেষে কুঞ্জ বাবুর নৌকায় উঠলেন এবং তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য জেদ করতে লাগলেন। কুঞ্জ বাবু তাঁর আগ্রহ দেখে নকুলেশ্বরকে নিযে তাদের বাড়িতে গেলেন। বাড়ির লোকজন ত তাঁর স্কুলে ভর্তি হবার বদলে সভ্য সমাজে ঘৃণিত কবির দলে ভর্তি হবার বাসনা শুনে অবাক। অনেক বোঝাপড়াতেও যখন তাঁর মতি পরিবর্তন হল না, তখন তাঁরা অগত্যা তাঁকে কুঞ্জবাবুর হাতে সঁপে দিলেন। অপুত্রক কুঞ্জবাবু তাঁকে শিষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন।

সে বছর দুর্গাপুজোয় কুঞ্জ দত্তের দলের বায়না ছিল নোয়াখালী জেলার দালাল বাজারে যদুবাবুর বাড়িতে। বিপক্ষে ছিলেন ফরিদপুরের মনোহর সরকার। ঐ দুর্গাবাড়ির গানেই নকুলেশ্বর প্রথম গানের আসরে দাঁড়ান। এত অল্প বয়সে নির্ভিক ভাবে ছড়া-পাঁচালী বলার দরুন হৃষ্টচিত্ত যদুবাবু একখানা চাদর দিয়ে নকুলেশ্বরকে আশীর্বাদ করেন।

কুঞ্জবাবুর দলে নকুলেশ্বর ১৩১৮-১৩২০ এই তিন বছর শিক্ষানবীশ ছিলেন। তখন পূর্ববঙ্গের কবিগানের স্বর্ণ যুগ। এই তিন বছরে বিভিন্ন জেলার বহু কবিয়ালের সঙ্গে গানে কু ৱাবুকে সহায়তা করেন। কখনও বা নিজেই পুরোদায়িত্ব নিয়ে গান করেন। ১৩২০ সালে ঢাকা-নরসিংদী বাজারে কুঞ্জ দত্তের সঙ্গে হরিচরণ আচার্যের গান হয়। আচার্য কর্তার সঙ্গে নকুলেশ্বরের এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি আচার্য কর্তার গান শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন। কোন কবিয়ালের সঙ্গেই তাঁর গানের তুলনা হয় না। নকুলেশ্বর এতদিন মনে করতেন অনেক কিছু শিখেছেন। কিন্তু সেদিন মনে হলো কিছুই শেখেন নি।

এদিকে আচার্য কর্তাও নকুলেশ্বরের গান শুনে প্রীত হলেন এবং নকুলেশ্বরকে তাঁর দলে দিতে কুঞ্জবাবুকে অনুরোধ করলেন।

নকুলেশ্বর একে ভগবৎ প্রদত্ত সুযোগ মনে করে ১৩২১ সালে আচার্য কর্তার দলে যোগ দিলেন। আচার্য কর্তার সাহচর্যে উপদেশ নির্দেশে নকুলেশ্বরের কবিগান পদ্ধতি নূতন মোড় নেয়। কর্তার আদেশে সঙ্গীত রচনা পরিবেশনা ইত্যাদিতে তিনি নূতন ধারা অবলম্বন করেন। আচার্য কর্তার দলে থাকতেই তিনি পরিচিত হলেন কর্তার বিশিষ্ট ছাত্র খুলনার রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গে। সে বৎসর কর্তার

দলের রাজেন্দ্র নকুল ও নোয়াখালীর কাশীনাথ নট্ট এবং জোটে উমেশ শীল সহ পরমানন্দে কাটল। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র-নকুল জুটি পূববঙ্গের কবিগানে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যান। কবিরসিক শ্রোতা ও অনুরাগীবৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করতেন—

হরি আচার্যের কাব্যোদ্যানে ফুটেছে দু'টি ফুল।
একটি তার রাজেন্দ্র সরকার আরেকটি নকুল ॥

১৩২২ সালে নকুলেশ্বর ঝালকাটির রাঙ্গা যামিনীর দলে খোদ সরকার হিসেবে যোগ দেন এবং এক বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে দল পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৩২৩ সালে তিনি নিজস্ব দল গঠন করেন। ইতি মধ্যে তাঁর গুরু কুঞ্জ দত্ত নিজস্ব দল বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। এবং নকুলেশ্বরকে "বীণাপাণি কবি পার্টি" নামে তাঁরই দল চালাতে বললেন।

বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুপ্রেরণায় কবিগানের মাধ্যমে স্বাদেশিকতা প্রচারের অপরাধে তিনি খুলনা জেলায় গান গাওয়ার সময় একবার পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। হাজতবাস ও কোর্টে চালান দেওয়ার পর তাঁর কবিগানের উপর ১৩৩০ থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। পূর্ববঙ্গের কবিগানের ললাটে এই স্বদেশ সেবার রাজটীকা কবিয়াল ও কবিগানের প্রাণশক্তির এবং জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার প্রতীক। নকুলেশ্বর ঐ পাঁচ বছর কবিগান বন্ধ রেখে "বীণাপাণি কীর্তন অপেরা" নাম দিয়ে কীর্তন যাত্রার দল করেন। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পুনরায় কবির দল পত্তন করে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গে অপ্রতিহত প্রভাবে গান গেয়েছেন।

১৯৫০ এর বরিশালের প্রলয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত নকুলেশ্বর দৈবানুগ্রহে প্রাণে বাঁচলেন এবং জন্মের মতো পূর্ববঙ্গের মায়া ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কোন রিলিফ বা রিফিউজী ক্যাম্পে ভর্তি না হয়ে কেবল নিজস্ব কণ্ঠ ও সঙ্গীত প্রতিভার উপর নির্ভর করে তিনি আবার দল গঠন করেন এবং তাঁরই মতো ফরিদপুর থেকে আগত কবিয়াল নারায়ণ চন্দ্র বালার সঙ্গে জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় পদ্ধতির কবিগানের প্রচার ও প্রচলন করলেন। আজো পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় কবিগানের যে কিছু রেওয়াজ আছে তার প্রাথমিক কৃতিত্ব এই দুই কবিয়ালেরই প্রাপ্য।

নকুলেশ্বরের কবিগান সম্পর্কে বিদগ্ধ শ্রোতাদের মন্তব্য—

"ইনি নিজে দল গঠন করিয়া নিজেই সেই দলের সঙ্গীত রচনা করেন; উত্তর প্রত্যুত্তরও তাঁহারই রচনা। আগমনী, মালসী, গোষ্ঠ, সখী সংবাদ—সমস্ত রকমের সঙ্গীত রচনাতেই ইনি সিদ্ধ হস্ত। কবির আসরে দেখিয়াছি এই সৌম্য প্রিয়দর্শন দলপতি যখন আসরে প্রবেশ করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তথা প্রতিপক্ষ কবির দল ইঁহার রচনা নৈপুণ্যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ইনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব এবং বিনয় নম্র।" (সংসদ, মাঘ, ১৯৪৫—শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ)

"প্রবীণতম লোক কবি নকুলেশ্বর সরকার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; বক্তব্য প্রকাশের দ্রুততায় এবং সতর্ক শব্দ চয়নে তিনি অদ্বিতীয়। আজো তাঁর সুরেলা কণ্ঠ শ্রোতৃ মনকে পুলকিত করে। শাস্ত্র জ্ঞান তাঁর অপরিসীম; যুক্তিবাদী এই যশস্বী শিল্পী ধর্মশাস্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় আমাদের মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন। বৈষ্ণব-পদাবলী থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে কীর্তন গেয়ে তিনি শ্রোতাদের পরম পরিতৃপ্তির আনন্দদান করেন। ছুৎমার্গ, কৌলীন্য প্রথা, মদ্যপান প্রভৃতি অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।" (অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ, কবিগান সাহিত্যপত্র, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫)

ছদ্মবেশে আমাদের সমাজ ও ধর্মে, আমাদের আচার ও আচরণে যে সব ব্যভিচার ও আবিলতা লুকিয়ে আছে তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে। —সাময়িক ও সামাজিক সমস্যামূলক সঙ্গীত রচনা করে তিনি প্রকৃতপক্ষে গণ-কবিয়ালের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সে সব গান থেকে আংশিক উদ্ধৃতি—

(১) আগে স্পর্শ করলে মদের পাত্র, ব্রাহ্মণ হতো অপবিত্র,
লাগত তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা—এখন মদের মটকী তারা।
মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বন্ধ,
ধ্যান ধারণা পিতৃ শ্রাদ্ধ, শুদ্ধ হয় না মদ্য ছাড়া ॥

(২) নিষ্কামী বৈষ্ণবের ধর্ম নাই মা কলিকালে,
এমন নির্মল ধর্মে দাগ লাগাল কিশোরী ভজনের দলে ॥
বৈষ্ণবের নাই কৌপনী কাছা, সামনে দোলে লম্বা কোচা,
ভোগের নামে অন্ন বেচা, ব্যবসা চলে।
কোন আখড়া, ‑‑রা কাঁকড়ার চাড়া, লাবড়া গেল রসাতলে ॥

(৩) ছিল গান্ধীবাদের মূল মহত্ব, গঠন করতে রাম রাজত্ব,
মনে আশা করে—আশা গেল ছারেখারে।
যত কুমন্ত্রী মন্থরার দোষে, রাম গিয়েছে বনবাসে,
দেশবাসী আজ মরে ত্রাসে, ছদ্ম রাবণের হুঙ্কারে ॥

(৪) শুনি ব্রাহ্মণে গায়ত্রী পড়ে, পবিত্র স্বভাব ধ'বে,
সবারে করবে পরিত্রাণ;
যত অশুচিরে শুচি ক'রে, আদরে বক্ষে দিবে স্থান।
ঘোর পাপী হলে পরে, গঙ্গায় পাপ ক্ষালন করে,
যদি গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সেই গঙ্গা পাতকুয়ার সমান ॥

(৫) আছি বাস্তু হারা হিন্দু যারা, হবে মোদের বাস্তু গড়াতে,
আবার হবে দাঁড়াতে—পথের কাঁটা হবে সরাতে।

কোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাঁধ বাটী,
সঙ্গে রেখ বাঁশের লাঠি, বনের ফেউ আর মহিষ তাড়াতে ॥

(৬) যেদিন স্বরাজ নিতে, নিশান হাতে, বঙ্গবাসী হয়ে অগ্রণী,
তেজে কাঁপায় মেদিনী—বলে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।
নষ্ট করতে ব্রিটিশ শাসন, সত্যাগ্রহ আর অনশন,
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সে বাঙ্গালীর অমর কাহিনী ॥

(৭) যারা গদী পাওয়ার কয়দিন পরে, নিজেদের দলের ভিতরে,
বাধাল নটখটি—তারা দেখায় পরের ত্রুটি।
আগে না ঘুচায়ে আত্ম দ্বন্দ্ব, করতে চায় দুর্নীতি বন্ধ,
ডাইলের সঙ্গে নাই সম্বন্ধ, কেবল সম্ভারের ফুটফুটি ॥

(৮) দারুণ ভেজালের আবর্ত হতে, দেবদেবীও পেল না রেহাই,
কত মূর্তি দেখতে পাই—মৃৎ শিলা আর ধাতু কাষ্ঠ নাই।
আখ চিবানো ছোবড়া দ্বারা, দুর্গামূর্তি করে খাড়া,
ঝিনুক শামুক কাঁকড়ার চাঁড়া, ভেজাল দিয়ে ভেজাল মা গড়াই ॥

(৯) কত সুপবিত্র দ্বিজের পুত্র, নাই তিলক কুশ পবিত্র,
গুটি সুতার যজ্ঞ সূত্র পরে—দিল তন্ত্র মন্ত্র ছেড়ে। মাগো—
ছিল সাম্ ঋক্ যজু আর অথর্ব, বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব,
সর্ব গর্ব করল খর্ব, ঐ সব অর্বাচীন বর্বরে ॥

(১০) যারা ভোট দিতে সেই কংগ্রেসেরে হয়েছ বেতাল।
তারা হুজুগে ধরো না যেন, মরা বৃক্ষের ডাল ॥
হায়গো, ভারতের এই স্বাধীন তরী,
কর্ম-নদী দিতে পাড়ি,
এতদিন আছেন কান্ডারী, পন্ডিত জহরলাল।
করো তার চেয়ে পাকা কান্ডারী, কান্ডার বহাল।
যেন মাঝ দরিয়ায় নিয়ে তরী, না করে বানচাল ॥

অনাচারী ব্রাহ্মণের অতি-আচারী মনোভাব এবং অব্রাহ্মণদের প্রতি মনুষ্যত্বহীন আচরণ লক্ষ্য করে কবি গেয়েছেন—

খেতে গেলে বামুন বাড়ী, কুকুর বিড়াল মনে করি,
ভাত বেড়ে দেয় আঁইটা কলার পাতে ;
যত মাছ মাংস আর পায়েস পিঠা, সকলি এক সাথে।
খেতে পার আর না পার, খাওয়ার পরে আইঠা পাড়,
এমন বাওন খাওন ছাড়, জাত যাবে না মুচীর ভাতে ॥

সনাতন ধারার কবি সঙ্গীত ছাড়াও নকুলেশ্বর যে সব সমস্যায় দেশ জাতি সমাজ জর্জরিত আড়োলিত আন্দোলিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। পৌরাণিক গানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ালম্বী সঙ্গীত রচনায় তাঁর লেখনী ও মস্তিষ্ক শেষ দিন পর্যন্ত সক্রীয় ছিল। এ জাতীয় অসংখ্য গান এবং পূর্ব বঙ্গের বহু প্রাচীন কবিয়ালের সঙ্গে গান ও জবাবের নিদর্শন সম্বলিত তাঁর দুই খানা বৃহৎ খাতা চুরি হয়ে যায়। তাতে বাংলার জনজীবনের সত্তর আশি বছরের ইতিহাস গানের মাধ্যমে বিধৃত ছিল।

সুদীর্ঘ ৭০ বছর কবিগান গেয়ে, এবং শেষ গানের দিন পর্যন্ত দু'-তিন ঘণ্টা অনর্গল সাবলীল ছন্দে টপ্পা-ছড়া-পাঁচালী গাওয়ার সামর্থ থাকতে ৮৮ বছর বয়সে তিনি কবিগান থেকে অবসর নেন। এবং নদীয়া জেলার চাকদহে খোসবাস মহল্লায় অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন। সেখানে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফ্রেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ৯২ বছর বয়সে সরস্বতীর বরপুত্র নকুলেশ্বরের বাণীকণ্ঠ চিরতরে নীরব হয়ে যায়।

নকুলেশ্বরের কবি-জীবন অনেক ঘাত প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। এই গান গেয়ে তিনি যথেষ্ট ধন মান যশ অর্জন করেছিলেন। "কবিয়াল কবিগান" নামক সুবৃহৎ জীবন-ভিত্তিক গ্রন্থ তাঁর কবিজীবনের তথা পূর্ব বঙ্গের কবিগানের অনেক অজ্ঞাত তথ্যে পবিপূর্ণ। এই গ্রন্থ কবিগানের "মহাভারত" "কবিগানেব মিউজিয়ম" "কবিগানের বিশ্বকোষ" বলে সুধী·সমাজে সমাদৃত সম্বর্ধিত হয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর পুত্র শ্রীকালীপদ সরকার পিতাব রচিত পল্লীগীতি, দেহতত্ত্ব, শ্যামাসঙ্গীত, ভাটিয়ালী জাতীয় গানগুলি "নকুলেশ্বর গীতিমাল্য" নামে প্রকাশ করেন।

নকুলেশ্বর ছিলেন পূর্ববঙ্গের কবিগানের শেষ সার্থক প্রতিনিধি। তাঁর অবর্তমানে পূর্ব বঙ্গের কবিগ - রূপ-রস-ছন্দ-অলংকার বিহীন তর্জাগানের প্রায় সমগোত্র হয়ে পড়েছে।

## মধুসূদন কাড়ার ( যশোহর )

প্রসিদ্ধ 'লোহাগড়ার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, 'লোহাগড়া গ্রামে সেকাল-একালে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে কবি, দোহা, জারি, প্রভৃতি গানবাজনা খুব হইত। আমাদের তারকচন্দ্র কবি-রসরাজ ( কাড়ার ), যশোহরের ইন্দু বিশ্বাস পাগলা কানাই ও কালম গাজির কবি, জারি ও গাজির গীত বাংলাদেশে সর্বত্রই পরিচিত। একালে আমাদের গ্রামের মধুসূদন সরকার ( কাড়ার ) একজন নব্য কবিদার।"

পুনশ্চ ঃ "এই সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ৺মধুসূদন সরকার মহাশয়। তাঁর জন্মস্থান হল যশোর জিলার লোহাগড়া গ্রামে। তিনিও কবি ছিলেন। তিনি

কবিগান কারও কাছে শিক্ষা করেন নি। কিন্তু তারককে মানস গুরু হিসাবে মানতেন। একলব্য যেমন দ্রোণাচার্যকে গুরু হিসাবে পান নি, কিন্তু তাঁর মূর্তি গড়ে তাঁর সামনে অস্ত্রবিদ্যা শিখে প্রখ্যাত হয়েছিলেন, মধুসূদনও সেইরূপ তারককে গুরু বলে জানতেন। পার্থক্য, দ্রোণাচার্য একলব্যের গুরু হতে অস্বীকার করেছিলেন, আর মধুসূদন তারকের মৃত্যুর অনেক পরে কবিগান আরম্ভ করেছিলেন এবং তিনি বাড়িতে মন্দির করে কোলকাতা থেকে জিনিষপত্র নিয়ে তারকের মূর্তি গড়ে উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।* * * মধুসূদন এই মন্দিরে বসে কবিগানের চর্চা করতেন।" ( পূর্ববঙ্গের অধুনা লুপ্ত কাড়ার জাতির ইতিহাস—শ্রীননীগোপাল দাশ )

মধুসূদন সরকারের কবিগান শিক্ষা সম্পর্কে জনশ্রুতি শোনা যায়—"মধুসূদন প্রায়ই এসে ঠাকুর ঘরের সামনে মাটিতে বসে থাকতেন আর কবিগান প্রাকটিস্ করতেন। একদিন মধুসূদন স্বপ্নে দেখলেন, গোঁসাই যেন তাকে বলছেন, কবিগানই যখন তুই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিস্ তখন আমার বাড়ীতে অমুক ঘরের অমুক জায়গায় বাক্সের মধ্যে কিছু কাগজপত্র আছে, তুই নিয়ে আসিস্।' সত্যসত্যই মধুসূদন সেখানে খোঁজ করে কিছু কাগজপত্র পেয়েছিলেন।" ( কবি রসরাজ তারক গোঁসাই—ননীগোপাল দাশ )

মধুসূদন অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তার কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি।

## নারায়ণচন্দ্র বালা ( ফরিদপুর )

ফরিদপুর জেলার মুকসুদপুর থানার অধীন গোহালা গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বর বালা নামে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর এক ভ্রাতা পরীক্ষিৎ বালাও ছিলেন একজন কবিয়াল। এরা কায়স্থ বংশোদ্ভব ; কৌলিক উপাধি 'দে সরকার'—কিন্তু 'বালা' নামেই এদের পরিচিতি। সাত আট পুরুষ পূর্বে এই বংশে গৌরী বালা নামে একজন সুবিখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক ছিলেন। ঝাড়-ফুক, লতাপাতা, ফুক-তেল পড়া ইত্যাদির সাহায্যে তিনি বসন্ত রোগ নিরাময় করতেন। এই জাতীয় চিকিৎসকদের 'বসন্ত বালা' বলা হতো। সেই থেকেই এই বংশের উত্তরাধিকারীগণ "বালা" নামে পরিচিত।

ঈশ্বর বালার পুত্রদ্বয় মথুরানাথ বালা এবং অম্বিকা বালাও কবির সরকার ছিলেন। মথুরানাথ বালা ১২৭০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩রা চৈত্র মারা যান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মথুরা বালার সুযোগ পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বালাকে নিয়ে এই বংশে কবিগানের ধারা তিন পুরুষে গড়াল। একটি গানে ফরিদপুরেরই এক চারণ কবি গেয়েছেন—

কবিতে চন্ডী গণক ঈশ্বর বালা—
এই রাজ্যে কবিয়ালা বলি।
মথুর অম্বিকা পরীক্ষিৎ, কবিতে হল দীক্ষিত,
অধরচাঁদ যাদব রক্ষিত, কোদাই মালী রাখার ঢালী।
ভেবে জলধর কয় রজনীরে, দিনের দিন তোমার আমার
তহবিল খালি॥

১৩১২ সালের ১২ই বৈশাখ নারায়ণ সরকারের জন্ম। পাঠ্যাবস্থাতেই বার বৎসর বয়সে তিনি মনসামঙ্গল বা রয়াণী গানে যোগ দেন। গোহালার 'বালা' বংশের আর একটি পারিবারিক ঐতিহ্য এই রয়াণী গান। ঊর্ধ্বতন সপ্তম কি অষ্টম পুরুষ গৌরী বালা থেকেই এই গান তাঁরা বংশ পরম্পরায় গেয়ে আসছেন। কবির পিতামহ ঈশ্বর বালা ও পরীক্ষিৎ বালা, এবং পিতা ও পিতৃব্য মথুর বালা ও অম্বিকা বালা কবিগানের সঙ্গে রয়াণী গানও গাইতেন। পাঠ্যাবস্থায় বার বছর বয়স থেকেই রয়াণী গানে জড়িয়ে পড়ায় অকালেই নারায়ণবাবুর লেখাপড়ায় সমাপ্তি রেখা টানতে হয়। বাইশ বৎসর বৎসর বয়স থেকে রয়াণী গানের সঙ্গে তিনি কবিগানও গাইতে সুরু করেন।

কবিগানে তাঁর শিক্ষা গুরু কে—এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন—আমি হাতে কলমে কখনো কাহারো দলে শিক্ষানবিশী করি নাই। তবে আমার বাবা মথুরা বালা ও পিতামহ ঈশ্বর বালার লেখা কতগুলি গান আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলাম। ঐগুলি লইয়া খুব গভীর ভাবে নিজে নিজেই অনুশীলন করিয়াছি। অনেকটা একলব্যের মতই সাধনা বলা যেতে পারে। তবে আমার গুরু বন্দনার সময় আমি সর্বাদাই আমার পরমারাধ্য পিতামহ ও পিতৃদেবের নামোল্লেখ করিতাম

পূর্ববঙ্গের কবিগানের মধ্যযুগে কবি সম্রাট হরিচরণ আচার্য মহাশয় কবিগানকে অশ্লীলতা মুক্ত করে, নূতন ভাবভাবনা তান লয় সুর যোগে ছাড়া ভিটা, বটের তলা ও শ্মশানখোলার কবিগানকে গৃহস্থের অঙ্গনে পাবিবারিক উৎসবানুষ্ঠানের উপযোগী করে তোলেন। প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই কবিগানের স্বর্ণ যুগ আরম্ভ। মধ্য যুগের শেষ পাদে এবং শেষ যুগের প্রথম পাদে যে দইজন দিক্‌পাল কবিয়ালের চমকপ্রদ কৃতিত্বে কবিগান শ্রী ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে আরোহন করেছিল তাঁরা হলেন বরিশালের নকুলেশ্বর সবকার এবং খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার। এঁদের পরবর্তী কবিয়ালদের মধ্যে নারায়ণ সরকার এক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। কবিগানে চাতুর্যপূর্ণ জবাবে নারায়ণ বাবুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

কবির সমাজ সচেতনতা ও বাস্তবতা বোধের পরিচয় মেলে দেশ ও জাতির সমস্যামূলক সঙ্গীতসমূহে। যেমন ঃ—

# পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত

১। বিহারের ভূমিকম্প ঃ

ধরণী জগদ্ধারিণী তুমি ক্ষমাগুণের খনি,
সে গুণ কি হারালে কলিকালে।
ঘোর কলিল ঘোর অন্ধকারে,
তুমি রাগ করে সন্তানের পরে, এই কি করলে ভাল ;
তোমার স্তনস্বরূপ পর্বতের চাপে, ছেলেপিলে ম'ল।
দার্জিলিং দ্বারভাঙ্গা পুণা, মজঃফরপুর গয়া পাটনা,
দিয়ে শিলের উপর ছেলে বাটনা—
কোন্ ব্যঞ্জনে সম্ভার দিলে ?

২। যুদ্ধকালীন দুঃখদুর্দশা ঃ

বড় দুর্যোগে দুর্ভোগে পড়ে, মা তোমারে ডাকি বারে বার।
দেশের চৌদিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা লেগে গিয়েছে—
মাগো উঠেছে ভীষণ হাহাকার ॥
মা তোর মুক্তিকামী পুত্র যত, অবিচারে কারারুদ্ধ সব ;
হল নিরুদ্দিষ্ট সুভাষচন্দ্র ভারতের গৌরব।
হয়ে স্বাধীনতা লাভের অরি, শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী,
কি দিয়ে মা শুভঙ্করী, করি এ দুর্দিনে দুর্গোৎসব ॥
একে অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট, ঘোর অভাবে ক্লিষ্ট বঙ্গদেশ।
তাতে লবণ কেরোসিন অভাবে, দুর্দশার একশেষ।
মোদের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ, আমদানি রপ্তানী বন্ধ,
যদিও শেষ হল যুদ্ধ, মোদের জীবনযুদ্ধের হয় নি শেষ ॥

৩। দেশবন্দনা ঃ

জয় জয় বঙ্গভূমি, তোমার চরণে নমি,
চিরারাধ্যা মাগো তুমি, যত বাঙ্গালীর।
জন্ম নিয়ে তোমার কোলে, তোমার অন্নে তোমার জলে,
তোমার ফুলে তোমার ফলে, হয়েছে মা বর্ধিত শরীর।
তোমার বন আর উপবন, আমার পক্ষে তপোবন,
তোমার মলয় সমীরণ, স্নিগ্ধ করে আমার দেহমন।
তোমার অমল কমল গন্ধ, আমারে দেয় প্রেমানন্দ
তোমার ভাষায় কাব্যছন্দ, আমার প্রাণে জাগায় শিহরণ।

৪। মিলন গীতি ঃ

কর গৃহদ্বন্দ্ব সম্বরণ।
দুই জাতি নয় ঠিক যেন ভাই, দুই জনে একজন ॥

দেখ দুই বিনে ভাই, কোন দিনই হয় না কোন কাজ সাধন।
দেখ নিজের অবয়ব, তাতে আছে দুই দুই সব,
আবার দুই কানে কেউ দুই শোনে না, শোনে একই রব।
আবার দুই চোখে কেউ দুই দেখে না, একটি রূপ হয় দরশন ॥
দিবারাত্রি মিলনে, পূর্ণ একটি দিন গণে,
আবার দুই মাসে হয় একটি ঋতু কয় জ্ঞানীগণে।
আবার দুই পক্ষে হয় এক একটি মাস, এক বৎসরে দুই অয়ন।
এই যে হিন্দুর কালী মা, মুসলমানের ফতেমা,
মিছে কেন দলাদলি, শেষকালে এক মা।
যেমন ভাষা ভেদে মামু মামা, বাবার শালা একই জন ॥
তেমনি হিন্দু মুসলমান, মাত্র নামে ব্যবধান,
মূলে গেলে আমরা কিন্তু এক বাবার সন্তান।
যারে মুসলমানে আল্লা বলে, হিন্দু বলে নারায়ণ ॥

গতানুগতিক বিষয় ছাড়াও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গান ও টপ্পা জবাব রচনায় নারায়ণ সরকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। একবার কবিয়াল রাজেন্দ্র সরকার নিজে 'যোগেন্দ্র মণ্ডল' হয়ে এবং নারায়ণ সরকারকে 'জওহরলাল নেহেরু' সাজিয়ে টপ্পা করলেন ঃ—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তুমি প্রতাপে প্রবল।
আমি পাকিস্থানের মন্ত্রী হই, তোমার ন্যায় ধনীর দুলাল নই,
চাষীর ঘরে জন্ম লই—যোগেন্দ্র মণ্ডল ॥
তোমরা বর্ণ হিন্দু মোদের প্রতি, চিরদিন করিয়াছ অত্যাচার,
রেখেছ পায়ের তলায়, দাও নাই মানুষের অধিকার।
মোদের শোষণ করে তোমরা শেঠ, আমাদিগের খালি পেট,
ছিন্ন বাস পাতার কুঁড়ে সার
কেন মোদের ভাতে নুন জোটে না,
তোমাদের দুধ ঘিতে পূর্ণ ভাণ্ডার ॥

নারায়ণ সরকার উত্তর বললেন ঃ—

তোমার কল্পনায় জওহরলাল আমি, করে লই স্বীকার।
তুমি মন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডল, করেছ কুবুদ্ধি সম্বল,
পেয়ে মুসলমানের বল, হলে মিনিস্টার ॥
কেন দোষ দিয়ে বর্ণ হিন্দুকে, ঢাকতে চাও নিজেদের অক্ষমতা,
শিক্ষা দীক্ষা না হলে হয় না মানুষের পূর্ণতা।
এই যে মনুষ্যত্ব মহত্ব, আপনার করায়ত্ব,
অন্যে কি দিতে পারে তা।

যার যার নিজের ডিমে 'তা' না দিলে—
অপরে দেয় না কি সেই ডিমে "তা" ॥

কবির জন্মস্থান গোহালা থেকে মাইল দুই দূরে কলিগ্রামে অনেক দেশীয় খ্রীষ্টানের বাস। সেখানে বিরাট খ্রীষ্টান মেলা বসত। ঐ মেলায় তিন দিন ধরে নারায়ণ ও রাজেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণ বাইবেলের উপর ভিত্তি করে একাদিক্রমে ১৫/১৬ বৎসর কবিগান করেন। খ্রীষ্টান ধর্মভিত্তিক কবিগানে তাঁরা দুইজনই পথিকৃৎ। কবিগানেরই চিরাচরিত ধারায় রচিত এ জাতীয় গানের কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল—

খ্রীষ্টের জড় দেহ কবরে রেখে শোকে দুঃখে বিষণ্ণ সবাই।
তিন দিবসের পরে, সবে গিয়ে নিশি ভোরে
দেখে সে শূন্য কবরে যিশুর দেহ নাই ॥
বিস্ময়ে যত শিষ্যগণে চায় ইতি উতি,
লক্ষ্য কররের প্রতি।
সন্দেহ সবার অন্তরে, কেহ কিছু কয়না ডরে
সহসা কবরের দ্বারে, দেখতে পায় এক অপূর্ব জ্যোতি ॥
অমনি মুহূর্তে মহাজ্যোতি হল অন্তর্হিত,
হয়ে স্বর্গের দূত আবির্ভূত, বলে সবাকারে।
অন্ধ অবিশ্বাসী, সে যে অবিনাশী,
তোরা মৃতের কবরে আসি, কেন খুঁজিস তারে ॥

একবার ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার ভাদ্রা-দৌলতপুর গ্রামে কংগ্রেস অধিবশন উপলক্ষে কবিগান হয়। তখন গান্ধীজী সবেমাত্র গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরেছেন। গানের আসরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি বিপক্ষ কবিয়াল গোপাল শীলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মূলক টপ্পা করেন ঃ-—

আমি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইণ্ডিয়াবাসী।
তুমি ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার, সম্ভ্রমে করি নমস্কার,
পেতে সূক্ষ্ম সুবিচার, ইংলণ্ডে আসি।
এই যে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার,
ভারতবাসী চায় স্বরাজ, কেন আজ কর অস্বীকার।
করে স্বাধীনতা অভিলাষ, কোন্ দোষে দোষী সুভাষ
বিদ্রোহী আখ্যা কেন তার ?
যারা মাতৃভূমির মুক্তিকামী, তাদের স্থান সিংহাসন না কারাগার ॥

এই টপ্পা গেয়ে তিনি পাঁচালীতে বৃটিশ শাসনের বর্বরতা, পাশবিকতা ও অর্থ-নৈতিক শোষণ নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতৃবর্গকে উদ্ধৃত্ত করে তোলেন। হঠাৎ দৌলতপুর থানার দারোগা পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসরে এসে রাজদ্রোহের অপরাধে

নারায়ণবাবুকে সদলে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে একরাত্রি হাজতে আটক করে রাখে। স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় তিনি পরদিন মুক্তি পেলেও সরকারী আদেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার যে সব কবিয়ালের সঙ্গে তিনি গান করেছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ—

ঢাকা—হরিচরণ আচার্য, (নরসিংদী), মদন শীল (রাজখাড়া), পূর্ণ সরকার (কালিয়াকৈর), অম্বিকা পাটুনী (বেনুপুর), দেবেন্দ্র দাস (হাসাড়া), শেখ জইনুদ্দীন, রেবতী ঠাকুর, কুমুদ সরকার, গোপাল সরকার, তারিণীচরণ সরকার (মাসাব)।

ত্রিপুরা—অর্জ্জুনচন্দ্র দেবনাথ (আন্দিকুট), দুর্গাচরণ ধুপী (ভাসখোলা)।

চট্টগ্রাম—রমেশ শীল।

ফরিদপুর—শশী সরকার, হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার (দুর্গাপুর) ছোট রজনী (নিজড়া) বড় রজনী, রাসবিহারী সরকার (জানদি), গঙ্গাচরণ সরকার, নিশিকান্ত সরকার (ভৈরবনগর)।

যশোহর—যোগেন শীল, রাজেন্দ্র মালো, রসময় সরকার, বিজয়কৃষ্ণ সরকার (ডুমদী)।

বরিশাল—শরৎ বৈরাগী (ঝালকাটি), নকুলেশ্বর সরকার (সুয়াকাটি+ঝালকাটি)।

খুলনা—বিজয় সরকার (চালনা) কালীপদ সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার (চুনখোলা)।

দেশভাগের পরেও কবি পূর্ববঙ্গে থেকে যান। কিন্তু ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অধিকাংশ সম্পন্ন হিন্দুর দেশত্যাগের ফলে পূজা পার্বণ, গান বাজনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে কবি ১লা সেপ্টেম্বর দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এবং বরিশালের স্বনামধন্য কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের সহযোগিতায় আবার কবির দল গড়ে তোলেন। এই দুই কবির চেষ্টায় এবং বাস্তুহারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আনুকূল্যে কবিগান আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গে আসর জমিয়ে তোলে। কলিকাতার সমস্ত বড় ·বড় মার্কেট ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রমে গঞ্জে, উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় এমন কি বাংলার বাইরে সাঁওতাল পরগণা, জামসেদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁরা কবিগান পরিবেশন করেছেন। উপরন্তু নারায়ণ সরকার মহাশয় কলিকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে ও মার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে, ভাবতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদের কবিয়াল সেখ গুমানী দেওয়ানের সঙ্গে কাব্যদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কলিকাতায় নিরন্ন নরনারীর ভুখা মিছিলেলের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে কবি রচনা করেছিলেন—

বাংলা জুড়ে উঠেছে আজ ক্ষুধার্তদের আর্তনাদ ;
জয়নগর আর কৃষ্ণনগর, সন্দেশখালি হাসনাবাদ।
মানুষ মরে অনাহারে কে করে তার প্রতিকার,
মন্ত্রীরা সব ভাবেন বসে কিসে হবে পকেট ভার।
মূল্যহীন এই স্বাধীনতা আমরা তবে পেলাম কি,
দেশবাসী প্রায় উপবাসী দু'একজনার পাতে ঘি।
নিরন্নেরা ছুটে আসে বলতে তাঁদের অন্নাভাব,
স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রীরা তার গুলির মুখে দেন জবাব।
এই নাকি সেই রামরাজত্ব গণতন্ত্র এরই নাম,
এর লাগি কি ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিল সেই ক্ষুদিরাম।
দেশের যত দামাল ছেলে ফাঁসীকাষ্ঠে দিল প্রাণ,
তারা কি কেউ চেয়েছিল এই জাতীয় প্রতিদান।
দীনেশ-বিনয়-বাদল-যতীন অগ্নিযুগের যত বীর,
হয় ত তারা এ সব দেখে লজ্জাতে আর নতশির।
প্রীতিলতা মাতঙ্গিনীর আত্মদানের এই কি ফল,
মশা গেল সাগর পারে জুটল দেশী জোঁকের দল।
মসনদে আজ বসে যারা তুচ্ছ করেন জনমত ;
এদের কাছেই তাদের আবার দিতে হবে কৈফিয়ৎ।
আমরা চাই না দলাদলি, ধারি নাকো তর্কের ধার,
দেশবাসী চায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নারায়ণ সরকার পরলোক গমন করেন।

## দুর্গাচরণ ধুপী সরকার (ত্রিপুরা)

ত্রিপুরা জেলার ভাসখোলা গ্রামে দুর্গাচরণ সরকারের জন্ম। দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের পূর্বাংশে যে কয়জন সৃষ্টিশীল কবিয়াল ছিলেন দুর্গাচরণ তাদের অন্যতম। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা ও বরিশাল অঞ্চলে তিনি তৎকালীন বহু কবিয়ালের সঙ্গে গান করেন। টপ্পা-পাঁচালী ছাড়া ডাক, মালসী, সখী সংবাদ সম্পর্কীয় সঙ্গীত রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল এবং সুকণ্ঠ দোহার-পত্রে গঠিত সদলে তিনি গান করতেন। একবার নোয়াখালী জেলার বাবুপুর গ্রামে নতুন ঠাকুরবাড়িতে ত্রিপুরা জেলারই সকদি নিবাসী শচীন্দ্র শীল কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় দুর্গাচরণের বিরুদ্ধে এক রঙফুকার করেন—

কবিগানের নাম শুনিয়ে,
দুর্গাচরণ এল ধেয়ে।
এখন লেপের তলে শুয়ে শুয়ে—
* * * কোল বালিশের খোল ॥

দুর্গাচরণ মোটা রঙ-এর রঙফুকারে আরো রঙনা চড়িয়ে শ্রীরাধার ভাবোন্মত্ততার মিশাল দিয়ে রসোত্তীর্ণ জবাব করে আসরে খুব বাহবা পেয়েছিলেন—

নিষ্কাম প্রেমের বিকাশ হলে প্রাণে, জ্ঞান থাকে না জড়ে প্রাণে,
শুদ্ধ প্রেমের তাই জানি লক্ষণ ; ও তার প্রমাণ আছে বিলক্ষণ।
তুমি শোন নাই কি ব্রজবাসে, শ্রীরাধিকা প্রেমাবেশে,
কৃষ্ণভ্রমে ছুটে এসে—করেছিল তমাল তরু আলিঙ্গন ॥

সাধারণ পরিবার ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবং সামান্য লেখাপড়া শিখে কেবলমাত্র ভক্তি প্রীতিরসে ও হৃদয়াবেগে দুর্গাচরণ খ্যাতিলাভ করেন। সুললিত সঙ্গীত রচনা এবং আসরে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য উত্থাপনে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর পুত্র রাইহরণ সরকারও পিতৃগুণের অধিকারী হয়েছিলেন।

ঢাকা জেলার ভাগ্যকুলের নিকটবর্তী কাটিয়াপাড়া গ্রামে ধীরেন্দ্র রুদ্রের বাড়িতে কবিগানে দুর্গাচরণ সরকার নিম্নোক্ত টপ্পা করেন—

আমি কল্পনাতে মধুমঙ্গল থাকি গোকুলে।
আমরা সঙ্গে নিয়ে ভাই কানাই, গোঠেতে রাখি বৎস গাই,
খেলা করতে আসি যাই, যমুনার কূলে ॥
তুমি মামা আয়ান হও নিঃসন্তান,
ভাগ্নেকে আদর করে শান্তি পাও ;
মামা মামী দু'জনে, ভাগনে কানাইর ভাল চাও।
তোমার ভাগিনা চিকনকালা, যে গাছ করে খেলা,
তাই তোমার রাগে জ্বলে গাও।
কালার খেলার বৃক্ষ এই কদম্ব—
কেন তুমি দম্ভ করে কাটতে যাও ॥

তারিণী সরকার এই টপ্পার নিম্নরূপ জবাব করেছিলেন—

তুমি কল্পনাতে মধুমঙ্গল কানাইয়ার চেলা।
ধন্য ধন্য তোমার চরিত্র, পুলকে পূর্ণিত গাত্র,
কর কানাইর সাথে দিনরাত্র, গোচারণ খেলা ॥
কালার খেলার বৃক্ষ এই কদম্ব—
কি জন্য দম্ভ করে কাটতে চাই ;
মধুমঙ্গল এই বৃক্ষ থাকতে, কালার মঙ্গল নাই

আমার ভাইগ্নেটা চঞ্চল বটে, সর্বদা গাছে উঠে,
মানে না কারও ডাক দোহাই ;
যদি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে মরে—
শেষে বা গুণের ভাগিনা হারাই ॥ ( সংগ্রহ )

## রমেশচন্দ্র আচার্য ( নোয়াখালী )

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অধীন শিবপুর গ্রামে আনুমানিক ১৯০৭ সালে কবিয়াল রমেশচন্দ্র আচার্য এক দৈবজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় খুব বেশী দূরে অগ্রসর না হলেও পারিবারিক পেশা সূত্রে শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়নে রত হন। বাংলা ১৩৩৪ সনে তিনি কবিগুরু হরিচরণ আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কবিয়ালী শিক্ষা করেন। আচার্য কর্তার কবি-জীবনের শেষকালের শিষ্যদের মধ্যে রমেশচন্দ্র অন্যতম ছিলেন। নিজস্ব কোন কবির দল না থাকলেও রমেশচন্দ্র সারা জীবন সখের দলের 'সরকার' রূপে বহু বিখ্যাত কবিয়ালের বিপক্ষে গান করেছেন। গান রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না থাকলেও চোখস জবাব, টপ্পা পাঁচালী ও রঙ ফুকারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অনর্গল ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বরিশালের নকুলেশ্বর সরকার, হরিচরণ নাথ, ঢাকার শ্রীতারিণীচরণ সরকার, ত্রিপুরার দুর্গাচরণ সরকার, রাইহরণ সরকার, শ্রীকালশশী সরকার, গোবিন্দ ধুপী, শচীন্দ্রকুমার শীল এবং নোয়াখালীর কাশীনাথ নট্ট, তারিণী নট্ট, বিপিন সরকার, অক্ষয় আচার্য, যতীন্দ্র গণ প্রভৃতি সরকারের সঙ্গে তিনি বহু গান করেন।

একদা নোয়াখালী জেলার বাবুপুর গ্রামে ক্ষীরোদ দে'র ( ক্ষীণা ) বাড়িতে গানে বিপক্ষ কবিয়াল বরিশালের হরিচরণ নাথ রমেশ আচার্যের পক্ষের রাধারানী নাম্নী সুকণ্ঠী অথচ কৃষ্ণবর্ণা এক গায়িকাকে "আলকাতরা সুন্দরী" আখ্যা দিয়ে রঙ ফুকার করলেন—

দেখি বিপক্ষে এক কাল ছুক্‌রি
গান গায় আর মাজা দোলায়।
আলকাতরা সুন্দরীর রূপে
আসমানের চাঁদ লাজে পালায় ॥

রমেশ আচার্য পরের আসরে জবাব দিলেন—

বাবু, ফুকারে সবার সম্মুখে,
আলকাতরা সুন্দরীর রূপে,
পালায় নাকি শশধর ;
বেটা ধর ধর আমায় কথা ধর।

লোকে বলে কথার কথা,
মিথ্যা কি হবে এ কথা,
জানি রমণীর রূপ পতিব্রতা,—
কোকিলের রূপ কণ্ঠস্বর ॥

হরিচরণ নাথ আবার এসে পতিতা শ্রেণীব উক্ত গায়িকার পতিব্রতা রূপকে বিদ্রূপ করে রঙ ফুকার করলেন—

পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা, ঐ দলেতে রাধারানী ;
বৃন্দাবন থেকে এলেন, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি !

রমেশ আচার্যের জবাব—

বাবু, ফুকার করে আমি শুনি, এই দলেতে রাধারানী,
কেমন রূপেব নমুনা ;
তুচ্ছ স্বরস্বতী যমুনা ।
ব্রজেশ্বরী রাধারানী, ভক্তিপ্রেম প্রদায়িনী,
এটা হাটবাজারগা রাধারানী—কার সঙ্গে কার তুলনা ॥

একবার কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় বাতিখা গ্রামে রমেশচন্দ্র ঢাকার তারিণীচরণ সবকাবেব বিরুদ্ধে এই টপ্পা কবেছিলেন—

আমি কুমারী জাহ্নবারানী কাব্যের ভূমিকায ।
পেয়ে নাম প্রেমের মকরন্দ, মন ভ্রমর রেখেছ বন্ধ,
তোমার চিত্তে নিত্য আনন্দ, নিত্যানন্দ রায় ॥
আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বসুধারে, কালরাত্রে বিয়া করে শান্তি পাও ।
বনাই আজ ন .ই করে, কি জন্য অশান্তি বাড়াও ।
কবে সবিশেষ সমারোহ, বোনকে করে বিবাহ,
বাসরে রজনী কাটাও,
আমার বড় বোনের কি দোষ ধরে—
আজ আবার আমায় বিয়া করতে চাও ?

উত্তরে তারিণী সরকার গাইয়েছিলেন—

তুমি কল্পনায় জাহ্নবী সতী কাব্যের বিধানে ।
তুমি সম্পর্কে আমার শালী, এত দিন রয়েছ খালি,
করব আলগা প্রেমের ঘটকালি, আজ তোমার সনে ॥
আমি গৌরাঙ্গের আদেশ প্রসঙ্গে—
রঙ্গেতে বিয়া করলেম বসুধায় ।
তোমায় বিয়া করিতে মনেতে নাইকো অভিপ্রায় ॥

যখন পাতে দিলে ভাত, হাতে ধরে অকস্মাৎ,
টান দিয়ে কোলে লই তোমায়।
তোমার চাঁদমুখ দেখে পেয়েছি সুখ—
কৌতুকে যৌতুক নিতে চাই তোমায়॥

কোন আসরে কবিকে রঙ ফুকার গাওয়ার জন্য আদেশ দিলে আদেশ দাতার মনের ইচ্ছা তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন। কিন্তু সেই সুসভ্য পরিবেশে আদিরসাশ্রিত রঙ ফুকার করে আবহাওয়া দূষিত করতে কবির ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি একটি বিশুদ্ধ রঙ ফুকার করে আসরের মর্যাদা রক্ষা করেন—

করতে রঙের ফুকার কর্তৃপক্ষে,
আজ দেখি সবার সমক্ষে,
আদেশ দিলেন রমেশে;
আমি রঙ কবির কি উদ্দেশে।
দাঁড়ায়ে সভার ভিতর, অসৎ রঙে চিত্ত কাতর,
বাবু, কালগুণে কেরোসিন আতর;
ইক্ষু রস খায় বায়সে॥

বিপক্ষ কবিয়াল এই ফুকারের কি জবাব দিয়েছেন জানা যায় নি।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালী জেলার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কবি চাঁদপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে কবি শচীন্দ্র শীলের সঙ্গে গান গাইছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পে আচ্ছন্ন পরিবেশে তাঁরা তাড়াতাড়ি গান শেষ করতে চাইলেন; কিন্তু উপস্থিত এস, ডি, ও, সাহেবের অনুরোধে অতিরিক্ত এক আসর গান গাইতে বাধ্য হলেন। বাড়ির জন্য উৎকণ্ঠিত কবি ধুয়া দিলেন—

নির্বান আগুন জ্বালাইয়া দিলি রে—
আজ আমার মন ভাল না।
দেখি চারি দিকে ঘোর অন্ধকার—
আলোর নাই নিশানা॥

এদিকে বাড়িতে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী চারপাশে লুঠেরাদের জিগিরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন। সে চেতনা আর ফিরে আসে নি।

এই বিয়োগান্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেও কবি নোয়াখালী জেলার বাবুপুর গ্রামে কালীর হাটে কবিগান গাওয়ার সময় হিন্দু-মুসলিম মিলন গীতি গেয়েছিলেন—

আমরা বলি জল আপনারা বলেন পানি।
আমরা বলি দিদি আপনারা বলেন নানি॥
আমরা বলি পাতা আপনারা বলেন বরগ।
আমরা বলি বাতি আপনারা বলেন চেরাগ।

আমরা বলি মাংস আপনারা বলেন গোস্ত।
আমরা বলি বন্ধু আপনারা বলেন দোস্ত॥
দুই নামে দুই ভাইয়ে ডাকি একই বস্তু হয়।
বলতে গেলে আল্লা কালী এক ভিন্ন দুই নয়॥

দেশ বিভাগ ও দেশত্যাগের ফলে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা থেকে কবিগান প্রায় সমূলে উচ্ছেদ হয়ে গেল। কবির রুজি রোজগারের কোন পথ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালে কবি দেহত্যাগ করেন। তাঁর সুদিনে রচিত গানের কলিই নিষ্ঠুর সত্য প্রমাণিত হল ঃ

কবি বাণীর বর পুত্র,
লক্ষ্মীর অপ্রিয় পাত্র,—
শেষের দিনে ভিক্ষাপাত্র,
একমাত্র সম্বল॥ ( সংগ্রহ )

## রমেশচন্দ্র শীল ( চট্টগ্রাম )

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে পূর্ববঙ্গের বহুবিস্তৃত কবিগান ও বিপুল সংখ্যক কবিয়াল অপরিচিত হলেও চট্টগ্রামের রমেশ শীলের নাম অনেকেরই পরিচিত। কারণ এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে রমেশ শীল কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় কমিউনিন্ট ভাবাপন্ন বা তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও সহানুভূতিশীল সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই তাঁর নাম জানেন। আবার অন্যদিকে মাইজ-ভান্ডারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও সুফী মতবাদে আকৃষ্ট হওয়ার দরুন এবং দীর্ঘদিন প্রথানুগ কবিগান গাওয়া থেকে বিরত থাকায় সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ও কবি সমাজ তাঁর সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানাধীন গোমদন্ডী গ্রামের চন্ডীচরণ শীলের পুত্র রমেশ চন্দ্র শীলের জন্ম ১৮৭৭ সালে। বাল্যকাল থেকে তরজা গানের প্রতি ছেলের আসক্তি দেখে পিতা একখন্ড 'বৃহৎ তরজার লড়াই' তাঁকে কিনে দেন। তিনিও তা মুখস্থ করতে লাগলেন। যৌবনে একদিন চট্টগ্রাম শহরে সদরঘাট জেলে-পাড়ায় কবিয়াল মোহন বাঁশী ও চিন্তাহরণের কবিগান শুনতে যান। কিন্তু চিন্তাহরণ অসুস্থতা হেতু গান গাইতে অসমর্থ হলে তার জায়গায় রমেশচন্দ্র অবতীর্ন হলেন। এবং মোহন বাঁশীর বিপক্ষে সমানে পালা দিলেন। সে থেকেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, এবং তিনি গান গাওয়াকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রামের কমিউনিষ্ট নেতা বঙ্কিম সেনের চেষ্টা ও যত্নে রমেশ শীল কমিউনিষ্ট মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪৩ সনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ

লাভ করেন। ১৯৪৫ সনে কলিকাতায় ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনে মুর্শিদাবাদের কবিয়াল গুমানী দেওয়ান ও বীরভূমের লম্বোদন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গান .করে এই বঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিকদের নিকট তিনি পরিচিত হন।

দেশ ভাগের পরেও রমেশচন্দ্র পূর্ব বঙ্গে থেকে যান। ১৯৫৫ সনে রাজনৈতিক কারণে একবছরের জন্য তাঁকে পাকিস্থানী কারাগারে বিনা বিচারে আটক করে রাখে। ১৯৫৪ সালে কাগমারী সম্মেলনে (ময়মনসিংহ) এবং ১৯৪৮ সনে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমমতাবলম্বী গুণগ্রাহীগণ তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের পদক ও স্বীকৃতিপত্র দেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর রচিত কিছু গানের বই আছে—যেমন, "রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়া," "চাট গাঁয়ের পল্লীগীতি", 'দেশের গান', 'লোক কল্যাণ' 'অশোকমালা' 'নূরে দুনিয়া' ইত্যাদি। তাঁর রচিত তিনটি গান নমুনাস্বরূপ দেওয়া গেল—

১, সরলে গরলে মিশে না। সাধুরে ভাই প্রেম ত সকলে জানে না।
প্রেমের প্রেমিক বটে যারা, প্রেম নিয়ে মাতোয়ারা,
প্রেম বিনে আর কিছুই জানে না।
প্রেমের বিষে যারে ধরে, জ্ঞান থাকে না বাঁচে মরে,
চোখ দেখিলে আলুগে যায় চিনা।
ইছুপ আর ও জুলেখা নারী, আর দেখি ফরহাদ শিরী,
প্রেম করিল তারা কয় জনা।
প্রেমিক ছিল লায়লা মজনুন, দেখাইছে প্রেমেরি গুণ,
আগুন পানি কিছু মানে না॥
প্রেমেতে হইয়ে উতলা, প্রেম করিল গোপবালা,
নন্দের কালা শ্যাম কেলে সোনা।
চন্ডীদাসের রজকিনী, প্রেম কইরেছে তারা জানি,
এক মরণে মরে দু'জনা॥
প্রেমে হনু বক্ষ চিরে, বিল্বমঙ্গল চিন্তা ছাড়ে,
তপ্ত তৈলে বাঁচে সুধন্বা॥
রমেশ কয় বলি না মিছে, মন রইল কামিনীর পিছে,
কাম চিনিলাম, প্রেম চিনিলাম না॥

২, দেশ জ্বলে দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনও লোক জাগিল না কেনে॥

দিন মজুর ঘরজা যারা, গত সনে মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে।
মরে গিয়েও যারা আছে, তারাও মরতে বসেছে,
অনাহার আর রোগের পীড়নে ॥
দুইবেলা কেহ খায় না, কেহ কারো পানে চায় না।
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুরগণে।
অনাহারে শরীর জীর্ণ, মার বুকেতে দুগ্ধশূন্য
দুগ্ধপোষ্য মরে দুগ্ধ বিনে ॥
পুত্র কন্যা বেচে পিতা, ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা
দয়া নাইকো কাহারো পরাণে।
অন্নবস্ত্রে পেয়ে কষ্ট, কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট
দারুণ এই উদরের কারণে ॥

৩. জালালাবাদ! জালালাবাদ!
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ! জালালাবাদ!
দুশমন হঠাতে তব বক্ষ মাঝে রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল,
অসীম প্রতাপে যায় বীরদাপে, সঞ্চারিয়া দেহে নবীন বল।
ভঙ্গ দিল ত্রাসিত শ্বেতাঙ্গ, টুটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ।
সূর্য উঠিল তুর্য নিনাদি, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ভাতিল তায়,
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী, মনেতে গণিল পরমাদ ॥
বাজিয়া উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিক দিগন্ত উজালা,
অযুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বীর প্রসবিনী চট্টলা।
বীরের দেশে জনম লভেছি, পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ ॥
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ! জালালাবাদ!

[ সূত্র—(ক) কর্ণফুলীর কবিয়াল, সাধন দাশগুপ্ত পরিচয়, ডিসেম্বর ১৯৭৮
(খ) গণ কবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান—পুলক চন্দ ]

## শচীন্দ্রকুমার শীল ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার সক্দি গ্রামে আঃ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শচীন্দ্র শীল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ধমনীতে কবিগানের স্রোত পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুল থেকে প্রবাহিত ছিল। তাঁর পিতা চৈতন্য শীল একজন বড় কবির সরকার ছিলেন। আর মাতামহ হরকুমার

শীলের তো কবিয়াল হিসেবে দেশ জোড়া নাম ডাক ছিল। শচীন্দ্র শীল উল্লেখযোগ্য কোন গান রচনা না করলেও সখী সংবাদ ও কবির জবাব, টপ্পা ও টপ্পার জবাব, রঙ ফকার প্রভৃতি উপস্থিত গান জবাবে পারদর্শী ছিলেন।

ত্রিপুরা জেলার ঠান্ডাকালী গ্রামে কবিগানে শচীন্দ্র শীল তারিণী সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত টপ্পা করেন—

আমি কল্পনায় শিবের শুক পাখি থাকি কৈলাসে।
রত্নপ্রসূতা ভারতভূমি, তার একটি সাররত্ন তুমি,
জ্ঞানানন্দ গোস্বামী, ভাবের আবেশে॥
হিন্দুর শাক্ত শৈব গাণপত্য—
শাস্ত্রোক্ত পাঁচ প্রকার উপাসনা ;
পঞ্চভক্তের পঞ্চ মত, কোন পথ হয় সঠিক নিশানা।
যদি রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়, ভবের বন্ধন ঘুচে যায়,
এই কথা বিশ্বাস করি না ;
বললেম জীবন ভরা রাধাকৃষ্ণ—
আমার কেন পায়ের বন্ধন ঘোচে না॥

তারিণী সরকার এই টপ্পার নিম্নরূপ জবাব দিয়েছিলেন ঃ

তুমি ভাগ্যবান শিবের শুক পাখি কল্পনায় প্রকাশ।
ধন্য হলেম তোমার চরিত্রে, প্রেমাশ্রু বহে দু'নেত্রে,
পবিত্র কৈলাসক্ষেত্রে, থাক বার মাস॥
শুনি আরোগ্য ভাস্করাদিশ্চ, জ্ঞান দান করে সে ত্রিপুরারি,—
ধর্মমিচ্ছেদনুতানন মুক্তি দান করেন শ্রীহরি।
ও তোর পায়ের বন্ধন কাটিলে, চলে যাবি জঙ্গলে,
বলবি না আর হরি হরি ;
বলিস বেড়ির গুণে হরি হরি—
এটা তোর বেড়ি নয়, মুক্তির সিঁড়ি॥

দেশ বিভাগ ও দেশত্যাগের বেদনাময় দিনগুলিতে শচীন্দ্র শীলের নিম্নোক্ত ধুয়ায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অন্তরাত্মার কান্নাই ধ্বনিত হয়েছিল যেন—

দেশের মানুষ ছিল যারা, দেশ ছাড়িয়া চইলে যায়—
মোদের কি হবে উপায়॥

১৯৭৫ খৃঃ একদিন ভাগবত পাঠ কালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(সংগৃহীত)

## নন্দকুমার দাস ( নোয়াখালী )

"নোয়াখালী জেলার চরবদ্দুর হালিয়া দাস বংশোদ্ভব নন্দকুমার দাস সন্দ্বীপের কবি প্রতিভার অপর নিদর্শন। উচ্চ শিক্ষার সহিত অপরিচিত এই যুবক স্বীয় চেষ্টায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভাবলে শুধু সন্দ্বীপ, হাতিয়া, বামনী প্রভৃতি স্থানে নহে, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানেও তিনি 'কবি' গাহিতে আহূত হইয়াছিলেন। নোয়াখালীর এমন কবি অল্পই ছিলেন যাহাদের সহিত কবিক্ষেত্রে নন্দকুমারের দুই একবার প্রতিযোগিতা হয় নাই। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ সকলেই তাহাকে শতমুখে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতেন। নন্দকুমারের নিজের এক যাত্রার দল ছিল। তাঁহার স্বরও বড় মধুর ছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে নন্দকুমার অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যু শয্যায় দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও নন্দকুমার এক মর্মস্পর্শী গান রচনা করিয়াছিলেন।" গানটি নিম্নরূপ ঃ—

মন রে ! কি ধন লয়ে আসলি ভবে,
কি ধন লয়ে যাবি—
ত্রিবেণী তরঙ্গময়ী কেমনে পার হবি।
সে ঘাটের মাঝি যারা বড় হুসিয়ার,
তারা পাপী যেতে নিষেধ করে, সাধু করে পার।
মন রে ! তুমি কার কে তোমার কাহার জন্য কাঁদ—
অন্তিমের বল,—বল 'হরিবল', পথের সম্বল বাঁধ ॥

## প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত ও রামদাস কৈবর্ত ( নোয়াখালী )

সন্দ্বীপের কলিওয়ালাদিগের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত এবং রামদাস কৈবর্ত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। রামদাসের নিবাস ছিল ন্যায়মস্তি এবং প্রাণকৃষ্ণ হুদ্রাখালী বাসী ছিলেন। প্রায়-অশিক্ষিত নৌ-জীবী কৈবর্ত বংশোদ্ভূত হলেও গান রচনা ও পাঁচালী গাইতে এবং পয়ার ত্রিপদীতে ছড়া কাটিতে তাঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনায়াসে অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল উপস্থিত বোল আওড়াতে সক্ষম ছিলেন। এঁদের কবিত্ব শক্তির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় অনেক সময় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানেও এঁরা কবিওয়ালা বা 'সরকার' রূপে আহূত হতেন।

( সন্দ্বীপের ইতিহাস—রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস )

## হরগোবিন্দ আদিত্য ( শ্রীহট্ট )

শ্রীহট্টের ছোটলিখার আদিত্য বংশের হরগোবিন্দ আদিত্য একজন সঙ্গীতজ্ঞ সাধক ছিলেন,—তিনি সুন্দর মালসী গীত রচনা করিতেন ও তাহাই গাইতেন। তাঁর রচিত একটি গীত নমুনা স্বরূপ এস্থলে দেওয়া গেল—

| | | |
|---|---|---|
| তারা জগতজননী, | হায়গো তারিণী, | বালক পানে দয়া হইল না। |
| ষড়রিপু বল, | হইয়ে প্রবল, | ভবানীর তরী করিতেছে তল,(মা) |
| ভয় পাইয়া মনে, | ডাকি নিশিদিনে, | কিঞ্চিৎ নয়নে হের না ॥ |
| শমন আসিয়ে, | শিওরে বসিয়ে | ঘন ঘন ঘন ঘন্টা রব করে, ( মা ) |
| কার কাছে যাব | কিসে ত্রাণ পাব, | ঘুচিবে শমন তাড়না ॥ |
| প্রণতি করিয়া | শ্রীপদারবিন্দে, | শ্রীহরগোবিন্দে বলিছে আনন্দে, (মা) |
| আমি যদি মরি, | ও হরসুন্দরি, | দুর্গানাম যে কেহ লবে না ॥ |

( শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—অচ্যুত চৌধুরী )

## তারিণীচরণ সরকার ( ঢাকা )

হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের কবি-জীবনের শেষ পর্বের শিষ্যদের মধ্যে তারিণীচরণ সরকার অন্যতম। আনুমানিক বাংলা ১৩১০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা জেলান্তর্গত রূপগঞ্জ থানাধীন মাসাব গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত নমঃশূদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম রামকমল সরকার। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ। মাত্র পাঁচ মাস বয়সে কলেরা মহামারীতে মায়ের মৃত্যু হলে তিনি মাতুলালয়ে মাতামহীর আদর যত্নে বেঁচে থাকেন।

কিন্তু অনতিকাল মধ্যে মাতুলের মৃত্যু হলে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য, নির্যাতন ও নিপীড়নে তার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ফলে লেখাপড়া, তেমন কিছুই করতে পারেন নি। মাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেই পাঠ্য জীবনের ইতি ঘটে। কিন্তু স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, যা পড়তেন বা শুনতেন তা সহজে বিস্মৃত হতেন না। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন সরকার আচার্য মহাশয়ের দলের ধরতা দোহার ছিলেন। তিনি ছোট ভাইকে এনে কর্তার কাছে হাজির করেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে দোহার হিসেবে নিতে রাজী হন নি। তবে দলের ফুটফরমাইশ খাটার জন্য রেখে দিলেন। দুর্গা, লক্ষ্মী ও শ্যামা পূজার গান শেষ হলো। রাসপূর্ণিমায় আচার্য মহাশয়ের বার্ষিক গান ছিল ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি থানার কাউয়াদি গ্রামে হরিকান্ত পাল মহাশয়ের বাড়ি। প্রথম রাতের গানের পর দিন সকাল বেলা তিনি দোতালা নৌকার উপর তালায় দলের প্রসিদ্ধ গায়ক শরৎচন্দ্র নাথের সঙ্গে বসে দুর্গা পূজা থেকে রাস পূজা পর্যন্ত যত গান

হয়েছে তার জবাব এবং যত টপ্পা হয়েছে তার উত্তর এবং আচার্য কর্তার এক আসরের পাঁচালী তিনি উক্ত নাথ মহাশয়ের প্রশ্ন ক্রমে মুখস্থ বলতে লাগলেন। নিচের তালায় বসে আচার্য কর্তা আগ্রহভরে সব শুনে তারিনীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহনকে ডেকে এনে বললেন যে তারিণীর যা মেধা, একটু চেষ্টা করলেই সে একজন কবিগানের 'সরকার' হতে পারবে। চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাকে কর্তার পায়ে ফেলে দিয়ে বললেন যে আপনার শ্রীচরণে ওকে সঁপে দিলাম। এখন আপনি জানেন, আপনার ধর্মে জানে। আচার্য কর্তা দলের ম্যানেজার নোয়াখালীর বিশিষ্ট কবি কাশীনাথ নট্টকে ডেকে এনে তারিনীচরণের হাতে লাল সুতা বেঁধে দিয়ে তাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করলেন। আচার্য কর্তার নির্দেশে আসরে গান স্মরণ করিয়ে দেওয়া, জবাব বলে দেওয়া পাঁচালী বলা ইত্যাদি কাজ চালাতে লাগলেন। ক্রমে ভয় সংকোচ দূরীভূত হয়ে তিনি অচিরেই এক প্রতিশ্রুতিবান কবি বলে পরিগণিত হলেন।

১৩৩২ সন থেকে তারিণীচরণ নিজ সামর্থে গান গাইতে শুরু করেন এবং ১৩৩৮ সনে নিজস্ব দিল গঠন করেন। ডাক, মালসী, সখীসংবাদ, জবাব, রঙ ফুকার টপ্পা পাঁচালী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর গানেই নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রাখেন। তাঁর সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য বলেছেন, "শ্রীমান তারিনীচরণ সরকার আমার ছাত্র। তাহার বয়স যদিচ কম তথাপি কবিগানে তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আমি বড়ই ভালবাসি।"

ঢাকার হরিপুর গ্রামে হরিচরণ আচার্য ও শ্রীতারিনী সরকারের মধ্যে গান হয়। সেই গানে তারিণী নিজে কল্পনায় রুক্মিণী হয়ে এবং হরি আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে কল্পনা করে টপ্পা করেন—

তারিণী (প্রশ্ন)—আমি রুক্মিণ। দুঃখিনী তোমার চরণ প্রয়াসী।
তুমি প্রাণবন্ধু কংসারি দ্বারকায় পাতলে সংসারী।
ষোল শত অষ্ট নারী তোমারই দাসী।
তোমায় সযতনে বৃন্দাবনে, ফুল সাজে সাজাইত গোপীগণে,
তেমনি সাজে সাজাইতে, আমার মনের আকিঞ্চন।
দিলেম চূড়াতে কৃষ্ণচূড়া গলেতে গুঞ্জ ছড়া, তুমি তাই করলে গ্রহণ।
দিতে রাধা পদ্ম শ্রীপাদপদ্মে, আমাকে নিষেধ কর কি কারণ॥

হরিচরণ (জবাব)—আমার প্রেমের গুরু রাধিকে, সর্বগুণ সাধিকে,
আন্ত্রিকে ভাবি পদদ্বয়।
নিতে রাধাপদ্ম শ্রীপাদপদ্মে, প্রেমগুরু রাধার কথা মনে হয়।

তারিণী ( পুনঃ প্রশ্ন )—কিসে রাধা তোমার প্রেমের গুরু—
এ কথা হবে তোমার প্রত্যাখ্যান ;
নিধুবনে রয়েছে কৃষ্ণকালী তার প্রমাণ।

পিরীত করে সুজনে সুজন, দুজনে সমান ওজন,
কারো ভাব নহে অসমান।
নইলে সেব্য সেবক পূজ্য পূজক—
প্রেমরাজ্যে চরণ মস্তক এক সমান ॥

হরিচরণ—ব্রজে মধুর লীলা রসের খেলা
রয়েছে গোলোকে এই লীলার মূল।
লোকে বলে সংসারে নাম নামীতে সমতুল।
আমার গুরু নামে যে পদ্ম, পাদপদ্মে নিব অদ্য,
আমার কি এতই মতি ভুল ?
দিলে নির্বিবাদে তোমার পদে—
নিতে কি পার কৃষ্ণ-চূড়া ফুল ?

ঢাকা জেলার মাধবদি বাবুরহাট বাজারে প্রবীণ অম্বিকা পাটনী সরকারের সঙ্গে নবীন তারিণী সরকারের নিম্নরূপ বোল কাটাকাটি ( টপ্পা চাপান ) চলে—

তারিণী—আমি কল্পনাতে প্রেমানন্দ নিত্যানন্দের দাস।
দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে,
হরিনাম কীর্তন প্রসঙ্গে,—
ভেসে প্রেমের তরঙ্গে, বেড়াই বার মাস ॥
অদ্য অবাক হয়ে দাঁড়ায়েছি,
কীর্তনে আশ্চর্য কান্ড দেখে,—
কে হে দু'ভাই সভার ঠাঁই, পরিচয় দেও আমাকে।
দেখি মদের বোতল বাম হাতে, বাংলা মদের নিশাতে,
যা ইচ্ছা বলতেছ মুখে।
কেন কাঁধা দিয়ে বাড়ি মারলে—
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের মস্তকে ॥

অম্বিকা—এল নিতা চৈতার বৈরাগীর দল নৈদানগরে।
মোরা জগা মাধা দু'টি ভাই,
মদ খাই আর কালী নামটি গাই,
এই দুই বিনে আর কিছু নাই—অসার সংসারে ॥
অদ্য মদের ঝোঁকে মনের সুখে—
দুটি ভাই আনন্দে দিয়েছি ঘুম ;
কে রে তোরা দল বেঁধে, করিতে এলি জোর জুলুম।

তোরা বাজাইয়ে খোল করতাল,
কেবল মারিস উভা ফাল—
তাই মোদের ভেঙ্গে গেল ঘুম।
কেন কান জ্বালালি প্রাণ জ্বালালি—
লাগায়ে মরা পোড়া নামের ধুম॥

তারিণী—বলালি, মরা পোড়া এই হরিনাম মদের নিশায়।
মধুর হরিনামে কান জ্বলে,
শুনে আজ আমার প্রাণ জ্বলে,
সকালে স্নান করে গঙ্গাজলে—ধরগা নিতাইর পায়॥
মধুর এই হরিনাম মরা পোড়া—
কি কথা বলালি মাধা দুরাশয়,
কালী প্রীতে শাক্তরা কি জন্য হরি হরি কয়!
যখন শাক্ত শৈব মারা যায়,
পোড়ে কি জলে ভাসায়,
তখনও হরিনামটি লয়;
তোর বাপ শিব সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী—
বল শুনি পাঁচ মুখে কার নামটি কয়॥

অম্বিকা—বললে, কালী প্রীতে শাক্তে কেন হরিনামটি লয়।
বলি কালী প্রীতে বল হরি,
দেহের ছয় রিপুর বল হরি,
এই হরি তোব সেই হরি—কোন্ পাগলে কয়॥
আমার মা বটে রাজরাজেশ্বরী—
তোর হরি পারঘাটে দেয় গুদারা;
মায়ের কাছে পাটনীর দাম—
দু'কড়া কিবা এক কড়া।
আমার কালী মায়ের নাম নিলে,
পার করে পাটনীর ছেলে,
লয় না রে গুদারার ভাড়া,
যাব মায়ের ছেলে মায়ের কোলে—
বদনে বলে জয় তারা তারা॥

তারিণী—বললে, কালী নামের সারি গেয়ে পাড়ি দিবি আজ।
ভব-সমুদ্রে তুফান ভারী, তরঙ্গে টিকে না তরী,
তাই আমাদের গৌরহরি, হরিনাম জাহাজ॥

উহার সারেং হল নিত্যানন্দ,
অদ্বৈত মাস্টারে টিকেট কাটে ;
ঝড় তুফানে জাহাজের বিপদ নাই মোটে।
উহার রামানন্দ চাপে কল,—
গদাধরে মাপে জল,—প্রেমানল কামের ধুম ছোটে।
তাতে এক টিকেটে যেতে পারবি—
ব্রজের সেই কেলিকদম্বের ঘাটে ॥

উপরের টপ্পা-জবাবটি পূর্ববঙ্গের কবিয়ালদের চাতুর্যপূর্ণ উপস্থিত বোল-কাটাকাটির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশ বিভাগের পরেও তারিণীচরণ দেশত্যাগ করেন নি। পূর্ববঙ্গের পূর্বভাগে ক্রমক্ষীয়মান কবিগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও কবি-জীবনে যবনিকা নেমে আসে।

( বঙ্গের কবির লড়াই, সংগ্রহ )

## শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার অবিনাশ চক্রবর্তী দেশবিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর কালে কবিগানে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঢাকা জেলার মাসাব গ্রামে তিনি শ্রীতারিণী সরকারের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন—

আমি কল্পনাতে বসুদেব নাম, অতএব জানাই।
তোমরা অস্থি প্রান্তি শ্রীকৃষ্ণের,
আমাকে দুঃখ দিলে ঢের,
আমি সম্পর্কে হই তোমাদের—ঠাকুরঝি জামাই ॥
করে ধনুর্যজ্ঞ কংস রাজা, নিমন্ত্রণ দিয়েছিল ব্রজেতে ;
কানাই বলাই দু'টি ভাই, এসেছে যজ্ঞ দেখিতে।
কৃষ্ণ কংসকে ধ্বংস করে, শুনেছি পরস্পরে,
রাজা হয় মধুপুরীতে ;
তাতে হস্ত বেন্ধে, পদ বেন্ধে,
তোমরা কেন আমায় এলে মারিতে।

এই টপ্পার জবাবে শ্রীতারিণী সরকার গাওয়ালেন—

তুমি ঠাকুর জামাই নাম বসুদেব, কল্পনায় প্রকাশ।
তুমি সম্পর্কে ননদ জামাই,
জীবনে বেশ করলে কামাই,
তাতে তোমাকে জমা-ই রাখি বার মাস ॥

বললে, হস্ত বেন্ধে পদ বেন্ধে, কি জন্য এলেম তোমায় মারিতে ;
ধর্মভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ জন্মেছে, তোমার নাড়ীতে।
করে স্ত্রীহত্যে আর গো হত্যে—
আরো সে মাতুল হত্যে, করেছে মধুপুরীতে ;
এমন দুষ্ট পুত্র জন্ম দিলা—
তোমার কি লাজ ছিল না দাড়িতে ॥ ( সংগ্রহ )

## বৃন্দাবন সরকার ( যশোহর )

অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার মহম্মদপুর থানাধীন ফলসিয়া গ্রামে এক দরিদ্র রাজবংশী মৎস্যজীবী পরিবারে আনুমানিক ১৩১৬ সালে কবি বৃন্দাবন সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মদনমোহন সরকার। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান বৃন্দাবন সেকালের প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ এবং আর্থিক অনটন উপেক্ষা করেও দূরবর্তী গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন ; কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর পর তাকে পড়াশোনায় ক্ষান্তি দিতে হয়। পড়াশোনায় ইতি ঘটলেও তাঁর অন্তরে বাজতে থাকে প্রকৃতির কাব্য-বীণা। চারদিকের মোহময়ী প্রকৃতি প্রভাবে তিনি গানের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। মধুমতী তীরে সিলামতপুর গ্রামের ( ফরিদপুর ) কবিয়াল অবিনাশ পাটনী মহাশয়ের কাছে কবিগানে তালিম নিতে থাকেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি ও সুন্দর কণ্ঠ সম্পদে তিনি অল্পকাল মধ্যে যশোহর খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলে একজন জনপ্রিয় কবিয়ালরূপে পরিচিত হন। যখন জীবনে সুখ ও সম্পদের দেখা পেলেন, তখনই ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের মতো স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ছিন্নমূলের দলে মিশলেন এবং অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে ঘর বাঁধলেন নদীয়া জেলার চাকদহ থানাধীন কালীগঞ্জ গ্রামে। কবিগান ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেন। গানে প্রথম জুড়ি বাঁধলেন বরিশাল থেকে আগত এবং চাকদহ নিবাসী হরিচরণ সরকার মশাই'র সঙ্গে। তা ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট কবিয়ালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গান করেছেন তাঁরা হলেন, বড় রাজেন্দ্র, ছোট রাজেন্দ্র, নকুল, বিজয়, নিশি, গোপাল, গৌর, হরষিৎ, মনোরঞ্জন, অমূল্য, নিত্যগোপাল প্রমুখ। দারিদ্র্যবশতঃ নিজে আশানুরূপ লেখাপড়া শিখতে না পারলেও সন্তানাদির লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তারা চাকরী-বাকরী করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। সংসারে আবার সুখ স্বাচ্ছন্দের দেখা মিলল। এমন সময় ১৯৪৫ সালের ১৬ই আশ্বিন দীর্ঘ রোগভোগের পর কবি ইহজীবন ত্যাগ করে গেলেন।

কবির সঙ্গীত রচনা শক্তির নিদর্শন হিসেবে একটি গান উদ্ধৃত হল ঃ—

বল ও গুরুধন তোমার চরণ পূজবো কোন্ ফুলে।
কত ফুল ফুটেছে ফুলবাগানে—কেমনে কোন ফুল নেই তুলে ॥
শিউলী চামেলী গোলাপ বকুল,
গন্ধরাজ যুঁই গাঁদা পারুল,
ঐ ফুল তুলতে গেলে প্রাণ হয় আকুল—
আমি পূজার কথাই যাই ভুলে ॥
কামিনী কামরাঙা জবা,
ও ফুল তুলতে গেলে হয়ে যাই হাবা,
উহার কোন্ ফুলেতে পূজা নিবা—
তুমি তাই আমাকে দাও বলে ॥
চম্পক কুঞ্জলতা বেলী, টগর গাগর কৃষ্ণকেলী,
আবার কেবা হয় বাগানের মালী—
তারে ধরবো আমি কোন্ কলে ॥
লালা নীল সবুজ শ্বেত স্থলপদ্ম,
উহাব কোন পদ্ম বা হয় বিক্ষুব্ধ,
আবার কোন পদ্মই বা হবে সদ্য—
ও ফুল ভাসছে কোন জলে ॥
আমি শুনেছি সাধকের কাছে,
বোঁটা নাই ফুল ঝোলে গাছে,
সেই গাছ বা কোন দেশে আছে—
ঐ ফুল ঝুলছে কোন ডালে ॥
পাগল বৃন্দবন ভাবছে বসি,
ফুল কবে মোর পড়বে খসি,
আনন্দ সাগরে ভাসি—
দিব গুরুর চরণ কমলে ॥

( কবিপুত্র শ্রীবিদ্যুৎকুমার সরকার থেকে প্রাপ্ত )

## বিজয়কৃষ্ণ সরকার ( যশোহর )

লোককবি বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী ( সরকার ) ১৩০৯ সালের ৭ ফাল্গুন যশোহর জেলার ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবকৃষ্ণ অধিকারী, মাতা হিমালয় দেবী। গ্রাম্য পাঠশালা ও স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেও দারিদ্র্যের জন্য

দশম শ্রেণীতে উঠে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এবং সামান্য অর্থোপার্জনের আশায় পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তবে পাঠ্যজীবনেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার শুরু ও স্ফুরণ ঘটে। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দেন, উদ্বুদ্ধ করেন। নড়াইলের জমিদারের যাত্রা পার্টিতে তিনি "বিবেকের গান" গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন।

১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে পার্শ্ববর্তী হোগলাডাঙ্গায় ফরিদপুরের মনোহর সরকার ও খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার কবিগান গাইতে আসেন। মনোহর সরকারের ভাবোদ্দীপক ছড়া-পাঁচালী শুনে বিজয় অভিভূত হন এবং মনোহর সরকারকেও স্বকণ্ঠে গান শুনিয়ে বিস্মিত করেন। বিজয়ের আগ্রহাতিশয্যে মনোহর সরকার তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। দুই বছর তাঁর কাছে শিক্ষানবিশীর পর তিনি কিছুকাল রাজেন্দ্র সরকারের কাছেও কবি শিক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৩৩৬ সালের ১২ অগ্রহায়ণ নিজস্ব কবিগানের দল গঠন কবেন। তাঁর নতুন দলের প্রথম কবিগান অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুরের ভেন্নাবাড়ী গ্রামে। বিপক্ষে ছিলেন প্রবীণ কবিয়াল মহিম সরকার।

১৩৪২ সালে কলকাতায় এলবার্ট হলে কবিগানের আসর বসে। উদ্যোক্তা ছিলেন রাজেন্দ্র সরকার। তার বছর দুই পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আশুতোষ ভবনে বিজয় সরকার ও রাজেন্দ্র সরকার কবিগান পরিবেশন করে বিশ্ব-বিদ্যালযের অধ্যাপক ও কর্মচারীদের পরিতৃপ্ত কবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

কবি জীবনে বিজয় নানাবিধ সুনাম সুযোগ যেমন পেয়েছেন, আবার দুর্যোগেরও সম্মুখীন হয়েছেন, এবং প্রতিভাবলে তা কাটিয়েও উঠেছেন। একবার কোন কারণবশতঃ খুলনা যশোহর ফরিদপুবের কবিয়ালগণ একজোট হয়ে তাঁর সঙ্গে গান গাওয়া বন্ধ করেন। বিজয় তখন ববিশাল ঝালকাটির কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের ( নকুল দত্ত ) শরণাপন্ন হন। নকুলেশ্বর তাঁকে নিয়ে চার বছর জোটে গান করেন। সে সময় আসরে আসরে নকুল সরকারের কীর্তন পাঁচালীর সুর আর বিজয়ের ভাটিয়ালীর ধুয়ায় এমন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল যে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীকালে বিজয়ের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী জোট গড়ে ওঠে ফরিদপুর ভৈরবনগরের কবিয়াল শ্রীনিশিকান্ত রায়ের সঙ্গে। নিশিবাবুর দেশত্যাগ পর্যন্ত তা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল।

ডাক মালসী, কবি ও সখী সংবাদ জাতীয় কিছু গান রচনা করলেও বাউল ও ভাটিয়ালীধর্মী গান রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত এ জাতীয় বহু গান লোকের মুখে মুখে ফেরে। যেমন—

১। পোষা পাখি ছেড়ে যাবে সজনী—
একদিন ভাবি নাই মনে ॥

২। ব্যথা জাগে কাছে এলে, জ্বলে মরি দ‍ূরে গেলে,
কোন ভাবে তারে পেলে, জ‍ুড়ায় আমার পোড়া প্রাণ ॥
৩। কেউ বা ভাসে অক‍ূলেতে কেউ বা পেল ক‍ূল,
কেউ বা পেল কাঁটার জ্বালা ; কেউ বা পেল ফুল ॥
৪। অন্তর দিয়ে যন্ত্রের স‍ুর বাঁধ,—
প্রাণের ব্যথায় গানের কথায়, নয়ন ভরে কাঁদ ॥
৫। কি সাপে কামড়াল আমায় রে সাপ‍ুড়িয়া—
জ্বলিয়া প‍ুড়িয়া মইলাম বিষে ॥
৬। ত‍ুমি জান না—ত‍ুমি জান না রে প্রিয়,
ত‍ুমি মোর জীবনের সাধনা।

ভাটিয়ালী এবং বাউল সঙ্গীতের ভাব-সংমিশ্রণে রচিত এই সকল গানেই বিজয় সরকারেয় কবি-মানসের স‍ুস্পষ্ট ছাপ মেলে। "কবিগানের সভায় প্রয়োজনে বস্তুধর্মী আলোচনায় ম‍ুখ্য ভূমিকা নিলেও মানসিকতার দিক থেকে বিজয় সরকার বাস্তবধর্মী শিল্পী নন্।" (অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ—কবিগান সাহিত্যপত্র)। তিনি সংবেদনশীল, ভাববাদী ; তার আবেদন কানের কাছে নয়, কানের ভিতর দিয়ে মরমের কাছে।

কবি বিজয় জীবনের প্রায় প্রান্তসীমা অবধি নিজ জন্ম ভিটায় বসবাস করেছেন। মাঝে মাঝে এই বঙ্গে এসেও গান করেছেন। শেষ কয় বছর তিনি ব্যারাকপ‍ুর মহক‍ুমার ক‍ুক‍ুটিয়া গ্রামে বাস করতেন। সেখানেই ১৩৯২ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

তাঁর রচিত বেশ কিছ‍ু গান সম্প্রতি "বিজয়-গীতি" নামে তাঁর প‍ুত্রদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে।

## শ্রীনিশিকান্ত সরকার (ফরিদপুর)

বাংলা ১৩২০ সালে ২২ শ্রাবণ ফরিদপ‍ুর জেলার গোপালগঞ্জের অধীন ভৈরব-নগর গ্রামে শ্রীনিশিকান্ত রায়ের জন্ম। পিতার নাম চন্দ্রকান্ত রায়। পিতার অন‍ু-প্রেরণাতেই আঠার বছর বয়স থেকে তিনি কবিগান গাওয়া শ‍ুর‍ু করেন। বস্ত‍ুত, স্ক‍ুলে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি কবিগানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ইনি প্রথমে গোপালগঞ্জ মহক‍ুমাধীন দ‍ুর্গাপ‍ুর গ্রামের মনোহর সরকারের কাছে, পরে খ‍ুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার অধীন চ‍ুনখোলার বিশিষ্ট কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের দলে যোগদান করেন এবং কিছ‍ুকাল তালিম নেওয়ার পর নিজস্ব দল গঠন করে কবিগানকে প‍ুরোপ‍ুরি জীবিকার্জনের পন্হার‍ূপে গ্রহণ করেন।

পৌরাণিক কাহিনীতে সীমাবদ্ধ কবিগানে নিশিকান্ত আলোচনা কালে আধুনিক বিষয়বস্তুকেও গ্রথিত করে দেন—ফলে নব্যশ্রেণীর কাছেও তাঁর গান শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। "বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা নিশিকান্তের যুক্তিকে করেছে ক্ষুরধার, বক্তব্যের প্রকাশকে করেছে বিজ্ঞানধর্মী। ভাবের কল্পলোক ও অধ্যাত্মবাদের তুরীয় মার্গ থেকে তিনি শ্রোতৃ-মনকে ফিরিয়ে আনেন মর্ত্যের ধূলায়—ব্যথা ও বঞ্চনা, আশা ও আশ্বাসে ভরা প্রাত্যহিক পৃথিবীতে।" ( অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহরী কবিরাজ—কবিগান সাহিত্যপত্র )

পাঁচালীতে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারে তিনি অনেক কবিয়ালের চেয়ে দক্ষ। তা ছাড়া আধুনিক কাব্য সাহিত্যের সঙ্গেও যে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে তা আসরে পাঁচালী বক্তৃতাতেই ধরা পড়ত। রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক যে কয়টি গান রচনা করেছেন তাতে ভাব-গাম্ভীর্য ও ভাষা-মাধুর্যের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। দেশবিভাগের পরেও তিনি পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা অঞ্চলে গান গেয়েছেন। যশোহরের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গেই তিনি দীর্ঘ দিন জোটবদ্ধ ছিলেন। উক্ত অঞ্চলে বিজয়-নিশি জোট এক বাক্যে পরিচিত ছিল।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে নিশিকান্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কারণ ততদিনে পূর্ববঙ্গে কবিগানে চিরস্থায়ী ভাটা শুরু হয়ে গেছে। শুধু কবিগান গেয়ে জীবিকার্জন আর চলে না। তার কারণ সুবিদিত। যা হোক, পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ পনের বৎসর জোটবদ্ধ হয়ে গান করেন। এই দুই কবিয়ালের প্রচারের ফলেই কবিগান বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনী ও বাস্তুহারা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীঅমূল্যরতন সরকার শ্রীসুরেন্দ্র সরকার, শ্রীরসিক সরকার এবং মাঝেমাঝে বাংলাদেশ থেকে আগত বিজয় সরকারের সঙ্গে গান করেছেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকেও তিনি অনেকবার গান পরিবেশন করেন। কবি বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলার পলতায় শান্তিনগর কলোনীতে বসবাস করছেন।

গতানুগতিক কবিগান রচনা এবং গাওয়া ছাড়া তাঁর রচিত কোন কোন কবিতা রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্বগুণে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। যেমন—

"নয়নে যাহারে সুন্দর দেখি
সে রয়েছে মম অন্তরে ;
নিঝুম নীরবে যেন সে সতত
মানস সলিলে সন্তরে।
যুগ যুগান্ত নিশি দিন মান, বিরহে মিলনে শুনি তার গান,
চাহে কত শত ভকতের প্রাণ, জনম জনম অন্তরে ॥

## হরষিত ভট্টাচার্য ( ফরিদপুর )

কবি হরষিত ভট্টাচার্য ১৩২২ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার অধীন ডালিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনার্দন ভট্টাচার্য, মাতার নাম বিনোদিনী দেবী। পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ করে দুই বৎসর গোপালগঞ্জ হাই স্কুলে এবং দুই বৎসর খুলনা জেলার সাচিয়াদহ হাই স্কুলে পড়ে ১৯৪০/৪১ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। সাচিয়াদহ থাকা কালে নিকটবর্তী আঠার বাঁকী নদীর পরপারে চুনখোলা গ্রামবাসী বিশিষ্ট কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে আসেন। এবং তাঁর পরামর্শে শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে থাকেন। রাজেন্দ্র সরকারের দলের সঙ্গে ঘুরে বিভিন্ন আসরে পাঁচালী বলা অভ্যাস করেন। কিছুকাল পর রাজেন্দ্র সরকারের দলে পুরোপুরি যোগদান করেন এবং অচিরে শিক্ষানবিশী শেষ করে ১৩৪৬-৪৭ সালে নিজস্ব দল গঠন করে বিভিন্ন কবিয়ালের বিপক্ষে সুনামের সঙ্গে গান গাইতে থাকেন। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং নবদ্বীপের নিকটবর্তী চর ব্রহ্মনগর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেখানে স্বপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষকতার সঙ্গে মাঝে সাঝে কবির "সরকারী"ও করতেন। পরে গান গাওয়া ছেড়ে দেন। ১৯৪৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অপরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন।

## মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ( ফরিদপুর )

কবি হরষিত ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার ডালিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। বড় দাদা হরষিত ভট্টাচার্য কবির দল গঠন করলে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করে ১৬।১৭ বৎসর বয়সে গানের দলে যোগদান করেন। এবং তিন বৎসর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে থেকে কবিয়ালী শিক্ষা করেন। দাদাকেই তিনি গানের গুরু বলে মনে করেন। তাঁর দাদা পাকিস্তান ছেড়ে এলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দল পরিচালনার ভার নিয়ে গান গাইতে থাকেন। কিয়ৎকাল পর তিনিও দেশ ত্যাগ করে আসেন। বর্তমানে কলিকাতা যাদবপুরে বিদ্যাসাগর কলোনীতে সপরিবারে বসবাস করছেন। এখনো কবিগানই তার জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন।

মনোরঞ্জন রসবেত্তা, ভাবুকচিত্ত এবং স্বভাব-কবিত্বের মানুষ। স্বরচিত গান কবিতায় তাঁর উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় মেলে তিনি যখন বলেন—

তন্ত্রবিহীন মন্ত্রবিহীন ভজনবিহীন বিস্মরণে।
গন্ধবিহীন জীবন কুসুম অঞ্জলি দেই ঐ চরণে॥

সবার মাঝে সকল শোভায়
নিত্য নতুন পরাণ লোভায়,
আমি তোমার জগৎসভায়,
বরণ করি ঐ মরণে ॥

## শ্রীরসিক সরকার ( খুলনা )

খুলনা জেলায় শ্রীরসিক সরকারের জন্ম। স্বাভাবিক কবিত্ব ও সংগীত প্রতিভার অধিকারী রসিক সরকার অল্প বয়সেই কবির দলে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি খুলনার গৌর সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি যশোহর জেলার বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী ( সরকার ) কে গুরু রবণ করে তাঁর নিকটও কবি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

নিজস্ব দল গঠন করার পর থেকে তিনি দীর্ঘকাল পূর্ব পাকিস্তানে গান করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই বঙ্গে এসে পূর্ববঙ্গাগত অন্যান্য কবিয়ালদের সঙ্গে কবিগান গেয়ে অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

ঐতিহ্যানুসারী কবিগান রচনায় রসিক সরকারের তেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নেই। কিন্তু পল্লীগীতি ও আধুনিক সঙ্গীতের সংমিশ্রণে স্বরচিত গান কবিগানের ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করে তিনি শ্রোতার মন জয় করে নেন। গানের আসরে তাঁর রঙ রসিকতাপূর্ণ বাচন-ভঙ্গিতে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। তাঁর রচিত একটি গান উদ্ধৃত হল—তা থেকেই কবির মরমী মনের পরিচয় পাওয়া যাবে—

প্রাণ দরদীয়া রে প্রাণ মরমিয়া রে—
কি ক্ষণে তুই এসেছিলি ভালবাসিতে ;
তাই ঘরের বাঁধন ছেড়ে হল বনে আসিতে।
কূল ছেড়ে কি অকূলে মোর হবে ভাসিতে ॥
সকলি ভুলেছি তোমার প্রীতির সোহাগে,
অকরুণ বন্ধু তুমি বুঝি নি আগে,
বোঝ না যে কিবা জ্বালা ভালবাসিতে।
আমি কেঁদে ফিরি বনে বনে দিবস-নিশীথে ॥
তোমার হাতে বাঁশী বন্ধু জানে কিবা গুণ,
আমার না-বলা ব্যথায় ধরালে আগুন ,
কান্নারাশি নামে আসি সুখের হাসিতে।
আমায় কি যাদু করেছে তোমার বাঁশের বাঁশীতে ॥

রসিক সরকার রচিত আরও কয়েকটি জনপ্রিয় গানের প্রথম পদ থেকেই পাঠক কবির রচনাশৈলী ও ভাবানুভূতির সম্যক আভাস লাভ করবেন—

১। ব্যথা মুখর কথার মালা গাঁথিস নিরালায় রে বিরহী-
পরাণ কি তোর আজো তারে চায় ॥

২। চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে—
আশা করি পরাণ বন্ধু আছ কুশলে ॥
৩। বল নিঠুর ভালবাসা হবে না কি ভুল।
আশা তরুর ফল ধরে না শুকাল মুকুল ॥
৪। ননদি গো যা ফিরে ঘরে।
বলিস তোরা ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী, কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে ॥

## শ্রীঅমূল্যরতন সরকার ( ঢাকা )

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার ঘিওর থানার অধীন গাংডুবী গ্রামে ১৩৪২ সালে কপালী বংশে শ্রীঅমূলেরতন সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ডাউরী সরকার, মাতার নাম দিব্যসুন্দরী। দশ বৎসর বয়সে কবি পিতৃহীন হন। ফলে লেখাপড়ায় বেশী দূর এগুতে পারেন নি। কিছু দিন পর তিনি কবিয়াল শ্রীউপেন্দ্র-কুমার সরকারের সংস্পর্শে আসেন। দুই বৎসর তার তত্ত্বাবধানে থেকে কবিয়ালী শিক্ষা ও সমাপনান্তে নিজস্ব দল গঠন করেন। কয়েক বৎসর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গান করেন। কিন্তু ক্রমেই গানের বায়না কমতে থাকায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীতে বসতি স্থাপন করেন। এই বঙ্গে নবাগত অবস্থায় তিনি প্রধান কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল গ্রাম-বাংলার দূরবর্তী অঞ্চলে গান গাইতে থাকেন। বর্তমানে তিনি স্বনামে পরিচিত কবিয়াল এবং সকল কবির সরকারের সঙ্গেই গান করেন। কিছু কিছু প্রথাগত কবিগান রচনা করলেও, পল্লীগীতি রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর রচিত একটি গান—

তুমি যদি মোর আপনজন
সখা হে পরাণ প্রিয়।
সন্ধ্যা বায়ে ঝরিব যবে—
আপন করে তুলে নিও ॥
বিদায় দিবসে মোর চলিবার পথে,
সাথী হয়ে সখা মোর চলিও সাথে,
বিজন অঙ্গন তলে কালো নিশীথে ;—
ঝলকিয়ে আলোক দিও ॥
ভরসায় নিরাশার উঠিল স্মৃতি,
খেলিবার বেলা বুঝি হয়েছে ইতি,
অমূল্য বলে সখা এহি মিনতি ;—
পথের দিশাটি দেখাইও ॥

## শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার ( ফরিদপুর )

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া থানার কান্দী গ্রামে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম। কবিগানের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাল্যকাল থেকেই। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার ধাক্কায় দেশছাড়া হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হন। খ্যাতিমান কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকারের কাছে শিক্ষানবিশী করেন দীর্ঘদিন। তারপর দল গঠন করে নিজেই সকল কবিয়ালের সঙ্গে গান করেন। কবিগান এবং রামায়ণ গানই কবির পেশা। কবির রচিত নিম্নোক্ত গানটিতে বিনা নোটিশে দেশ বাড়িঘর হারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ক্যাম্প-কলোনী মাঠে-ঘাটে বাসের মর্মন্তুদ দুঃখ এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ ফুটে উঠেছে—

এমন সোনার বাংলা দেশে,
মানুষ বেড়ায় ভেসে ভেসে,
হলাম বাস্তুহারা সর্বহারা—
কার কলমের এক খোঁচায়।
আমরা ক্যাম্পে শুয়ে আজো মাঠে,
আর কত দিন জীবন কাটে,
দেখে মোদের দুঃখ কষ্ট—
শেয়াল কুকুর লজ্জা পায় ॥

কবির ভ্রাতা শ্রীনিবাস সবকারও কবিগান গেয়ে থাকেন।

## শ্রীকালশশী চক্রবর্তী ( ত্রিপুরা )

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর থানার অধীন বাবুরহাট সংলগ্ন এনায়েৎনগর গ্রামে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী শ্রীকালশশী চক্রবর্তীর জন্ম। পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্তী। পেশায় তিনি ছিলেন চাকুরীজীবী। পয়ত্রিশ বৎসর ধরে চাঁদপুরে স্টীমার কোম্পানীতে চাকুরী করেন। স্বাভাবিক আকর্ষণেই তিনি কবিগানে যোগ দেন। কবিগানে কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি বলে জানান। বিগত ৩৪ বৎসর ধরে কবিগান গেয়ে আসছেন। নোয়াখালীর রমেশ আচার্য, ত্রিপুরার শচীন্দ্র শীল, গোবিন্দ ধুপী, যোগেশ সরকার, অবিনাশ চক্রবর্তী, ঢাকার শ্রীতারিণীচরণ সরকার প্রভৃতি কবিয়ালদের সঙ্গে বিভাগ-পরবর্তী পূর্ব বঙ্গের নোয়াখালী ত্রিপুরা, ঢাকা এলাকায় গান গেয়েছেন। জীবনে প্রথম গান করেন চাঁদপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শচীন্দ্র শীলের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গেও কবি মাঝে মাঝে গান করে থাকেন।

## শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার ( খুলনা )

একই বংশে তিন পুরুষ ধরে কবিগান গাওয়ার নজীর যে কয়টি পরিবারে আছে, খুলনা জেলার চুনখোলার সরকার বংশ তার অন্যতম। শ্রীঅনাদি সরকারের পিতামহ নদীয়ারচাঁদ সরকার কবি গাইতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ সরকার তো ডাকসাঁইটে কবিয়াল ছিলেন। তাঁরই ভাইপো শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার পূর্ববঙ্গে খুলনা-যশোহর অঞ্চলে কবিগানের এখনো যেটুকু রেশ আছে, তাই আঁকড়ে ধরে আছেন।

অনাদি সরকারের জন্ম ১৩৩৮ সালের ২২শে আশ্বিন। তাঁর পিতার নাম কুঞ্জবিহারী সরকার, মাতা জহরমণি দেবী। জ্যেঠা মহাশয় রাজেন্দ্র সরকারের কাছেই তাঁর কবিগানের হাতে খড়ি। বাল্য বয়সেই তিনি গানের দলে যোগদান করেন। ১৩৫৮ সালে নিজে 'সরকার' হয়ে গান গাইতে থাকেন। এবং কবিগানকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে কবিগানের বর্তমান বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করে কবি অনাদি সরকার যে বড়ই বিমর্ষ গ্রন্থের ভূমিকাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। এখনো তিনি বাংলাদেশে যে সকল কবিয়ালের সঙ্গে গান গেয়ে থাকেন তারা হলেন শ্রীরাজেন্দ্র সরকার ( ছোট ) শ্রীস্বরূপেন্দু সরকার, শ্রীনারায়ণ বালা, শ্রীগৌর সরকার প্রমুখ।

## মুসলমান কবিয়াল

"কবিওয়ালাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান-কবিওয়ালাও দেখিতে পাই। যুগল, চণ্ডী, গোপাল, মিঞাজান, কাঞ্চন ইহারা সকলেই মুসলমান, নিবাস নাটোর। ইহারা সকলেই মৃত। কমল নামে একজন বিখ্যাত মুসলমান কবিওয়ালা এখনও জীবিত আছেন। ইহারা সকলেই লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিয়ালা। ইহাদের মধ্যে একমাত্র মিঞাজান ব্যতীত সকলেই গান রচনায় ও গাহিতে বিশেষ দক্ষ। মিঞাজান শুধু গাইতেই দক্ষ ছিলেন, গান রচনায় তাঁহার হাত ছিল না। গোয়ালন্দের বিখ্যাত ইসমাইল এখনও জীবিত ; কবিগানে অনেক দিগ্বিজয়ী কবিওয়ালাকে পরাস্ত করিয়াছেন। ইহারা জাতিতে মুসলমান হইলেও অনেকেই পরম বৈষ্ণব ও কালী ভক্ত ছিলেন। সমাজের সঙ্কীর্ণতা তাহাদের প্রাণে স্থান পায় নাই; সত্যের পুণ্যালোকে তাহাদের প্রাণ উদ্ভাসিত ছিল। কাঞ্চনের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে বলিহার রাজবাটীতে একবার রথোৎসবের সময় কাঞ্চন দল লইয়া গান করিতেছিলেন। তখন বিপক্ষ দলের সরকার ভুবন বৈরাগী কাঞ্চনকে মুসলমান হইয়া হরিনাম গান করাতে ঠাট্টা করিলে কাঞ্চন সভায় দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তরে গাহিতে লাগিলেন—

"হরিনাম আমার কর্ণ প্রিয়,  
হরিনাম আমার রসনায় ছাড়ে না,  
হরি রূপ চক্ষে আমার ভাল লাগে।"—ইত্যাদি গাইতে গাইতে

দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়, আর জ্ঞান হয় নাই। প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণারামের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই ধর্ম কলহের দিনে এইরূপ ধর্মের উদারতা অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।" ( কবির ঝঙ্কার )

কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের একটি গানের ফুকারে আরো কয়জন মুসলমান কবিয়ালের নামোল্লেখ দেখা যায়—

কবি রইজ মোল্লা মুসলমান, কালাচাঁদও কবিগান
করিত আর যোগদান দিত জারীতে ;
তোরাফ আলী, মোসলেম গণি, নাদের মোল্লা নলচিঠিতে।
ঢাকায় আফাজদ্দী জারীতে, আর কেদু বয়াতী,
কবি কাঞ্চন মুসলমান জাতি,—
মুর্শিদাবাদ জেলায় তরজায় খ্যাতি,
গুমানী সে গান করতেছে লম্বোদর চক্রবর্তীর সাথে ॥

## মহিলা কবিয়াল

পূর্ববঙ্গের কবিগানে মহিলাদের স্থান একাধাবে মুখ্য এবং গৌণ। কবিয়াল হিসেবে সেকালের মাত্র দুইজন মহিলার নামই শোনা যায়। এরা হলেন ঝালকাটির ( বরিশাল ) কবিয়াল বিধু সরকারের কন্যা কুসুমকুমারী। তিনি পিতৃ গুণের অধিকারী হয়ে কবিত্বে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহুকাল পূর্বে বরিশালে কালীজিরা নদীর পাড়ে আমিরাবাদ বন্দরে কবিয়াল নিবারণ বসু বিপক্ষে মহিলা কবিয়াল কুসুমকুমাবীকে ব্যঙ্গ কবে গেয়েছিলেন—

বল কুসুম কুমারী—
মেয়ে হযে কোন্ সাহসে কবতে এলি 'সরকারী'।
লোকে কথার কথা কয়—
চৌদ্দ হাত কাপড়ে নারীব কাঁধে কাছা রয়।
এসব রান্নাঘরের কান্না তো নয়—শাস্ত্র জানা দরকারী।
কবিগান ছেলে খেলা নয়—
কেবল কাজল পরে চোখ ঠারিলে, সে কি কবি হয়।
ও তোর শাস্ত্রের সঙ্গে নাই পরিচয়--রাঁধতে জান তবকারী।

কুসুমকুমারী আসরে এসে নাবীব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গাইলেন—

সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা হল নারী।
ভেবে তারণ কারণ নারীর চরণ, বক্ষে ধরেন ত্রিপুরারি ॥
পাগল শিব তালে নাচে, গঙ্গা তার শিরে আছে,
গঙ্গাধর নাম পেয়েছে, শিরে গঙ্গা ধরি।
আবার রাধার পদে স্বনাম লিখে, খাতক হলেন বংশীধারী ॥

নারীকে নিন্দা করা কি খাটে।
নারী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড উদরী, তন্ত্রসারে তাই রটে ॥
অসাধ্য কর্ম সাধিতে, বিশ্বস্রষ্টা নারী সৃষ্টি করেন জগতে ;
নিজে আদ্যাশক্তি খড়্গ হাতে, অসুরের মাথা কাটে ॥
সুন্দ আর সে উপসুন্দ—দেবতার বিরুদ্ধে যেদিন করিল দ্বন্দ্ব,
সেদিন দায় ঠেকে দেবতাবৃন্দ, তিলোত্তমার পায় লোটে ॥
সীতা অসিতা সাজিল, শতস্কন্ধ রাবণেরে বধ করেছিল ;
নারী বিশ্ব প্রসব করে দিল—বুঝি তোর জন্ম বাপের পেটে ॥

উক্ত কুসুম কুমারী ব্যতীত আর একজন মাত্র মহিলা কবিয়ালের নাম শোনা যায় —তিনি খুলনার 'ক'বেল' কামিনী।

কবিয়াল হিসেবে না হলেও কবির দল সংগঠন ও পরিচালনে মহিলাদের দান অসামান্য। বিশেষত ঝালকাটি বন্দরে এদের অনেকেরই নামকরা কবির দল ছিল। এরা দোহার বাদক নিয়ে দল গঠন করে ঠিকা মাহিনায় কবিয়াল নিযুক্ত করে গানের বায়না নিয়ে জেলায় জেলায় গান গেয়ে বেড়াতেন। নিজেরাও খ্যাতনামা গায়িকা ছিলেন। এদের মধ্যে বড় মনোমোহিনী, অধরমণি, কালা যামিনী, রাঙা যামিনী প্রধান। খ্যাতনাম্নী গায়িকাদের মধ্যে স্বর্ণমণি, পরশমণি, বিধুকামিনী, আদরমণি, সত্যভামা, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, রাধি, মানদা, শরৎবালা, প্রিয়বালা, সরলা, তরঙ্গিনী, কুমুদিনী, ছোট গিরিবালা, সুভাষিণী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে সবার সেরা বড় মনোমোহিনী। তার মধুক্ষরা কণ্ঠ এককালে পূর্ববঙ্গে কবির আসরকে মাতোয়ারা করে তুলতো। পুরুষ দোহারদের সংখ্যা ছিল অগণিত। কাকে ছেড়ে কার নাম বলব। তবু আচার্য কর্তার দলের সুবল, বিহারী, গোবিন্দ ও রাধাচরণ ছিল অতুলনীয়। এদের মতো সুধাকণ্ঠ গায়ক কবিতে আর ছিল না বললে চলে। নোয়াখালীর যোগদিয়ার প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, রূপাচরার মনোহর বৈরাগী, জিরতলীর নগেন্দ্র দাসের কণ্ঠে গান শুনেই কবিগানের মাধুর্য প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। এ সকল গায়ক গায়িকা সুমধুর কণ্ঠে বেহালা হারমোনিয়াম ক্ল্যারিওনেট সহযোগে বসন্ত কালের ভোর রাতে যখন সুর ধরত—সে সুর ঘুমের মানুষকে বিছানা থেকে তুলে আনত। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ শ্রোতৃবৃন্দ এসে আসর ভরে তুলত। আর অশ্লীলতা পাপকে কবিগানের ত্রিসীমানা থেকে করেছিল দূরীভূত।

সবার শেষে ঢুলীদের কথা। ঢোলে কাঠি মেরে গানের শুরু এবং শেষ। ঢোলের বোলে মুখের বোলে সমন্বয় না হলে গান ব্যর্থ। ঢোল বাজনায় বরিশাল জেলার ঢুলীদের প্রসিদ্ধি সর্বজন স্বীকৃত। মাচরং-এর যজ্ঞেশ্বর ঢুলী, বনমালী ঢুলী, বৈকুণ্ঠ ঢুলী, রজনী নট্ট, হরিচরণ নট্ট, বসন্ত নট্ট, অশ্বিনী নট্ট প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী ঢুলী ছিলেন।

# কবি-সঙ্গীত

# ডাক

[ 'ডাক' কবিগানের উদ্বোধন সঙ্গীত ; আহ্বান বা প্রার্থনাগীতি। ডাক এবং তৎসহ মালসী গানেই কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভক্তি রসাশ্রিত ও আত্মতত্ত্বমূলক। কখনো কখনো সমাজ সমস্যামূলক বিষয় নিয়েও ডাক গান রচিত হয়। ডাক-মালসীর বাদ্য ও সুর শুনেই বিচক্ষণ শ্রোতার দল মাঝরাত্রে বা শেষ রাত্রে শয্যা ছেড়ে গানের আসরে ছুটে যেতেন। শ্রোতাদের শয্যা থেকে ডেকে আনে কিংবা আরাধ্য দেবতাকে ডাকে বলেই 'ডাক' গান নামকরণ হয়েছে কি না কে জানে ! ]

## ডাক

**হরিচরণ আচার্য**

১

পূজ দিবানিশি মন তুলসী ভক্তি চন্দনে শচীনন্দনে—
বাঁধ একতা বন্ধনে ভারত সন্তান সবে।
ত্যজ হিংসা নিন্দা বিষাদ, কি ব্রাহ্মণ কি নিষাদ—
মহাপ্রসাদ পাও মহোৎসবে ॥
শিখ কলিযুগের যুগধর্ম, শুধু একতার কর্ম—
গাও হরিনাম তারক ব্রহ্ম, মানব জন্ম সফল হবে।
সবে কাঁপায়ে মেদিনী, কর হরিধ্বনি—
হরি রবে করী সব পলাবে ॥
অন্তরা—ভোগবিলাসিতা আর অলসতা ত্যজিয়া,
শিখহ ত্যাগের ধর্ম শ্রীগৌরাঙ্গ ভজিয়া।
চল অহিংসা পরম ধর্ম বাক্য বুঝিয়া ॥
দেখ গৌর সনে নিত্যানন্দ অক্রোধ পরমানন্দ,
নাহি বাছে ভালমন্দ সর্বজীবে দয়া।
কিবে ভোগবিলাস ত্যাগিনী, যৌবনে যোগিনী,—
কুললক্ষ্মীগণ সেব দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

২

ত্যজ অন্য আকিঞ্চন, মজ রে মজ রে মন—ভজ নদীয়া রাজন,
গৌরাঙ্গ সুন্দরের গৃহস্থ আশ্রমের লীলা।
বাজে খোল করতাল, সকাল বিকাল—
করে গোলোকের নাথ ভূলোকে খেলা ॥
নাচে মুরারি মুকুন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,
গদাধর, শ্রীধর আর নিত্যানন্দ,
গোরাচাঁদ নিয়ে সব ভক্তবৃন্দ, বসাল চাঁদের মেলা।

ভজ অন্তঃপুরে বাস, প্রেমসুখের বিলাস,—
সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া কাঞ্চনমালা ॥
অন্তরা—অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায় ;—
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।
শিখ নবদ্বীপের মধুর ভজন প্রাণের পিপাসায় ॥
রাখ গুরুপদে নতশির, সাধন ভজন হবে স্থির,
শিশির বসন্তের কৃপায়।
তোরে নদীয়া নাগরীর সাজে—সাজাবে শ্রীমায় ॥

৩

গৌর প্রেম সাগরে ছুটল ভাবের লহরী, অষ্ট প্রহরই,—
উঠে শিহরি শিহরি শ্রীহরি-শ্রীহরি বলিতে।
করে রূপে দগদগ, রসে ডগমগ, জগদঘ হরে চলিতে ॥
মিলে মানুষে অমরে, অস্ত্র ছাড়া সমরে, এল পাষণ্ড পামরে দলিতে।
দেখে ভূলোকের ক্ষুধা, গোলোকের সুধা, পুলকে বিতরে কলিতে ॥
অন্তরা—যারে ভাবিলে যায় ভবব্যাধি, যারে ভাবে ভববিধি,
ভাব সেই ভাবনিধি গৌর বিনোদিয়া।
কিবে ভাবে রসে পরিপূর্ণ, পূর্ণতর অবতীর্ণ,—
ধন্য ধন্য সুধন্য নদীয়া ॥
কিবে বাহিরে কীর্তনানন্দ, মত্ত হল ভক্তবৃন্দ,
লোভে মকরন্দ গন্ধ পাইয়া।
সদা হরিচরণের আশা, বসন্তের ভরসা,
অন্তে পাব গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ॥

৪

অনন্ত মত অনন্ত পথ, একই ঈশ্বর অনন্ত জগৎজোড়া।
তারে শাক্তে কয় শঙ্করী, বৈষ্ণবে কয় হরি,—
মগে বলে ফরাতারা ॥
বদর বলে মাঝিমাল্লা, মুসলমান কয় খোদাতাল্লা,
গড্ বলে ফিরিঙ্গীরা ॥
বলে গাণপত্যে গণেশ, সৌর বলে দিনেশ,—
মহেশ বলে শৈব যারা ॥
অন্তরা—না বুঝে তত্ত্ব, না ভজে সত্য, ভারতে হল না একতা।
লেখে বেদ কি পুরাণে, কিতাবে কোরাণে,—
হিন্দু মুসলমানের এক কথা ॥

লেখে মুনি ঋষি পয়গম্বর, মুসলমানের জুম্মা ঘর,
মন্দিরে হিন্দুর দেবতা।
তবে কেন করে কাটাকাটি রক্তে ভাসাল মাটি,
পাবনা, ঢাকা, কলিকাতা॥

ডাক — গোবিন্দ ঠাকুর

দুর্গা আমার দুঃখহরা ভবদারা পরাৎপরা মহেশমোহিনী।
তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রী জগজ্জননী॥
সুরাসুর গন্ধর্ব নরে, তোমার বন্দনা করে, দিবা যামিনী।
তুমি সারাৎসারা, বহুরূপা শক্তি সনাতনী॥

অন্তরা—মা তোমার মায়া জালে, কালে কালে জড়ায়ে হয়েছি আবদ্ধ।
ছয় জনে ছয় দিকে টানে, কেহই ত না কথার বাধ্য॥
মরণ কথা হয় না স্মরণ, মা তোমার মায়ার কারণ,
মন-বারণ মানে না বারণ হয়েছে অবাধ্য।
অধীন গোবিন্দ কয়, যাবার সময়, পাই যেন তোমার পাদপদ্ম॥

ডাক মালসী — কিঙ্কর শীল

শঙ্করী! ওমা শুভঙ্করী! কি করি মা তবতে এবার।
মাগো যে দেখি অকূল, পাইব যে কূল,
এমন ভরসা নাই মনে আমার॥
দিলে তুমি চরণ-তরী, তবে যদি ভবে তরি,
কৃপা করি কর মা নিস্তার।
(আমার) আর কি আছে বল, পারের সম্বল,
ভৈরবী কেবল ভরসা তোমার॥

অন্তরা—চরণ পাবার আশা আমার আছে কি?
(বাবা) ভোলানাথকে চরণ দিলে, আমাকে মা দিয়ে ফাঁকি॥
(বাবা) ভাঙ খেয়ে বুক পেতে আছে, তুই থাকিস মা তারি কাছে,
আমি মিছে মা বলে ডাকি।
(দিলে) শঙ্করে শঙ্করী চরণ, কিঙ্করে দোষ করেছে কি??

ডাক — ঈশান নাথ

ভব তরঙ্গ তুফানে এবার পড়ে, দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি,—
মা বিনে সন্তানের গতি কি-ই।
দুর্গা নামে দুঃখ হরে, স্বহস্তে লেখেছে হরে,
দেখলাম সকলি ফাঁকি;

দ্বিজ ঈশান ভাগ্যে ওমা দুর্গে,
আর আছে কি বাকী ?

অন্তরা—খেলা ফুরালো, ঘরে নিয়ে চল, বেলা নাই মা আসতেছে তুফান।
ছেলের তরে প্রাণ কাঁদে না, হলি কি তুই এতই পাষাণ ?
কতকাল হল, তোর কোল ছাড়া, যায় না ত মা সইতে পারা,
ছেলের গায়ের ধুলো ঝাড়া গো, তাও ত মায়ের কাম।
এখন মাথার ঘাম মা পায়ে পড়ে, মেলে দে স্নেহের আঁচলখান ॥

### ডাক—বিশ্বপিতার বন্দনা — লাল মামুদ

প্রভো বিশ্ব মূলাধার !
অনন্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার।
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী
কেহ খোদা আল্লা বলি, তোমাকে ডাকে সারাৎসার।
নামের গুণে পারের দিনে সকলি হয় পার ॥
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বাঁধ ভক্তি ডোরে।
তোমারে টানে অনিবার।
তুমি দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার ॥
হিন্দু কিংবা হোক মুসলমান,
তোমার পক্ষে সবই সমান,
আপন সন্তান জাতির কি বিচার ?
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল কি চামার ॥
জন্ম নিয়া মুসলমানে, বঞ্চিত হব শ্রীচরণে,
আমি মনে ভাবি না একবার।
( এবার ) লাল মামুদে হরেকৃষ্ণ নাম করেছে সার ॥

### ডাক—ভক্তের আকুতি — বলাই নাথ

তোরে বারে বারে মা বলে, মা ডাকি কেন শুনছ না।
বুঝি দীনের প্রতি দয়া হৈল না।
মাগো, ভব ঘোরে এনে মোরে দিলে জঠর যন্ত্রণা ॥
সুতে এত বিপরীত, করেও মায় কখন ধরে না,
পুরাণে কয় শমনের ভয়, দুর্গা নামে থাকে না।
আমি ভেবে দেখি সবি ফাঁকি,
কর্মপাশ আর কাটা যায় না

জানলাম তত্ত্ব, কপাল সত্য
কপাল বৈ আর কিছুই ত না।
পাগল বলাই বলে, দুর্গা বলে—
আর কেহ তোরে ডাকবে না॥

ডাক কালীচরণ দে

ওমা কালিকে কালের ভয় পেয়ে মা—
কালী বলে ডাকতেছি তোমায়।
তুমি কালবারিণী বিপদহারিণী দীনতারিণী,
তারগো আমায়॥
শুনেছি মা বললে কালী, দূরে যায় সব মনের কালি,
তাইতে কালী ডাকি সর্বদায়।
মাগো কালের মুখে পড়বে কালি—
কালী যদি আমায় রাখ রাঙা পায়॥

অন্তরা—কালের ভয় কি রাখি মা, কালবারিণী বদনে যদি বলি কালী।
আমরা নেচে গেয়ে বলব কালী; আনন্দে বাজাইয়া করতালি॥
কাল কাটাইলাম 'কালী বলব' বলে, করে কেবল আজি কালি।
কালী বলে নিদানকালে, যা কর মা রক্ষাকালী॥

ডাক হরকুমার শীল

হরি মানুষ সাজে মানুষ সমাজে, বৃথা কাজে এসেছিলাম।
কুসঙ্গ পরশে মজে রঙ্গ রসে, রঙ্গিনীর রসে মত্ত হলাম॥
দিল গুরু মহাজন অমূল্য রতন, অযতনে হারা হলাম।
হয়ে সে ধনে বিপত্তি, খাটেনা আপত্তি, দেহ সম্পত্তি হতেছে নিলাম॥

অন্তরা—জয় জনার্দন, অসুর মর্দন, গিরি গোবর্ধন ধারণ।
জয় পীতবসন, বিঘ্ন বিনাশন, মস্তকে দিও হরি চরণ॥
গোপেন্দ্র বালক, সুরেন্দ্র পালক, পুলকে ত্রিলোক তারণ।
হরকুমার নাস্তিকে, এ অধম নাস্তিকে, মস্তকে দিও হরি চরণ॥

ডাক ভগবতী ভুঁইয়া

যদি শ্যামল ভারত, শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ মনোহর সাজিত।
তবে মধু নিনাদিয়া, রস বিনোদিয়া, নদীয়া নূপুর বাজিত॥
হত অরুণলাল চরণ তল, মাগি রঙিন রেঙ্গুনে যাজিত।
আর বিহার বসন শষ্যতা স্মরি,
সুরধুনী সুরে বাজিত বাঁশরী,

*পাঞ্জাব মাদ্রাজে বাহু প্রসারী—*
*বোম্বে শির সিন্ধু মোহন চূড়া রাজিত !*
হৃদয় নন্দন, দিল্লীতে বৃন্দাবন, ফুল মালায় মলয় চন্দন মাজিত ॥

অন্তরা—আর সাধক সাধিকা, সাজিত রাধিকা, আরাধনার প্রীতি রঙ্গে ।
কিবে আনন্দিত পুলকে সাজিত নন্দ, সুযশ যশোদা সঙ্গে ॥
হ'ত তরুণ তমালতলা, মিলন কদম্ব দোলা, সখীরা নাচিত ঋতুরঙ্গে ।
উন্নত দৈবকীর পাষাণ টলিত, নিরাশা কংস শ্মশানে জ্বলিত,
দলিত কলির পাপ-ভুজঙ্গে ।
আবার অঘাসুর যদি হ'ত অঘটিত, ভগবতী আছি বঙ্গে ॥

ডাক — রাসবিহারী সরকার

আমায় রক্ষ রক্ষ দক্ষপুত্রী, জগদ্ধাত্রী জগৎতারা ।
এবার অন্নকষ্টে পুত্রগণ তোর হল সারা ॥
আগে করে কোপদৃষ্টি, করলে অনাবৃষ্টি,
শেষে বৃষ্টির জলে গেল শস্য মারা ।
ওমা তারা অন্নাভাবে উপবাসী, ছিন্নবাসে দিবানিশি,
কেউ দিয়ে মা গলে ফাঁসী, যেতেছে ত্বরা ।
কেন এত অত্যাচার, কর মা এবার—
কর দেশের উপকার, ভবদারা পরাৎপরা ॥

অন্তরা—পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে লইনু শরণ ।
রেখ নিরাপদে তব পদে থাকে যেন মন ॥
কাশীতে মা কাশীশ্বরী, অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরি,
করেছিলে অন্ন বিতরণ ।
রাসবিহারীর অন্ন কষ্ট কর নিবারণ ॥

ডাক — অম্বিকা পাটনী

মন তোর গুরুদত্ত নিত্যসেবার গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া—
এমন হিয়ার ঠাকুর কার হাতে দিয়া, রয়েছ বিদেশে ।
মজে কামিনী কাঞ্চনে, কাচের আকিঞ্চনে—
আর কতকাল রবি প্রবাসে ॥
আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দাসী নিকুঞ্জ সেবিকা,
গুরুদত্ত নাম পেয়ে কদলিকা,
মায়ার পুত্তলিকা দেখে প্রহেলিকা, ততঃভ্রষ্ট হলি শেষে ॥
রেখে গুরুবাক্যে শ্রুতি, স্মরে পূর্ব স্মৃতি,
দেশের মানুষ চল দেশে ॥

অন্তরা—মন তোর যা গেছে তা গেছে ভাই, যা আছে সামাল তাই,
এখন ভজনানন্দে মজ।
মন তোর কুসঙ্গ ভঙ্গ দিয়া, শচী মায়ের অঙ্গনে গিয়া,
শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া ভজ ॥
গুরু হরি বলে কথা রাখ, গৌর ভক্ত সঙ্গে থাক,
অঙ্গে মাখ ভক্ত পদরজ।
মন তোর এখনো সময় আছে, গিয়ে শ্রীমায়ের কাছে,
নদীয়া নাগরীর সাজে সাজ।

### ডাক — অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ

শান্তি সুখ আশে ভবে এসে, মায়িক ভ্রান্তি বশে,
কাঁদতে কাঁদতে গত দিবানিশি।
ও ভুলে তারণ কারণ শ্রীহরিচরণ, মজে কামিনী কাঞ্চন প্রত্যাশী ॥
বিবেকহীন স্বভাব গতিকে ভুইলে সুমতি,
কুমতিকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি।
আমার দোষে পূর্ণ গাত্র, ভরসা একমাত্র, হরি তুমি অদোষ দরশী ॥

অন্তরা—আমার নাই সাধন বল, রিপুবল প্রবল, বিফল জীবন।
আমি ভুলে সদাচার, করি কদাচার, ভবে দুরাচার কে আছে এমন ॥
পঞ্চ মহাপাপের পাপী হই, অন্তরের অন্তরে রই,
যোগ্য নই পরশে চরণ।
এবার পতিত অর্জুনে, স্বগুণে স্থান দেও চরণে,
তুমি হরি পতিতপাবন ॥

### ডাক — চন্দ্রকান্ত দাস

মা তুই কলুষনাশিনী, কৈলাসবাসিনী, সুহাসিনী ভবদারা।
মুণ্ডমালেতে ভূষিণী, পাষণ্ড দলনী, উলঙ্গিনী অসিধরা ॥
যত দেবতা তুষিতে, দৈত্য বিনাশিতে, পতির বক্ষে হলি খাড়া।
ষড় রিপু ষড় দৈত্য, করতেছে দৌরাত্ম্য. এ বিপত্তে রক্ষ গো তারা ॥

অন্তরা—এ দুর্দিনে আর, তুমি বিনে আমার, অনুপায়ের উপায় মা কে আছে।
ভাই বন্ধু পরিবার, খাইবার পরিবার, ধরিবার কেহ নাই পাছে ॥
কুহকিনীর ফাঁকিতে, মা তোমাকে ডাকিতে, শিখিতে ভুল পড়িয়াছে।
দেহ মন ক্লান্তে, তোর এই চন্দ্রকান্তে, কাঁদতে যাবে আর কার কাছে ॥

ডাক — কুমুদরঞ্জন সরকার

তুমি দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দুঃখহারিণী
কালী কালবারিণী নিস্তার দুস্তরে।
তুমি হও মা আদ্যাশক্তি, দেহে নাই মোর ভক্তি,
কিসে পাব মুক্তি এ ঘোর সংসারে॥
বারে বারে ডাকি মা মা বলে, কুপুত্র বলে ভাসালি সলিলে,
এবার দয়া প্রাণে মা, নে মা কোলে তুলে.
কুমাতা কভু নাই সংসারে॥
যদি আমি মরে যাই তাতে দুঃখ নাই,
তারা মা বলে কেউ ডাকবে না তোরে॥

অন্তরা—ত্বং হি তারিণী, ত্রিতাপহারিণী কলুষনাশিনী কালিকে।
তুমি গিরীশনন্দিনী, সুরেশবন্দিনী, হরাঙ্গিনী গিরি বালিকে॥
আর অসুরনাশিনী, শ্মশানবাসিনী, নমামি নৃমুণ্ডমালিকে।
কুমুদ পামরে, কবিত্ব সমরে, দিও তোমার ঐ শক্তিকে॥

ডাক — হরিচরণ নাথ (সরকার)

১

নমামি মা বাক্‌দায়িনী, নমি জ্ঞানদায়িনী।
বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী মাগো—তুমি বীণাপাণি॥
আছ গো মা কণ্ঠমূলে, জিভের বাক্য তব বলে—
শুষ্ক বৃক্ষ জ্ঞান-ফলে—পূর্ণ কর বরদায়িনী।
জ্ঞানী জনে ধ্যানেজ্ঞানে, সদা জপে নিশিদিনে,
দয়াময়ী নিজগুণে—চরণ দিবে শ্বেতবরণী॥

অন্তরা—শুধু বনফুল মা দিব না চরণে।
মনফুল দিব পায়, এই বাঞ্ছা মনে॥
অশ্রুজলে ধুয়ে কেশে মুছাব চরণ,
হৃদাসনে বসাইব মনেরই মতন।
জ্ঞান-চন্দন তুলসী দিব, দেহপ্রাণ আহুতি দিব,
অন্তিমে মা তোরে পাব বলে হরিচরণে॥

২

দুর্গে দুর্গতিহরা ঈশানী অসিধরা তুমি মা কুলকুণ্ডলিনী।
নিদ্রিতা মূলাধারে, শিবসহ একাধারে, জাগ গো জাগ গো জননী॥
দ্বিদল উপরে, চল শির মধ্যে, পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
করে ষটচক্রভেদ, ঘুচাও মনের খেদ, ধন্যা চৈতন্যারূপিনী॥

অন্তরা—এ দেহ বিশ্বচক্রে, বিরাজ ষটচক্রে, বহুরূপা তুমি শঙ্করী।
বিনাশিয়ে প্রপঞ্চে, পঞ্চদেবেরি মঞ্চে, বঞ্চ ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
আধার চক্র সাধিষ্ঠান, মণিপুরে অধিষ্ঠান,
হও মা নিজ রূপ ধরি।
দীন হরিচরণে, ভবভয় হরণে, তরণে দিও চরণ-তরী ॥

**ডাক** **রাজেন্দ্রনাথ সরকার**

১.
আমার হৃদয় মন্দিরে, বাজায়ে মন্দিরে, কে গো তুমি গেলে,
যখন ভালবাস আবার এস, বিদ্যুৎ বাতি জেবলে।
ঐরূপ মাঝে মাঝে তড়িৎ সাজে, কি বুঝে বা এলে ॥
এত মনোহর যার ছবিখান, তার সাজে কি এত অভিমান,
ত্বরায় এসে দাঁড়াও জুড়াইয়ে প্রাণ, সুমধুর খেলা খেলে।
আমার নয়নেরই জল, কুসুম সকল, তব পদে দিব ঢেলে ॥
ত্রিতাপে তাপিত পাপময় দেহ, তার মাঝে তোমার শান্তিময় গেহ,
তুমি ভিন্ন আর জানে না কেহ, সাধ্য কার দ্বার খোলে ঠেলে।
আমার রুদ্ধ হৃদয় দ্বার, এস গুণাধার, শ্রীকর পরশে মেলে ॥

চালক—মাঝে মাঝে কত সাজে কত প্রেম দিয়ে,
চোখের উপরে তুমি থাক লুকায়ে।
ক্ষণেক ভাবের অভাবে রাখ মরমে মারিয়ে ॥
আমি যখন তোমায় ভুলি, তুমি দাও হে করতালি,
অন্তরের অন্তরে দাঁড়িয়ে।
আমার বন্ধ মন্দিরে দাও চন্দন ছড়ায়ে ॥
কও না কথা দেও না ধরা, বুঝেছি এই তোমার ধারা,
তুমি আমায় যাবে না ভুলিয়ে।
আমার যাক্ এদিন, নিও সেদিন স্বধামে তুলিয়ে ॥

২.
বিভু তুমি সর্বাধার, সাকার নিরাকার, যীশু আল্লা বুদ্ধ হরি,
অনন্ত ভাবেতে ভাবিতে ভাবিতে জন্মিয়া যেন মরি।
আমি ক্ষুদ্র সংস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ করি ॥
তুমি অনাদির আদি, অনন্ত উপাধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত ঔষধি,
অনন্ত নদী, অনন্ত জলধি, তাতে অনন্ত লহরী।
আমার প্রাণটি লও মিলায়ে অনন্ত নিলয়ে, যেন সর্বত্র নেত্র তোমারে হেরি ॥

তুমি শিবলিঙ্গ শালগ্রামেতে প্রস্তর, অশ্বত্থ তুলসী বৃক্ষরূপ ধর
কালী কৃষ্ণ রবি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, তুমি গজানন গৌরী।
তুমি সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধু বলব কেন গৌর হরি ॥
চালক—চিন্ময় মৃণ্ময় তুমি হিরন্ময়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার জয় জয় জয় ॥
তুমি অসীম সসীম এক অনন্ত সর্ব সমন্বয়।
তুমি দেশ কাল পাত্র'ভেদে, কোরাণ বাইবেল বেদে, ধর্ম প্রচারিছ দয়াময়।
তুমি সকলের সকল আবার কারও কিছু নয় ॥
তুমি জটিল কুটিল সরল, স্বর্গ নরক সুধা গরল, এই যেন সদা মনে রয়।
তোমার ভাব নিয়া আমি যেন কাঁদি সব সময় ॥

৩.

বিশ্বে তাহার গান, বিশ্বে তাহার গান।
এ গান শুনতে হলে, হৃদয় খুলে পেতে রেখো কান,
মেতে যাবে প্রাণ ॥
বহে সমীরণ করে তাঁরই গুণকীর্তন,
ডাকে পাতায় পাতায় জগৎ পাতায়, মাতায় সবার মন ॥
ঐ যে নেচে নেচে উঠায় কেমন সঙ্গীতের তুফান ; কুসুমের বাগান ॥
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাজে বহুবিধ যন্ত্র,
ঐযে উচ্চরবে উচ্চারয়ে অব্যক্ত মন্ত্র,
তারে শত স্বতঃ-প্রকাশ কত তন্ত্র, করিছে আহ্বান ;
এই সবই তাঁহার দান ॥
চালক—চলিছে অষ্ট প্রহরই অমিয় সঙ্গীতলহরী।
দেখ্‌রে নয়ন শুন্‌রে শ্রবণ, আর কেন মিছে গহরী ॥
সাজিয়ে প্রকৃতি নানা আভরণে, সতত প্রণমে তাঁহার চরণে,
প্রেমে ডগমগ তাঁহারি স্মরণে,পুলকে উঠিছে শিহরি ॥
কত তাল কত রাগ কতই রাগিনী,
উঠিছে ছুটিছে দিবস রজনী,
হৃদয়েরই মাঝে, মাঝে মাঝে শুনি—বাজায় বাঁশরী শ্রীহরি ॥

ডাক — নকুলেশ্বর সরকার

১

জীবনের শেষে, খেয়াঘাটে এসে, কাতরে তোমারে স্মরি—
এস হে দয়াল হরি।
নদীর তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ, ভয়ে আতঙ্কে শিহরি ॥

বেপারের আশে এপ্যারে আসিয়া,
মায়া-কুহকিনীর কুহকে পশিয়া,
লাভে মূলে আজি সকলি নাশিয়া—
পথে পথে কেঁদে মরি ॥
জীবন প্রভাতে যাহাদের সাথে, খেলেছিনু কত খেলা ;
খেলা করে সারা, আগে এসে তারা, ভাসায়ে দিয়েছে ভেলা।
সম্মুখে দুরন্ত অকূল পাথার, কিসে হব পার জানি না সাঁতার,
নিজ গুণে এসে ভব-কর্ণধার, দিও শ্রীচরণ তরী ॥

অন্তরা—শুনেছি সাধুর অধরে, সঙ্কটে যারা পড়ে,
নিজ গুণে তার তারে, ভব-কর্ণধার !
কাতরে মিনতি করি, এস হে শ্রীহরি,
দিয়ে শ্রীচরণ তরী, কর মোরে পার ॥
জীবনের সম্বল যাহা কিছু পেয়েছি,
সকল বিলায়ে দিয়ে সব-হারা হয়েছি।
ফেলে আসা পথ যত, খুঁজে মরি অবিরত,
কারো সাড়া মিলেনা ত, ডেকে বার বার ॥
লুপ্ত হয়েছে স্মৃতি, সুপ্ত হয়েছে মন,
শ্রবণ হয়েছে বন্ধ, অন্ধ হল দু' নয়ন।
নকুলের শেষ দিনে, দীনবন্ধু তুমি বিনে,
কে তরাবে এ নিদানে, কে আছে আমার ॥

২.
আমার হৃদয় নদীয়ার মাঝে, এসো নদীয়াবিহারী।
নিয়ে তব অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি ॥
চিত্ত সুরধুনীর কূলে
নাচ একবার হেলে দু'লে,
মনানন্দে বাহু তুলে,
মুখে বলে হরি হরি ॥
আসক্তি কুসুম তুলে সাজায়ে ডালা,
আপন হাতে প্রেম সুতে গাঁথিয়ে মালা ;
জয়গুরু গৌরাঙ্গ বলে,
সে মালা পরায়ে গলে,
সাধু ভক্তের চরণ তলে,
ধূলায় যাব গড়াগড়ি ॥

অন্তরা—হায়গো, নাচ গোরা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ।
তুলে অতুল রাতুল পদে, মধুর নূপুর তান ॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজুক ধিনা কেটে ধিক্ ধিক্,
ভক্তজনে কাছে ডাকো, অভক্তকে শতধিক,
প্রিয় ভক্তগন সনে,
নাচ হরি সংকীর্তনে,
নকুলের বাসনা মনে,
শুনি হরি গুণগান ॥

৩.
দেশের এ ঘোর বিপদে, রাখো মা শ্রীপদে,
কাতরে মিনতি করি, এসো মা শুভঙ্করী।
দৈত্য বিনাশিতে অসি নিয়ে হাতে, সেজেছিলে ভয়ঙ্করী ॥
জাল ভেজাল অসত্য উৎকোচ অনাচার—
মহাপাপে হল বসুমতী ভার,
তাইতে হল বুঝি কল্কি অবতার,
ধ্বংসের মুরতি ধরি ॥
ধ্বংসের নেশায় দেশ হল উন্মত্ত, ভালো মন্দ নাহি জ্ঞান,
ধ্বংসের বেদীতে, হল বলি নিতে, অসংখ্য অমূল্য প্রাণ।
রক্তে রাঙ্গা হল বাংলা মায়ের অঙ্ক,
মানুষ দেখে লাগে মানুষেব আতঙ্ক ;
এ হতে বাঙালী জাতির কলঙ্ক
কি আছে বলো শঙ্করী।
হিংস্র পশু যারা হিংসা করে তারা, উদরের ক্ষুধা মিটায়,
খায় না শুধু মারে, পশু বল্‌লে তারে, পশুরাও লজ্জা পায়।
ধ্বংস যবনিকার অন্তরালে যারা,
সরিষাতে ভুত সেজে আছে তারা,
তাদেরই কল্পিত, কুকল্পনার দ্বারা
ধ্বংস যজ্ঞের ছড়াছড়ি ॥
অন্তরা—অনাচারে অবিচারে পাপে ডুবলো দেশ—
রন্ধ্র গত হয়ে শনি ক'রেছে-প্রবেশ।
এখন ভাইয়ে মারে ভাইকে ছুরি, নাইকো দয়ার লেশ ॥
পেয়ে ধ্বংসের অভিব্যক্তি, দেশের যত যুবশক্তি,
সেজেছে আজ মহাকালের বেশ।
করে রক্ত নিয়ে মাতামাতি, নিয়তির আদেশ ॥

বোমা ছোরা পাইপ গানে, যে ধ্বংস ডাকিয়া আনে,
দূর হবে না এ ভূতের আবেশ।
কবি নকুল বলে, এমনি হলে—বাংলা হবে শেষ ॥

## ডাক
**নারায়ণচন্দ্র বালা**

আমায় আর কতদিন বদ্ধ করে রাখবি সংসারে
দে মা মুক্ত করে মুক্তি দায়িনী।
আমায় এনে ভবের হাটে, করলি মায়ার মুটে,
মিছে খেটে মরি দিবা রজনী ॥
সঙ্ করি শঙ্করী দিলি এ সংসারে,
নিত্য মন মত্ত মায়া ঘুম ঘোরে,
(এবার) ভব-বারিধির বিষম ঘোনায় পড়ে—
ডাকি তোরে ভব-ভাবিনী।
আমার কুপথে কুপক্ষ সকলি বিপক্ষ,
রক্ষ বিরূপাক্ষ বক্ষবাসিনী ॥

অন্তরা—আর কাল বলে গেল দিন, দিন দিন কত দিন, হল না সেদিন জীবনে।
কবে কেটে মায়া ফাঁসী, ওমা মুক্তকেশী, স্থান দিবি শ্রীচরণে।
ভাই বন্ধুগণে যেদিন বিদায় দিবে, ধরিবে এসে কাল শমনে।
সেদিন সাধন বিহীনে, দীন নারায়ণে, নিজগুণে রেখ চরণে ॥

## ডাক
**দুর্গাচরণ সরকার**

ওহে নবীন কিশোর, শ্যাম নটবর, করুণা বিস্তার করিয়া।
নিয়ে কিশোরীকে বামে, বস একাসনে, হৃদি-বৃন্দাবন জুড়িয়া ॥
তোমার ও পদপল্লব, জগৎ দুর্লভ, নয়ন সফল করিব হেরিয়া।
আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ নব ভাবে মজে,
নিত্য নবরূপ হেরব চিত্ত মাঝে,
মন-পৌর্ণমাসী নব নব সাজে—
মাঝে মাঝে দিবে গড়িয়া ॥
হেরে যুগল রূপের মাধুরী, দিবা বিভাবরী—
রাখব নয়ন প্রহরী করিয়া ॥

অন্তরা—আমার মনমাঝে বিহার কর বনবিহারী।
প্রেম যমুনার কূলে, বসে বংশীবটমূলে।
বাজাও হে মোহন বাঁশরী ॥

কর চিত্ত নিত্য বৃন্দাবন, দ্বাদশ কোঠা দ্বাদশ বন,
গোবর্ধন নয়ন কোটরী।
ও দীন দুর্গাচরণ বলে, যেন প্রাণ অন্ত কালে,
ঐরূপ দেখে যেন প্রাণে মরি ॥

ডাক — শ্রীতারিণীচরণ সরকার

গুরু তারণ কারণ হরিচরণ শরণে মরণ বারণম্।
তোমার দুর্লভ ও পদপল্লব দুখানি, সর্ব কারণে কারণম্ ॥
প্রভু এ ভব দুস্তর পাইতে নিস্তার মাত্র, তব কৃপা হি কেবলম্।
লহ লহ প্রভু এ জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা তুমি সে আমার,
তুমি বিনে আর কেহ নাই এবার, ওহে অধম তারণম্।
কর শুভ দৃষ্টিপাত, ওহে সৃষ্টিনাথ, নইলে জীবন গেল অকারণম্ ॥
অন্তরা—প্রভু কেউ নাই আমায় উদ্ধারিতে তুমি বিনে।
ওহে পতিতপাবন অবতার, পতিতকে কর উদ্ধার,
তোমার পতিতপাবন নামের গুণে ॥
বট তুমি হরি কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর একবিন্দু,
দীনবন্ধু আমার এই দুর্দিনে।
বলে জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, যেন যায় চলিয়া,
আমার প্রাণপাখি অন্তিমের দিনে ॥

ডাক — বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চির সুন্দর এস বন্দন মন্দিরে প্রেমালোক জ্বালিয়া।
মম প্রীতি ভকতি প্রেম অর্ঘ্য আদি দিব পদে ঢালিয়া ॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি একেশ্বর, শাশ্বত অব্যয় তুমি অবিনশ্বর,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর, তুমি কালী কালিয়া।
অঙ্গেতে লেগেছে চলবার পথের ধূলি,
জীবনের দিবসে ঘনাল গোধূলি,
গোপন অন্তরের অন্তরায়গুলি, দেহ প্রভু খুলিয়া ॥
অন্তরা—ওগো দেবতা ব্যথাহারী, মোরে থাকিও না আর ভুলিয়া।
আশাবাণী কও, আপন হাতে দাও, দেউল দুয়ার খুলিয়া ॥
কাঁদিছে এ বিশ্ব তোমারি কারণ, তুমি বিনে অশ্রু কে করে বারণ,
অরূপ অরুণ সম করুণ কিরণ, শ্রীকরে দাও বুলিয়া ॥
সন্ধ্যার আঁধার ঐ আসিল ঘিরে,
পারের কাণ্ডারী তুমি অকূল নীরে,
পাগল বিজয় কাঁদিছে দাঁড়ায়ে তীরে, তরীতে লও তুলিয়া ॥

## ডাক

শ্রীঅমূল্যরতন সরকার

আমায় শিখায়ে দাও তোমার পূজা ওগো দেবতা—
মন্ত্র আমি জানি না হে তন্ত্র বারতা ॥
পূজা জানি না তোমার, কিবা দিব উপচার,
কি নাই তোমার—দিবার মত কি আছে আমার,
তুমি এ জগতের আধার হে বিশ্বপিতা ॥
আমি পূজারী একজন, ইহা বলে জগজ্জন,
আমি আছি আমায় তুমি আছ যতক্ষণ ;
তুমি করিলে পলায়ন কে বলবে কার কথা ॥

ঝুমুর—বুঝি না একি তব ছলনা, বুঝি না একি তব ছলনা।
যত করি আমি, সবই জান তুমি, ভুল হলে কেন ডেকে বল না ॥
চলিতে বলিতে ঘুমে জাগরণে, তুমি চির দরদী আমারি কারণে,
মাঝে মাঝে সাড়া দাও গোপনে গোপনে,
আমি তোমায় ভুলি, তুমি ভুল না ॥
তুমি মোর কাছে এলে, চেয়ে দেখি আমি নাই,
একটু আড়ালে গেলে তোমাকে ভুলে যাই,
অমূল্যে আর কাঁদাইও না ক্ষমা চাই—
ধাঁধাঁর দোলায় দিয়ে দোলনা ॥

## মালসী/ভবানী

[ মালসী সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ ; শ্যামাসঙ্গীত ভাবানুসারী সঙ্গীত বিশেষ। আকারে বৃহৎ এবং সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে রচিত গান। মালসী কথাটি সংস্কৃত মালশ্রী ( মালবশ্রী—মালব রাগের পত্নী ) রাগিণীর চলিত রূপ বলে কারো কারো ধারণা। বর্তমানে মালসী গান বলতে বোঝায় বার থেকে চৌদ্দ স্তবক বিশিষ্ট কবিগানের অন্যতম অঙ্গ মালসী গানকে।

প্রাচীন কবিগানে "ভবানী বিষয়" শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছিল, তার উপজীব্য ছিল মহামায়ার মহিমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আকুতি ও আবেদন, মায়ের কাছে সন্তানের আবদার অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ—যা সাধারণতঃ শ্যামাসঙ্গীত তথা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ধারা ও ধরণ।

কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর্তি ও মোক্ষলাভের আকুতির স্থানে এলো সমষ্টিকেন্দ্রিক বিষয় ও সমস্যা। দেশ, জাতি ও সমাজ যে সকল নিত্য নূতন সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে সে সব বিষয় অবলম্বন করে কবিয়ালগণ যে সব গান রচনা করতে থাকলেন, সেগুলিই "ভবানী বিষয়ক" গানের স্থান গ্রহণ ক'রে "মালসী" গান নামে প্রচলিত ও প্রচারিত হতে থাকে। যেমন, ভবানী বিষয়ক যুদ্ধের মালসী, ভবানী বিষয়ক দুর্ভিক্ষের মালসী ইত্যাদি। ভবানীকে উদ্দেশ্য করেই এ সকল গান রচিত ও গীত হতো।

ক্রমে উক্তশ্রেণীর গানের শিরোনাম থেকে "ভবানী বিষয়" অভিধা লোপ পায় এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যামূলক গানগুলি যুদ্ধের মালসী, দুর্ভিক্ষের মালসী, দেশ-ভাগের মালসী, বাস্তুত্যাগের মালসী, কণ্ট্রোলের মালসী, দুর্নীতির মালসী ইত্যাদি নামে রচিত ও গীত হতে থাকে।

তারা, কালী, ভবানী, দশভুজা, মহামায়া প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাকে সম্বোধন করে রচিত হলেও দেশ ও সমাজের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ মালসী গানের বিষয়বস্তু-রূপে গৃহীত হয়ে এই গানকে অনেকটা গণ-সঙ্গীতের রূপ তথা সমাজ দর্পণের মর্যাদা দান করেছে। ডাক গানের সাথে সাথেই একটি করে যে মালসী গান গাওয়া হয়, তাই এক কথায় ডাক-মালসী। বলা বাহুল্য এই গানের জবাব হয় না। ]

### সমাজচিত্রের মালসী — হরিচরণ আচার্য

চিতান—দেখি দেশের দশা দশভুজা, বিষম দশা, দশম দশার প্রায়।

পাড়ন—দেশে ছিল বা কি, হল বা কি, মাগো মা—
কত কি সাক্ষাতে দেখা যায়॥

১ম ফুকার—দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত,
কন্যার চিন্তায় মস্তিষ্কের হয়ে ছন্নতা ;
দাঁড়ায় কন্যারূপে মৃত্যুকন্যা, যমরূপেতে জামাতা।
গরীব ভদ্র কন্যার বিয়ের পাত্র, তালাস করলে বি, এ, পাত্র,
হাতে উঠে ভিক্ষা পাত্র, শিক্ষা এই ত নব্য সভ্যতা॥

মিল—তুমি ইচ্ছাময়ী বেদে তন্ত্রে কয়, তোমার ইচ্ছায় সকলি হয়,
তবে কার ইচ্ছাতে এসব হল।
মুখ—বিধি বিষ্ণু প্রসবিনী, অবিধির বিধিদায়িনী—
বিয়ের বিধি কি করলে তাই বল ॥
ডাইনা—সংসারে দুঃখে দুঃখিতা, গরীব পিতামাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল,
আপন বসনে কেরোসিন তেলে, আগুন জেবলে দুঃখাগুন নিভাইল।
পেয়ে স্নেহলতার বার্তা, পড়েছে মরণের পরতা,
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল।
খোঁচ/খাদ—সব বিপরীত, সব বিপরীত, হিতাহিত জ্ঞান সবে হারাইল ॥
২য় ফুকার—আবার কুলীনের কুসংস্কার, কুলের পদে নমস্কার,
কুলীন বরের বয়স আশি পঁচাশি ;
ঘটে বিয়ের পাত্রী, স্কুলের ছাত্রী, পাঁচ সাত দশটি রূপসী।
বৃদ্ধ ভবপারের পায় তরণী, নিস্তারিণী সব তরুণী,
বিয়ে নয় সে বৈতরণী, দুদিন পরে প্রাপ্ত হয় কাশী ॥
মিল—আছে সমাজে মান্যগণ্য লোকসকল,
সবে বিধি বাক্য ভেবে নকল, অবিধিকে দখল করল ॥
অন্তরা—ভারতের বালবিধবা, নির্বান্ধবা, তাদের প্রতি কেবা করে লক্ষ্য।
যাদের বুকের জ্বালা যায় না বলা, কে বুঝে অবলা দুর্বলার দুঃখ ॥
পুরুষের নাই ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীর উপর নিষ্ঠুরের কার্য,
বড় বড় ভট্টাচার্য, বিধবা বিবাহের বিপক্ষ।
আছে দত্তা কন্যা পুনঃ দত্তা, মহাত্মা পরাশর মুনির বাক্য ॥
পরচিতান—করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মত প্রকাশ।
পরপাড়ন—করি বেদ পুরাণরূপ সাগর মন্থন, মা গো মা—
এই বিবাহের আইন করালেন পাস ॥
৩য় ফুকার—যদি পুরুষের হয় স্ত্রীবিয়োগ, করে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ,
বিয়োগের পর পুনঃ পূরণ হয় ;
দিতে বিধবা বিবাহের বিধি স্বয়ং বিধি পরাজয়।
কেহ মন্মথে হয়ে প্রমত্তা, একার্ণবে সব ভেবে মিথ্যা,
করে না ঠেকে অগত্যা, ভ্রূণ হত্যা মহা পাপের ভয় ॥

## জাতীয় অধঃপতনের মালসী — হরিচরণ আচার্য

চিতান—ব্রহ্মময়ী তোর ব্রহ্মাণ্ডেতে জন্ম নিয়েছি।
পাড়ন—ঐ যে আমেরিকা ইউরোপ, কলকারখানা নানারূপ,
দেখে অপরূপ অবাক হয়েছি ॥

ফুকার—এসে ইংরেজ রাজার রাজত্ব, বিজ্ঞানের আধিপত্য,
ভারতবাসী তার তত্ত্ব কি রাখি ; তারা মা গো—
সদায় রেলগাড়ি আর স্টীমারে, বেড়াই বাবুগিরি করে,
উড়ো জাহাজ শূন্যে উড়ে, সেই দিকে চেয়ে থাকি ॥

মিল—মোদের ঘরের জিনিস পরে নিয়ে ডঙ্কা মারে তারা,—
হায় হায় সর্বস্ব হারায়ে মোরা, মরার মত বেঁচে আছি ।
মুখ—দীন দয়াময়ী মা, এখন দেশ দিয়ে বিদেশীর হাতে,—
দিনে দিনে পরাধীন হতেছি ॥
ডাইনা—দেখেছি রামায়ণ পড়ে, আগে মেঘনাদ থেকে মেঘের আড়ে,
রথে চড়ে রণ করিত কত ; এখন সব কল্পনার অতীত ;
কথা ঠাকুরমায়ের গল্পের মত ।
সবই পণ্ড নাই কাণ্ডজ্ঞান, মুখে বলি বিজ্ঞান বিজ্ঞান,
যত জড় বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, হারাইয়ে অজ্ঞান হয়েছি ।
খোঁচ/খাদ—শিল্প কি বাণিজ্য কার্য সব ভুলে গিয়েছি ॥

ফুকার—মাগো, শ্রীহট্টের চম্পক নগর, জন্মিয়ে চাঁদ সদাগর,
সাগর পারে বৃদ্ধি করত ঐশ্বর্য ; তারা মাগো—
সে ত চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়ে, বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়ে,
সে যে নিঃশঙ্কাতে ডঙ্কা দিয়ে, লঙ্কায় করত বাণিজ্য ॥
মিল—এখন আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়ে ভারত অগ্রগণ্য,—
মাগো, হয়ে নগণ্য জঘন্য, সকলি শূন্য দেখতেছি ॥
অন্তরা—আবার কি মেসমেরিজম মিডিয়াম করা,
আমেরিকা হতে ভারতে এল ।
এসব বশীকরণ, আত্মা আনয়ন, প্রাচীনকালে এই ভারতে ছিল ॥
দেখছি রামায়ণ পড়ে, সীতার তরে লঙ্কাপুরে,
দশরথ এসে মৃত্যুর পরে, সাক্ষী দিয়েছিল ।
আবার গান্ধারীর সব মৃত পুত্র, একত্র এনে ব্যাসে দেখাইল ॥
পরচিতান—শুধু পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভারত পরাধীন ।
পাড়ন—মোদের পূর্ব পুরুষের স্বাস্থ্যধন, হারায়ে হলেম নির্ধন,
অনুতাপেতে সদায় তনুক্ষীণ ॥
ফুকার—আবার পাতাল গঙ্গার তুলছে জল, বসতেছে নলকূপের কল,
আমেরিকায় কৌশল আবিষ্কার করিল, তারা মা গো মা—
অর্জুন বাণে অঘটন ঘটায়ে, শরশয্যায় সাধ মিটায়ে,
এই গঙ্গার এই জল উঠায়ে, ভীষ্মকে পান করাইল ॥

মিল—দেশে রামায়ণ আর মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ;
এসব ভূরিভূরি আছে প্রমাণ, অনুমানে সব জানতেছি।

**বার্ধক্যের মালসী** **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—মহামায়া এই মানব কায়া, এসব তোর মায়ারই কৌশল।
পাড়ন—দেহে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, আহার বিহার বিলাস ঘুম,
চলছে ধুমাধুম, দমবাজি কেবল ॥
ফুকার—কত সঙ করালি শঙ্করী গো—সংসারে আনিয়া,
বাল্য পৌগণ্ড আর কৈশোরাদি—যৌবন জরা দিয়া।
মাগো, দেহের ইন্দ্রিয়াদি যত ইতি, যার যার কর্মে দিল ইতি,
যো আদমী কিনেগা হাতি, আদমী ছুট্ গিয়া ॥
মিল—এখন এক বিষয়ে পাগল হলেম, দেখে ঠেকে শিখে—
বৃষ বৃদ্ধ হলে সেই বৃষকে, যতন করে কোন্ কৃষকে।
মুখ—ধরলো বৃদ্ধকালে রোগে, পশুর ভাব অন্তরে জাগে,
শিশুর ভাবে সাজাইয়া দে আমাকে ॥
ডাইনা—অচল হল সচল তনু, অচল উঠতে বসতে কটি জানু,
মাটিতে ভর করে চলে কার্য,
রাস্তায় হাঁটিতে লাঠিতে করে শরীরের সাহায্য।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শুকায় জিহ্বা, কষ্টে কাটাই রাত্রি দিবা,
বলি মাগো মা বাবাগো বাবা, দুর্গানাম আসে না মুখে।
খাদ—কিবা ছিলেম কিবা গো হলেম, মরি গো সেই দুখে ॥
ফুকার—এখন শুভ্র বরং কল ধারণ, দাড়ি গোঁফে চুলে,
গেল পান সুপারী, মুড়কি মুড়ি, দন্তের অন্তকালে।
মাগো, এখন একলাফে আর যাইনা লঙ্কা, কাঁকালি হয়েছে বঙ্কা,
শমন রাজায় বাজায় ডঙ্কা, এই বুড়াকে ধরবে বলে ॥
মিল—এখন নয়নে নাই দৃষ্টিশক্তি—কি দিবা শর্বরী,—
চিনা মানুষ চিনতে নারি—চেয়ে থাকি মুখেব দিকে।
অন্তরা—বুড়া ত হয়েছি সব সুখ গেছে সরিয়া।
এখন অন্ধকারে চলাফেরা লোকের হাতে ধরিয়া ॥
কাশ ঘন ঘন, আর তব পদে নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ,
মাগো তারা তারা বলে যেন, যেতে পারি মরিয়া ॥
পরচিতান—দুইটি অকার-আদি গুণনিধি, বুড়াকে খোঁড়া করেছে।
পাড়ন—বড় কষ্টে যায় মা রাত্রদিন, পরের দশা পরাধীন,
মাগো আগের দিন বাঘে খেয়েছে ॥

ফুকার—এখন সোন দিয়ে পাকা চুল বাছি—সঙ্কোচে সরমে ;
আনলেম পাকা চুলের পাকা কলপ—সবই মনভ্রমে।
মাগো, বৃথা তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, পাকা দাড়ি পাকা চুলে,
কি হবে আর কলপ দিলে, যখন তলপ দিল যমে ॥

## ভবানী বিষয়ক দুর্ভিক্ষের মালসী — হরিচরণ আচার্য

চিতান—তারা ! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী, আগম নিগম তন্ত্রে কয়।
পাড়ন—জীবের পক্ষে তুই বিপক্ষে, মরি দুঃখে গো মা—
হল দুর্ভিক্ষে প্রলয় ॥
ফুকার—এইবার বরিশাল ফরিদপুর ঢাকা, ময়মনসিং ত্রিপুরা,
হল জীবের দুঃখ, ঘোর দুর্ভিক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া।
মাগো, নাই চাউল নাই টাকাকড়ি, বাজারে নাই মাছ তরকারী,
মুগ মটর আর বুট খেসারী, সমস্ত জিনিস চড়া ॥
মিল—শুনি অন্নপূর্ণা নামটি নিলে, জীবে অন্ন পায়,—
কেন সে নাম নিয়ে এ অনুপায়, কষ্ট পাই কপালের ফলে।
মুখ—অন্নপূর্ণা গো মা, কেন অন্নপূর্ণা নামের ফল মা, ফলে না কলিকালে ॥
ডাইনা—মা হয়ে বিমাতার মত দিবি কত দুখ,
সদা হা অন্ন হা অন্ন বলে, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে দেশের লোক।
অশেষ দুঃখ এ দুর্ভিক্ষে, ভিক্ষুকের মিলে না ভিক্ষে,
হল সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষে, রেঙ্গুনের আতপ চাউলে।
খাদ—আউশ ধান্যের আশা ছিল সেও নিল জলে ॥
ফুকার—এবার দেশে দিল দুঃখ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী ;
কারো দিনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসী।
কেহ ক্ষুধাতুর সন্তানের বদন, দেখে দুঃখে করে রোদন,
ভবের মায়া করে ছেদন, গলাতে দিয়েছে ফাঁসী ॥
মিল—কেহ দু'দিন পরে অন্ন রেঁধে কার্যে যায় বাহিরে,—
কেহ সেই অন্ন খায় চুরি করে, মারতে আসে ধরতে গেলে ॥
অন্তরা—মরি দুঃখে এ দুর্ভিক্ষে সব হল মাটি।
যার যা ছিল, সকল গেল, কেহ বান্ধা দিয়ে খেল, কলস ঘটিবাটি ॥
কেহ কেহ হাটে হাটে, উদরের দায়ে চাউল লুটে, হয় ফাটাফাটি।
দীন দৈন্য ক্ষুধায় ক্ষিণ্ণ, কেহ একবেলা খায় অন্ন, এক বেলা রুটি ॥
পরচিতান—আবার জীবের কিবা অদৃষ্টের ফের, দুধের সের চারি পাঁচ আনা।
পাড়ন—গাভীগণে তৃণ বিনে, দিনে দিনে গো মা—অতি হয়েছে ক্ষীণা ॥

ফুকার—কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সংসারের এই প্রথা,
মাগো অন্ন বিনে প্রাণে মরে কেমন দুঃখের কথা।
আছ অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে, কাশীশ্বরী কাশীপুরে,
সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, ( তবে ) পুত্রের প্রতি কি মমতা ॥
মিল—হরিচরণ বলে কবির দলে লাভের আশা তফাৎ,
মাগো বিশ জনের দুই বেলা ভাত,
কিসে যোগাই এই আকালে।'

## যুদ্ধের মালসী

হরিচরণ আচার্য

চিতান—তারা, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী শিবের তন্ত্রেতে শুনি।
পাড়ন—এবার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নাই তোমার, উঠ্‌লো ভারতে হাহাকার ধ্বনি ॥
ফুকার—হল ইউরোপে প্রলয় চিহ্ন, চল্লিশ অক্ষৌহিণী সৈন্য,
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য, তাতে সমুদ্রের পথ রুদ্ধ।
তাইতে জার্মানী আর সার্ভিয়ারে, অকালে সৃষ্টি সংহারে,
রাম রাবণের যুদ্ধের পরে, হয় নাই এমন যুদ্ধ ॥
মিল—কোথায় রণের অনল হল প্রবল, বিদেশ ইউরোপে,
এবার ভারতবর্ষ ভয়ে কাঁপে, সেই রণ উপলক্ষে।
মুখ—রণরঙ্গিনী জয় দে ইংরাজ পক্ষে ॥
ডাইনা—আমরা সব ভারতের প্রজা সরল সোজা লোক ;
শুনি দুর্বলস্য বলং রাজা, চাণক্যের এই শ্লোক।
হউক যুদ্ধ সমুদ্রের পারে, শক্তি দিয়ে ইংরাজেরে,
তুমি রক্ষাকালী মূর্তি ধরে, ভারত কর রক্ষে।
খাদ—দেশ গেল দেশ গেল সবে বলতেছে একবাক্যে ॥
ফুকার—শুনি জল যুদ্ধ হয় স্টীমারে, স্থলযুদ্ধ সমুদ্রের পারে,
ব্যোমযানে রণ শূন্যেতে থেকে ; এমন রণ দেখেছে কে।
হল নরশক্তি রণাসক্ত, রক্তে ধরা অভিষিক্ত,
এবার ইচ্ছামত নরের রক্ত, খাউক ভূষণ্ডী কাকে ॥
মিল—আগে রামায়ণ মহাভারতে রথের কথা শুনি,—
এবার ব্যোমযানে ইংরাজ জার্মানী দেখান প্রত্যক্ষে ॥
অন্তরা—হল না ভাদ্র মাসে পাটের আদর, বিলাতে রপ্তানী বন্ধ।
এই যে পুণ্যা' করে শূন্য করে, জমিদার বসেছে অদ্য ॥

গেল এই মুসুমের আশা, ধনীর হাতে একটা পয়সা,
অদ্যাপি নাই বিঘূর্ণমোহদ্য।
এবার হাটে ঘাটে শুনি, পাট:পাট পাট,—
আর শুনি কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ ॥
পরচিতান—সর্বমঙ্গলা এ কি অমঙ্গল, কিছু পারি না জানতে।
পাড়ন—কেবল বিষাদ বৃদ্ধি ঘুচল বুদ্ধিবল, এ কি ধুমকেতুর ফল,
দুই বৎসর অন্তে ॥
ফুকার—র'ল পাট বন্ধ গৃহস্থের বাড়ি, নাই ধান চাউল টাকাকড়ি,
বাড়ি বাড়ি হাহাকার ধ্বনি ; খাদ্য কি দিয়ে মা কিনি।
অনধিকার চর্চায় থেকে, যুদ্ধের কথা সবার মুখে,
এবার ঘুমালে লোক স্বপ্নে দেখে, বিলাত আর জার্মানী ॥

## জয়দেবপুর ( ভাওয়াল ) কুমারের মালসী — হরিচরণ আচার্য

চিতান—মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লীলা হয়।
পাড়ন—মা তোর পূর্ব বঙ্গে রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল,
হল অপূর্ব লীলার অভিনয় ॥
ফুকার—শুনলেম অতিপ্রিয় পুত্র তোমার, জয়দেবপুরের মধ্যম কুমার,
মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে ;
রাজার শবদেহটি সৎ লোকেরা—এল সৎকার করে।
মাগো, হায় হায় চাঁদের বাজার আঁধার হল, শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল,
মরা মানুষ ফিরে এল, আবার বার বৎসর পরে ॥
মিল—দেশে রাজা প্রজা জমিদার সব কি উৎসাহে ছুটল;
এবার ভাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যায় পূর্ণ শশী।
মুখ—আশ্চর্য সব লোকে, এসে উদয় হল নরলোকে, পরলোক নিবাসী ॥
ডাইনা—শ্রীমন্তে মশান মাঝে, তুমি রক্ষা করতে ভক্তরাজে,
সেজেছিলে কমলে কামিনী ;
এবার সে হইতে আশ্চর্য লীলা—করগো জননী।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী, জয়দেবপুর শূন্য রাজধানী,
মাগো, তুই হয়ে গণেশ জননী, কোলে নে নবীন সন্ন্যাসী।
খাদ—ভবের খেলা চক্ষে দেখুক, শিখুক ভারতবাসী ॥
ফুকার—রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থসাধন করতে তারা,
রাজকুমারকে বিষ খাইয়েছিল ;

হায় হায় শ্মশানবন্ধু হয়ে তারা—শব শ্মশানে নিল।
মাগো, বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে পালাল ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্মদাসে, এসে পুনর্জীবন দিল ॥
মিল—পুনঃ জীবন পেয়ে, বনে গিয়ে হয়ে ঘোর বিরাগী—
হল সঙ্গগুণে মহাত্যাগী, মহাযোগী মহাঋষি ॥
অন্তরা—অনেকের মন দেহের সন্দেহের কেন্দ্র।
অঙ্গের চিহ্ন দেখে অনেকে কয়—এই সন্ন্যাসী সেই রমেন্দ্র ॥
দেখতে ও চাঁদ বদনখানি, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি,
এল না সে রাজার রানী, রাজার শালা সত্যেন্দ্র।
আবার বর্ধমানের রাজার মত—
হয় না যেন জাল প্রতাপচন্দ্র ॥
পরচিতান—অসার মায়ার সংসার, মায়ার সাগর, সার মাত্র মা তোমার চরণ।
পাড়ন—যে জন সর্প সহ করে বাস, তার প্রাণের আর কি বিশ্বাস,
সাক্ষী রাজা রমেন্দ্রনারায়ণ ॥
ফুকার—এরূপ মায়ামোহে পেয়ে দাগা, কত রাজ্যের হতভাগা,
কত রাজ্য করে দিল মাটি ;
কত সোনার সংসার করলি শ্মশান, তুই পাষাণের বেটি।
মাগো, আমরা হয়ে জীবন্মৃত, ছালিতে ঢেলেছি ঘৃত,
অন্ধকারে অবিরত, ভূতের বেগার খাটি ॥
ফুকার—শুনলেম মুন্সেফপুরের মুকুন্দ গুণ, দিন দুপুরে হয়েছে খুন,
পাপের আগুন জ্বললে কি আর নিভে ;
আশুবাবুর ·. ত ব্যাধি ধর্মে কত সবে।
মাগো, এখন সম্মিলনের মহাযজ্ঞে, দেখতে পাবে যোগ্যাযোগ্যে,
শালার ভাগ্যে, রানীর ভাগ্যে—জানি শেষকালে কি হবে ॥

## ভবানী

তারকচন্দ্র কাড়ার

চিতান—ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মবিদ্যা মাগো আদ্যা সবাকার।
পাড়ন—তুমি সারাৎসারা কালীতারা, মহাবিদ্যা অনাদ্যা বিশ্বমূলাধার ॥
ফুকার—মা তোর শ্রীচরণ ধন সাধনার ধন,
শত্রুভাবে ধরে চরণ দিলে মহিষাসুরে।
সাধনার ধন ভক্তিতে পায়, আমার নাই মা কোন উপায়,
ভক্তও নই শত্রুও নই, চরণ পাই মা কেমন করে ॥

মিল—যেমন পিতৃ স্বত্ত্ব পায় সন্তানে,
থাকতে পিতা বর্তমানে, না দিলে কি পায় ;
পিতা মহাকাল ধন দেবার বেলায়, কাল হয়ে রয় এককালে।
মুখ—দুর্গে জীবের সর্বস্বধন ঐ শ্রীচরণ, শিবের বক্ষে দিলে ॥
ডাইনা—আমি একা ঘরে বসত করি, চোরের সঙ্গে সদাই ফিরি,
রিপু ছয় চোর সাথে,
এবার সিঁদকাঠি দিব মা—ঐ ছয় চোরের হাতে।
সিঁদ করবো অষ্ট পাশ কেটে, শিবের হৃদ গারদে উঠে,
শিবের হৃদপদ্মের ধন নিব লুটে—জয় কালী জয় কালী বলে।
খাদ—শিবের ঘরে করবো চুরি মা যা থাকে কপালে ॥
ফুকার—মাগো, চোরে যদি তোরে ডাকে, চুরি করতে যেতে ;
যাত্রা সিদ্ধি তোর নামেতে।
কালী মন্ত্র জপে মুখে, এবার চন্ডীপুরে ঢুকে,
মোহ করবো মহেশ্বরকে, মা তোর সম্মোহন মন্ত্রেতে ॥
মিল—ভোলা পারবে না আর নাড়তে গাত্র,
হাতে লয়ে বিল্বপত্র মোহিত যোগে।
বলবো কার আজ্ঞে কালীমা'র আজ্ঞে—
লাগ গিয়ে শিবের বক্ষস্থলে ॥

## মালসী — হারাইল বিশ্বাস

চিতান—কর্মক্রমে এসে এই জন্ম ভূমেতে।
পাড়ন—পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, মনে করে অহঙ্কার ;
তাদের কর্তা হয়ে ভুলে আছি মা—তব মায়াতে ॥
লহর—জানি সংসারের কর্তা হওয়া, স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া,
মা গো, মায়ানিদ্রা ভাঙলো না,—তারা মা মা,
মাগো, আমার পুত্র আমার দারা, তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা,
'তারা' বলে এক দিন তারা—ডাকতে পাল্লাম না।
মিল—তারা দিন কতক কাল সুখে ভুলে আছি নিশিদিন,
যখন আসবে সমন করবে দমন,—এ সুখের দিন কোথায় রবে ?
মুখ—তারা মাগো, আমায় বল শুনি মা,—
সেদিন আমার কি সুখে যাবে ?
ধুয়া—সময় অন্ত হবে যখন, দারাপুত্র এসে তখন, করবে নিরীক্ষণ,—
বলবে, ছিলে কর্তা, চললে কোথা, রেখে যাও কি ধন ?

করিয়ে ধনের উদ্দেশ, মায়া কান্না কাঁদিয়া শেষে,
আমায় সাজায়ে সন্ন্যাসীর বেশে, শ্মশানভূমে ফেলে দিবে।
খাদ—ভোজের বাজী এ সংসার জানি গো শিবে ॥
লহর—জানি বন্ধুবর্গ আছে যারা, দিনে দিনে সবই তারা,
করবে তারা ধনের প্রার্থনা ; তারা মা মাগো—
সবে বলবে সে সময়ে, দিবে কি ধন যাও হে দিয়ে,
আমি যাব কি ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না ॥

## লহর মালসী

কানাই নাথ

চিতান—তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে শুনতে পাই।
পাড়ন—তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ
মাগো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই ॥
লহর—তুমি আদ্যাশক্তি তারা, তোমায় ধরতে দেও না ধরা,
জীবকে সারা করলে মায়াজালে।
তোমার মায়াতে মা হযে মুগ্ধ, বিষয়-বিষে হইলেম দগ্ধ,
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে ॥
মিল—পাপ পুণ্য মা তোমার কার্য, দোষের ভাগী আমি,—
ঠিক বাজিকরের মেয়ের মত,
দেখাও ভোজের বাজি ভূমণ্ডলে ॥
মহড়া—এমা দুর্গে! পাপ পুণ্যের বিচার কর তুমি মা,
আমি সে ভার দিয়েছি তোমার চরণ কমলে ॥
ধুয়া—এ দেহে মা তুমি রাজা,—
দেহরাজ্যে তোমার প্রজা, ছয় জনা এখানে ;
তারা প্রজা হয়ে, রাজার হুকুম আমলে না আনে।
ছয় জনা মা প্রতিবাদী, সূক্ষ্ম বিচার কর যদি,
হয়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদী, আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে ॥
খাদ—সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণ তারা,—আপনি সৃজিলে।
লহর—আমি তরব তমঃ গুণে—এবার সার ভেবেছি মনে মনে ;
সত্ত্ব গুণের গুণ কি আছে বল।
সাক্ষী আছে মৈষাসুরে, তমঃ গুণ সে প্রকাশ করে,
মা তোমার এই রাঙা চরণ পেল ॥
মিল—তমঃ গুণে সাধন সিদ্ধি, সত্য জানা গেল,
জানি তমঃ গুণে তরে গেল—কালকেতু ব্যাধের ছেলে ॥

ঝুমুর—সদা তাই ভাবি মা বসে নিশিদিন।
কবে হবে আমার বিচারের দিন ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে, আমার সেদিন বা কিরূপে যাবে,
ভেবে হইল এই তনু ক্ষীণ ॥

## ইংরেজী শিক্ষার মালসী

মথুরানাথ বালা

চিতান—তুমি ত্রিতাপনাশিনী দুর্গে বেদে শুনতে পাই।
পাড়ন—তোমার নাম নিলে হয় শমন জয়ী, সে নামের ফল ফলে কই,
তাইতে বলি ও ব্রহ্মময়ী, নামের গুণ তো নাই ॥
ফুকার—তুমি যমকে দিলে রাজত্ব ভার, সে করে পাপপুণ্যের বিচার,
যে অত্যাচার করে রাজা কলি ;
দেখে তার দৌরাত্ম্য পাপে মত্ত হলাম সকলি।
মাগো যাগ যজ্ঞ হোম দান কি ব্রত, এখন নাই আর পূর্বের মত,
ধর্ম কর্ম ছিল যত, ও তা ধন দিয়ে ভুলালি ॥
মিল—শিখায়ে ইংরেজী বিদ্যা দিয়েছ জীবেরে,—
ও সেই আকর্ষণী মন্ত্রের জোরে, সব তত্ত্ব যেতে হয় ভুলে।
মুখ—কালী তারা মহাবিদ্যে, শিখায়ে ইংরেজী বিদ্যে জগৎ মাতালে ॥
ডাইনা—ছিল দ্বিজের লক্ষণ তিলক করা, আর সন্ধ্যা করা,
চণ্ডী পড়া ছেড়ে দিছে তাই ;
কেউ বা ভাগবত রেখে ইংরেজী শিখে—
কারো মুখে রাম হরিনাম নাই।
বলে কলিতে ইংরাজ দেবতা, কিসের কৃষ্ণ কালীমাতা,
হরিকথা কৃষ্ণকথা, ছেড়ে সদায় ইংলিশ বলে।
খাদ—এত সাধের ছিল বেদ পুরাণ, ও তা গেল রসাতলে ॥
ফুকার—মাগো ইংলিশ ম্যান হয়েছে যারা, শিব দুর্গা মানে না তারা,
রাধাকৃষ্ণ নাম শুনতে পারে না ;
কোন দেবদেবী দেখিলে পরে প্রণাম করে না।
তারা লয় না প্রসাদ আর হরির লুট, যদি পায় পাউরুটি বিস্কুট,
পেট ভরে খায় কয় ভেরী গুড, বলে দেও বিলাতিখানা ॥
মিল—নট ফরগেট মি, ভেরী গুড, গুড বাই বলে কথায় কথায়,
বাবু গিন্নীর কাছে ডেকে বলে, তিন টাকার চাকরী পেলে ॥
অন্তরা—কি মোহিনী আছে মা তোর ইংরেজীতে।
জাতির ভয় করে না কেহ, বিলাত যায় ব্যারিষ্টার হতে ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্র শূদ্রে বৈদ্যে, শিখতেছে ইংরেজী বিদ্যে,
ও মনের সুখেতে।
মাগো হিন্দু মুসলমান, করলি এক সমান—
মান রল না কোন মতে ॥

দেনার ভবানী — রাসবিহারী সরকার

চিতান—রাখবি এ ভবে আর কত দিন দীনতারিণী তারা।
পাড়ন—ও মায়া-নদীর ঘাটে তুফান উঠে, তারা গো মা—
আমার ডুবল সাধের ভারা ॥
ফুকার—আনলেম মহাজনের ষোল আনা, ব্যাপার করিব দুনা,
হলেম দেনা মহাজনের ঠাঁই,
করব কি ধন লয়ে বেচাকেনা, আমার হাতে কিছু নাই।
করে ক্যামিকেলের দোকানদারী, মাল কুঠিত হল চুরি,
আমার জমায় শূন্য খরচ ভারী, এবার নিকাশ দিবার সাধ্য নাই ॥
মিল—নিকাশের ঘর পূর্ণ কর ব্রহ্মময়ী তারা—
যেন নিকাশে পড়ি না ধরা, আমায় রক্ষা কর পুত্র বলে।
মুখ—এই ছিল কি শ্যামা গো মা, এবার আমার কপালে ॥
ডাইনা—রেখে দশ মাস দশ দিন মা তোর পেটে—
পাঠিয়ে দিলি ভবের হাটে, দিয়ে মায়াডুরি ;
মা তোর মায়াডুরির পাকে পড়ে, আমার আমার করি।
আমার সঙ্গের সঙ্গী যারা ছিল, পূর্ব সত্য না মানিল,
আমার সাধের ভরা ডুবিয়ে দিল, কাম-সাগরের অগাধ জলে।
খাদ—ত্রাণকর্ত্রী কর ত্রাণ আমায় কুসন্তান বলে ॥
ফুকার—আমায় মুক্ত কর মুক্তকেশী, করে লয়ে তীক্ষ্ন অসি,
মায়াফাঁসী করে দাও ছেদন ;
তোমার প্রেমদানে প্রেমানন্দে করি হরি সংকীর্তন।
আমি পুরাণে প্রমাণে শুনি, ত্বং হি পতিত উদ্ধারিণী,
জেগে চতুর্দলে কুণ্ডলিনী, কর পাপ দেহে প্রেম বরিষণ ॥
মিল—দুস্তরে নিস্তার তারা ত্রিলোকতারিণী—
আমায় দিয়ে অভয় চরণ-তরণী, পার কর ভব-সিন্ধু জলে ॥
অন্তরা—এবার আমার ভবের ব্যাপার সারা হল।
হাতে পুঁজি নাই আমার, হবে কি ব্যাপার,
লাভে মূলে আমার সকল গেল ॥

গুরু দত্ত ধন লয়ে এলেম, কর্মদোষে সব খোয়ালেম,
এখন শুধু হাতে বসে রলেম—
ভবপারে যেতে কিছু নাই সম্বল ॥
পরচিতান—আমার এ দেনা মা কত দিনে মিটাইয়া দিবে।
পাড়ন—এনে ভবের হাটে, করলি মায়ার মুটে,—
তারা গো আমায় আর কত ঘুরাবে ॥
ফুকার—আমি মহাজনের চালান এনে; ব্যাপার করব আশা মনে,
পরম ধনে দিলাম বিসর্জন ;
আমায় অবিশ্বাসী পাইকার বলে, জিনিস দেয় না মহাজন।
এখন ক্ষান্ত করে দোকানদারী, যাত্রা করলেম দোকান ছাড়ি,
আমায় কৃপা করে শুভঙ্করী, কর এ দেনা হতে মোচন ॥
মিল—আমায় আর কত কষ্ট দিবি শুভঙ্করী—
মাগো তাইতে কাঁদে রাসবিহারী, পার কইরো মা পারির কালে ॥

**আশার মালসী** (খণ্ডিত) **কুঞ্জবিহারী দত্ত**

চিতান—ভবে আসিতে আসিতে ওমা আসিতে, আশাতে ভুলে রয়েছি।
পাড়ন—আমার যে আশাতে ভবে আসা, হল না সংসার—
আশার দেশে আশার বশে, অসার আশার পসার খুলেছি ॥
ফুকার—যখন জননী জঠরে বাসা, কঠোরে তোর চরণ আশা.
হতো কতবার, দেখে অসার অন্ধকার।
আশা ক্ষেত্রে আসা মাত্রে, আশা-সূত্রে বেঁধেছে আবার।
ভুলায়ে তোর চরণ আশা, দিলে দুরন্ত কু-আশা,
ঠিক যেন নিশির কুয়াসা, দুই নয়নে মায়ার অন্ধকার ॥
মিল—আশা হি পরমং দুঃখ, মহতের বাক্য,—
নৈরাশ্য পরমং সুখ, সতত তাই শাস্ত্রে ঘোষে।
মুখ—কুলকুণ্ডলিনী গো, আর কতকাল রাখবি আমায় বেঁধে আশা-পাশে ॥
ডাইনা—সিদ্ধির দেশে সিদ্ধি নাই মা, থাকলে অষ্ট পাশ ;
ও সেই অষ্টপাশে কষ্ট কিসে, আশার পাশকে যে করেছে নাশ।
যে করে তোর আশায় বাসা, তার থাকলে মা ভবের আশা,
পুনরায় হয় ভবে আসা, যেতে নারে সিদ্ধির দেশে।
খাদ—উঠিতে বসিতে মা আসিতে, আছি মিছে আশাতে মিশে ॥
ফুকার—হলো আশা আমার গুরুমন্ত্র, আশা আমার বাদ্যযন্ত্র,
আশা উপচার, করতে নারি পরিহার ;
আশা আমার প্রাণের দোসর, আশার সঙ্গে আহার আর বিহার।
আশা গীতা ভাগবত পুঁথি, আশা আমার মাথার ছাতি,
আশা পরিধানের ধুতি, আশা আমার গলার মোতিহার ॥

চিতান—তারা জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, মা তোর কোলে পেলাম কত সুখ।
পাড়ন—কত সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, শান্তির কুটীর পেয়েছি,
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতেছি ভবে পুত্রকন্যার মুখ॥
ফুকার—মাগো বাল্য আর যৌবনারম্ভে ছিলাম মা তোর কোলে,
শেষে মহামায়ার কোলে দিয়ে, কোল ছাড়া করিলে,
আমার আর কি সেদিন আসবে ফিরে, বসব মা তোর কোলের পরে,
আধ আধ মধুর স্বরে, আর কি ডাকব মা বোল বলে॥
মিল—আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দেখিস কৃপা নেত্রে,
এখন ফেলে দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে, ভুলে গেলি পুত্র স্নেহ।
মুখ—এত ভালবাসিস তারা, তবে কেন সারাৎসারা,
জীর্ণ জরা করলি আমার দেহ।
ডাইনা—আমার ভোলা পিতার মন ভুলায়ে,
রাখলি ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে, করলি আমায় সৃষ্টি ;
মা তোর বুকের দুগ্ধ পান করালি করে শুভদৃষ্টি।
যখনেতে প্রসবিলে, আকাশের চাঁদ হাতে পেলে,
এমন মমতা দূরে ফেলে, জেবলে দিলি ত্রিতাপ দাহ।
খাদ—মা বিনে সন্তানের মাযা আর কি বোঝে কেহ॥
ফুকার—আমায় যখনে যে ভাবে রাখিস, তাতেই থাকি রাজী ;
আমার আর কোন ধন নাই মা সম্বল, চরণ মাত্র পূঁজি।
তোমার মোহ মায়ায় পড়ে ধরা, বাহ্য চিন্তায় আত্মহারা,
এখন দেখি সবই তারা, এসব তোরেই ভোজের বাজী॥
অন্তরা—পুত্রের প্রতি বাদানুবাদ, এই বিসম্বাদ, তারা তোর অন্তরে।
যদি এত ছিল মনে প্রসবের দিনে, মারলি না কেন সূতিকাগারে॥
ভেক ভুজঙ্গের মাতা যেমন, প্রসবিয়া করে গ্রহণ,
সেই স্বভাব করেছিস ধারণ, এত দিন পরে।
থাকতে মাতা বর্ত্তমানে, পুত্র মরলে প্রাণে,—
মা বলে কে মা ডাকবে তোরে॥
পরচিতান—আমার সংসারের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত।
এখন কি খেলা মা খেলেছিস, পূর্ব্বের মায়া ভুলেছিস,
সেজেছিস মা বিমাতার মত॥
ফুকার—ও তুই পাষাণীর কন্যা ঈশানী পাষাণীর জঠরে—
ও তোর পাষাণ প্রাণে পুত্রের মায়া, বুঝবে কেমন করে।
করে পঞ্চভূতে ভূতের কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড,
বাপকে দিলি ছাগের মুণ্ড, তুই আর খাতির করবি কারে॥

চিতান—মাগো ! সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষ, কলির প্রবেশ, গত কত দিন।
পাড়ন—এখন কালের ফল মা ফলতেছে, পাপের আগুন জ্বলতেছে,—
ক্রমে হতেছে ভারতের শ্রীহীন ॥
ফুকার—মাগো মহাত্মা গান্ধীর আদেশে, ভারতবাসী স্বরাজ আশে,
দেশে দেশে হরতাল করেছিল ;
করে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি মা, দেশ মাতায়ে ছিল।
মাগো দেশের নেতৃবৃন্দ দলে দলে, কেহ ফাঁসে কেহ বা জেলে,
দেশের যত যুবক ছেলে, তারা রাজবন্দী হল ॥
মিল—এখন নিত্য নূতন আইন প্রচলন, কে করে তার বারণ,
মাগো রাজার শাসন প্রজার শোষণ,
আর কি দেশের মঙ্গল আছে।
মুখ—বিদেশী নয় দোষী, মোদের দেশবাসী দেশবিদ্বেষী,
সর্বনাশ করতেছে ॥
ডাইনা—দেখে কংগ্রেসের উন্নতি, বিদেশীরা চতুর অতি, কাউন্সিল স্থাপনে,
মাগো কাউন্সিলের বিচারপতি দেশী-সভ্যগণে।
ঋণ সালিশী বোর্ডের বিচার, সুযোগ খাতকের আর প্রজার,
মাগো সুদ বিনে আসল টাকার, বিশ বৎসর কিস্তি দিতেছে।
খাদ—মহাজন বিরুদ্ধে খাতক নালিশ দায়ের করতেছে ॥
ফুকার—খাতক খত দিয়ে মা টাকা নিল, তিন বৎসর তার মুদ্দৎ ছিল,
খতের টাকা না দিলে আপোষে,—
তখন মহাজনে নালিশ করতো, সুদ আসলে কষে।
এখন উল্টে গেছে দেশের হাওয়া, মহাজনের নাই সে দাওয়া,
খাতক দিয়ে মোছে তাওয়া, ঘরে বসে বসে হাসে ॥
অন্তরা—দেশে এল বিধবা বিবাহ।
করে অনেক লোকে সম্মতি দান, প্রতিবাদী কেহ কেহ ॥
এই বিবাহের সম্প্রদাতা, ভাবছে বসে কন্যার পিতা,
বিবাহিতা কন্যার বিবাহ।
আবার কোন গোত্রে গোত্রান্তর হবে, পুরোহিতের এই সন্দেহ ॥
পরচিতান—মাগো বিশ বৎসর আর ষোল বৎসর না হলে পর,
হয় না বিয়ের কাল।
পরপাড়ন—গেল হিন্দু ধর্ম রসাতল, নাই আর কন্যা দানের ফল,
যত ভদ্রের দল আইন করল বহাল ॥
ফুকার— মাগো হয়ে এই বিবাহের প্রথা, খেয়েছে সমাজের মাথা,

যারা থাকে শহরে বন্দরে ;—
ও যার মেয়ে বিয়ে পাশ করেছে, দেখেছে আইন পড়ে।
এখন লাগে না বিবাহের ঘটক, লাগে না জ্যোতিষের যোটক,
মনে প্রাণে হলে আটক, তারা গোপনে কাজ সারে ॥
মিল—আমি উচিত কথা বল্লেম বলে কেউ যদি মা চটে,
পড়িলে বিষম সঙ্কটে, তুই ভিন্ন আর কে আছে ॥

**ভবানী** — **চন্দ্রকান্ত দাস**

চিতান—ভবদারা ভব ভয়হরা তারা গো মা, বড় বিপদ তোর ভবের খেলায়।
পাড়ন—সঙ্কটে স্থান দিও শঙ্করী তব রাঙ্গা পায়, মাগো অনুপায়ের উপায়,
তোমারই ও পায়, যে পায় সে পায়, পায় তোমার কৃপায় ॥
ফুকার—মাগো তোমাকে যে করব ভক্তি, দেহেতে নাই এমন শক্তি,
নিঃশক্তি আমি, পতিত র'ল এ জমি।
দাঁড়ায়ে মা ভবের কূলে ডাকব তোমায় মা মা বলে,
পুত্র বলে স্নেহ হলে, সেদিন পার করে দিও তুমি ॥
মিল—শিখায়েছ মা বোল বুলি, তাইতে ডাকি গো মা—
এটুকু তোমার মহিমা, তা না হলে আমার আর কি।
মুখ—তুমি মা রাজরাজেশ্বরী, তোমার কাজ করি,
তুমি না করালে করি কি ॥
ডাইনা—চলতে শক্তি বলতে শক্তি, মা দর্শন শক্তি স্পর্শন শক্তি,
জাগাও অনিবার ;
আমার দেহে দেও নাই ভক্তির শক্তি,
বল শক্তি মা, সে দোষ কি আমার।
তুমি চালাও আমি চলি, তুমি বলাও আমি বলি,
মাগো তোমার খেলা আমি খেলি, পাপা-পুণ্যের আর ধার ধারি কি।
খাদ—তোমাব রাজ্যে তোমার কার্যে মা আমি সদা রত থাকি ॥
ফুকার—মাগো পাপপুণ্য আর ধর্মাধর্ম, এ সংসারে যত কর্ম,
আমার হয় কিসে, তুমি আনলে এই দেশে।
আমি করতেছি তোমার কাম, তাতে হ'ল আমার বদনাম,
বরং আমি যে দেশে ছিলাম, আমায় নিয়ে চল সেই দেশে ॥
মিল—দেব দানব আর গন্ধর্ব নর, কিংবা বিষ্ঠার কৃমি,
সবার মধ্যে আছ তুমি, তবে আর ভালমন্দ কি ॥
অন্তরা—মা গো কর্মক্ষেত্রের কর্ম তোমার, আমিও ত তোমার কোলেরই ছেলে।
তোমার কর্তব্য কাজে ঘটায়ে ত্রুটি, পুত্র ব'লে কেন নেও না গো কোলে ॥

সাধুদের মা সচ্চরিত্র, অসাধুর অসৎ চরিত্র,
সকলি তোমার পুত্র, কারে দিতে পার ফেলে।
আমি সাধু থাকি আর অসাধু থাকি, তবু ত ডাকি তোমায় মা মা বলে ॥
পরচিতান—ভাটা জোয়ার জ্যোৎস্না আঁধার, দিন রাত্রি আর,
সৃষ্টিস্থিতি হয় তোমার ইচ্ছায়।
পরপাড়ন—সংসারে তুমি সকল জায়গায় কর বিচরণ, মাগো তব শ্রীচরণ,
করতে দরশন, কি কারণ বঞ্চিত কর আমায় ॥
ফুকার—মাগো এ সংসারে স্বর্গ-নরক, সকলি করেছি পরখ,
কিছু নাই বাকী ; সদা তোর কাছে থাকি।
স্বর্গে কিংবা নরকে যাই, তাতে আমার আপত্তি নাই,
কিন্তু মাগো এই ভিক্ষা চাই, যেন সদায় তোমাকে দেখি ॥

## আমি'র মালসী — মহেশচন্দ্র কবিভূষণ

চিতান--কর্মদোষে জন্ম নিলাম ভবেতে এসে।
পাড়ন—মিছে মায়া মদে, ঘোর বিপদে ফেলালে শেষে,
মাগো আছি কেবল আমি'র উদ্দেশে ॥
ফুকার—মাগো শিখেছি এক আমি'র বড়াই, সে আমি'র ত মূল্য কিছুই নাই,
শুধুই গোল করা ;
মাগো, আমি আসল আমি হলে, সে আমি কি ঘুচ্‌ত ম'লে ?
মিছে 'আমি' 'আমি' বলে, ভুলেতে গেছে পড়া ॥
মিল—আমির তত্ত্ব একদিনও ত, করে দেখলাম না,—
আমায় কেবল আমি জেনে, করছি ভবে বেচাকেনা।
মুখ—ভুল ভেঙ্গে দে ভবদারা, আমির একটা পাইয়া যাই সীমানা ॥
ডাইনা—জন্মিলাম যে আমি লয়ে, সে আমি গেল গত হয়ে,
শেষকালে কি মা,
পাইয়াছে যৌবনের আমি বার্ধক্যের সীমা ॥
এই আমিরও দিন দুই চারি, থাকব আমি অধিকারী,
আমি যখন যাবে ছাড়ি, সে আমি'র সঙ্গী দেখি না।
খাদ—আমি গেলে আমি'র আর ত অর্থই থাকবে না ॥
ফুকার—যখন দেখবে লোকে আমি'র ভিতর, আমি একটা হয়ে অন্যতর,
আমি'র কেউ সে না ;
তখন আমি'র দশা চিন্তা করি, বলবে সবে হরি হরি,
বল দেখি গো ও শঙ্করী, এই আমি, আমি কি না ॥

ঝুমুর—মিছে আমি আমি করা।
একদিন আমি গেলেই, আমি মড়া॥
আমি যে এই আমি ছাড়া, যায় ত না মা বুঝতে পারা,
আমি'র এমনি ধারা।
পড়লেই আমি'র কলে, আমি করে তোলে,
মহেশ বলে আমি ঘুচাও ত্বরা॥

## ভবানী

অটল সরকার

চিতান—ভব সংসার কারাগারে, বন্দী করে মা,
লুকালে কোথায়?
পাড়ন—জীবে নাই তোর কিঞ্চিৎ দৃষ্টি—তারা গো মা,
এতে কি সৃষ্টি রক্ষা পায়?
ফুকার—মা, তুই সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী, জগন্মাতৃ জগদ্ধাত্রী,
বিচার কর্ত্রী মুখ্য মূলাধার।
আছে ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার, মা গো—
ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে, মরেছে লোক লক্ষে লক্ষে,
এমনি হলে জীবের পক্ষে, রক্ষে পাওয়া ভার॥
মিল—সেই ভাবনা করে মরি—দিবস শর্বরী,
অবিচারে দণ্ডধারী, জীবন দণ্ড করে ফিরে।
মুখ—তারা গো মা, ভ[illegible] ভাবাভাব দেখে আমার—
মন গিয়েছে ফিরে॥
ডাইনা—ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মাণ্ডে তোর এতই অত্যাচাব,
হল পলকে সব লণ্ডভণ্ড, তুণ্ড তুইলে চাইলে না একবার।
যে দেখি তোর প্রলয় কাণ্ড, কত জীবের জীবন দণ্ড,
নরমুণ্ড খণ্ড খণ্ড, বুড়ীগঙ্গার তীরে নীরে।
খাদ—কি সুখে ঘর করি ও শঙ্করী, আমি ভাবি তাই অন্তরে॥
ফুকার—মা, তুই ঢাকাবাসী পূর্বপুণ্যে, ঢাকা রক্ষা করবার জন্যে,
ঢাকেশ্বরী ঢাকাতে নিবাস, আছে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ, মাগো—
সে ঢাকার মা এতই শাস্তি, রঙমহলের চিহ্ন নাস্তি,
জলে স্থলে কতই কিস্তি, কল্লে সর্বনাশ॥
অন্তরা—সুখের কাল গেছে দূরে।
কলিকাল বিষম কাল, এখন অকালে সকালে নিয়ে যাও মোরে॥

কলির বিষম তাড়া তারা, বলতে দেয় না তারা তারা—
তাই ভাবি অন্তরে, বলি গো মা তোরে,
এখন পটল তুলতে দে মা অটলেরে ॥

## তরীর মালসী

বৈষ্ণবচরণ দাস

চিতান—ভবতরীতে দেহ তরিতে মন হল চঞ্চল।
পাড়ন—তোরে না দেখে মা শঙ্করী, ত্বরিতে ধরলেম পাড়ি,
এখন তরীতে উঠে জল ॥
ফুকার—আমার দেহতরীর বাইন খেয়েছে, ঝলকে ঝলকে উঠে জল,
দেখে হত বুদ্ধিবল।
তাহে মদন মাঝি পাজি, কোন কথায় হয় না রাজি,
অকূল পারির মাঝামাঝি, হাইল ছেড়ে তরী করে তল ॥
মিল—এ তরীতে তরিতে মা যায় না আশা করা,
চরণ তরীতে তারা, ত্বরিতে তরাও সন্তানে।
মুখ—মাতৃ মায়া দেখে জানুক, শ্রবণে শুনুক,
জগতের লোক দেখে লউক নয়নে ॥
ডাইনা—মা বিনে সন্তানের দুঃখ, এ ভবে কে করে লক্ষ, দক্ষসুতা ওগো শিবানী,
তুমি জগৎপ্রসূতা মাতা, বিধিবিরিঞ্চি প্রসবিনী।
নিস্তারিণী জেনে তোরে, ডাকি মা দুস্তরে পড়ে,
তুই বিনে আর কে নিস্তারে, এমন কে আছে ভুবনে।
খাদ—তরী নিয়ে তরিতে মা পড়েছি নিদানে ॥
ফুকার—ছিল নামের বাদাম জ্ঞান মাস্তুলে, অনুরাগ রূপ পাল গুরায় খাড়া,
জু'টে মাঝি কর্তারা ;
প্রতিকূল অতি তরঙ্গে, বেউঁরি খাটায়ে রঙ্গে,
কুসঙ্গ বাতাসে ভাঙ্গে, তরীর গুরাসহ মাস্তুলের গোড়া ॥
অন্তরা—এ তরীতে তরিতে মা প্রাণে লাগে ভয়।
দেখে বরষা গেল ভরসা, নদীর প্রবল তরঙ্গে কম্পিত হৃদয় ॥
পড়েছি বড় নিদানে, ত্বরায়ে নেও নিজ গুণে, আপন তনয়।
অভয়ে এ ভয়ে তরাও স্বগুণে, সন্তানে হইও মা সদয় ॥
পরচিতান—আমার নাই মা তরী, নাই কাণ্ডারী পাড়ির ভয় বড়।
পরপাড়ন—আমি দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
যা তোমার মনে লয় কর ॥

ফুকার—মাগো ডুবিল ডুবিল তরী, মরি মরি অকূল পাথারে ;
ডাকি কাতরে তোরে।
নাম নিয়ে মরিলে প্রাণে, তারা নাম সারা ভুবনে,
কলঙ্ক নিঃশঙ্ক মনে, করবে জনে জনে ঘরে ঘরে ॥

## সাপিনীর মালসী

অম্বিকা পাটনী

চিতান—তোরে ভজব বলে ভবানী গো, ভবে জন্ম লই।
পাড়ন—এসে সংসারে মা সঙ সাজি, করতেছি ভেল্কিবাজী,
আমার মন পাজি হল না রাজী, ভজন হল কই ॥
ফুকার—আমি মাতৃগর্ভ কারাবাসে ছিলাম গো জননী,
তখন মা বিনে কি জানি। মা গো—
শেষে ভুল হল ভূমিষ্ঠ হয়ে, ধরণীর কোল মিষ্ট পেয়ে ,
মহামায়ায় বিস্মরিয়ে, করি ওয়া না ওয়া না ধ্বনি ॥
মিল—বাল্য আর পৌগণ্ড গত, যখন কৈশোবেতে সমাগত হয়েছি জননী,
তখন নারীরূপা ভুজঙ্গিনী, ভঙ্গিতে ভুলাল আঁখি।
মুখ—বিষানলে অঙ্গ জ্বলে, কামিনী সাপিনীর কোলে,
আর কতকাল থাকি ॥
ডাইনা—না শিখে সাপ ধরা মন্ত্র, আমি বৃথা করে ষড়যন্ত্র,
সোহাগ করে মাথায় বুলাই হাত,
আগে জানি না যে এই সাপিনী, কটাক্ষেতে বক্ষে ফোটায় দাঁত।
বিষম ফণা বিস্তার করে, সম্মুখেতে পেখম ধরে,
কটাক্ষে দংশিল মোরে, প্রাণের ভয়ে তোবে ডাকি।
খাদ—বিষে অঙ্গ অবশ হল, প্রাণ যাওয়ার নাই বাকী ॥
ফুকার—যারা সাপের মন্ত্র বিষের ঝাড়া জানে গো জননী,
তাদের মূলের হয় না হানি। মা গো—
দেখলে ভুজঙ্গিনী ভয়ঙ্করা, আগে দিয়ে লয় ধুলা পড়া,
শেষে মাথার উপর দিয়ে পাড়া, তারা তুলে লয় মাথার মণি ॥
মিল—আমি নই তাদের মতো, এখন হলেম তোর শরণাগত,
শোন বেদেনীর মেয়ে—
আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্র হয়ে, বিষের জ্বালায় মরব নাকি ॥
অন্তরা—ঝেড়ে দে গো মা আমার এই বিষের ঝাড়া।
আমার সর্ব অঙ্গ হিম হয়েছে, স্থির হয়েছে নয়নতারা ॥

ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্বাসে শ্বাসে, এখনো ডাকি আশ্বাসে,
আসতে হলে চলে আয় মা তারা।
নইলে তারা তারা তারা বলে, ভবের ব্যাপার হবে সারা ॥
পরচিতান—মা তুই অনন্তরূপিণী তারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী।
পাড়ন—শুনি তন্ত্রসারে শিব বলে, এত দিন ছিলেম ভুলে,
আবার তুই না কি মা চতুর্দলে, সর্পরূপিণী ॥
ফুকার—যদি তুই সাপিনী এই সাপিনী মূলে না হোস্ তফাৎ ;
করি চরণে প্রণিপাত। মা গো—
তবে আমি বরং কামের চোখে, না চিনে চেয়েছি তোকে,
ও তুই মা হয়ে সন্তানের বুকে, করলি কোন পরাণে দন্তাঘাত ॥

## মালসী—কলির মাহাত্ম্য ভগবতী ভুঁইয়া

চিতান—ব্রহ্মময়ীর এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলি এত নিকৃষ্ট কিসে।
পাড়ন—ও সেই চন্দ্র সূর্য দিবারাত্র নক্ষত্রমণ্ডল,
সেই গঙ্গার জল, সেই বৃক্ষের ফল,
কলির পাপ বেশ বলি হুতাশে।
ফুকার—ধন্য বুদ্ধ রামকৃষ্ণ চৈতন্য, বিজয় বিবেকানন্দ বটে,—
এসব কলিতে সব ঘটে ; মা গো—
শঙ্কর আচার্যের শিষ্য পদ্মপাদ—ভক্তিবলে জলের উপর হাটে।
জয়দেব পদ্মাবতীর পুণ্য,—প্রভু খায় যার পাতের অন্ন,
মেহার সর্ব্বানন্দ ধন্য—জোড়া লাগায় পুণার মাথা কেটে।
মিল—মাগো, দ্বাপরে এক ছেলে কেটে, দাতা হল কর্ণ ;
প্রভুর জন্য ইন্দ্রদুম্ন, আঠার ছেলে কাটে নালায়।
মুখ—কলির বিজ্ঞান বিদ্যুৎ বলে, আকাশেতে জাহাজ চলে,—
বিদ্যুতাগ্নির পাঙখা করে গায় ॥
ডাইনা—ত্রেতায় ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, মেঘের আড়ে একার সাধ্য,
এখন হাজার ব্যোমযান আকাশে ;
টেমস্ নদীর নিচে রেল চলতেছে, লঙ্কাবন্ধন বেশী আর কিসে।
ব্যাবিলনে শূন্যে উদ্যান রয়, আফ্রিকায় গাছে দুগ্ধ হয় ;
মরা মানুষে কথা কয়—স্পিরিট গুণে আমেরিকায়।
খোঁচ—বিনা তারে জগদীশ বোস, ছয় দিনের পথ টেলিগ্রাম চালায় ॥
ফুকার—বয়স সাতাশ বৎসর হরিনাথ দে'র, ষোল ভাষায় এম, এ, অধিকার ;
ব্যাস বাল্মিকী দুর্বাসার, মা মা গো—

গৌতম বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের,
সংস্কৃতের অধিক জানা কার।
সন্দীপনাদির পাণ্ডিত্যে, তিন চার ইস্কুল স্বর্গে মর্ত্যে;
অন্য থাকুক এই ভারতে—টোল কলেজ স্কুল হাজার হাজার ॥
মিল—আগে কৃষ্ণের দেখা পেয়েও ছিল, শত্রুতা বিদ্বেষ;
কলিতে ভক্তি বিশ্বাস বেশ—
সাক্ষী আছে ঘট পট পূজায় ॥
অন্তরা—মাগো সত্যযুগের কীর্ত্তি মন্দির দেখেছি কত।
তার একটিও নয় চীনের প্রাচীর, আগ্রার তাজমহলের মত ॥
সাইপ্রাস দ্বীপের পিতল মূর্তি, পিরামিড মিশরের কীর্ত্তি;
খনার গণা মীরার সতীত্ব।
মদন গান বাদ্যের স্কুলের মাষ্টার,
সাত বছর বয়স বিখ্যাত ॥
পরচিতান—মাগো কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, সৈন্য চল্লিশ লক্ষের কম ছিল।
পাড়ন—এবার ইংলণ্ড রুশিয়া তুর্কী বেলজিয়াম জার্মান,
ইটালী আফ্রিকা জাপান—
দুই কোটির ঊর্দ্ধে যুদ্ধে এল ॥
চিতান—এখন যন্ত্র যুগের মান বেড়েছে,
মন্ত্রযুগ গেছে অধঃপাতে।
পাড়ন—দেখি অটোমেটিক কলের ঢেঁকি,
নিত্য ভ ন ধান;
গিন্নীরা সব পেয়ে আসান—
রেডিওর গান শোনে কান পেতে ॥
ফুকার—এখন বিজ্ঞানের জয় আর্শি যন্ত্রে
সূর্য দেবে খবর কয় সদাই,
মাইন যন্ত্রে বরুণ গোঁসাই, মাগো—
কামান বন্দুক বোমায় দিনদিন খেটে,
অগ্নি দেবের কপালেতে ছাই।
শনি আর নারদ এক খাটে, পবনদেবের এরোপ্লেন পিঠে,
পৃথিবী কয় গেলেম চ'টে, বাবার বয়সে এমন যুদ্ধ দেখি নাই ॥
মিল—করে ভগবতী এই নিবেদন ভারতবাসী সবের—
এবার জয় হবে ইংরাজ সম্রাটের,
ব্রিটিশের মান থাকুক বজায় ॥

চিতান—মা তোর কলির খেলা, আজব লীলা বুঝতে সাধ্য কার।
পাড়ন—এখন আছে কলির কলি হয় নাই বিকশিত,
দেখি বিপরীত কান্ড চমৎকার ॥
ফুকার—মাগো কলি রাজায় রাজ্য পেল, গেল ধর্মের রাজত্ব,
এখন সত্যের নাই স্বত্ব ;
যারা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় তাদের উপর ভীষণ দৌরাত্ম্য।
বন্ধ হল ধর্মের গুদাম, পিতায় সাজে পুত্রের গোলাম,
কুলোকে পায় হাজার সেলাম, গবুড়ের মাথায় ভুজঙ্গেব নৃত্য ॥
মিল—গাছের মাথায় মাছের বাসা চিলের বাসা জলে,
গন্ধ পেয়ে পাকা বেলে, ঠোকরাইয়া খায় পাতিকাকে।
মুখ—কলি গো তোব কলির কান্ড, বলতে অবাক তুন্ড,
ভেকেব নৃত্য হাতির মস্তকে ॥
ডাইনা—এফ, এ, পাশ বি, এ, পাশ করি, ছেলে দৌড়ায় জুড়ীর গাড়ী,
দিন রাত্রি করে বাবুয়ানা :
কিন্তু মায়ের মার্গে কাপড় জোটে না, রাঁড়কে খাওয়ায় সাহেবী খানা।
বৌকে কবে পাটেশ্বরী, চাকরানী খাটে মা বুড়ী,
দিনটি কাটায় বেন্ডীবাড়ী, ব্রান্ডির বোতল হাতেই থাকে।
খাদ—ব্রাহ্মণেব ব্রহ্মত্ব হানি, বেদের বাণী চন্ডালের মুখে ॥
ফুকার—কারো পরমিষ্ট বাড়ি এলে, মিষ্টি বাক্যে বলে ইষ্টের ঠাঁই,
বড় কষ্টে কাল কাটাই ;
এবার যে কষ্টে রেখেছে প্রভু, কেমন করে বার্ষিক জোগাই।
শালা শালী এলে বাড়ি, ভোজনের আয়োজন ভারী,
জল খাওয়ায় খাস্তা কচুরী, ইষ্ট সেবায় দুধে মিষ্ট নাই ॥
অন্তরা—কলিতে পিতা পুত্রে, মাষ্টার ছাত্রে, মিত্রে মিত্রে নাই মা বর্গ।
ডাকলে সমাদরে মায, চোখ পাকায়ে চায়,
ভার্যার ডাকে পায় হাতে স্বর্গ ॥
কেহ পিতার স্কন্ধে চড়ে, বৌকে রাখে শিরে,
মায়ের ঘাড়ে ধরে খড়্গ।
কারো বাবার নামে পিন্ড পায় না,
শালার শ্রাদ্ধে করে বৃষোৎসর্গ ॥

পরচিতান—খেলে মহোৎসবের মহাপ্রসাদ, কুলীনের কুল নষ্ট পায়।
পরপাড়ন—বাবুদের নাই আর আসল দিকে দৃষ্টিপাত,—
খেয়ে বেশ্যার ভাত, জাতের মান বাড়ায় ॥

ফুকার—আগে মান্যবরের মান্য দিতে, নতশিরে করতেম নমস্কার,
এখন লোপ হয়েছে তার ;
আমরা এ, বি, সি, ডি, রিডিং করে, ভুলেছি সব সাধুব ব্যবহার।
ভর্তি হয়ে হাই স্কুলে, মাতৃভাষা গেলেম ভুলে,
মান্য ব্যক্তি কাছে এলে, হাত তুলে কই গুডমর্নিং মিস্টার ॥

**স্বরাজের মালসী** **হরিচরণ সরকার**

চিতান—শুন ভারতের দুঃখের কথা, ভারতমাতা ভারতেশ্বরী।
পাড়ন—দেখি দিনে দিনে কর্মগুণে ধর্মের পরাজয়,
সর্বকার্যে অধর্মের জয়, এ বিপর্যয় কেন শঙ্করী ॥
ফুকার—আমরা পরের ধর্মে, পরের কর্মে সাধ করে মজুর সাজি ;
কিন্তু স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, তাতে কেউ হয় না রাজি। হায় হায়—
ধর্মস্থাপন কর্ম নিয়ে, বিবেকের বাঁধ এঁটে দিয়ে,
নাথুরামের গুলি খেয়ে, হায় রে ম'ল মহাত্মা গান্ধিজী ॥
মিল—মোদের স্বরাজ পাওয়া, স্বাধীন হওয়া, বহু পুণ্যের ফলে ;
দেখি যোগাযোগ সব তলে তলে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার সাথে।
মুখ—জাগ গো ভারতেশ্বরী, দিলি স্বার্থের মাথায় স্বরাজছত্র, পবিত্র ভারতে ॥
ডাইনা—সোনার ভারত সোনার বঙ্গ, এখন বঙ্গের করল অঙ্গভঙ্গ,
হিন্দু মুসলমানে ;—তবু দলে দলে দলাদলি, কার কথা কে মানে।
যারা হল দেশের নেতা, তাদের মধ্যে নাই একতা,
ট্যাক্সধরা স্বাধীনতা, ফল পেলেম তাব হাতে হাতে।
খাদ—কেহ মরে স্বার্থ নিয়ে, কেহ মরে ভাতে ॥
ফুকার—মোদের স্বাধীন রাজ্যে স্বাধীন কার্যে, বুঝি না আইনেব মর্জি,
হায় হায় এমন বান্ধব আর কে আছে, জানাবে দুঃখের আর্জি।
যত বাস্তুহারাব দুঃখ দেখে, মুখ্যকর্মে লক্ষ্য রেখে,
প্রাণ দিল কাশ্মীরে থেকে, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ॥
অন্তরা—হায়রে ভারতবাসী, ছাড়িয়ে দ্বেষাদ্বেষি ; মিশামিশি কর হে সবাই।
হারায়ে জাতিগোত্র, হয়েছি পোষ্যপুত্র, মূল সূত্র স্বাধীন হওয়া চাই ॥
পৈত্রিক ধন হয়েছে নষ্ট, ঝাড়জঙ্গলে কষ্ট পাই।
সাহায্য পেয়েছি মস্ত, খাবার বন্দোবস্ত নাই ॥
দশ কাঠা পাঁচ কাঠা নিয়ে, ভাই বন্ধু ছেড়ে দিয়ে,
বিনা খুনে আন্দামানে যাই ;—
তবু মোদের স্বাধীন হওয়া চাই ॥

পরচিতান—ধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত ভারতবর্ষ, বিশ্ব মাঝে ছিল দৃশ্য রূপ।
পরপাড়ন—হয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব কারো মন্দ, কারো হয় ভাল,
বাঙালী কাঙালী হল, দুর্দশা ঘটিল নানারূপ ॥
ফুকার—মাগো দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন এ ধরার ভার হরিতে,
হলে যুগে যুগে যুগাবতার, ধর্মস্থাপন করিতে।
বুঝি দুষ্টকে দেখিয়ে বলী, নিদ্রিতা রয়েছিস কালী,
এবার বুঝি এসেছিলি, শুধু সাধু সংহারিতে ॥

## পূজার মালসী

মধুসূদন সরকার

চিতান—স্বার্থময় এই সংসারে মা গো আশায় জগৎ বাঁধা।
পাড়ন—জীবকে সংসার মেয়াদে সুখ সম্পদে,
মায়ার ফাঁদে লাগালে ধাঁধা ॥
ফুকার—ভবে রাজার আশা রাজ্যশাসন
ধনী লোকের আশা বেশী ধনে; দেখি আশা ত্রিভুবনে।
যে জন ভবে অর্থশূন্য, তার থাকে না মান্যগণ্য,
কেঁদে ফেরে অর্থের জন্য, দিবানিশি অতি দুঃখিত মনে ॥
মিল—সে যে অর্থলাভ বাণিজ্য আশে ভ্রমে দেশবিদেশে,
এবার কি করে উন্নতি হবে, দিবানিশি তাহাই ভাবে।
অন্তরা—কি দিয়ে করিবে পূজা দশভূজা গরীব হলে।
করতে দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা
সব দেখি মা টাকার বলে।
নাম ধর রাজরাজেশ্বরী, রাজার পূজা খাও শঙ্করী,
দেখি না নাম তোমার কাঙালেশ্বরী—
কাঙাল কি তোর নয় গো ছেলে ॥
পরচিতান—সাধক তোমার করিবেন পূজা, মাগো সাত্ত্বিক ব্রহ্মজ্ঞানে।
পাড়ন—করে রেচক পূরক কুম্ভকাদি—
মা ষট্‌চক্রে ষষ্ঠী আরাধনে ॥
ফুকার—পরে সপ্তমীতে সুষুম্নাতে, যোগী ঋষি করে যোগসাধন;
হৃদিপদ্মে সিংহাসন।
উঠায়ে সে হৃদিখাটে, ভক্তিপুষ্প দেয় জ্ঞান ঘটে,
মাতৃকান্যাস ধরবেন এঁটে, মা তোমাকে করিতে অর্চন ॥
মিল—অনুরাগের চণ্ডী করিবে পঠন, হয়ে নিষ্ঠ মন,
মা তোর গরীব ছেলে মধুসূদন,
কি দিয়ে তোমায় পূজিবে ॥

চিতান—দেখি বর্ণে বর্ণে স্বর্ণে পর্ণে মায়ের কত পূজা হয়।
পাড়ন—আমরা ফলকামী সব পূজারী, বুঝে পাই না কি করি,
হেরি অশুদ্ধ পূজা বিশ্বময় ॥
ফুকার—শুনি রক্ত ধাতু ভবেৎ মাতা, শুক্র ধাতু ভবেৎ পিতা, শূন্য ধাতু প্রাণ ;
তবে কার কাছের কোন ধাতু দিয়ে মাটির মা নির্মাণ।
মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন যিনি, মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি,
আগে তার পূজা না দিয়ে জ্ঞানী, কেন মাটির পরে সটান টান ॥
মিল—কেন চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী সাজাব ঘুমের ঘোরে,
এসব পূজা বুঝে করবো পরে, এই ভাবে আয় সবাই জাগি।
মুখ—আমার ভগ্নী ভাই, তোরা আমার সাথে আয় না সবাই,
মায়ের পূজায় লাগি ॥
ডাইনা—মা আমাদের জগৎ ভরে, আছে নারীরূপে ঘরে ঘরে,
কেউ বাজারে হারিয়ে স্বপথ ;
করবো উদ্ধারিতে আবাহন, বাধ্য করে বাবাগণ,
এই মরমে করিনু শপথ।
বাজবে পূজায় ঋষিদের ঢাক, মায়ের চরণ প্রেমফুলে ঢাক,
পূজার মহামন্ত্র মা বলা ডাক, মাকে কেউ বলিস না মাগী।
খাদ—ভয় নাই তোদের আমি হব সকল দোষের ভাগী ॥
ফুকার—যে মা অভাব শূন্য রাজ্যে থাকে, ষোড়শ উপচারে তাকে পূজে বিশ্বময়,
মাতা লউক বা [illegible] লউক বলি, বলি প্রসাদ সমুদয়।
যে মা মলিন গাত্রে বসন দীর্ণ, অন্নাভাবে তনু শীর্ণ,
হায় হায় তার পূজা থাকতে অপূর্ণ, মা অপর্ণা কি পূজা লয় ॥
মিল—যদি ক্ষুধায় কাতর মুচি মেথর, অতিথি যায় ফিরে,
তোদের সেই বাড়ি দেবে খায় কি রে, ভেবে দেখ ভাই পশুখাগী ॥
অন্তরা—পূজা করা সোজা নয় ভাই বড়ই শক্ত।
আগে দেবভুক্তা দেবং যজেৎ, তা না হলে কিসের ভক্ত ॥
ব্যথা দিয়ে ভ্রাতার মনে, তার এক কড়া কেড়ে এনে,
পূজায় কিছু দিস্‌নে কিনে, মাকে করিতে বিরক্ত।
কেহ নিজের রক্ত থাকতে যেন, মাকে দিস না পরের রক্ত ॥
ভক্ত ভক্তা ভগ্নী ভ্রাতা, মন কর্মে রাখ পবিত্রতা,
দয়া ক্ষমা ন্যায়পরতা, নিয়ে আগে হোস যুক্ত।
দিলে পূজার মতো একটি পূজা, সেইদিন হবি সংসার মুক্ত ॥

পরচিতান—কেন পূজার মণ্ডপ ক্ষুদ্র করে, শুধু ভদ্রলোক বসাই।
পরপাড়ন—হবে আমাদের এই পূজার ঘর, রসাল বিশাল চরাচর,
আলো দিবাকর নিশাকর দুই ভাই ॥
ফুকার—হবে এই পূজা মহানিশিতে, ঘোর তমো মোহ নাশিতে, পূজা হলে শেষ,
দেখব প্রেমালোকে আলোকিত, আমাদের এই দেশ।
হবে ব্রহ্ম সংঙ্গীত এই পূজার গান, গাইবে রবি কবির প্রধান,
ও তাই শুনবে হিন্দু যবন খৃষ্টান, সবাই মণ্ডপে করে প্রবেশ ॥
মিল—হবে নজরুল ইসলাম আনুকূল্য প্রতিদ্বন্দ্বী তার,
দীন রাজেন্দ্র কয় এই পূজার হার, সবার কাছে ভিক্ষা মাগি ॥

## পূজার মালসী — রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—আমি ক্ষুদ্রাকারে মা তোমারে পূজা করে সেজেছি ক্ষুদ্র।
পাড়ন—পেলেম এই পূজার ফল বুঝিতে, ও তাই তোমায় চাই পূজিতে,
মাগো সাজায়ে অসীম 'সমুদ্র ॥
ফুকার—মানস পূজা ভিন্ন অন্য মতে, এই পূজা পারে না হতে,
ভক্তিহীনের এই পূজায় আসক্তি,
ওমা আদ্যাশক্তি, আদিতে দাও আমাকে এ শক্তি।
তোমায় সকল রূপে সকল কাজে, ও পূজিব অনন্ত সাজে,
দেখব অনন্ত বাঁধনের মাঝে, আমার অনন্তকাল মুক্তি ॥
মিল—আমার এ সংকল্প নয়কো অল্প, হয় না যেন নষ্ট,
মাগো, ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ, স্বকৃপায় সন্তুষ্টা হয়ে।
মুখ—আমার পূজায় মাগো, আমার কল্পনাতীত হয়ে জাগো,
পঞ্চ আকাশ ছেয়ে ॥
ডাইনা—মন্ডপ-ঘর মোর আকাশখানি, তাতে প্রকৃতির বায়ুর ব্যজনী,
সূর্য প্রদীপ চাঁদ ধূপতির ধূপ,
দেখব সূর্যালোকে তিনটি চোখে,
মা তোমার এই বিশ্বব্যাপী রূপ।
আসন শিবস্বরূপ লও হৃদিপদ্ম, ভক্তি অর্ঘ্য অশ্রু পাদ্য,
দৈবী সম্পদ বিংশ পদ নৈবেদ্য—
প্রসাদ করে দাও তুমি নিয়ে।
খাদ—মনটা করুক ঘণ্টা-বাদ্য বীজাদি মিশায়ে ॥
ফুকার—অসৎ চিত্তবৃত্তি পশুগুলি, তোমার দ্বারে দিব বলি,
তর্পণ করব জ্ঞান-যজ্ঞ আগুনে ;

মিলবে অনন্তাভিমুখে, সুখে সব তোমার চরণে।
আমার আত্মার রাজ্যের প্রতিবাসী, ও সপ্তস্বর্গের দেবী আসি,
মাগো, দেখবে তোমার রূপরাশি, সবে অনিমেষ নয়নে ॥
মিল—তোমার কৃপা বিনে কোনদিনে কেউ তোমারে পায় না ;
পূজা তুমি না করালে হয় না, করাও পূজা শক্তি দিয়ে ॥
অন্তরা—অনন্তরূপিনী তারা মহৎ-ব্রহ্ম প্রসবিনী।
বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী।
নশ্বরত্বের পবপারে, অনন্ত:জীবনাগাবে,
সর্বাকারে একাধাবে, দেখা দাও বিশ্বরূপিনী ॥
পরচিতান—শুনি, দৃশ্যমান এই বিশ্ব হতে মাগো, অতি ভীষ্ম তোমার ধ্যান।
পরপাড়ন—ভেবে মূচ্ছিলা দারু আদি নরকে নিরবধি,
আগের সেই পাপে, আমি এই অজ্ঞান ॥
ফুকার—পূজার যাবতীয় শব্দবাদ্য, প্রাণী-মুখে প্রণবাদ্য,
যোগীর মুখে সুবাদ্য বম্ বম্ ;
বাজবে অনাহতে সুসঙ্গীতে, উত্তমের উত্তম।
পূজার উৎসাহে উৎসাহী ধরা, ও হের হর-মনোহরা,
মাত্র তুমি না জাগিলে তারা, হবে বাহ্য পূজা ধমাধম ॥
মিল – তোমায় পূজার পব বিসর্জন দিব, প্রেম সাগরের জলে,
আমি জয় কালী জয় কালী বলে, সে জলে রব ডুবিয়ে ॥

**শক্তিপূজার মালসী** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—ভুলে আদ্যাশক্তির মাহমা যে, ভক্ত সেজে মহীমাঝে,
মোহে মজে কপট শাক্ত হই।
পাড়ন—রেখে মন্ডপে দশভূজা, করে ভন্ডামি পূজা,
পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে লই ॥
ফুকার—আমরা মাটি দিয়ে 'মা'-টি গড়াই, মাটির ভূষণ অঙ্গে পরাই,
সিংহে চড়াই দশভূজা মাকে ;
আরো সর্প ময়ূর বিড়াল ইঁদুর, গড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে।
যত লক্ষ্মী ষষ্ঠী সরস্বতী, কার্তিক গণেশ বলদ হাতি,
যখন প্রভাত হয় এই পূজাব রাতি, তখন এই মা কোথায় থাকে ॥
মিল—দেখি পূজান্তে হয় অম্বুতে লয় কুম্ভকার দুহিতা,—
ভোরে বরুণের আশ্রিতা, ছাগে ভক্ষে কলেবর।
মুখ—ভুলে যাও এ মাটির পূজা, খাঁটি প্রাণে ভক্ত সাজা,
যুক্তি তর্কের সিদ্ধান্ত সুন্দর ॥

ডাইনা—দশ দিক দমিত করা, ও সে দিক্‌বসনা দিগম্বরা,
সেই প্রতীকে সাজাও দশভূজা ;
তোমার দেহ করে কাশীক্ষেত্র, এঁকে মহাশক্তির চিত্র,
আরোপে সেই রূপের কর পূজা।
মন-মণিকর্ণিকার ঘাটে, বসায়ে বাসনার মঠে,
নিত্য শুদ্ধ হৃদিপীঠে, পূজা কর বিশ্বম্ভর।
খাদ—বৈরাগ্য হবে পুরোহিত, বিবেক তন্ত্রধর।
ফুকার—সাজাও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানা, ত্রিকালজ্ঞা ত্রিনয়না,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় স্বরূপিণী ;
করতে দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন দশাস্ত্রধারিণী।
আগে সাত্ত্বিক বলের সিংহ গড়, আসুর বলের অসুর মার,
শেষে সত্ত্ব গুণে কীর্তন কর, মায়ের মর্ত্য-আগমনী ॥
মিল—তোমার ললাট চিত্রে চিত্র কর ত্রিগুণে অঙ্কিত,
আদ্যাশক্তির গর্ভজাত, ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি-হর ॥
অন্তরা—কীর্তি পরাক্রম কার্তিকেয় নাম, শাক্তের সিদ্ধিকাম দেব গণপতি।
সম্পদ আর বিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, কেশবের আরাধ্যা, লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
কাম কামনা পশু অতি বলবান, অনুরাগের খড়্গে কর বলিদান,
সৌভাগ্য বৃষভে বাজায়ে বিষাণ, আসিবেন জ্ঞান-বেশে পশুপতি ॥
পরচিতান—দেখি বিশ্ব যার ইঙ্গিতে নাচে, তারে গড়াও মাটির ছাঁচে,
মাটির কাছে কাম মোক্ষ চাও।
পরপাড়ন—তোমরা মাটির মায়ের পূজনে পাঁঠা কিনে ওজনে,
প্রসাদ ভোজনে প্রচুর অংশ পাও ॥
ফুকার—ত্যজে ব্রহ্ম স্বভাব ভাবোত্তম, বাহ্য পূজা ধমাধম,
মাটির কাছে নৈবেদ্যাদির বোঝা ;
তোমরা নিজেরা দাও, নিজেরা খাও, পুতুলের মুখ বোঁজা।
খাঁটি মহামায়ার পূজা করতে, হবে না প্রতিমা গড়তে,
শুভ মহানিশায় মহাতন্ত্রে, কর মহাশক্তির পূজা ॥
মিল—অধম নকুল বলে দূরে ফেলে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি,
চিৎস্বরূপার চিন্ময় মূর্তি, চিত্তে চিন্ত নিরন্তর ॥

**সমাজ মালসী** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—মা তোর সত্য ত্রেতা দ্বাপরান্তে, ঘোর কলির ঘোর কাল কৃতান্তে,
গ্রাসিল এই সোনার বঙ্গদেশ।

পাড়ন—আমরা সমাজ শৃঙ্খলে আঁটা, জাতি কৌলীন্যের ঘটা,
হিন্দু ধর্মটা ছুঁৎমার্গ বিশেষ ॥
ফুকার—আমরা হীন দোষের হিন্দু ব'লে, বেদের বলে গৌরব করে থাকি,
মোদের অন্ধ জ্ঞান-আঁখি ; মা মাগো—
আমরা বেদ দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে -
চোখ থাকিতে অন্ধের মতন থাকি।
জানি না সে বেদের তত্ত্ব, জানি না হিন্দুর মাহাত্ম্য,
খাঁচায় ভরা প্রভুভক্ত, আমরা যেমন ব্যাধের তোতা পাখি ॥
মিল—আমরা মন্ত্রবিহীন তন্ত্রবিহীন বেদ অনধিকারী—
বর্ণবিপ্র শুদ্ধাচারী, তাদের মুখে বেদ উচ্চারণ।
মুখ—তন্ত্র মন্ত্র সাম গানে, নিত্য বেদের অধ্যয়নে—
হিন্দুগণের বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ ॥
ডাইনা—বর্তমান কালের প্রতাপে, এখন ম্লেচ্ছেও অজপা জপে,
বেদোচ্চারণ ক্ষুদ্র শূদ্রে মুখে ;
যত হিন্দু জাতির জাতীয়তা, বামন জাতির সুতার পৈতা,
ন্যায়ের দন্ডে ঠেকেছে বিপাকে।
চাতুর্বর্ণং ময়ংসৃষ্ট, বেদের ভাষ্য গীতায় রাষ্ট্র,
গুণকর্মে দেখাও উৎকৃষ্ট, কেবা বামন কেবা যবন।
খাদ—ব্রহ্মতত্ত্ব ন জানাতি, বামন জাতি কে করে বরণ ॥

ফুকার—আমরা বেদের দোহাই দিয়ে সবাই, অন্ধ হিন্দু দেখাই হিন্দুয়ানি,
আমরা বেদের কি জানি ; মা মাগো—
আমরা চিনি না চিনির আস্বাদন,—
চিনির বলদ চিনির বস্তা টানি।
বেশ্যাপুত্র সেই বশিষ্ট, দেখালেন বেদের বৈশিষ্ট্য,
মৎস্যগন্ধার গর্ভসৃষ্ট, বেদের কর্তা হলেন সেই ব্যাসমুনি ॥
মিল—এখন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব গেল—নব্য শিক্ষার ফলে,
ভাষা শূন্য মন্ত্র বলে চলবে না যজমানি যাজন ॥

অন্তরা—অনার্য আজ আর্য হল, উঠল সাড়া রাজ্য জোড়া—
আর্য ধর্ম উঠল জেগে, উন্নত অনার্য যারা।
কেউ যদি ভাই ছোট থাক, কর্মোন্নতি ভুল নাকো,
কর্ম করে ধর্ম রাখ—ভুলে যাও ভাই জাতির ধারা—
জাতি হয় না কর্ম ছাড়া ॥
শুচিস্পর্শ বিষম বিষে, ঘিরেছে এই বঙ্গদেশে,

বিষের বিনাশ করবি কিসে—শিখ মন্ত্র বিষের ঝাড়া,
ছুঁৎমার্গ পরিহার করা ॥
পরচিতান—আমরা এলেম যারা মানুষ সাজে, মিশব মানুষের সমাজে ,
তার মাঝে কেন এত অনিয়ম ।
পাড়ন—বন্য পশুর সমাজ নয় মন্দ, তাদের নাই জাতির দ্বন্দ্ব,
মানুষ জ্ঞানান্ধ পশুরও অধম ॥
ফুকার—হিন্দুর জাতিবন্ধ ঘরের চালে, হুঁকার জলে জাত রয়েছে ভরা,
এই তো সমাজের ধারা ; মা মাগো—
যত শুচিস্পর্শ নদীর জলে, দধির জলে যায় না জাতি মারা ।
কুকুর বিড়াল কোলে তোলে, স্নান করতে হয় মানুষ ছুঁলে,
এ সমাজকে সমাজ বলে, নররূপী বড় পশু যারা ॥
ফুকার—হিন্দুর আর্যগুরু ভট্চার্যরা, আর্য ধর্ম দিল রসাতলে,
তাসার সুতা দেয় গলে ; মা মাগো—
তাদের পূজার ফুল চণ্ডালে ছুঁলে, দোষ ঘোচে না গঙ্গাজলে ধুলে ।
বিল্বপত্র গাছে কাঁটা, চাকর বিনা তুলবে কেটা,
রামধনা সেই চণ্ডাল বেটা, বেলপাতা আর পদ্ম তুলবার কালে ॥

**বিপ্লবী মালসী** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম দৃশ্য, স্বার্থপরের যে উদ্দেশ্য,
হয়েছে সে রহস্য প্রচার ।
পাড়ন—দেশের কাঙ্গালী বাঙালী যত জুটে এসো সব—
বাঙালীর সেই লুপ্ত গৌরব, সুপ্ত সিংহ জাগাতে আবার ॥
ফুকার—প্রথম স্বরাজ নিতে নিশান হাতে, যে বাঙালী হয়ে অগ্রণী,
তেজে কাঁপায় মেদিনী—হায় হায় গো—বলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ।
নষ্ট করতে ব্রিটিশ শাসন, সত্যাগ্রহ আর অনশন,
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সে বাঙালীর অমর কাহিনী ॥
মিল—এখন বাঙালীর সে শৌর্য-বীর্য লুপ্ত হল কিসে—
সবে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র বেশে, নির্বাণ অগ্নি আবার জ্বাল ।
মুখ—বাস্তুহারা হলেম বলে, কাজ কি ভেসে নয়ন জলে,
কর্মের বলে জ্বালাও ধর্মের আলো ॥
ডাইনা—বাস্তুহারা করল যারা, ( তাদের ) গদী বজায় রাখতে তারা,
আসন্ন এই ইলেকশানের ভোটে ;
নূতন ভোটার তালিকা করিতে, উদ্বাস্তুর নাম চায় না দিতে,
আইন সচিবের পাকা বুদ্ধি বটে ।

কাজ কি ওসব ভিক্ষা চেয়ে, দাঁড়াও ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে,
বানরের মুখ ভেংচির চেয়ে, রাবণ মারে সেও ভাল।
খাদ—ফাঁসী কাষ্ঠে ক্ষুদিরাম সে আদর্শ দেখাল ॥
ফুকার—আছি বাস্তুহারা হিন্দু যারা হবে আবার বাস্তু গড়াতে,
মোদের হবে দাঁড়াতে—হায় হায় গো—পথের কাঁটা হবে সরাতে।
কোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাঁধ বাটী,
সঙ্গে রেখ বাঁশের লাঠি, বনের ফেউ আর মহিষ তাড়াতে ॥
ফুকার—যত জমিদারের পতিত জমি, ছিল জঙ্গল আর অনাবাদী,
মোরা সেজে আবাদী—হায় হায় গো—জঙ্গল কেটে আশায় ঘর বাঁধি।
মোদের বুকের রক্তের দ্বারা, হয়েছে কলোনী গড়া,
তুলে দিতে আসবে যারা, তাদেরে দাও জ্যান্ত সমাধি ॥
মিল—যত অতীতকালের পতিত জমি আবাদ করলেম যারা,—
ন্যায্য পারিশ্রমিক চাইতে তারা, জমিদারের কাছে চলো ॥
অন্তরা—এবার কঠিন হস্তে করতে হবে দুর্নীতি দমন।
যত মজুতদার আর চোরা কারবারী, দেশের কাল শমন ॥
হায় গো, দেশে যত মজুতদারে, দেশের মাল সব মজুত ক'রে,
বেচতেছে তাই চোরা দরে, দরিদ্রের মরণ।
হায় গো, স্বাধীন দেশের অবিচারে, রুটি চাইলে লাঠি মারে,
দারিদ্র্য জানাব কারে, কে আছে এমন।
সবে ভিক্ষা ছেড়ে শিক্ষা কর সুভাষ আন্দোলন ॥
পরচিতান—যখন জওহর বস্ ; স্বাধীন তক্তে, বাঙালীদের তপ্ত রক্তে,
সিক্ত হল কংগ্রেসী আসন।
পাড়ন—হল যে বাঙালীর তপ্ত রক্তে অভিষিক্ত দেশ,
ওই সেই বাঙালীর কাঙ্গালীর বেশ,
কোন্ পাপে এই অশেষ নির্যাতন ॥
ফুকার—শুনি বিষস্য বিষমৌষধি—নেতাজী সেই সুভাষের শিক্ষা,
ছেড়ে করুণা ভিক্ষা—হায় হায় গো—অগ্নি মন্ত্রে সবে লও দীক্ষা।
হয়েছে ছিল যা হবার, পেয়েছি ছিল যা পাবার,
বাঙালীর সম্মুখে আবার, এলো ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা ॥

## সাম্যবাদ মালসী

নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—মোদের ভারত পুণ্যপীঠস্থানে, মিলে হিন্দু মুসলমানে,
রাষ্ট্র করো শ্রেষ্ঠ স্বর্গধাম।

পাড়ন—জানি আদম জন্মায় আদমী সব, মনু জন্মালেন মানব,
একই বিভব, এক বস্তুর দুই নাম ॥
ফুকার—যদি আদম করেন আদমী পয়দা, মনুর সৃষ্টি মনুষ্য পুত্র,
মূলে এক বৃক্ষের পত্র—হায় হায় গো—জল পানি এক নাম বিভেদ মাত্র ;
অভিন্ন নারী স্বরূপা, যেই হাওয়া সেই শতরূপা,
নামাজ রোজা ধ্যান অজপা, একই স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য ॥
মিল—একই উপাদানে যদি হিন্দু মোসলেম গড়ে,
তবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব করে, কেউ করো না দেশের ক্ষতি।
মুখ—সাম্প্রদায়িকতা ভুলে, সব জাতি একত্রে মিলে, করো দেশোন্নতি ॥
ডাইনা—কামার কুমোর মালো ছুতার, যত হাড়ি ডোম ভুঁইমালী চামার,
ধোপা নাপিত যবন জোলা তাঁতি,
আমরা সবাই ভারতমাতার ছেলে, বর্ণ বৈষম্যতা ভুলে,
সবে মিলে গাও মিলনের গীতি,
কোন জাতি করলে ত্যজ্য, রাষ্ট্রের অভাব অনিবার্য,
রক্ষা করতে হলে রাজ্য, কার্যে লাগে ছত্রিশ জাতি।
খাদ—বিশ্বপ্রেমে সবাই মজ, খোঁজ পরপ্রীতি ॥
ফুকার—মোদের রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার লক্ষ্য হবে এক সমান,
আমরা এক জাতি এক প্রাণ—হায় হায় গো—
হিন্দু মোসলেম বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান।
বর্ণ-বিদ্বেষ দূরে ফেলে, ভাই-এ ধর ভাই-এর গলে,
জাতীয় পতাকা তলে, সবে মিলে করব আত্মদান ॥
মিল—হিংসা বিদ্বেষ না হলে শেষ, দেশ হয় না উন্নত,
আফ্রিকার জঙ্গলের মতো, কেউ হইও না ভ্রাতৃঘাতী ॥
অন্তরা—ভাইরে, কিসের হিন্দুস্থান, কিসের পাকিস্তান
মহাপ্রস্থানের আর বাধা নাই।
মোরা কেউ যাব শ্মশানে, কেউ বা গোরস্থানে,
শেষের দিনে একই স্থানে ঠাঁই ॥
আল্লা হরি নিয়ে মস্ত লাঠালাঠি,
ভাই-এ হয়ে শত্রু ভাই-এর মাথা কাটি,
হিন্দুর দেহে যে সব জল বায়ু মাটি,
মুসলিমের আব আতস খাগ আর বাই।
হিন্দুর বেদে বলে সোঽহং ব্রহ্মবাদ,
কোরাণ বলে কোল হু আল্লা হু আহাদ,

অজ নিত্যব্রহ্ম আল্লা হু সামাদ,
বেদ কোরাণে অভিন্ন দেখ ভাই ॥
পরচিতান—যত হিন্দু মোসলেন ঐক্য হলে, দেশের দুঃখ যাবে চলে,
সবে মিলে করো সেই চেষ্টা।
পাড়ন—আমরা মিলে আর্যে অনার্যে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকার্যে,
করব রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ॥
ফুকার—ছাড় ধর্ম নিয়ে দলাদলি, কোরাণে কয় আল্লা হয় আদিম,
বেদে ব্রহ্ম হয় অসীম—হায় হায় গো—পুরাণে সে জড় মাছ কাছিম।
বেদ পুরাণে নাইকো অমিল, যেই হরি সেই ছোবহানা জিল,
আল হামদো লিল্লাহে রাব্বিল, হিন্দুর রাম আর মুসলিমের রহিম ॥
মিল—কবি নকুল বলে ভুলে গিয়ে জাতি বৈষম্যতা,—
জাগাও মিলন মন্ত্রে ভারতমাতা, প্রভাত হবে দুঃখের রাতি ॥

## বাংলাদেশ যুদ্ধের মালসী — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—ছিল পাকিস্তানের প্রবল চেষ্টা, উপনিবেশ বাংলাদেশটা,
কায়েম করবেন ইয়াহিয়া খান।
পাড়ন—তারা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে, বাংলাদেশটা শোষণ করে,
এবার মুজিবরের করে, কাটা গেল কান ॥
ফুকার—বাংলায় ইলেকসনের হুকুম দিয়া, ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া,
দেশবাসী মোর পক্ষে জোট, ভরে উঠবে সোনার কোট। হায় গো—
কিন্তু ভোট গণনায় দেখল যখন, ভেঙ্গেছে তার নেশার স্বপন,
শতকরা নিরানব্বই জন, দিল মুজিবরের পক্ষে ভোট ॥
মিল—হবে বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইলেকসনের ফলে,
থাকবে অবাঙালী করতলে, এই কি কভু হতে পারে।
মুখ—ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়াহিয়া, ভুট্টো বোনাইর যুক্তি নিয়া,
হুকুম দিয়া, নির্বাচন বাতিল করে ॥
ডাইনা—ইলেকসন বাতিল করিতে, হঠাৎ পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে,
টিক্কা খানের হাতে ভার সঁপিল ;
তুমি পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়া, কামান বোমা বন্দুক দিয়া,
বাঙালী সব ধ্বংস করে ফেল।
ধ্বংস যজ্ঞের মন্ত্র দিয়া, আঁধার রাতে ইয়াহিয়া,
ভুট্টো বোনাই সঙ্গে নিয়া, ইসলামাবাদ পাড়ি ধরে।
খাদ—কৌশল করে মুজিবরে নিয়ে গেল ধরে ॥

ফুকার—তখন টিক্কা খানের অত্যাচারে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে,
পোড়ে কত বাড়িঘর, শেষে কয়েক দিনের পর। হায় গো—
বাংলার মুক্তি ফৌজের কান্ড দেইখ্যা, ভয় পেয়ে পালাল টিক্কা,
ডেকে কয় ঠেডা মালিক্যা,.এসে ডুবা নৌকার বৈঠা ধর ॥

মিল—ঠেডা মালিকের সে মালিকানা ফুরায়ে এসেছে,—
যত আজরাইল ঘোরে পাছে পাছে, কখন জানি ঘাড়ে পড়ে।

অন্তরা—রাখলো গারদ ঘরে মুজিবরে বিনা ত্রুটিতে।
এমন দেশদরদী মিলে কি এক গুটি কোটিতে ॥
হায় গো, বিনা দোষে মুজিবরে, ওরা যদি হত্যা করে,
বাংলাদেশটা উঠবে গড়ে, সৈন্য ঘাটিতে।
তেমন লক্ষ মুজিব জন্মেছে আজ বাংলার মাটিতে ॥
হায় গো, চোর গুন্ডা ডাকাত যা ছিল, রাজাকারে নাম লেখাল,
তাদের উপর হুকুম হল, বাংলা লুটিতে।
তাদের চড়তে হবে স্বাধীন বাংলার শূলের খুঁটিতে ॥

পরচিতান—শুনি হয়ে ভারতের বিরুদ্ধ, পাকিস্তান করবে যুদ্ধ,
যথাসাধ্য করে মরণ পণ।

পাড়ন—দেশের জনমত বিভ্রান্ত করতে, ব্যাঙ যেতে চায় সাপের গর্তে,
নিজের বাণে নিজে মরতে, করে আয়োজন ॥

ফুকার—যারা বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতরে, বাংলাদেশটা নিতে কেড়ে,
কত অভিযান চালায়, তাতে নয় মাস কেটে যায়। হায় গো—
যাদের মুক্তিফৌজ আর গেরিলারা, মারের চোটে করল সারা,
ভারতের বিরুদ্ধে তারা, ক্ষৌরী কামান ধরতে চায় ॥

ফুকার—যাদের বাংলার কিলে ভাঙল দাঁড়া, ভারতের বিরুদ্ধে তারা,
যুদ্ধ করার সাধ করে, লোকে বেহায়া কয় কারে। হায় গো—
যদি পাকিস্তান আজ ভাঙ্গা মাজায়, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজায়,
উইপোকার যে পাখা গজায়, কেবল পুড়ে মরবার তরে ॥

ফুকার—এই যে পাকিস্তানের অপকীর্তি, নব্বই লক্ষ শরনার্থী,
এই ভারতের আশ্রিত, তাদের সুদিন সমাগত। হায় গো—
আবার স্বাধীন বাংলার স্বাধীন প্রাণে, চলে যাবেন স্বসম্মানে,
স্বাধীন বাংলার জয়গানে, হবে বিশ্ব মুখরিত ॥

মিল—কবি নকুল বলে কালে কালে দেখতে পাবেন সবে,
বাংলার এই পাকিস্তান ঢুকে যাবে, জিন্না সাহেবে কবরে ॥

**দুঃখ দুর্দশার মালসী ( খণ্ডিত )** **অন্নদা সরকার**

চিতান—দেশের কি দুর্গতি হৈমবতী ঘটায়ে দিলি।

ফুকার—ভেঙ্গে যোগেশ্বরীর যোগ, মহাপ্রলয় যোগ
লাগল এসে শেষে ;
বৃদ্ধ যুবা ছাওয়াল, সাধু ফকির আওয়াল,
ধনী মানী জ্ঞানী কাঙাল কি বাঙাল,
ঠেকেছে এই দেশে।
জীবের জীবনের প্রাধান্য অন্ন হল শূন্য
চাষার ক্ষেতের ধান্য ছিন্ন জলে ভাসে ॥

ফুকার—মাগো আমিন এসে দেশে দেশে;
পাটের জমি মাপ দিয়ে গেল ।
জমি তিন ভাগের এক ভাগের বেশী
চাষ করতে পারবে না,
করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা,
আইনের মতে মত দিয়ে গেল ॥

ফুকার—মাগো জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় আসলে পরে,
নিরামিশ পাকের ঘরে,
পাটপাতার হতো আমদানি ;
যত বিধবা রমণী—মা গো।
দিয়ে নারকেল বাটা মরিচ পোড়া,
পাতা ভাজা পাতার বড়া,
জলে ডুবে হল সারা—
এবার পাটপাতার হল না শুক্তানি ॥

অন্তরা—মা তোর আশ্রিত লোক নিরাশ্রিত—
জীবন্মৃত উপায় কি করি।
যেমন বৃক্ষ ভেঙ্গে লতার কষ্ট—
মাটিতে যায় গড়াগড়ি ॥
গরীব লোকের কি দুর্দশা,
নাই ধান চাউল টাকা পয়সা,
বস্তার চালের দাম চড়া ভারি।
দেখে অন্নের অভাব দুর্ভিক্ষের ভাব—
নাইউর বন্ধ বাপের বাড়ি ॥

মিল—দীন অন্নদা কয় আমার দিন দুঃখে গেল কেটে,
চরম পরম তত্ত্ব রইলেন ভুলে—
মলেম ভূতের বেগার খেটে ॥

**মিলন গীতি মালসী** **নারায়ণচন্দ্র বালা**

চিতান—যত শাস্ত্র পড়ি তর্ক করি তবু যায় না মনের ভুল।
পাড়ন—এসব ভেদ বিচারে পথ ভুলে, পরমার্থ পদ ভুলে,
আছি অকূলে, পাইনে কোন কূল ॥
ফুকার—শুনি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, ভেদজ্ঞানে অনন্ত শাস্তি,
পুরাণ কি কোরাণ;
আবার মন্দিরে মসজিদে গীর্জায় একই সুরে গান।
তবু কেহ বলে ইষ্ট কৃষ্ট, কেউ বলে সার যীশুখৃষ্ট,
কিন্তু বিচারে নয় কেউ নিকৃষ্ট, এসব মূলে গেলে এক সমান ॥
মিল—যত সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী তারাই মর্ম জানে,
এসব ভেদ বিচার আর অভিমানে, সব সমাজের অবনতি।
মুখ—ছেড়ে বিভিন্নতা, আর কি ভাই ভাইয়ে হবে একতা,
জাগবে সকল জাতি ॥
ডাইনা—সকলই এক পিতার সন্তান, এই যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান,
এ জ্ঞান কবে হবে;
ছেড়ে দলাদলি গলাগলি করব সমভাবে।
সব জাতি একত্রে মিলে, একই সুরে একই তালে,
কবে আল্লা হরি যিশু বলে, গাইব মধুর মিলন গীতি।
খাদ—ভেদ বিচারে হয় না কভু সামাজিক উন্নতি।
ফুকার—শুনি বাইবেল কিংবা কোরাণ বেদে, একই কথা ভাষা ভেদে,
করে লয় স্বীকার;
তবে বেদ কোরাণ কি বাইবেল বড় কে করে বিচার।
এই যে উপাসনা পূজা নামাজ, রুচি ভেদে করে সমাজ,
যদি মূলের বেলায় একজনার কাজ, তবে কেন এত ভেদ বিচার ॥
অন্তরা—সকলই এক পিতার পুত্র, শূদ্র ভদ্র ক্ষুদ্র মুচি মেথর।
বৃথা জাতীয়তা ভ্রান্ত প্রথা, পরমপিতা পরমেশ্বর ॥
সব জাতি এক জ্যোতির সৃষ্টি, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি,
সুধারে করুণা বৃষ্টি সকলের উপর।
এসব অন্ধ জীবে কিসে পাবে, প্রেমময়ের প্রেমের আকর ॥

পরচিতান—আবার কেউ মরে সমাজের ডরে, কথা বলতে করে ভয়।
পরপাড়ন—যত অজ্ঞানী অন্ধ ভন্ড, সমাজের মেরুদন্ড,
যেন প্রকান্ড ষন্ড সমুদয় ॥
ফুকার—এসব নরাকারে পশু যত, সমাজে দৌরাত্ম্য কত, করে নিশিদিন,
তবু বেদজ্ঞানে তার বাক্য মানে, যত অর্বাচীন।
যেদিন জাগবে পূর্বস্মৃতি, উঠবে ফুটে ব্রহ্মের জ্যোতি,
সেদিন দেখতে পাবে সকল জাতি, কে কুলীন কে অকুলীন ॥

## রকেটের মালসী কালিচরণ দাস

চিতান—মাগো স্মৃতি শ্রুতি বেদ পুরাণে, দর্পণে কেউ দেখতে চায় না মুখ।
পাড়ন—এখন সবাই কয় সায়েন্সের যুগ, বুঝুক বা কেউ না বুঝুক,
পেয়ে নূতন হুজুগ, তাইতে বাড়ে সুখ ॥
ফুকার—ছিল আদিম যুগে আর্য ঋষি, চিত্ত সংযমেতে বসি,
প্রাণে বেঁধে বিজ্ঞানের বাঁধন;
থেকে উপবাসী দিবানিশি সেই তথ্যের সাধন।
মাগো মসি দিয়ে লিখলেন তারা, আমাদের ধন আমরা হারা,
পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানবিদ যারা, তারাই করছে তারই উদ্বোধন ॥
মিল—এই সব দেখে শুনে ভাবি মনে কোন পথ লয়ে হাঁটি;
ইহার কোনটা নকল কোনটা খাঁটি, কার কাছে গিয়ে শুনিব।
মুখ—বলে দে মা তারা, আমার চক্ষে ঝরে দুঃখের ধারা, কি দিয়ে মুছিব ॥
ডাইনা—রামায়ণ মহাকাব্যে আছে শক্তিশেল;
রাবণের মন্ত্রপূতঃ বাঁধা ছিল স্কেল।
রাম যখনে স্তুতি কবে, আয়রে শেল মোর বক্ষোপরে,
শেল সেদিক না লক্ষ্য করে, বলে লক্ষ্মণের বক্ষে পড়িব।
খাদ—ব্যথার ব্যথীত পাই না খুঁজে মা, ব্যথার কথা কব ॥
ফুরার—জার্মানী হইল মানী, আর্যঋষির ধনে ধনী,
করলেন তিনি এটমের প্রচার;
আবার তাদের দোষে গেল তাদের নিজ অধিকার।
আমেরিকান টাকার বলে, নিয়েছে তা সুকৌশলে,
জাপানে পরীক্ষা নিলে, করল লক্ষ লক্ষ জীব সংহার ॥
মিল- এসব মারণাস্ত্র মরণ কারণ বারণের নাই কেউ,
উঠল বিশ্ব ভরে প্লাবনের ঢেউ, হবে তায় মহা বিপ্লব ॥
অন্তরা—বিশ্বব্যাপে উঠল খেপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ।
এখন কারো চাপে কেউ থাকবে না, খুলেছে অজ্ঞান আবরণ ॥

বিস্ফোরণ সব রেখে দূরে, যুদ্ধ চলছে ব্রেণ কালচারে,
পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যের জোরে, হল নিরস্ত্রীকরণ।
আবার রাশিয়ায় দেখাল প্রমাণ করে, বিজ্ঞানের এক বশীকরণ ॥
পরচিতান—আরো বাকী আছে বা কি, আরো বা কি দেখাবি আমায়।
পাড়ন—শুনি উইদাউট পাশপোর্টে, উইদাউট টিকেটে,
ধ্রুব কিসে উঠে, ধ্রুবলোকে যায় ॥
ফুকার—বর্তমানে রাশিয়ানে, আর্য ঋষির মহাদানে, বিজ্ঞানে লভিল শীর্ষস্থান ;
তারা বিজ্ঞানেতে শূন্য পথে চালায় অভিযান।
মাগো রকেট পাঠায় চন্দ্রলোকে, বিশ্ব চমক সেই আলোকে,
বিশ্ববাসী শুষ্ক মুখে, বুকে সবার প্যালপিটেশান ॥

**দুর্গাপূজার মালসী** ( খণ্ডিত )  **নরহরি সরকার**

দুর্গাপূজা করবো বলে বাঞ্ছা মনে।
পূজার যা যা প্রয়োজন, কিছু আয়োজন,
হল না এ দুর্দিনে ॥
গেল সপ্তমী অষ্টমী নবমী—
বদ্ধ হয়ে বিষম কবিগানে।
শক্তি পূজার নৈবেদ্য, হল কাক কুকুরের খাদ্য,
পূজা অশুদ্ধ মন্ত্রতন্ত্র বিনে ॥
দিয়ে ভক্তি বিল্বদল, শুদ্ধ গঙ্গার জল,
শক্তি নাই দিতে শক্তির চরণে ॥

আমার এই দেহ দুর্গামণ্ডপ দুর্গা যাবে ত্যজে।
নিদয় হয়ে মা দাঁড়ালেন—
বিদায় হওয়ার সাজে ॥
নবমীর অবসান, ঘাটে বাঁধা নৌকা খান,
ঘনঘটা গরজে।
সোনার প্রতিমা বিসর্জন হবে—
অকূল সিন্ধু মাঝে ॥
মা থাকিতে প্রাণে মরে, মা তোমার সন্তান।
রক্ষা কর দয়াময়ী ত্রিজগতের প্রাণ ॥
মাগো তুমি বিনে এ সন্তানে কে করে কল্যাণ।
অন্নবস্ত্র নাই মা ঘরে, কি দিয়ে মা এ সংসারে,
সংসারীগণ পাবে পরিত্রাণ।
দিও নরহরির শেষের দিনে শ্রীচরণে স্থান ॥

**অন্নকষ্টের মালসী** **শ্রীনিশিকান্ত সরকার**

চিতান—বড় দুর্দিনে পড়িয়ে মা দুর্গে, তোরে ডাকি বারে বার।
পাড়ন—দুটো অন্ন দিতে জননীর, দুঃখে ঝরে চক্ষের নীর,
এই বুঝি সেই ঘোর কলির, কলুষ অন্ধকার ॥
ফুকার—দেখি বেদ পুরাণ ইতিহাস পড়ে,
ভারতবাসীর ঘরে ঘরে, জন্মিত যে যব গম ধান ;
বাঁচত খেয়ে পরে ছ'টি বৎসর, মায়ের এমনি দান।
দেশের চালক গোষ্ঠী সাপ আর বেজী, যার যার পক্ষ রাখেন তেজী,
দুই তিন টাকা চাউলের কেজি, এখন কে কাহার বাঁচাবে প্রাণ ॥
মিল—আমরা যুক্তফ্রন্টের কন্ঠে শুনলাম খাদ্যনীতির বাণী,
আছে বাংলাদেশে যত প্রাণী—না খেয়ে কেউ মরবে না আর।
মুখ—কি শুনলাম আর কিবা দেখি,
ধর্ণা দিয়ে অন্নে ফাঁকি, এই কি বিধাতার বিচাব ॥
ডাইনা—দেখি শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য, জ্বলে উঠল অগ্নিতুল্য,
যায় না তো আর স্পর্শ করা হাতে,
কেবল কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সবাই চায় কমাতে।
ধান চাউলের সরকারী দর, হাটে লয় না পাটের খবর,
বাড়ে ঠাণ্ডা ঘরে আলুর কদর, মুনাফা লোটে মজুতদার।
খাদ—চেঁচালেও 'সরকারী' মা দেবে না খাবার ॥
ফুকার—যত স্বল্প মাইনের কর্মচারী, বিপদে পড়েছে ভারী,
বুঝতে নারি কি দিয়ে জীবন রাখি ;
সবার এক সপ্তাহ খেতে হবে—দুই দিনের খোরাকী। মা মাগো—
খেয়ে সরকারী নির্দিষ্ট খাবার, সাধ্য নাই অফিস যাবার,
পথে ঘাটে অক্কা পাবার, বুঝি বেশী দিন আর নেই বাকী ॥
মিল—মাগো ন্যায্য মূল্যে খাবার দিতে সরকারের নাই শক্তি,—
আনলে বাহির হতে কোন ব্যক্তি, পুলিশে করে অত্যাচার।
অন্তরা—মাগো খাদ্য নিয়ে লুকোচুরি, কেন তুই দেখিস না চোখে।
মিলে চড়া দামে বস্তা বস্তা, ন্যায্য মূল্যে পায় না লোকে ॥
শহর বন্দর গ্রাম নগরে, খাদ্য থাকতে গোলা ঘরে,
নরবলি এমন করে, যারা দেয় তোকে।
এই সব মহিষাসুর নিধন করতে—
আবার আয় মা মর্ত্যলোকে ॥
পরচিতান—করিস যুগে যুগে যাওয়া-আসা মা, করতে দুষ্টের নিধন।

পাড়ন—দেশের খাদ্য লুকান কোথা, সরকার জানে না সে কথা,
এর চেয়ে আর অক্ষমতার কি আছে প্রমাণ ॥
ফুকার—এবার আয় মা মহিষমর্দিনী, চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী,
শূলপাণি দাঁড়াক এসে তোর পক্ষে ;
যত দুষ্টমতি দুষ্কৃতির দল—পাবে না আর রক্ষে। মা মাগো—
সমাজ বিরোধী শুম্ভ নিশুম্ভ, গড়তে চাহে জয়স্তম্ভ,
চূর্ণ করতে দুষ্টের দম্ভ, মা তুই মরণাঘাত দে বক্ষে ॥

## দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মালসী  শ্রীতারিণীচরণ সরকার

চিতান—তারা জগদ্ধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগন্মাতঃ পুরাণে শুনি।
পাড়ন—দেখি ভারতবর্ষে বর্তমান বর্ষে, কেন উঠল প্রলয়ের ধ্বনি ॥
ফুকার—মা নাইনটিন্ থার্টি নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে,
করে যুদ্ধের প্রথা, হিটলার মহাযুদ্ধের নেতা—মা মা মা
হের হিটলার অসীম সাহসে, নয়টি দেশ নিল ছয় মাসে,
লোকে উপাধি দিল তার শেষে, হিটলার রণদেবতা ॥
মিল—প্রলয় কাণ্ড লণ্ডভণ্ড মহাযুদ্ধের ফলে—
কেউ দেখে নাই কোন কালে, অলৌকিক কান্ড দুনিয়ায়।
মুখ—কোথায় গো তারিণী, এবার বল শুনি, লোকের কি উপায় ॥
ডাইনা—ইংলণ্ডবাসী নাগরিকগণ, প্রাণ রক্ষার দায় বিদেশ গমন.
করে জাহাজেতে ;
এমন কত জাহাজ মারা গেল, মাইন কিবা টর্পেডোর আঘাতে।
শিশু আর মহিলা ভরা, কত জাহাজ গেল মারা,
স্রষ্টার সৃষ্টি নষ্ট করা, হের হিটলার জন্মেছে ধরায়।
খাদ—না কি ভেল্কি দিয়ে কল্কী এল হিটলার রূপে ধরায়।
ফুকার—মা বর্তমানে বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানই উন্নতির সোপান,
বলতেছে লোক সকল, কত বিজ্ঞানের কৌশল। মা মা মা—
পাশ্চাত্যদের বিজ্ঞানেতে, নূতন সৃষ্টি পৃথিবীতে,
তাতে মানুষ মারে শতে শতে, বিজ্ঞান মানুষ মারা কল ॥
অন্তরা—মাগো বিজ্ঞানের বীজ কে দিল মানুষের হাতে।
শুনি ট্যাঙ্ক বন্দুক বোমা মেসিনগান, তৈয়ার হয় বৈজ্ঞানিক মতে ॥
মা সূর্যের জ্যোতি আয়না ধরে, দেশ পুড়ে দেয় ছারখার করে,—
মারণাস্ত্র বলে তারে, বর্তমান যুদ্ধেতে।
করতে ইংল্যাণ্ড নষ্ট বিমান যুদ্ধে, বোমা মারে শতে শতে ॥

পরচিতান—করে ধনে জনে অকালে ক্ষয়, এই যুদ্ধে জয় নেওয়া কি উচিত।
পাড়ন—করতে বিশ্বশান্তি হিটলার না কি করল প্রতিজ্ঞে,—
লোকের ভাগ্যে ঘটল বিপরীত ॥
ফুকার—মা বিশ্বশান্তি হবে কোথায়, কত লোক যুদ্ধে মারা যায়,
হিটলারের প্রভাবে, মূলে অশান্তি বাড়িবে। মা মা মা—
বিশ্বশান্তি সদর্পে কন, হিটলার তো আর ভগবান নন,
হের হিটলারের দশা যেমন, দশাননের দশা হবে ॥
ফুকার—মা, অতি সহজ মানুষ মারা, কঠিন ব্যাপার তৈয়ার করা,
বিনে স্রষ্টার কৃপা, তা-ই ভুলেছে হিটলার ক্ষেপা। মা মা মা—
স্রষ্টার সৃষ্টি নষ্ট করতে, হের হিটলার জন্মেছে মর্ত্যে,
শেষে বন্দী হবে ফন্দীর গর্তে, যেমন মহম্মদ হানিফা ॥

**মালসী** **শ্রীঅমূল্যরতন সরকার**

চিতান—কেন কথা কইয়ে ওগো হরি আড়ালে লুকাও।
পাড়ন—কিবা অজানা গীতিকা ছন্দ মন্দ পবনে,
হৃদি নন্দনে গুঞ্জরিয়া যাও ॥
ফুকার—বাজে রিমিঝিমি সুর ছন্দ সমীরণ তরঙ্গে তালি,
এক গোপন বাঁশী ; হরি হে—
আমার রুদ্ধ হৃদয় মুক্ত করি, দাঁড়াও বন্ধু অন্তরে আসি।
নীলদ ঘন বরণ মন্মথ মদন মোহন,
প্রেমদায় মনোর:·:, ঝলকি ও আলোক রাশি ॥
মিল—অন্তর অঙ্গন তলে, দরদীয়া মোর নাচ গো—
শ্যামল সুন্দর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গে।
মুখ—পড়ুক ঝরি বৃন্ত খুলি, ভক্তি কুসুমগুলি,
দুলি দুলি নৃত্য তরঙ্গে ॥
ডাইনা—অজানা অকূল স্রোতে, সুদূরে দুর্গম পথে
ছুটেছে মোর জীবন তরণী ;
দেখি নিভু নিভু হল ঐ যে, দিবস দীপ আলোকখানি।
রঙ্গময় তরঙ্গ নৃত্যে, ভুলেছি বেভোলা চিত্তে,
স্নেহময় সরল বন্ধুত্বে, তুলে নাও তরঙ্গ ভেঙ্গে।
খাদ—দিগন্তে অনন্ত প্রান্ত উঠিবে রেঙ্গে ॥
ফুকার—আমায় ভালবেসেছিলে কত, মনে নাই কি প্রথম দেখাতে,
ও সেই অন্ধকার রাতে ; হরি হে—
আমায় সাথী হয়ে এলে নিয়ে, অজানা এই বিজন পথে।

কুসঙ্গীদের সঙ্গে দিয়ে, আড়ালে দাঁড়ালে গিয়ে,
মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে, ব্যাকুল ব্যথা দিচ্ছ হিয়াতে ॥
ঝুমুর—আমায় কি বাঁধনে বেঁধেছ হরি, জঞ্জাল জালে জড়িয়া।
আমার যত চাওয়া পাওয়া, সবই যাবে খোয়া,
দিলে তব ছোঁয়া কর তুড়িয়া ॥
শ্রীকর পরশ করি, খুলে দাও বাঁধন দড়ি,
অনন্ত আকাশে উড়ি, বেড়াই ঘুরিয়া।
কাঁদিছে অমূল্য, হরি তব তুল্য, কে আছে মোর দরদীয়া ॥
পরচিতান—আমার জীবন বীণা তুমি বিনা কে বাজায় মধুর।
পাড়ন—যত হাসা কাঁদা সুখে দুখে উঠে ঝঙ্কারি,
এ যে তোমারই—মনোনীত সুর ॥
ফুকার—তোমার সংসার নাট্যমঞ্চ মাঝে, নানা সাজে সাজালে মোরে,
কত ছলনার ফেরে, হরি হে—
তাই ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদি, ক্ষণে থাকি বিস্ময়ে পড়ে।
বিষয় ভীষণ অঙ্কে, ডুবেছি বাসনা পঙ্কে,
যবনিকা পতনাঙ্কে, হস্ত ধরে তুলিও মোরে ॥

## আগমনী ও বিজয়া

[ আগমনী বিজয়া গানে বাৎসল্য রসের ছড়াছড়ি। বাঙালী সমাজে মেয়েদের জন্য বাপ-মায়ের যে আমরণ দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ জাতীয় গানে। বৎসরান্তে একবার মেয়েকে বর্ষাকালে বাপের বাড়িতে "নাইওর" আনার যে রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, তার ছায়াপাত দেখা যায় এ গানগুলিতে। এ সকল গানের জবাব দেবার রীতি নেই। ]

### আগমনী ষষ্ঠী — হরিচরণ আচার্য

চিতান—হল বর্ষা গত, শরদাগত শারদীয় মহোল্লাস।
পাড়ন—গিরি উমা আনতে যায় কৈলাসপুরে, রানী করে অধিবাস ॥
ফুকার—শুভ ষষ্ঠী কল্পারম্ভ, বারিপূর্ণ কুম্ভ, আম্রশাখায় সুশোভিত,
করে সিন্দুরে চন্দনে চর্চিত।
তুষ্ট করতে সে চণ্ডিকা, পুরীতে হয় কুশণ্ডিকা,
বাঁধিল নব-পত্রিকা, কুল পুরোহিত ॥
মিল—হেথায় গিরি গিয়ে কৈলাসে, শুধায় প্রিয় নম্র ভাষে,
জামাই কীর্তিবাসে—ভব তব পাশে এই ভিক্ষা চাই।

মুখ—জামাই হে, দয়া করে দেও আমাকে, উমাকে নিয়ে যাই ॥
ডাইনা—আমার বুকে দারুণ পুত্রশোক, কেবল উমাচাঁদের দেখে চাঁদ মুখ,
সে শোক নিবারিয়ে থাকি ;
প্রাণের উমার কথা মনে পড়ে, জামাই হে—
আমার সদা ঝরে দু'টি আঁখি।
বড় আশা মনে করে, এসেছি এক বৎসর পরে,
তিন দিনের নাইয়রে নিব প্রাণ উমারে,—
বেশী দিন রাখিতে মনে বাঞ্ছা নাই।
খাদ—বিনে উমাচাঁদ, চাঁদ আমি কিসে প্রাণ জুড়াই ॥
ফুকার—লোকের পুত্র হলে পরে, থাকে নিজ ঘরে—
সবার আছে তাই জানা ; কভু জন্মভূমি ত্যাগ করে না।
কুক্ষণে জন্মে দুহিতা, সদা থাকে পরাশ্রিতা,
পিতামাতার দুঃখের কথা, অন্যে জানে না ॥
মিল—থাকলে স্বামীর ঘরে শত সুখ, তবু না দেখিলে দুহিতার মুখ,
পিতামাতার মনে দুঃখের সীমা নাই ॥
অন্তরা—জামাই, তিন দিনের নাইয়রের তরে উমাচাঁদকে নিয়ে যাব।
আমার চাঁদ জিনি চাঁদ, অকলঙ্ক চাঁদ,—
নিয়ে এই চাঁদের নিছুনি চাঁদকে দিব ॥
জয়া চাঁদ আর বিজয়া চাঁদ, উমাচাঁদের সঙ্গে পাব।
( ওহে ওহে জামাই ) নিয়ে কার্তিক গণেশ দুই সোনার চাঁদ,—
চাঁদের বাজার আমি মিলাইব ॥
পরচিতান—গত নিশিতে মেনকা রানী উমাকে দেখে স্বপন।
পাড়ন—উমা উমা বলে কাঁদতে কাঁদতে, ধরাতে হল পতন ॥
ফুকার—জগৎবাসী হিন্দু যত, সবে আনন্দিত,
দেখবে বলে উমার মুখ ; দেশে এসেছে সব প্রবাসী লোক।
মা আসবে আসবে বলে, সবে নাচে কুতূহলে,
এ সময় উমা না দিলে, সবে পাবে দুখ ॥

## মহাসপ্তমী মালসী

হরিচরণ আচার্য

চিতান—শুভ সপ্তমীতে, গিরিপুরেতে, গিরিবালার আগমন।
পাড়ন—করল আনন্দময়ীর আগমনে—নিরানন্দ পলায়ন ॥
ফুকার—রানী ধান্যদূর্বা নিয়ে, মণ্ডপেতে গিয়ে, নিরখিয়ে উমার মুখ ;
ভেসে নয়ন জলে কেঁদে বলে, অন্তরেতে সুখ।

এত দিন মা কৈলাসপুরে, ছিলি পাগল জামাইর ঘরে,
বহু দিনে পেয়ে তোরে, জুড়াইলেম বুক ॥
মিল—আমার কার্তিক গণেশ দুটি ভাই ;
মাগো একটি মেয়ে বিধি, তোরে দিত যদি,
বিয়ে দিলে জানতি মায়ের বেদনা।
মুখ—উমা গো, দুঃখিনী মা বলে কি তোর, মনেতে পড়ে না।
ডাইনা—আমার একটি পুত্র মৈনাক ছিল, সে ত সমুদ্রেতে ডুবে ম'ল,
কে আছে আর কারে ডাকি ;—
কেবল তোর চাঁদ বদন দেখব বলে উমা গো—
আমি বর্ষাবধি বসে থাকি।
কার্তিক গণেশ পেয়ে কোলে, থাকিস কি মা আমায় ভুলে,
উপযুক্ত কালে ছেলে মেয়ে হলে, মা'র মমতা ভবে কেউ ভুলে না।
খাদ—মায়ের মাথা খাইস খাইস, তুই আর কৈলাসে যাইস না ॥
ফুকার—নারদ কুমন্ত্রণা দিয়ে গিরিকে ভুলায়ে,—
এনেছিল পাগল বর, সে যে অতি বৃদ্ধ দিগম্বর।
তৈল অভাবে জটা চুলে, কাল ভুজঙ্গ ধরে গলে,
তুই করিস কপালের ফলে, ঐ পাগলের ঘর ॥
মিল—তাইতে একে আমার দুরদৃষ্টের ফল, হল গিরিরাজ অচল ;
নাইক চলাচল, নাইয়র আনতে কারে পাঠাই বল না ॥
অন্তরা—হল আজ বড় আনন্দ, আমার নিরানন্দ গেল দূরে।
হল আমার আনন্দে জগতের আনন্দ,—
জয়ধ্বনি শুনি জগৎ ভরে ॥
যত নগরবাসী ঘিরিল আসি, আনন্দেতে গিরিপুরে।
হল আনন্দ সবার, রাজা কি প্রজার—
চাঁদের বাজার আমার মণ্ডপ ঘরে ॥
পরচিতান—সদা লোকের মুখে শুনি গো উমা, তোমার দুঃখের বিবরণ।
পাড়ন—তোরে একা রেখে সে কৈলাস বাসে, শ্মশানবাসী পঞ্চানন ॥
ফুকার—মা তুই মায়ের কথা রাখ, হিমালয়ে থাক, কাজ কি সে কৈলাসে গিয়ে ;
পাগল জামাইকে মা সঙ্গে নিয়ে।
রাজ্য ধন সকলি তোমার, আর কে আছে গিরিরাজার,
মিলাইয়া চাঁদের বাজার, যাস নে ভাঙ্গিয়ে ॥
মিল—যত ধনরত্ন দেই মা তোর সঙ্গেতে—
মাগো ওসব দিয়ে বুঝি পাগল বাবাজী,
সিদ্ধি কিনে খায়,—সঞ্চিত করে না ॥

## নবমী — লোকনাথ চক্রবর্তী

চিতান—নবমী প্রভাত কালে, গৌরীকে নিবার ছলে, এইলেন পঞ্চানন।
পাড়ন—করে শিঙ্গার ধ্বনি, বভম্ বভম্ বভম্ ধ্বনি,
শুনি তাই গিরিরানী, জুড়িলেন ক্রন্দন ॥
লহর—( তখন ) জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বলে, গিরিরানী কেঁদে বলে,
কইগো উমাধন ? আমি দুঃখিনীব জীবনের ধন ;
আয় মা একবার করি কোলে, মায়ের কথা যাইস না ভুলে,
তোর দুঃখে মোব জীবন জ্বলে, জামাই পাগলা পঞ্চানন ॥
মিল—শিঙ্গা ধ্বনি শুনতে পাই, এসেছে পাগলা জামাই, তোমাকে নিতে,
আমি ঘরে রব হায় কি মতে, তুই গেলে প্রাণ রবে না।
মহড়া—মাগো উমা এবার তোরে কৈলাসে যেতে দিব না ॥
ধুয়া—কেমন করে যাবে উমা, আমি যে তোর দুখিনী মা,
আমাকে ছেড়ে,—
আমি তোর দুঃখেতে পুড়ে মরব, কাঁদবি তুই পরে ;
গর্ভে ধরে আমি তোবে পেলেম কত যন্ত্রণা।
খাদ—ঝিয়ের বেদন মাযে বিনে অন্যে বুঝে না ॥
লহর—তুই গেলে মা জামাই বাড়ি, তোর বিচ্ছেদে মবব পুড়ি,
গিরিপুরী ঘিরবে আঁধারে ;
দেখতে দেখতে গেল নবমী, উদয় হল কাল দশমী,
বিদায় দিয়ে তোরে আমি, ঘরে রই কেমন ক'রে ॥ ( খণ্ডিত )

## বিজয়া — রামগতি শীল

পায়ে ধরি রে নবমী তিথি, আর প্রভাত হইও না।
তুমি প্রভাত হলে নয়ন খুলে, নয়নতারা আর হেরব না ॥
আঁধার ঘরের চাঁদের আলো, বড় স্নেহের ধন উমা,
হলে নয়নতারা উমা হারা, দেহেতে প্রাণ আর রবে না ॥
দুদিনের জন্য পেয়েছি তারে, ভাল করে আজও হেরি না।
( মায়ের চাঁদ মুখখানি ভাল করে— )
বল, না হতে বোধন, করি বিসর্জন—
কেমনে এমন সুবর্ণ প্রতিমা ॥

## আগমনী — রামনাথ ভুঁইমালী

গিরি আমার গৌরী এসে বসেছে।
রূপে ভুবন আলো হয়েছে।

মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী—
দিন যামিনী সমান করেছে ॥
উমা আমার নয়নতারা, লোকে বলে "তারা তারা",
তারা কি তার কাছে ?
জিনি কোটি শশী বদনশশী—
কত শশী পদে পড়েছে ॥
অন্তরা—ভোলানাথ আসবে নিতে দশমীতে,
এখনি ভাবতেছি তাই মনে।
( আমার ) আঁধার ঘরের উজল মাণিক,
ছেড়ে দিব কোন্ পরাণে ॥
দুখপাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা রতন,
কে তারে করিবে যতন ? শিব থাকে শ্মশানে।
তার বাড়ির ভিতর ভূতের আড্ডা,
ভূতে কি তার যত্ন জানে ॥

## বিজয়া

চিতান—অধীর প্রাণে, গিরির পানে চেয়ে রানী কয়।
পাড়ন—তুমি পাষাণ হয়ে, আছ সয়ে, আমার ত না সয়,
উমার অদর্শনে জ্বলে যায় হৃদয় ॥
ফুকার—বল বল গিরি কই সে গৌরী,
কই গেল কই গেল, মরি না পাই হেরিতে।
আমি হাতে পেয়ে উমাশশী, যেপেছিলাম এ তিন নিশি,
কপাল দোষে পড়লো খসি, না চাই জীবন ধরিতে ॥
মিল—আঁধার ভবন করে সে ধন, লুকাল কোথায়,
এই ছিল সে কোথা গেল, মরি মরি মনোব্যথায়।
মুখ—যায় জ্বলে যায় আমার তনু, বল গিরি কি করি উপায় ॥
ডাইনা—না শুনে না দেখে নেত্রে, সঁপেছিলে যোগ্য পাত্রে, সোনার প্রতিমা,
জনে জনে কয়ে ফিরি, জামাইর মহিমা ;
জন্মে যে দুখ পায় নাই গৌরী, সে দুঃখে দেয় গড়াগড়ি,
বল কিসে ধৈর্য ধরি, পেটে ধরেছিলাম উমায়।
খাদ—এসেছিল কাল বিজয়া বধিতে আমায় ॥
ফুকার—আমি বুকে পেয়ে বুকের ধনে, আর দু'চার দিন রাখব মনে,
করিলাম চেষ্টা বিফল।

না যাইতে নবমী নিশি, নিতে এল উমাশশী,
করে না বিলম্ব বেশী, এমনি সে বন্ধ পাগল ॥
ঝুমুর—কই গেল সে উমা।
আমার স্নেহের ধন, অঞ্চলের সোনা।
নিবায়ে মণ্ডপের বাতি, কেমনে বঞ্চিব রাতি, গো—
উমা কি বুঝল না ?
নাই কি সম্ভব, নিত্য দুর্গোৎসব,
এ দুঃখ উদ্ভব তবে হৈত না ॥

সংগ্রাহক ঃ মহেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ

**আগমনী—লহর মালসী** **বিজয়নারায়ণ আচার্য**

চিতান—পিতামাতার স্নেহের কথা, জগন্মাতা করিয়ে মনে।
পাড়ন—লয়ে সঙ্গে লক্ষ্মী ভারতী, ষড়ানন গজপতি,
করলেন শুভযাত্রা, সপ্তমী দিনে ॥
লহর—এথা উমা আসার আশা পেয়ে, পথপানে ছিলেন চেয়ে,
ব্যাকুল হয়ে গিরিরাজ জায়া, হায়রে—মায়ের কত মায়া।
অদূরে উমাকে হেরি, বলে মেনকা সুন্দরী।
এই যে, এলো আমায় মনে করি, প্রাণকুমারী বিজয়া ॥
মিল—আনন্দে অধীরা হয়ে গিরিরাজ জায়া,
অমনি দ্রুতগতি ধেয়ে যেয়ে, হিমালয়কে বলতেছে।
মহড়া—গিরিরাজ হে, শীঘ্র দেখ এসে—
এই যে আমার উমাধন এসেছে ॥
ডাইনা—বারটা মাস ছিলাম চেয়ে, দেখা হৈল মায়ে ঝিয়ে,
এলো আমার উমা,
গিরি ত্রিজগতে কোথায় মিলে উমার উপমা।
কোলে বসে ডাকিবে মা, মা ডাকে কি মাধুরিমা,
আমার নিরুপমা উমা সমা, মেয়ে কে আর পেয়েছে
খাদ—উমা রূপে পুরী আমার আলো করেছে।
লহর—আমি কত জন্ম জন্মান্তরে, কত কঠোর সাধন করে,
গর্ভে ধরেছিলাম উমা ধনে, আমার কতই না সুখ মনে।
বৎসরে বৎসরে আসি, উদয় হয় মোর উমাশশী,
( আমি ) আনন্দ সলিলে ভাসি, 'মা' ডাক শুনলে চাঁদবদনে ॥
মিল—কৈলাস হইতে আসতে পথে কষ্ট হৈল ভারি,—
তারে খেতে দেই গে তাড়াতাড়ি, বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে ॥

অন্তরা—গিরি, আর আমি উমারে, দিব না হে ছেড়ে,
যেতে কৈলাসপুরে, দু' চার মাস।
আমি রাখিয়া উমারে আপনার ঘরে, পুরাব মনের আশ ॥
কি নিশি দিনে, ঘুমে জাগরণে সর্বদা করি হা হুতাশ।
যদি নিতে আসে শিবে, না দিলে কি নিবে,
এবার ফিরে যাবে কৃত্তিবাস ॥
পরচিতান—উমার কথা বলতে গেলে, অশ্রুজলে ভরে দু'নয়ন।
পাড়ন—ভবে এমন মেয়ে আছে কার, রূপে গুণে চমৎকার,
আমার বহু ভাগ্যে মিলেছে এই ধন ॥
লহর—আমার উমাধনকে করলে কোলে, সর্বজ্ঞান হয় ধরাতলে,
কর্মফলে ফলে এমন ফল, উমা নিদানের সম্বল।
চাইলে উমার বদন পানে, কার প্রাণে আর ধৈর্য মানে,
আপনে ঝরে নয়ন কোনে, ফোঁটা ফোঁটা স্নেহ জল ॥

## বিজয়া — হারাইল বিশ্বাস

চিতান—সুখের নবমী গত বিজয়ার প্রবেশ।
পাড়ন—নিয়ে গৌরী, সর্ব শূন্য করি, কৈলাসেতে চলিলেন মহেশ ॥
লহর—তাই দেখে সব পুরবাসী, বলে নয়ন জলে ভাসি,
কই গো পাষাণ গৃহিণী।
কি সুখে রয়েছ বসে, উমা তোমার কৈলাসে,
যাবার কালে একবার এসে, হের ঈশানী ॥
মিল—যেমন বনদগ্ধা হরিণীর প্রায় গিরিরানী,
বলে ও মা উমা খানিক দাঁড়া করি কোলে।
মহড়া—আমার প্রাণকুমারী, মম পুরী আঁধার করি,
কেন মা যাইতেছ চলে ॥
ডাইনা—আমি সংবৎসরে আহ্লাদ করে আনলাম তোরে,
মনের এই সাধ প্রাণ জুড়াব বক্ষে ধরে,
হায় হায়, হায় হায় অকস্মাৎ, শিরে দিয়ে বজ্রাঘাত,
মা, কি আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে ॥
খাদ—কাল কিছু খাইলে না মা, ঘুমে ছিলে।
লহর—আমার এই সাধ রৈল অন্তরে, ক্ষীর ননী রৈল পড়ে,
খেলে না মা তায়, কালনিদ্রায় ; হায় হায় রে—
কার লাগি করিয়া যতন, করলেম তোরে প্রতিপালন,
কারে সঁপে দিলাম এখন, কে বা লয়ে যায় ॥

মিল—আমার মনোসাধ না মিটিল মায়ায় ভুলে,—
বলি ও উমা, আয় একবার আয় তোর মার কোলে ॥

### আগমনী — অজ্ঞাত

গিরিরাজ আর ত সহে না ব্যাজ, আসবে না কি আমার উমাধন।
শুনি লোকে বলে থাকে, মিথ্যা হয় না ভোবের স্বপন ॥
ঐ আসে ঐ আসে কবে, আশাতে প্রাণ আছি ধরে,
আসবে সে সম্বৎসরে গো, তিন দিনের কারণ।
আমার বক্ষের আগুন বক্ষে থাকে—
হয় না চক্ষেব জল নিবারণ ॥
ঝুমুর—আঁধার ঘর করে উজল, হে গিরিবব, ঐ বুঝি উমাই আমার এল।
আমি তারে লইগে কোলে, তোবা একটু উলু দে লো ॥
না জানি পথে পথে, কত রোদ লাগছে রথে,
উমা ননী হতে অতিশয় কোমল।
এই লাগিয়া উমার কারণ, আমার ভাবতে ভাবতে জীবন গেল ॥

### আগমনী — অজ্ঞাত

এলে কি উমা চন্দ্রমুখী, আব তোমাবে যাইতে দিব না।
ওমা কন্যাদানের ফল কি কেবল, নয়ন জল আর কুভাবনা।
জন্মে যে দুখ ″ য় নাই গৌরী, সে দুঃখে দেয় গড়াগড়ি,
মা হয়ে কি সইতে পারি, লোকের গঞ্জনা।
সে ত পাষাণ হয়ে সযে থাকে, আমার হৃদয় পাষাণত না ॥
ঝুমুর—সপ্তমী নয় অষ্টমী, নয নবমী, উমা তুই সদাই থাক আমার ঘরে।
শিব সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী মাগো, তোরে কি আর যত্ন করে ॥
তোবে কি বলব শিবে, কত আর কষ্ট দিবে,
গেলেও ত সেই আসিবে, আর এক বছর পরে।
দেখে শূন্য মণ্ডপ, হয় উপদ্রপ, মাগো সর্বদা মন লু লু করে ॥

### আগমনী ডাক মালসী — বিজয়নারায়ণ আচার্য

মা শিব সীমন্তিনী শক্তি সনাতনী জননি !
দিতে ভক্তজনে মা চরণ দু'খানি, এসেছ ভক্তের বাড়ি।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, স্কন্ধ গণপতি।
পদে পশুর রাজা, অসুব অরি ॥

সারাটা বৎসর গতে একবার,
আশ্বিনে অম্বিকা আসিবে আবার,
বারংবার থাকি এই আশা মনে করি।
হৈল বাসনা পূরণ, এই নিবেদন,
মরণ কালে যেন চরণ হেরি ॥
ঝুমুর—আহা মরি কিবা, অপরূপ শোভা,
চণ্ডী মণ্ডপ হইয়াছে আলো।
ভক্তের ভবনে দেবীর আগমনে, সঘনে দুন্দুভি বাজিল ॥
আনন্দ সাগরে আনন্দ জোয়ারে,
অতুল আনন্দ উথলিয়া উঠিল।
আনন্দময়ীর আনন্দ আনন্দে ভুবন ভরিল ॥

## দুর্গাপূজার ষষ্ঠী গান — রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—হল বর্ষা অন্ত নবঘন নভে মিশিল।
পাড়ন—বিমল আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, নব রসে জগৎ ভাসিল।
ফুকার—কিবা শরৎ সুহাসিনী, মধুর ভাষিণী, মায়ের মঙ্গল গায়,
নব ভাবোৎসাহে জগৎ জাগায়,
কি দরিদ্র কি ধনী, সবার মুখে মঙ্গল ধ্বনি,
স্নিগ্ধ সমীরণে শিহরি ধরণী, বিমুগ্ধ নয়নে চায় ॥
মিল—ভেবে শুভ ষষ্ঠীর আগমন, হল ভূলোকবাসী সবার পুলকিত মন ;
মায়ের আগমন মনে জেনে।
মুখ—এসেছে এসেছে কি সুখের সময়, শরতে ভারত ভুবনে ॥
ডাইনা—বাজে টং টং টিকারা, বাজে সেতারা দোতারা চৌতারা,
তারার আগমন আশে,
বিমল আকাশ মাঝে তারাগুলি, তারাও সকলে হাসে।
যে দিকেতে ফিরাই আঁখি, শান্তির প্রতিমূর্তি দেখি,
সাধু ভকতের মন থাকি থাকি, নাচিছে সদায় আনন্দ তুফানে।
খাদ—বিমোহিত মহী সদা প্রকৃতির গানে ॥
ফুকার—দেখি দিঘী সরোবরে কিবা শোভা করে,
নানা পুষ্পে সুশোভিত, হল সৌরভে সর্বত্র পূর্ণিত।
আকাশখানি সুকৌশলে, প্রতিফলিত মাঠের জলে,
কুমুদিনীর নিচে অর্ধচন্দ্র দোলে, মিলনে কি বিপরীত ॥

মিল—যেন আকাশ গিছে পাতালে, অস্থির সলিলে স্নান করে সকলে,
স্বর্গবাসী বুঝি মত্ত নর্তনে ॥
অন্তরা—শুনি প্রহরে প্রহরে, তরুগণ পরে, পাখিগণে করে সুমধুর রব।
মিলি যত বিহঙ্গিনী, দিতেছে হুলুধ্বনি,ঐ শুনি মায়ের অধিবাস উৎসব ॥
ছুটিছে তরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী বেগে, তর তর বেগে তটবাসী জাগে,
শরতের সমীরণ মাঝে মাঝে লেগে, বাঁকে বাঁকে তরঙ্গ ফাঁকে ফাঁকে নীরব ॥
পরচিতান—মায়ের শ্রীপাদপদ্ম পাব বলে, হাসিতেছে কত ফুল ॥
পাড়ন—হাসে সরোবরে সরোজিনী, বনে হাসে শেফালী বকুল ॥
ফুকার—যত পতিপ্রাণা সতী, ভুলে পতির প্রীতি,
পিতার ঘরে আসিল, এসে ভাই ভগ্নীতে মিশিল।
সবে মিলি সোহাগ ভরে, নূতন কাপড় যত্নে পরে,
আজ বটপত্রের ন্যায় সুখের সাগরে, জগৎ যেন ভাসিল ॥
মিল—এ সুখ বরণিতে না পারি, ওমা বিশ্বেশ্বরী গৌরী,
এ সুখের লহরী জাগায়ে দিতেছ সবার মনে ॥

## সপ্তমী — নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান—ষষ্ঠী হয় সমাপত, সপ্তমী আবির্ভূত, ব্রহ্মাণ্ডে মহা মহোৎসব।
পাড়ন—ভক্তিতে দণ্ডিতে করে চণ্ডী পাঠ, আরম্ভ হল দুর্গোৎসব ॥
ফুকার—বলে কই মা কই মা কই, উদয় ব্রহ্মময়ী,
গিরীন্দ্র ভবনে, উমার মায় অমনি তাই শুনে।
মেয়ে দেখতে ধেয়ে এল, মায়ে ঝিয়ে দেখা হল,
বলে মা তুই আছিস ত ভাল, মা ব'লে আছে কি মনে ॥
মিল—যদি কন্যা সুখে রয়, মায়ের মনে সুখোদয়,—
বলব কি মা দুঃখের বিষয়, মন পোড়াতে মরি পুড়ে।
মুখ—বল মা কি সুখে ঘর করিস, ভাঙড় ভিখারী জামাইর ঘরে ॥
ডাইনা—শুনতে পাই সব লোকের মুখে, শূন্য ঘরে তোকে রেখে,
জামাই দিগম্বর, সিদ্ধি খেয়ে পড়ে থাকে কুচনী নগর।
সদাশিবের ঘরে সদা, অন্নশূন্য শুনি অন্নদা,
ছেলেমেয়ের লাগলে ক্ষুধা, কে শুধায় মা ডেকে তোরে।
খাদ—অমন কেবা আছে আমার, পাঠাব আর কারে।
ফুকার—আমি অচলা রমণী, অচলা রূপিনী—
চলিতে সাধ্য নাই ; বল মা কিসে সে কৈলাসে যাই।
কোলের ছেলে দিয়ে জলে, মনাগুনে মরি জ্বলে,
পাষাণীর প্রাণ পাষাণ বলে, বেঁচে রয়েছি গো তাই ॥

অন্তরা—আগে জানলে জামাই পাগলের সন্তান।
তবে দিতাম কি আর কন্যাদান॥
সর্বনেশে নারদ এসে বলে, কয়ে ভুলাল সে।
বুড়ো রাজা হারায়ে দিশে, আমার বিশেষ মেয়ে প্রাণ॥
পরচিতান—জামাই মোর ত্রিপুরারি, ত্রিপুরের অধিকারী,
ত্রিপুরের বাসনা পুরায়।
পাড়ন—কোন দোষ নাই জামাইর আমার আশুতোষ।
অসন্তোষ তোমায় আর আমায়॥
ফুকার—একদিন বলেছিল গিরি, মা তুই কাশীশ্বরী,
জামাই তোর কাশীশ্বর; প্রজা ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর।
ছেলের নামটি সিদ্ধিদাতা, কল্যাণী কমলার মাতা,
অন্নদা তুই অন্নদাতা, অন্নশূন্য কেন তোর॥

## ভোরগোষ্ঠ কারুণ্য বা বিলাপ

[ভোর গানে প্রভাত বর্ণনা, অন্ধকার অবসানে আলোর আবির্ভাব, দুঃখান্তে সুখোদয়ের আশা প্রকাশ পায়। গোষ্ঠ গানে প্রভাতকালে রাখাল বালকগণের সাজ-সজ্জা গোচারণযাত্রা এবং অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের উদ্বেগ মুখ্য বিষয়। কারুণ্য বিষয়ক গানে বিচ্ছেদ বেদনার হাহাকার ও আর্তনাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। এ সকল শ্রেণীর গানে করুণ রসের আধিক্য। গানগুলি শ্রবণানন্দের জন্যই সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া হতো এবং এগুলির কোন জবাব করা হতো না।]

### স্বদেশী ভোর — হরিচরণ আচার্য

চিতান—গেল ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায়।
পাড়ন—ঘোর বিলাসী শশী, শশী মুখে মেখে মসী,
নিশি অন্তে অস্তাচলে যায়॥
ফুকার—ঊষা ভক্তি নবশক্তি ভারতে উদিল, অসার আমোদ কুমুদ মুদিল।
ছুটল জ্ঞান-সরোজের কি সুগন্ধ, উঠল সূর্য সদানন্দ,
যত ভারতের পাপ পেচক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা লুকাল॥
মিল—তোমরা জন্মেছ স্বর্গতুল্য ভারতভূমে—
কুম্ভকর্ণের ন্যায় এত ঘুমে, বল কত রবে।
মুখ—জাগ ভারতবাসী, স্মরণ কর আর্য ঋষি, কার্যক্ষেত্রে চল সবে॥

ডাইনা—ব্রাহ্মমুহূর্তে ভ্রাতৃবর্গ শিখ ধ্যানের নিয়ম,
জপ অন্তরে মূল মন্ত্র—বন্দে মাতরম্,
ফুল তুলে নানা জাতি, জ্বাল ধূপ ঘৃতের বাতি,
ভারতমাতার মঙ্গল আরতি, কর ভক্তিভাবে।
খাদ—যত কর্মী সব কর্ম কর, ধর্ম লোভে ॥
ফুকার—পড় ছাত্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড় স্মৃতি বেদ,
ছাড় অন্য বিদ্যা অসার ক্লেদ।
ছাড় এণ্টান্স এফ, এ, বি, এ, এম, এ, প্রণাম দাও গোলামীর নামে,
আছে গীতা ভাগবত ভারতভূমে, জ্যোতির্বেদের অঙ্গ আয়ুর্বেদ ॥
মিল—কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ কর—
সংস্কৃত টোল অলঙ্কৃত কর অকৈতবে ॥
অন্তরা—জাগ পৃথিবীর যত বীর, স্থির কর নন্-কোপারেশন।
প্রাতঃস্নান করে, দেশী বস্ত্র পরে, পবিত্র কর অন্তঃকরণ ॥
ভোরে পড় নিতাই গৌরাঙ্গ চরিত—
কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করল দেশের হিত,
যৌবনে যোগিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী, স্মর সেসব কুললক্ষ্মীগণ ॥
পরচিতান—ছাড় অলসতা, বিলাসিতা উঠ ভ্রাতৃগণ।
পাড়ন—মাতৃস্নেহ পাবে, কর্ম কর ধর্ম ভেবে,
আর কতকাল রবে অচেতন ॥
ফুকার—ছাড হিংসা দ্বেষ, জাগাও নিজের দেশ,
দেশের দেশীগণ; হবে দুর্দিনের পরিবর্তন।
ছেড়ে প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা, সত্য ধর্মে রাখ নিষ্ঠা,
কিন্তু সকল ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম নাম সংকীর্তন ॥
মিল—পাবে সদাত্মা মহাত্মাদের সৎ সাহায্য,—
অসার ভোগ করে ত্যজ্য, ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চল সবে ॥

## রাধাশ্যামের মিলন ভোর — হরিচরণ আচার্য

চিতান—মনের আনন্দে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে রাইশ্যামের মিলন।
পাড়ন—নিদ্রার অলসে আবেশে, সুমধুর প্রেমরসে,
ভুজপাশে দু'জনার বন্ধন ॥
১ম ফুকার—নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা যায়, ফুলের মনোহর শয্যায়,
রতিপতি পতিত লজ্জায়।
নিশি সুপ্রভাতের সময় হেরি, তমাল ডালে সারি সারি,
সুখে বসে শুক-শারী, জয় জয় রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় ॥

মিল—তখন রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ মনোরঙ্গে—
রাধা ত্রিভঙ্গের নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করিল।
মুখ—গাত্র তোল ধনি, নেত্র মেল গুণমণি, গেল যামিনী
ঐ দিনমণি প্রকাশিল ॥
ডাইনা—শশী নিশির মন লুটিয়ে, প্রভাতে উঠিয়ে গেল,
সময় বুঝে নিশি গেল ;
তারা সব মনের বেগে, যায় সংসার অনুরাগে,
ঊষা সুন্দরী আপনি জেগে, জগৎ জাগাইল।
খাদ—হল অসময় আর কি সুখের সময় রইল ॥
২য় ফুকার—ফুটিল সরোবরে কমল ফুল, হয়ে সৌরভে আকুল,
গৌরবেতে ভ্রমে অলিকুল।
ঐ যে বনে বনে বহু বহু, কোকিল এসে মুহুর্মুহু,
কেহ করে কুহু কুহু, আবার কেহ করে সুখে কুল কুল কুল ॥
মিল—যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে ব্যবসা করে—
তারা প্রেয়সীর করে ধরে, ঊষা যাত্রা করিল ॥
অন্তরা—পাতার অগ্রে নিশির শিশিরে, সুধীর সমীরে,—
যেন সোহাগ নাসিকায় মুক্তা লড়ে।
কোন কোন পাতা হতে বাতাসে, শিশির পড়িয়ে ধরণী ভাসে,
বিরহিনী যেন যামিনীর শেষে,—
পতি নাই দেশে, নয়ন জল ঝরে ॥
পরচিতান—দেখ পূর্বাকাশ তরুণ অরুণ কিরণ আভায়, শোভে কি শোভায়।
পাড়ন—ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধুগণে, ইষ্ট নাম স্মরণে,
স্থির মনে প্রাতঃস্নানে যায় ॥
৩য় ফুকার—নিশির শেষ শীতল বাতাস আসিল, সবার চিত্ত তোষিল,
ঈষৎ শীতের অংশ পশিল।
যারা মান করিয়ে পতির দোষে, শুয়েছিল শয্যা পাশে,
সে সময়ে তারা এসে, আপন পতির বুকে মিশিল ॥
মিল—মঙ্গল আরতি দিবার তরে,
যোগী ঋষি দেবালয়েতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল ॥

## বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভোর — হরিচরণ আচার্য

চিতান—সুখ শয্যাতে ভার্যা সঙ্গে সুপালঙ্কে ছিলেন গৌরাঙ্গ
পাড়ন—হায় হায় না হতে নিশি ভোর, না হতে শশী ঘোর,
সোনার গৌর, করলেন ন'দে লীলা সাঙ্গ ॥

ফুকার—উঠিল ভাস্কর ফুটিল পুষ্কর, শর্বরী প্রভাত,
হল এ প্রভাত কি কুপ্রভাত।
হায়, শূন্য শয্যা নিরখিয়ে, পালঙ্কেতে হস্ত দিয়ে,
কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ে, মন্দিরে নাই আমার প্রাণনাথ ॥
মিল—মনের দুঃখেতে বিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়া জ্বলে,—
উষা সুন্দরীর প্রতি বলে, ভেসে চক্ষের নীরে।
মুখ—উষা বল বল, তুমি কি দেখেছ বল,—
আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল, এত নিশি ভোরে ॥
ডাইনা—হলে অন্য দিন নিশি ভোর, সুমধুর ভোরের সুর আলাপনে,
প্রভু যেত প্রাতঃস্নানে।
আজ কেন এমন দেখি, নাচিছে দক্ষিণ আঁখি,
আমার হৃদয় পিঞ্জরের পাখি, বুঝি গেছে উড়ে।
খাদ—শিরে বজ্রাঘাত দুঃখের কথা বলব কাবে ॥
ফুকার—কত সোহাগে কি অনুরাগে গত নিশিতে,
প্রভু এ দাসীর মন তুষিতে ;
হায়, করে কত রসিকতা,
খেয়ে এই অবলার মাথা,
দিয়ে গেল তৈল সলিতা, প্রদীপ নির্বাণ কালেতে ॥
মিল—আমার বুকে শেল দিয়ে গেল প্রাণপতি,
ভাগ্যবতী লক্ষ্মী সতী সর্পাঘাতে মরে ॥
অন্তরা—আঁধাব নবদ্বীপ প্রদীপ শূন্য হল হায়।
মরি হায় হাঃ, আমি বাতাহতা লতা, স্থান পাব কার পায় ॥
প্রতিদিন কোকিলে কবে কুহু কুহু,
আজ কেন প্রভাতে করে উহু উহু ; মুহুর্মুহু শুনা যায়।
ও সেই ভ্রমরের গুন্ গুন্, কৃষ্ণ গুণাগুণ,
আগুন আগুন বলে, আগুন দিচ্ছে গায় ॥
পরচিতান—আমি জ্বালিয়ে মোমের বাতি,
ইতি উতি করলেম অন্বেষণ।
পাড়ন—খুঁজে পেলেম না প্রাণনাথ, উঠিল দিননাথ,
বাজের অঘাত বাজে, আমার শিরে যেমন ॥
ফুকার—কত জন্মেতে কত কর্মেতে করেছিলেম পাপ,
দিল কোন সতী কি অভিশাপ ;
হায়, এ নব যৌবনের কালে, পতি গেল সতী ফেলে,
পতিতপাবন পতি বলে, আমি গঙ্গাজলে দিব ঝাঁপ ॥

## গোষ্ঠ

**হরিচরণ আচার্য**

চিতান—নিশি প্রভাতকালে, ব্রজের সব রাখালে নন্দালয়ে যায়।
পাড়ন—তখন নিয়ে নন্দরানী, কোলে রতনমণি,
অঞ্চলে মুছাইয়া চাঁদবদনখানি, যতনে গোপালকে সাজায় ॥
ফুকার—শোভে শিরে চূড়া করে বেণু, কর্ণেতে কুণ্ডল,
কিবে অলকা তিলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল।
নাচে চতুর্দিকে সব রাখালে, কানাই বলাই মধ্যস্থলে,
নৃত্য করে হেলে দুলে, যেমন শ্বেতকমল আর নীলকমল ॥
মিল—দেখে নন্দালয়ে এ উৎসব, শচীকে কয় বাসব,—
শচী দেখ ঐ নন্দের বৈভব, হল কি ভাবেতে।
মুখ—ধন্য ব্রজের সম্পদ, তুচ্ছ আমার এই ইন্দ্রত্ব পদ,
এই নন্দের সাক্ষাতে ॥
ডাইনা—দেখ গোলোকের ব্রহ্ম গোপাল, এ গোকুলে,—
করে গোপনে গোপের ঘরে, মধুর বাল্যলীলে।
ধন্য সব গোপের রমণী, রমণীর শিরোমণি,
নন্দরানী দেয় ক্ষীরননী, কৃষ্ণের চাঁদ মুখেতে।
খাদ—এ নন্দের কি মহাভাগ্য, দেখ ত্রিজগতে ॥
ফুকার—হল ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য কিবে পুণ্যবল,—
ধন্য শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম শ্রীমধুমঙ্গল।
রাখাল কথা বলে হা রে রে রে, সখ্যভাবে খেলা করে,
কাঁধে করে, কাঁধে চড়ে, তারে খেতে দেয় উচ্ছিষ্ট ফল ॥
মিল—যারে ব্রহ্মা মহেশ্বর পেল না ধ্যান করে,—
সে ত আনন্দে নৃত্য করে, নন্দের আঙ্গিনাতে ॥
অন্তরা—ধন্য নন্দ উপানন্দ কি আনন্দ নন্দালয়।
ধন্য ধবলী কবলী, সেউলী শ্যামলী, কালী কমলী ধেনুচয় ॥
ব্রহ্মা যারে ব্রহ্ম ভাবে, ভক্তবৎসল ভক্তিভাবে—
রস পেয়ে বাৎসল্যভাবে, নন্দের বাধা মাথায় লয় ॥
পরচিতান—ধন্য সব গোপকুল, ধন্য ধন্য গোকুল, ধন্য নন্দগ্রাম।
পাড়ন—ধন্য ধন্য কালিন্দী তট, অহিংসা অকপট, ধন্য যাবট,
ধন্য বংশীবট, যমুনার নিকট মধুর ধাম ॥
ফুকার—ধন্য তপন তনয়ার তীরে গিরি গোবর্ধন,
ধন্য তাল তমাল শাল রসাল বকুল, মধু নিধুবন।
কৃষ্ণ কটিতে কইয়ে কাছনী, করেতে ধইরে পাচনী,
যশোদার নীলকান্তমণি, করে বনে বনে গোচারণ ॥

## লক্ষ্মণ বর্জন বিলাপ — হরিচরণ আচার্য

চিতান—সুখের রামলীলা ভঙ্গ করতে অযোধ্যাতে কালপুরুষ আগমন।
পাড়ন—শ্রীরাম দায় ঠেকে সত্যের তরে, করলেন লক্ষ্মণ বর্জন॥

ফুকার—লক্ষ্মণ রামের পায়, প্রণাম করে যায়, হায় রে—
করে সপ্ত প্রদক্ষিণ, বলে আমি অতি দীনহীন।
হায়রে, বামে নিয়ে জানকী, জানকীনাথ একবার দাঁড়াও দেখি,
জন্মের দেখা চক্ষে দেখি, আজ আমার সেই শেষের দিন॥

মিল—শ্রীরাম লক্ষ্মণের ভাব দেখে কয় ব্যাকুল মনে,
লক্ষ্মণ তুই বিনে এত দিনে, হলেম প্রাণে হত।

মুখ—লক্ষ্মণ তোরে হয়ে হারা, প্রাণে যায় না ধৈর্য ধরা,
হলেম জীয়ন্তে মরা, দুঃখ বলত কত॥

ডাইনা—ও তুই আমার প্রাণের দোসর, ছিলিরে নিরন্তর, কাছে কাছে,
লক্ষ্মণ তুই গেলে রে আমার যেতে হবে, ও তোর পাছে পাছে।
আয় তোরে ধরি বুকে, দাদা বল ও চাঁদমুখে,
একবার রাম-লক্ষ্মণ দেখুক লোকে, এ জনমের মত।
খাদ—আমার যত দুঃখরে, ফাটে বুক হলেম জীবন্মৃত॥
ফুকার—ও তোর মত ভাই, আমি কোথা পাই,
ভাইরে যখন গেলেম বনবাস; ছিল তোর গুণে বন স্বর্গবাস।
ভাইরে, ছায়ার মত সঙ্গে থাকে, এমন ভাই আর নাই ত্রিলোকে,
কার জন্য ভাই কার ভাই থাকে, চৌদ্দ বৎসর উপবাস॥

মিল—ভাইরে সংসারে যার অন্তরে ভাইয়ের ব্যথা,
জীয়ন মরণ তার সমান কথা, এই সর্বসম্মত॥

অন্তরা—আমার জন্মাবধি দুঃখের কপাল, সুখ আর হইল না।
সোনার অযোধ্যার আকার হল ছারখার,—
ভাইরে চাঁদের বাজার আর রইল না॥
তিলেক দাঁড়াও ভাই, তাপিত প্রাণ জুড়াই,
যাই যাই আর বইলো না।
লোকের স্ত্রীপুত্র মরিলে, প্রাণ থাকিলে মিলে,—
প্রাণের ভাই মইলে আর মিলে না॥

পরচিতান—সীতা গিয়েছে পাতালপুরে, আমায় ছেড়ে, করে এই সর্বনাশ।
পাড়ন—এখন তুই গেলি উপেক্ষিয়ে, কার মুখ চেয়ে, করব এ গৃহবাস॥

ফুকার—হয়ে জ্যেষ্ঠ ভাই এত কষ্ট পাই, ভাইরে বুকে রইল ভাইয়ের শোক,
আমি দুঃখের উপর পেলেম দুখ।
ভাইরে যদি তোর কনিষ্ঠ হতেম, তোরে রেখে আমি মরে যেতেম,
তবে তোরে দেখাইতেম, দাদা হওয়া কত সুখ ॥

## গোষ্ঠ

অম্বিকা সরকার

চিতান—গোকুল পরিহরি, নন্দের দুলাল হরি, যাবেন মথুরাতে।
পাড়ন—পিতামাতার কাছে বিদায় হয়ে শ্যাম দয়াময়,
শেষে যায় রাধার কুঞ্জেতে ॥
ফুকার—কৃষ্ণ ধরে রাধার কোমল করে, কেঁদে বলে ধীরে ধীরে,
যাব কংসের যজ্ঞেতে,
খুড়া অক্রুর আমায় এসেছে নিতে। হায় হায় রে—
আছে শ্রীদামের শাপ গোলোকধামে, থাকতে নারি আমি কোনক্রমে,
মজে আমার কৃষ্ণপ্রেমে, প্রিয়ে সুখ হল না তোমার ভাগ্যেতে ॥
মিল—লীলা সাঙ্গ হল, মধুর প্রেম ভাঙ্গিল,—
বদন তোল রাই,—কথা বল মধুর স্বরে।
মুখ—প্রিয়ে বিদায় দেও, বিদায় হতে এসেছি, চলেছি সেই মধুপুরে ॥
ডাইনা—তুমি শোন গো শ্রীরাধিকা, এই হল জন্মের দেখা,
ফিরে হয় কি না হয়,
আমার শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখে গেলাম, তোমার ঐ রাঙা পায় ;
রৈয়াছি খতের দেনা, এ জন্মে তা শোধ হল না,
তুমি তাই বলে পায় ঠেল না, এ দাসেরে।
খাদ—তোমার খতের দেনা শোধ করব রাই জন্মান্তরে ॥
ফুকার—তোমার খতের দেনা শোধ করিতে, যাব আমি নদীয়াতে,
হব গৌর অবতার, তখন তুমি আমার কইরো উপকার।
আমার দাদা বলাই নিতাই হবে, তুমি মধুর প্রেম বিলাবে,
হরিনাম প্রেমের প্রভাবে, যেন কলির জীব সব হয় উদ্ধার ॥
মিল—হব দণ্ডধারী, গৌর মূর্তি ধরি, হব ভিখারী—
ভিক্ষা করব ঘরে ঘরে ॥
অন্তরা—এই ভিক্ষা চাই, প্রেমময়ী রাই, মুক্তি যেন পাই, প্রেম দেনা হতে।
আমি চাঁচর কেশ মুড়াব, বেহাল বেশ ধরিব,
সদা কাঙালের মতো কাঁদব, পথে পথে ॥
রা রা শব্দ কেবল বলব রসনায়, ধা বলতে পারব না পড়িব ধূলায়,
আমায় দয়া করে তুমি সে সময়, দিও পদাশ্রয়, নিও কোলেতে ॥

বাঁশী ত্যজে করে নিব করঙ্গ, মেতে করব প্রেমতরঙ্গ,
থাকি যেন সদা সাধু সঙ্গেতে ॥

পরচিতান—তুমি দীক্ষাগুরু, তুমি শিক্ষাগুরু, তুমি প্রেম মহাজন।

পাড়ন—আমার প্রতি রাই অনিবার, যে দয়া হয় তোমার,
ভুলতে আর পারব না কখন ॥

ফুকার—প্রিয়ে আমি যাব মথুরাতে, আমার মাকে মা বলিতে,
ব্রজেতে আর লক্ষ্য নাই, আগে তোমার কাছে বলে রাখি রাই।
আমার মা যখনে গোপাল বলে, কাঁদবে ননী করে তুলে,
তখন আমার মায়ের কোলে, তুমি মা বোল বলে গিয়ে বইস রাই ॥

## শ্রীরাধার ভোর

অম্বিকা পাটনী

চিতান—প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে, জাগিয়ে শর্বরী।

পাড়ন—নিশি প্রভাতকালে, ধরে সখীর গলে,
বলে রাই রাজার কুমারী ॥

ফুকার—সখীরে, আমি কাইল নিশিতে শুনলেম বাঁশীর স্বর,
কুঞ্জে আসবেন কুঞ্জেস্বর।
বাঁশীতে হয়ে উদাসী, নিশিতে নিকুঞ্জে আসি,
কুসুম তুলে রাশি রাশি, আসার আশে সাজালেম বাসর ॥

মিল—আর কি প্রাণবন্ধু আসার আশা আছে,—
ঐ শান ঊষাচর গাছে গাছে, গাহিছে বিহঙ্গ।

মুখ—নিশি গেল গেল, কুঞ্জে নাহি এল, বাঁকা ত্রিভঙ্গ ॥

ডাইনা—যুগল আঁখি কয় দেখি, শ্যামের রূপের শোভা,
যুগল হস্তে চায় করতে যুগল চরণ সেবা।
পান করতে অধর সুধা, অধরের ধরে ক্ষুধা,
আমার অঙ্গে চায় করতে সদা, কৃষ্ণ সঙ্গ।

খাদ—বিনে সে সঙ্গ, অনঙ্গে মাতিল অঙ্গ ॥

ফুকার—সখীরে, আমি কুল কলঙ্ক ঠেলিয়ে দুই পায়,
মনে ভেবে সদুপায়।
তুচ্ছ করে লোকলজ্জা, করেছিলেম বাসর সজ্জা,
কিশোর বিনে আশার শয্যা, হল যেন শরশয্যার প্রায় ॥

অন্তরা—সখী কই এলো, কই এলো কালা।
পোহাল নিশি, হায় হায়, বাসী হল দাসীর কুসুমের মালা ॥

আমার মতো সইরে ঐ কুমুদিনী, প্রাণকান্ত বিহনে বিরসে মুদিনী,
পূর্বাচলে উদয় হল দিনমণি, দেখে আমোদিনী সরোজবালা ॥
পরচিতান—সখী, বিধি কি লিখেছিল এত দুঃখের অঙ্ক।
পাড়ন—মজে কালার প্রেমে, এই ব্রজধামে,
ফল পেলেম কৃষ্ণ কলঙ্ক ॥
ফুকার—সখীরে, আমরা কৃষ্ণ সেবায় হয়ে অনুকূল,—
তুললেম নানা জাতি ফুল।
চন্দনে চর্চিত করি, রেখেছিলেম যত্ন করি,
বিহনে সে ফুলবিহারী, ফুল হল সই জীবন বধের মূল।

## তরণী বধ বিলাপ — অম্বিকা পাটনী

চিতান—রণে শ্রীরামের শরাসনে, ধরাসনে তরণী হইল পতন।
পাড়ন—কাটা মুণ্ডেতে অবিরাম, জপিয়ে জয় রাম রাম।
আত্মারাম নিত্যধামে করে গমন ॥
ফুকার—তখন কাটা মুণ্ড করে ক'রে, মুহুমুর্হু উচ্চস্বরে কাঁদে বিভীষণ,
পুত্রশোকের শাসন কি ভীষণ,—হায় রে—
বক্ষে ধরে ধরণীকে, কেঁদে বলে তরণীকে,
কোন্ পরাণে হান্‌লি বুকে, দারুণ পুত্রশোকের শরাসন ॥
মিল—কোথায় শুনেছিস পুত্র মরে পিতার আগে,—
আমার সেই দুঃখ প্রাণে জাগে,—নাইরে বিরাম।
মুখ—রাম পদ করে তরণী, গেলি রে জীবন তরণী,
ত্যজ্য করে ধরণী ধাম ॥
ডাইনা—আমায় বলরে কে তুই বিনে, চন্দ্রবদনে ডাকবে পিতা,
তোর মতো ধন পাব কোথা।
তুই বিনে অন্তকালে, কে নিবে অন্তর্জলে,
বলরে কে দিবে কর্ণমূলে, তারকব্রহ্ম রাম নাম।
খাদ—বুঝি জন্মের তরে, জীবন তরণীরে, তোরে হারালাম ॥
অন্তরা—আমি কিক্ষণে আজ রামের সনে, রণে এসেছিলাম।
বুঝি এ জীবনের তরে, জীবন তরণীরে, হাতে ধরে বিসর্জিলাম ॥
আমি কি বাদ সাধিলাম, পরিচয় না দিলাম, শুধাইলেন যখন রাম।
আমায় বলেছিল মিত্র, আজি কার এ পুত্র, করিতে এলো সংগ্রাম ॥
আমার আপনা কপাল আপনি খেলাম, কি বাদ সাধিলাম।
আগে না জানিয়ে হায়, অগ্নি শিখায়, পতঙ্গেরই প্রায়,
স্ব-ইচ্ছায় ঝাঁপ দিলাম ॥

পরচিতান—সোনার চাঁদ তোরে বিদায় দিয়ে, কি ধন নিয়ে,
কি সুখে রব ভবনে।
পাড়ন—কেন মোর প্রতি ভগবান, হল না কৃপাবান,
গেল না পোড়া প্রাণ, পুত্রের সনে ॥
ফুকার—যখন রামের বাণে কাটে মাথা, আমি হয়ে মুক্তিদাতা,
করলেম মুক্তি দান – বধো বৈষ্ণব বাণে ভগবান। হায় রে—
পিতা হয়ে পুত্র মারতে, রামকে বললেম অস্ত্র ধরতে,
আমার মতো স্বর্গে মর্ত্যে, কে আছে এমন পাষাণ ॥

ভোর — হরিচরণ সরকার

চিতান—নিত্য নিকুঞ্জে কুঞ্জেশ্বরী, সুখ শর্বরীতে।
পাড়ন—প্রেমের পিপাসাতে, শ্যাম আসার আশাতে,
ফুল শয্যা করলেন কুঞ্জেতে ॥
ফুকার—সেঁউতি যুথি গোলাপ মালতী বনফুলের অভাব নাই,
ফুলের সৌরভে, মনের গৌরবে, ভ্রমে অলিগণ সবাই ; হায়—
চন্দনে চর্চিত করে, কৃষ্ণচন্দ্র সেবার তরে
চন্দন মেখে চন্দ্রাধরে, অমনি বসলেন চন্দ্রমুখী রাই ॥
মিল—প্যারী শর্বরী দেখে অন্ত নিরানন্দে,
বলে ললিতায় কেন্দে কেন্দে, বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ।
মুখ—নিশি পোহাল ঐ, কুঞ্জে এল না সই, আজ হল মোর আশা ভঙ্গ।
ডাইনা—কৃষ্ণ সেবার ফুল হল বাসী সুপ্রভাতে,
এ ফুল কারে দেব, যাব আমি যমুনাতে,
যমুনার কূলে গিয়ে, যুগল আঁখি মুদিয়ে,
কৃষ্ণরূপ হৃদে ক'রে ধ্যান—সই গো কৃষ্ণরূপ
আমি বাসী ফুল কবে নিয়ে, কৃষ্ণ উদ্দেশে দিয়ে, ত্যজিব এ পাপ পরাণ,
আমি ত্যজিব ত্যজিব, আমার কানু উপেক্ষিত তনু—
আমার এ জীবনে ফল কি বল,
জীবন বিসর্জন দিয়ে করব প্রেমের ব্রত সাঙ্গ।
খাদ—সখী অনঙ্গ দহে অঙ্গ বিনে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥
ফুকার—মনেরই সাধে কুসুম শ্যামপদে, দিতে ছিল বাসনা,
নিশি সুপ্রভাত উদয় দিননাথ, প্রাণের বন্ধু এল না ; হায়—
পেলেম না মনোরঞ্জনে, দিলেম না ফুল শ্রীচরণে,
মনের আশা রইল মনে, আমার কৃষ্ণসেবা হল না ॥

অন্তরা—কোথা রইল সে পরাণ সখা।
প্রাণ সখী গো, আছে হৃদয়ে তাহার ঐ ছবিটি আঁকা।
শিশির ভারেতে শাখী নতশির, মুকুল প্রস্ফুটিত হল অতসীর,
বন্ধুর বিরহে শিহরে শরীর, তারে জীবন থাকিতে আনিয়ে দেখা ॥
পরচিতান—ছিলেম যে আশায় পাতকিনী চাতকিনীর মতো।
পাড়ন—দুরাশা ফুরায় না; জ্বালা ত জুড়ায় না, প্রাণ হল কন্ঠাগত ॥
ফুকার—বিনে সে বাঁকায় করি সেবা কায়, কিসে পোড়া প্রাণ জুড়ায়;
ঘরে ননদি, প্রেমের বিবাদী, আমি স্থান পাব কার পায়। হায়—
করেছিলেম আশা ব্রত, শ্যাম বিনে সব হল হত,
ফুলের গন্ধ শূলের মতো, সখী বিঁধে আমার নাসিকায় ॥

## নন্দরানীর স্বপ্ন গোষ্ঠ — হরিচরণ সরকার

চিতান—দেখে স্বপনে গোপালেরে নন্দরানী।
পাড়ন—অমনি জেগে নিশি ভোরে, ধরে নন্দের করে, বলে কাতর বাণী ॥
ফুকার—আমার প্রাণ গোপাল এসেছিল, মা বোল বলে ডাকিল,
কাছে বসিল, ক্ষীর সর চাইল; হায় হায় হায়—
যার দুঃখেতে চক্ষে ধারা, ধরতে গেলে না দেয় ধরা,
অমনি দেখতে দেখতে মাখম চোরা, আমার কোথায় লুকাল ॥
মিল—আমার কোন পাপে এত কষ্ট প্রাণকান্ত,
ভ্রান্ত প্রাণ ত মানে না শান্ত, প্রাণের গোপাল বিনে।
মুখ—বল হে নন্দ মহারাজ, সেই রাখালরাজ, আসবে কি আর বৃন্দাবনে।
ডাইনা—আমার যে হতে ছেড়ে গেছে বংশীধারী,
হায় হায় বৃন্দাবন শান্তির ধাম, বিনে সে কৃষ্ণ রাম, সকল শূন্য হেরি,
বিনে মোর কেলেসোনা, কে খাবে মাখন ছানা,
দারুণ পুত্রশোকের যাতনা, আর ত সয় না প্রাণে।
খাদ—আর কিগো প্রাণ পাব, প্রাণ জুড়াব কত দিনে ॥
ফুকার—আমার বিনে ব্রজে রাম কানাই, বক্ষ জুড়াই লক্ষ্য নাই.
বাঁচি কেমনে, সহে না প্রাণে, হায় হায় হায়—
কান্না করি অহরহ, মা বলে শুধায় না কেহ,
হায় হায় মা বিনে আর পুত্রস্নেহ, ভবে অন্যে কি জানে ॥
মিল—যখন গোপালেরে মনে পড়ে জ্বলে মর্ম,
আমার কিসের বা গৃহকর্ম, ধারা বয় নয়নে।
অন্তরা—আর কি হবে সে আনন্দ, শ্রীনন্দ ভবন।
হায় শ্রীদাম সুদাম, সুবল বসুদাম সবার নিরানন্দ মন ॥

আর কি বেণুর নিনাদে, মনের আহ্লাদে ধেনু করে বিচরণ।
আমার বিনে প্রাণ গোপাল, নিয়ে সব গোপাল, কে করিবে গোচারণ।
আর ত তাথৈ তাথৈ রবে, রাখালবৃন্দ সবে, করে না নর্তন কীর্তন ॥
পরচীতান—আমি পেয়ে ধন হারাইলেম কর্ম দোষে।
পাড়ন—আমার মিছার এ ছার জীবন, বিনে সে জীবন ধন, জীবন বাঁচে কিসে ॥
ফুকার—যখন চাইত গোপাল দে মা সর, বলতেম বাছা সর সর সর,
নাই রে সর, বক্ষে দুঃখের শর ; হায় হায় হায়—
এক কড়ার নবনীর তরে, বেন্ধেছিলেম বাছার করে করে,
আমার সেসব কথা মনে পড়ে, হায় হায় যেন মৃত্যুর শর ॥

## ভোর — রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—কুসুম শয্যাতে নিদ্রাবেশে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ে।
পাড়ন—নিশি প্রভাতকালে, পাখি ডাকে গাছের ডালে,
জাগিল বিষ্ণুপ্রিয়ে, সে ধ্বনি শুনিয়ে ॥
ফুকার—অমনি নাথের সঙ্গ ভঙ্গ জেনে, চঞ্চলে অচল,—
করে আঁখি দুটি ছল ছল। হায়—
বসে কুসুমশয্যা পরে, চন্দ্রবদন নেহার করে,
যুগল চরণ বক্ষে ধরে, ঝরে ঝর্ ঝর্ নয়নজল ॥
মিল—তখন এই দৃশ্য কাঞ্চনমালা নিরখিয়ে,
প্রেমে উন্মত্তা হয়ে, বলে উচ্চৈস্বরে।
মুখ—তোরা দেখসে আয়, গৌর পায় কি শোভা পায়,
প্রিয়ার হিয়ার পরে ॥
ডাইনা—যেন সুন্দর সব কুসুমের সুষমা হেরি,
বড় ভালবেসে পদে স্হান দিয়েছে হরি ;
সৌন্দর্যহীন ফুলে থেকে, মাধুর্য সব মনোদুখে,
বুঝি স্থান নিল প্রিয়ার বুকে, ও পদ পাবার তরে।
খাদ—দেখিলে রূপের আভা, প্রভা লুকায় প্রভাকরে ॥
ফুকার—দেবীর যেমনি বক্ষ, শ্রীগৌরাঙ্গের তেমনি পদকমল,
শুধু পরিপূর্ণ পরিমল, হায়—
যেন প্রেম সরোসির রসে, অমল কমল বিমল হাসে,
নয়ন ভ্রমর বসলে এসে, সে ঐ রসে মিশে হয় অচল ॥
মিল—আমরা শুনেছি কুঞ্জ কানন মিলন মাধুরী,—
বুঝি সেই কিশোরা কিশোরী, এল ন'দেপুরে ॥

অন্তরা—গোরার নখরে প্রতিফলিত, বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ সুধাকর।
ঐ দেখ চাঁদের মাঝে চাঁদ বিরাজে, চাঁদ জিনিয়ে কর॥
চাঁদ ভেঙ্গে বিধি গড়িয়া দর্পণ, প্রভুর পাদপদ্মে করিছে অর্পণ,
তাহাতে নয়ন সলিলে তর্পণ, প্রিয়া করে কি সুন্দর॥
পরচিতান—ধনির অন্তরে বাহিরে বিহরে ও রূপরাশি।
পাড়ন—ধনির নয়নমণি, তার মধ্যে ওই গৌরমণি, মণিময় হারে—
আহারে কি গৌরশশী॥
ফুকার—ও রূপ রসসিন্ধু মাঝে, যে জন ডুবায়েছে প্রাণ,
ক'রে দিবানিশি রূপের ধ্যান ; হায়—
দূরে হতে রূপ যায় না দেখা, মহাজ্যোতি অঙ্গে মাখা,
জ্যোতির আড়ে স্বরূপ ঢাকা, তাইতে দূরে হতে হয় জ্যোতি জ্ঞান॥
মিল—অধম রাজেন্দ্রের এই প্রার্থনা হরি গুরুর পদে,
যেন গৌর রূপ জাগে হৃদে, জন্ম জন্মান্তরে॥

## কৃষ্ণের গোষ্ঠখেলা রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—গোপাল বলে সব রাখালে নিশি ভোরে করে গাত্রোত্থান।
পাড়ন—শীঘ্র সেবা করে বাল্যভোগ, করবে বলে শুভযোগ,
নন্দালয়ে আনন্দে আগুয়ান॥
ফুকার—সবার করেতে পাচনী নড়ী, খুলে বৃষ গাভীর দড়ি,
ত্বরিতে গো-পাল তাড়ায়, গো-পাল গোপাল না দেখে দাঁড়ায় ;
যশোমতী ব্যস্ত হয়ে, ধরা চূড়া মোহনবাঁশী দিয়ে,
মোহন সাজে সাজাইয়ে, গোলোকনাথেরে গোষ্ঠে পাঠায়॥
মিল—যাত্রাকালে বাজিল গোপালের মোহনবাঁশরী,—
শুনে যশোদার চক্ষে বারি, বলে সকাতরে।
মুখ—বলাই বলি রে শোন, নিয়ে গোপাল আদরের ধন,—
যাস্‌নে গহন বনান্তরে॥
ডাইনা—আমার একমাত্র গোপাল, তাতে আরো দুধের ছেলে,
ক্ষীর সর নবনী মুখে দিবি, বাছার ক্ষুধা হলে,
আর যেন গোপাল মোটে, উচ্চবৃক্ষে না উঠে,
যেতে দিস্‌না যমুনার তটে, আমার মাথার কিরে।
খাদ—তোরা কেউ বুঝিসনে, মায়ের প্রাণ যে কেমন করে॥

ফুকার—আমি গোপালেরে দিয়ে বনে, শূন্য গৃহে ক্ষুণ্ণ মনে,
ভাবি যে কি কত ছাই, পাগলিনীর মত পথে চাই ;
গোপাল হলে চক্ষের অন্তর, দণ্ডে জ্ঞান হয় যেন যুগযুগান্তর,
কত মায়ায় মায়ের অন্তর, বিধি গড়েছিল ভাবি তাই ॥
মিল—আমার গোপাল করিলে বনে মোহনবংশী ধ্বনি,—
আমি তাই যেন কানে শুনি, একা থেকে ঘরে ॥
অন্তরা—তোরা বনফুলের মালা গেঁথে দিস গোপালের গলে।
ওকে খেলায়ে ভুলায়ে রাখিস, যায় না যেন জলে ॥
বনে স্থলপদ্ম আর রাধাপদ্ম ফুটেছে কত স্থলে।
ওকে তুলে তুলে দিস সকলে, যখনে যা বলে ॥
গোপাল ফুল যে বড় ভালবাসে, ফুল দিলে ভুলে।
উহার অদম্য উৎসাহ বাড়ে, কদম্ব হেরিলে ॥
পরচিতান—গোপালেরে সঙ্গে করে, বনান্তরে যাসনে বহু দূরে।
পাড়ন—যদি হাটিতে পথে কান্দে, রাখিস্‌রে কান্ধে কান্ধে,
পায় যেন ফুটে না কুশাঙ্কুর ॥
ফুকার—যদি গোপালেরে করি বারণ. কেন রে করবি গোচারণ,
মুখ খালি মলিন দেখি, আমার সাধ্য কি ঘরে রাখি ;
ভুলে তোদের সখ্য রসে, গোঠের খেলা বড় ভালবাসে,
তাইতে পাঠাই বনবাসে, নইলে ঘরে আমার অভাব কি ॥
মিল—ভানুর তাপেতে তাপিত হলে বাছার কোমল গাত্র,—
ধরিস শিরেতে পত্রের ছত্র, অতি সমাদরে ॥

## শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ অর্জুনের বিলাপ রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—কালের করাল করে, জরা ব্যাধের শরে, হায় হায় কৃষ্ণ ম'ল।
পাড়ন—শুনে এই সংবাদ অর্জুন বীর, হয়ে ঘরের বাহির,—
মণিহারা ফণীর মত সে দ্বারকায় প'ল।
ফুকার—বীরের কঠিন হৃদয় ভেদিল, কি ভীষণ শোক শেলপাট,
দুঃখে আপনি ভাঙ্গে আপনা ললাট ;
জন্মের শেষ এই দেখাদেখি, করে কত ডাকাডাকি,
বেচাকেনা থাকতে বাকী, ঘোর অন্ধকার ও তার ভবের হাট ॥
মিল—অতি কাতরে কোলে নিয়ে কৃষ্ণ মৃতদেহ,
বীরের হতেছে অন্তর্দাহ, কেঁদে কেঁদে বলে।
মুখ—ও ভাই বনমালী, একাকী তুই কোথা গেলি,
ভাসাইয়া অকূল সলিলে ॥

প্যাঁচ—ও ভাই তুই ছিলি সব অন্তরঙ্গের দেহ রথের রথী,
দয়া করে হলে আমার কাষ্ঠ রথের সারথি,
অচল করে সবাকারে, তুই র'লি ভাই শবাকারে,
প্রভা নাই আজ প্রভাকরে, দিবসে হয়েছে রাতি ;
অন্ধকার এ রৌরবে, কে রবে কার গৌরবে,
মোদের তোর সাথে যেতে হবে, ও তুই না ফিরিলে।
খাদ—তোর মত ভাই ত্রিভুবনে আর কি মিলে ॥
ফুকার—ও তোর শোক সমুদ্রের রুদ্র আগুন, ভীষণ তার প্রতাপ,
আমার সেই তাপে আজ মিলেছে ত্রিতাপ ;
যে অঙ্গ সাজাতেম ফুলে, তাই আজ দিতে হবে চিতায় তুলে,
এই হাতে তোর আগুন জ্বেলে, আমি সেই আগুনে দিব ঝাঁপ ॥
মিল—ও ভাই ফিরে আয়, নিয়ে যারে সঙ্গে করে,—
কেন না বলে গেলি মোরে, এ তোর কেমন লীলে ॥
অন্তরা—ফিরে আয় রে গোকুলবিহারী।
তুই যে অকূল কাণ্ডারী, তুই যে অকূল কাণ্ডারী ॥
কালীদহের বিষ জলে, মরে বাঁচালি শিশুকালে,
কর দেখি সে মধুর লীলে, জনম সফল করি।
( কৃষ্ণ রে ) নইলে তুই বিহনে মরবে প্রাণে, যত পুরুষ নারী,
( ও তোর যত পুরুষ নারী ) ॥
যদি হয়ে থাকে লীলা সাঙ্গ, বারেক ফিরে আয় ত্রিভঙ্গ,
অনুগত অন্তরঙ্গ, নে রে সঙ্গে করি ( কৃষ্ণ রে )।
শেষে তোরে নিয়ে, ব্রজে গিয়ে, এক সাথে সব মরি,
( আমরা এক সাথে সব মরি ) ॥
পরচিতান—ও তোর যদু বংশ, আগে করলি ধ্বংস, এই কি করবি বলে।
পাড়ন—কুলের অবলা নারীগণ, নিলি না কি কারণ,
এ তাপ রৌদ্র কিরণ, পেয়ে ছিন্ন কমল দলে ॥
ফুকার—ও তুই মরিলে বাঁচাতে পারিস, যদি করিস মন,
ভাইরে তোর সাজে কি এই সাজে মরণ ; হায় হায়—
দাঁড়াইয়ে অন্তরীক্ষে, অন্তরঙ্গের দুঃখ দেখ রে চক্ষে,
কি শেল দিয়ে সবার বক্ষে, করলি মানব লীলা সংবরণ ॥
মিল—ও তোর অভাবে ঘোর অন্ধকার, দেখি যুগাবসান,—
করবো সকলে মহাপ্রস্থান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥

**ঊষার ভোর** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—হল নিশির শেষ শুভ্র আকাশ, ঊষার বিকাশ, মনে অনুমানি।
পাড়ন—অমনি শ্যাম বিয়োগ বিরহ শোক, জাগে রাধার প্রাণে,—
ধরে ঊষার চরণে, বলে রাধারানী॥
ফুকার—ধরেছ ঊষা নবীন ভূষা, দিবাকর অভিসারে,
ধরে দু'টি হাত কোটি প্রণিপাত করে বলি তোমারে ; হায়—
প্রাণ বঁধুকে বুকে ধরি, আছি সারা বিভাবরী,
ও তুই প্রভাত হলে শর্বরী, আমায় শ্রীহরি যাবে ছেড়ে॥
মিল—নারীর মনের ভাব প্রাণের ব্যথা, নারী বুঝতে পারে,—
সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো ঊষাবতী।
মুখ—সমদুঃখী বলে, মিশে যাও রজনীর কোলে,
রাখো দাসীর এই মিনতি॥
ডাইনা—গত বহুদিন পরে, বঁধুয়া এসেছে ঘরে,
বুকে ধরে রাখিয়েছি তায় গো—
প্রভাতে ঊষার আলোকে, হাসিবে দেশের লোকে লোকে,
সেই দুখে প্রভু যদি যায় গো—
কেমনে রাখিব ( বিরহ দাহনে দেহ—বঁধু হারা হয়ে দেহ )
আদেশ দাও নিশাকরে, মিশে যাক নিশার ঘোরে,
বারণ করে দাও ঊষাচরে, আর না গায় প্রভাতী।
খাদ—বিচ্ছেদের কি জ্বালা তুমিও তো জান সতী॥
ফুকার—ঘরে ননদী শ্যাম প্রেমের বাদী, নিশিদিন আমায় শাসায়,
তবু গোপনে নির্জনে বসে, আমি কাঁদি তার আশায় ; হায়—
আজ পেয়ে শুভ রজনী, বক্ষে এলো গুণমণি,
ওগো হাসিস না তুই ঊষারানী, আমার বঁধু যদি লজ্জা পায়॥
মিল—নারীর মনের ভাব প্রাণের কথা নারী বুঝতে পারে,
সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো ঊষাবতী॥
অন্তরা—ঊষা গো জানো না কি সতীর পতিপ্রেম সোহাগ।
প্রেমের মিলনে মধুর অতি, বিচ্ছেদে হয় অনুরাগ॥
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে, ওঝায় বিষ নামাতে পারে,
বিচ্ছেদ বিষে যারে জারে, হাড়ে হাড়ে লাগে দাগ।
কান্ত যখন ফেলে যাবে, আমার প্রাণ তো চলে যাবে,
ঊষা তোমার নিতে হবে, নারী বধের পাপের ভাগ॥

পরচিতান—তোর সুষুপ্তির কোলে, আপন ভুলে, আছেন বিশ্ববাসী।
পাড়ন—যেন জেগে রয় শুধু আমার এ তৃষিত আঁখি,
অনিমেষ নেত্রে দেখি, বঁধুর মধুর হাসি॥
ফুকার—উষার ইসারায়, যদি নিশা যায়, উদয় হয় সে দীননাথ,
লোকলজ্জা ভয়ে ত্যজিয়ে আমায়, যদি যায় সে প্রাণনাথ ; হায়—
আশাভঙ্গ মহাপাপে, বন্ধুবিচ্ছেদ অনুতাপে,
পতিহারা সতীর অভিশাপে, সুখনিশি হবে না প্রভাত॥

## রাখাল গোষ্ঠ বিলাপ — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—মধুর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা মধুর বৃন্দাবনে।
পাড়ন—ধেনু বৎস সঙ্গে, সব রাখালে মনোরঙ্গে, যায় চম্পকের বনে॥
ফুকার—তখন চম্পকের ফুল দৃষ্টিমাত্র, গোকুলশশীর আকুল চিত্ত,
হল অকস্মাৎ, কোমল চক্ষেতে হয় অশ্রুপাত ; হায় রে—
ঢলে প'ল ধরাতলে, সে ভাব দেখে দুঃখে সব রাখালে,
প্রাণের গোপাল গোপাল বলে, শিরে করে করাঘাত॥
মিল—মনের দুঃখেতে কাছে গিয়ে কৃষ্ণের করে ধরে,—
বলে কাতরে হলধরে, ভেসে চক্ষের জলে।
মুখ—কানাই আয়রে কোলে, চাঁদ বদনে দাদা বলে, নিয়ে যাই গোকুলে॥
ডাইনা—যেন জিনি নীলোৎপল, শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেছে,
তোমা বিহনে, এ জীবনে বল ফল কি আছে ;
ভাই ফেলে ভাই মরিলে, আমরা সব রাখাল মিলে,
গিয়ে ঝাঁপ দিব যমুনা জলে, গোপাল গোপাল বলে।
খাদ—আগে কে জানে ভাই এই ছিল কপালে॥
ফুকার—কানাই তোরে ফেলে গোষ্ঠে গেলে, উচ্ছিষ্ট ফল মিষ্ট পেলে,
আমরা কারে খাওয়াব, এমন সখ্য প্রেম কোথায় পাব ; হায় রে—
বসায়ে কদম্বতলে, বনফুলের মালা দিয়ে গলে,
ফুলের ছত্র শিরে তুলে, রাখাল রাজা কারে সাজাব॥
মিল—কানাই তোর মরণ শুনে কানে, তোর সে পিতামাতা,—
দারুণ পাষাণে ভাঙবে মাথা, শোকানলে জ্বলে॥
অন্তরা—একবার ওঠ রে ভাই বনমালীরে, একবার ওঠ রে ভাই বনমালী।
সেজে আয় রে গোষ্ঠের ভাবে, নাচি আগের ভাবে,
কি ভেবে এভাবে নীরবেতে রইলি॥
হারা হয়ে তোরে ওরে প্রাণ কেশবে, ভাই শোকের অসহ্য যাতনা কে সবে,
রাখালবৃন্দ সবে, কেহ নাই উৎসবে, হের নিরুৎসবে, রয়েছে সকলি॥

ধবলী কবলী শেওলী শ্যামলী, হাম্বা রবে কাঁদে সুরভী সকলি,
হয়ে শোকাকুলি, আকুলি ব্যাকুলি—
( সবে ঢলে পড়েছে ) কানাই তোর বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গের বিষে )
ওঠো ওঠো ওরে কানু, মেল দু'নয়ন রে,
কি দুখে আঁখির জলে ভাসিছে বয়ান রে,
( দেখা যায় কিরে ভাই ) ও তোর কোমল অঙ্গ ধূলিমাখা )
আগে যদি জানতেম কানু যাবি রে ছাড়িয়া,
হৃদয়-পিঞ্জরে তোরে রাখিতেম ভরিয়া,
( বুঝি সাঙ্গ হল ) মধুর ব্রজলীলা সাঙ্গ হল, তুই বিনে ভাই শ্যাম ত্রিভঙ্গ )
আজি কি কুক্ষণে, এসে গোচারণে,
কাচের আকিঞ্চনে, কাঞ্চন দিলেম ডালি ॥

পরচিতান—আমরা ভাই বিনে ভাইয়ের দুঃখ, আর কারে জানাব।
পাড়ন—তোরে হারা হয়ে, কোন পরাণে কি ধন নিয়ে, ফিরে ঘরে যাব ॥
ফুকার—মোদের এত সাধের বৃন্দারণ্য, তুই বিনে হল অরণ্য,
বিপন্ন রাখাল সবাই, এখন কারে নিয়ে ঘরে যাই ; হায় রে—
যখন বলবে নন্দরানী, কোথায় আমার প্রাণের রতনমণি,
কোন প্রাণে বলব জননী, তোমার প্রাণের গোপাল বেঁচে নাই ॥

**দাতা কর্ণ-বৃষকেতু আর্তি — নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—একদিন ছল করে কর্ণের বাসে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে,
এসে শ্যাম নীলপদ্ম।
পাড়ন—খেতে চায় বৃষকেতুকে, অপূর্ব যৌতুকে, মনের কৌতুকে—
দাতা কর্ণ হলেন বাধ্য ॥
ফুকার—হায় হায় ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ, স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য,
দান কর্মে ব্রতী হল,
কি পাষাণ বুকে, কৌতুকে পুত্রকে, স্নান করাল ; হায় গো—
দান প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে, স্ত্রী পুরুষে যুক্তি করে,
পুত্র বৃষকেতুর শিরে, করাত ধরে দু'জন দাঁড়াল ॥
মিল—দেখে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষরূপ মুক্তির সেতু—
অমনি ডেকে কয় বৃষকেতু, আমার ভাগ্য ভাল।
মুখ—দেখ সঙ্গীগণে আজ আমার এই শেষের দিনে—
বুঝি জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হল ॥
ডাইনা—বুঝি ছল করে কংসারি ঘুচাতে সংসারী করে কৃপে,
অদ্য দান নিতে এলেন ব্রাহ্মণ রূপে,

এমন দিন কবে হবে, ব্রাহ্মণে মাংস খাবে,
আমার চৌদিকে ঘিরে সবে, হরি হরি বল।
খাদ—বুঝি নন্দের নন্দন মায়ার বন্ধন কেটে দিল ॥
ফুকার—আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হল, আয়ু সূর্য অস্ত গেল,
গগনে আর বেলা নাই,
আজ আমার এই শেষের দিনে, হরে কৃষ্ণ নাম শুনাও শ্রবণে,
তারকব্রহ্ম নামের সনে, আমি ভবের বিদায় হয়ে যাই ॥
মিল—যদি নাম নিয়ে মরতে পারি, হরি নামের সনে,—
ফলবে অন্তিমে নামের গুণে, চতুর্বর্গের ফল ॥
অন্তরা—এ ভব সংসার সকলি অসার, কেবা ভবে পর, কেবা কার আপন।
আছে কি হবে কি, যাবে কি রবে কি,
সবই দেখবি ফাঁকি, ভাঙ্গিলে স্বপন ॥
জন্মিলে মরণ অবশ্য সম্ভবে, নিয়তির লিপি বল কে খন্ডাবে,
পঞ্চভূতে একদিন পঞ্চ মিশে যাবে, বৃথা ভবে তবে কেন কাল যাপন ॥
ঈশান বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যে পদ,
সে সম্পদে ঘুচাব বিপদ, সেবি শ্রীপদ—
মম মাংসে করতে পারণ, যাওয়া আসা করতে বারণ,
কৃপা করে ভবতারণ এসেছেন এবার।
সংসার বিষফল, ঘুচেছে কর্মফল, জনম সফল হয়েছে আমার ॥
( তোমরা ভাই করিও—বন্ধুদলে সবে মিলে )
করাতে কাটিবে মাথা, না সরিষে বুলি,
অঙ্গে মেখে দিও আমার কৃষ্ণ নামাবলি।
( বুঝি ভেঙ্গে গেল ) আমার অসার আশার বাসা—
( আমার আর হবে না ভবে আসা )
যেন বিষয় ত্যজে, মিশি ব্রজরজে, কৃষ্ণ পদাম্বুজে মজে আমার মন ॥
পরচিতান—ভবে লীলাময়ের লীলার বাজার, কত হাজার হাজার,
মায়ার দোকান বসে।
চিতান—কেহ লাভ করে দুনা ছয়, কারো হয় মূলে ক্ষয়,—
কেহ পড়ে রয়, স্বীয় কর্মদোষে ॥
ফুকার—আমি জড় জগৎ পরিপূরি, নিত্যধামে যাত্রা করি, পূর্ণ করি মনস্কাম,
কর্মদোষেতে আসিতে হয় না, যেন আর এই ধরাধাম ;
যেন ভক্তি পেয়ে অহৈতুকী, কৃষ্ণপদে আমি মজে থাকি,
নয়ন মুদে যেন দেখি, ও সেই যুগল কিশোর রাধেশ্যাম ॥

# সখী সংবাদ

[ রাধা-কৃষ্ণ লীলাভিত্তিক সকল শ্রেণীর গান, যেমন—পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপোল্লাস, অভিসার, মান, কলহান্তরণ, বংশীশিক্ষা, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস, মিলন, দূতী সংবাদ, সুবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি, এক কথায় 'সখী সংবাদ' বলে কবি সমাজে প্রচলিত। সখী সংবাদই কবিগানের প্রাণ। এই গানগুলি মুখ্যত প্রেমের গান—কবির কাব্যশক্তির নিদর্শন, কাব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাধাকৃষ্ণের খোলস ছাড়ালে গানগুলি সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক চাওয়া পাওয়ার আর্তি, বিচ্ছেদ বেদনার আক্ষেপ, মিলন বিরহের হাসি অশ্রুতে নিষিক্ত নিটোল প্রেম-সঙ্গীত বিশেষ। সেকারণেই এ সকল গানের আবেদন জাতিধর্মের গন্ডীর ঊর্ধ্বে—সর্বজনীন সর্বকালীন। জোড়ায় জোড়ায় বা এককভাবে রচিত এ সকল গানের জবাব গাওয়াতে হয় বিপক্ষ কবিয়ালকে গানের মাধ্যমেই। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন কবিয়াল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জবাব করে থাকেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে কবিগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কথাই কমবেশী নানা ভাবে বলা হয়েছে, বাকি রয়েছে সেই রসিক শ্রোতার দল—যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্যহারা না হয়ে এই গানের, বিশেষতঃ বাঁধা গান ও জবাবের রসাস্বাদন করত। এ সকল সাধারণ শ্রোতার সূক্ষ্ম রসবোধ সম্পর্কে কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বলেছিলেন—"গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব প্রকাশ এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষ কবিয়াল কর্তৃক বক্তার বক্তব্যের ভাবরস বজায় রেখে, বিপরীতধর্মী জবাব দান—পূর্ব বঙ্গের কবিগানের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। যাঁরা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তাঁরা গানগুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্র মনে শ্রবণ করে ভাষান্তরালে লুক্কায়িত উত্তর দানযোগ্য ভাবগুলি স্মরণে রাখেন, এবং বিপক্ষ সরকারের কাছে ঐ জাতীয় পদগুলির সরস জবাব শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। এমন অনেক শ্রোতা ছিলেন যাঁরা গানের জবাবে এমন আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে, সরকার মহাশয়েরা জবাবের ফুকারের ত্রিপদীটি বলবার সময় দুটি পদ বলতেই তাঁরা শেষ পদটি বলে নেচে উঠতেন। এ কি সামান্য অনুভূতি! কবির মনের ভাব গ্রহণ করে সে ভাবের অভিব্যক্তি যাদের মুখে বক্তার বক্তব্য প্রকাশের পূর্বেই ব্যক্ত হয়, তাঁদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই জাতীয় প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা পদ্মা-মেঘনার পূর্ব পারে অর্থাৎ ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ ছিল। সে সব অঞ্চলে ছড়া-পাঁচালীর চেয়ে গান ও জবাবের প্রাধান্য ছিল বেশী। গানের এলাকা যত পশ্চিমে এগিয়েছে, ততই ছড়া-পাঁচালীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। গান এবং জবাব গৌণ হয়ে পড়েছে।" ]

**সুবল-শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ—১নং** **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—কিবে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের স্বভাব, ভাবুক হলে মিলে।
পাড়ন—নব অনুরাগে তনুতে অতনু জাগে, রাই কানু ভানুজার কূলে ॥

ফুকার—কেলি কদম্ব তরুর মূলেতে একদিন, দাঁড়াল নন্দের নন্দন,
বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু, মরি কি সুচারু, অঙ্গে অগুরু চন্দন।
শুভ চিহ্ন বহু বহু, অঙ্গে দেখি মুহুর্মুহু,
দক্ষিণ ভুরু দক্ষিণ বাহু হতেছে স্পন্দন ॥

মিল—তখন জল আনতে রাই কিশোরী যায় যমুনার কূলে,
তখন ধরে সুবলের গলে, বলে চিকনকাল।
মুখ—সুবল, রমণীর শিরোমণি, সার রমণী কার রমণী, কে বে বল ॥

ডাইনা—কিবে গজেন্দ্র গমন গঞ্জি রঞ্জিনী রঞ্জিয়ে যায়,
অতুল রাতুল পায় নূপুর পঞ্চম গায়।
নিতম্ব দোলাইয়ে, কদম্ব তলা দিয়ে,
অম্বু আনিতে কুম্ভ নিয়ে, যমুনাতে গেল।

খাদ—দেখে মন চঞ্চল, আঁখি হল ছল ছল॥

ফুকার—ধনির প্রতি অঙ্গ অতি মনোহর, যেন ঝরে পড়ে পরিমল,
নীল শাড়িতে জড়িত, যেমন তড়িত, করিতেছে ঝলমল।
রম্ভা কিংবা তিলোত্তমা, না না তা হতে উত্তমা,
রমা হতে মনোরমা, এ রামাকে চিনিস্ কি সুবল ॥

মিল—আমার প্রাণ ধরে টানতেছে ঐ রূপ দরশনে,
কোন্ জন্মে কি ধনির সনে আমার চিনা ছিল ॥

অন্তরা—আমার নয়ন যুগল ভুলিল সুবল'রে—
আয় না যমুনার কূলে যাই।
ধনি এই পথে গেল হেঁটে, কদম্বতলার ঘাটে,
আয় ঘাটের মাটিতে লুটাই ॥
ভাইরে, শুধু কুম্ভের ভরে মাজা হেলিয়ে পড়ে—
দেখে আমার প্রাণ পোড়ে ভাই।
কেমন কঠিন পুরুষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধনি,
তার কি শরীবে দয়া নাই ॥
পরচিতান—দেখলেম যে সৌন্দর্য, রূপের যে মাধুর্য, ধৈর্য রই কেমনে।
পাড়ন—বলতেছি প্রকৃত, এ প্রকৃতি অপ্রাকৃত, বিক্রিত হলেম চরণে ॥

ফুকার—কি মোহিনী জানে মোহিনী, কিবে তেরছ চাহনি চায়,
কিবে অপরূপ রূপে রসের স্বরূপ, কিরূপে ভুলিব হায়।
সরে না বাক্য অধরে, সুবল আমায় রাখ রে ধরে,
লৌহকে চুম্বকে ধরে, কোথায় জানি টেনে নিয়ে যায়।

ঐ—জবাব — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—মধুর পূর্বরাগের পূর্বভাগে, জাগে নবপ্রেম হৃদয়।
পাড়ন—হয়ে চোখে চোখে সম্মিলন, মনের সনে মন মিলন,
প্রেমিকের মন, প্রেমরসে তন্ময়॥
ফুকার—রাধে কক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কুম্ভ, দোলায়ে সুভার নিতম্ব,
যমুনায় যায় আনতে জল, করে রূপের আলো ঝলমল।
দেখে রাধার রূপের জ্যোতি, কৃষ্ণ হয়ে ছন্নমতি,
অমনি বলে সুবল সখার প্রতি, কার রমণী বল সুবল॥
মিল—তাই শুনিয়ে সুবল বলে, শোন বলি কানাই,
চিনা মানুষ চিনলি না ভাই, এত ভ্রান্তি ভাল নয়।
মুখ—তাকাস নে ঐ রূপের পানে, মানে মানে চল রে রসময়॥
ডাইনা—কার রমণী যমুনায় যায়, শুনতে চাইলি শ্যাম,
আয়ানের গৃহিণী ধনি, রাধা উহার নাম।
বৃষভানু রাজার কন্যে, গোকুলে গোপকুলের মান্যে,
অপরাহ্নে জলের জন্যে, এসেছে এই যমুনায়।
খাদ—আর এক কথা শুনে কানাই, বাঁচি না লজ্জায়।
ফুকার—বললি, কেমন কঠিন পুরুষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধনি,
দয়াশূন্যে তাহার প্রাণ, কথা বললি কি রে কালাচাঁন।
ভার্যা রেখে গৃহবাসে, জল তুলে দিলে পুরুষে,
ভাই রে দেশবিদেশে লোকে হাসে, থাকে কি পুরুষের মান॥
ফুকার—বললি, রম্ভা কিংবা তিলোত্তমা, তা হতে অতি উত্তমা,
রূপে ভুলাল আমায়; ছিঃ ছিঃ বলিস কি তুই শ্যামরায়।
দেখে তোর ঐ রূপরাশি, ভোলে কত যোগী ঋষি,
ওসব উর্ব্বশী রূপসী আসি, দাসী হয়ে থাকবে পায়॥
ফুকার—বললি, সব রমণীর শিরোমণি, জলের ছলে কার রমণী,
এলো যমুনার ঘাটে?
পরনারীর রূপের পানে, তাকাস কেন আড় নয়নে,
ভাই রে পরের সোনা দিলে কানে, সে সোনায় যে কান কাটে॥

ফুকার—বললি, যে পথে রাই গেল হেঁটে, পথের ধূলোয় পড়বি লুটে,
বললি কি রে পীতবাস, শুনলে লোকে করবে উপহাস,
তুই যে মোদের কালশশী, পদ নখে কোটি শশী,
পেতে তোর চরণের ধূলোরাশি, যোগী ঋষির অভিলাষ ॥
ফুরার—বললি, সুবল আমায় রাখ রে ধরে. লৌহকে চুম্বকে ধরে,
টেনে নিতে চায় নাকি ; ছিঃ ছিঃ বললি কি কমলাঁখি ?
চুম্বকের গুণ আছে জানা, স্বভাব তাহার লোহা টানা,
তুই যে মোদের কেলেসোনা, চুম্বকে তোর টানবে কি ॥

## শ্রীরাধার পুর্বরাগ—১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান—হল রঙ্গময়ীর শ্রীঅঙ্গেতে যৌবনের অংকুর।
পাড়ন—ভানুসুতার কূলে, কেলিকদম্বের তলে, দাঁড়াইলেন গোপীর মনোচোর ॥
ফুকার—প্যারি স্বর্ণ কুম্ভে অম্বু আনিতে, কদম্বতলার ঘাটে যায়,
নব রঙ্গেতে রঙ্গিণী সঙ্গেতে সঙ্গিনী, মত্তমাতঙ্গিনী প্রায়।
কি জানি হৃদয়ে জাগে, তনু যায় কি অনুরাগে,
মন যেন পবনের বেগে, মনের মতো মনের মানুষ চায় ॥
মিল—হঠাৎ কদমতলে হেরে কালাচাঁদ, প্রাণে লাগল পিরীতির বাঁধ,
সঙ্গিণীর প্রতি বলে।
মুখ—ইন্দিবর নিন্দিরূপ, কেগো সখী কালিন্দীর কূলে ॥
ডাইনা—বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু কর্ণেতে কুণ্ডল,
অলকা তিলকাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডল ;
কামকান্তি জিনি কান্তি, গলে দোলে বৈজয়ন্তী,
বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা বলে।
খাদ—তরুণ অরুণ কিরণ চরণতলে ॥
ফুকার—ঐ দেখ গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ সই লো, শিরে উচ্চ চূড়া মনোহর,
মধুর মুখেতে হাসিটি, করেতে বাঁশীটি, কটিতটে পীতাম্বর।
তারুণ্য কারুণ্যামৃত, মরি কি লাবণ্যামৃত,
পান করে ঐ রূপামৃত, মৃত আঁখি হলো গো অমর ॥
মিল- আমি সাধন করে মীন হয়ে সখী, ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি—
সে রূপ জলধির জলে ॥
অন্তরা—সখী, মরি কি সুন্দর, নব নটবর, তপন তনয়ার ঘাটে।
খেলে সজল সজীব, কোলেতে চপলা, পীত ধটি কটিতটে ॥

চন্দনেতে অর্ধ ইন্দু, ঊর্ধ্বে মৃগমদ বিন্দু—
ঠিক যেন সেই পূর্ণইন্দু, শোভা করে ঐ ললাটে।
উহার কর পদ নখে, গণ্ডস্থলে মুখে, কত চন্দ্র এল জুটে ॥

পরচিতান—কি যে ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গমোহন।

পাড়ন—ঐ দেখ কি রঙ্গেতে, ত্রিভঙ্গের বাঁকা ভঙ্গীতে,
নয়নের ইঙ্গিতে ভুলায় মন ॥

ফুকার—যেন মদন করিয়ে শোধন, বিধি বদন গড়িয়াছে
কত সুধাকর সুধা ছানিয়া, আনিয়া সর্বাঙ্গে মিশায়েছে।
একবার মাত্র দরশনে, পশিয়ে রূপ হৃদাসনে,
যেন আমার মনের সনে, মনে মনে কথা বলতেছে ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—শুনে কিশোরীর সে রসের কথা বলে সঙ্গিনী সকল।
পাড়ন—দেখে জলের ঘাটে শ্রীহরি, উঠলি কেন শিহরি,
চল কিশোরী বারি নিয়ে চল ॥
ফুকার—আমরা সব সঙ্গিনী তোরই সঙ্গে, জল ভরিতে মনোরঙ্গে,
নিত্য আসি শ্রীমতী, হঠাৎ হল আজ তোর কি মতি।
জলের ঘাটে রূপ দরশন, তাইতে উন্মাদিনীর লক্ষণ,
রাধে, সাক্ষাৎ যদি হতো মিলন, জল নিতি না প্রাণ দিতি ॥

মিল—রূপ দেখিয়া অন্ধ কূপে দিও না'ক ঝাঁপ,
শেষে পাবি মনস্তাপ, তাইতে বারণ করিলাম।
মুখ—পরপুরুষে মন সঁপিলে, এ গোকুলে রটিবে দুর্নাম ॥
ডাইনা—চিন্ময় রসে নাই আকিঞ্চন জানালি আমায়,
পরপুরুষের রূপের পানে, সতী কি তাকায়,
আজ তোরে ভুলাবে বলে, কালিন্দী যমুনার কূলে,
দাঁড়াল কদম্ব মূলে, নন্দনন্দন বাঁকাশ্যাম।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে ব্যথিত হলাম ॥
ফুকার—বললি, ঐ কালরূপ চক্ষে হেরে, ঢুপ করে ঐ রূপ সাগরে,
আঁখি-মীন ডুবিল তোর, আছে মীন হলে ধীবরের ডর।
মতি রেখে পতির ধ্যানে, থেকে পতির রূপ সাধনে,
রাধে, পতি রূপামৃত পানে, আঁখি চকোর অমর কর ॥

ফুকার—বললি, অধরে মুরলী ধরি, রাই বলে বাজায় বাঁশরী,
তাই শুনে হলি ব্যাকুল, কেন হাসালি কুলনাকুল।
হারা হয়ে ধবলী গাই, বাঁশীতে কয় হারাই হারাই।
রাধে তুই শুনিস যে বলে রাই রাই, এ সকল তোর শ্রুতির ভুল॥
ফুকার—বললি, অধরে মুরলী ধরে, হাসিতে উদাসী করে,
দেখে উহার মৃদুহাস; কেন হল রাই তোর বুদ্ধি হ্রাস।
কাজ কি উহার মৃদু হাসে, যা শুনে কুলজা হাসে,
সদা শুনবি বসে পতির পাশে, সতী ধর্মের ইতিহাস॥
ফুকার—বললি, নব নীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে।
শুনে দুঃখ ধরে না; সতী এ সঙ্কল্প করে না।
ধরে নিতে সাধ্বী সতী, শশধরের কি শকতি,
শুনি সতীর অঙ্গ মৃত্যুপতি, স্পর্শ করতে পারে না॥

## শ্রীরাধার পূর্বরাগ—২নং

হরিচরণ আচার্য

চিতান—বললে, বিহরে কালিন্দীর কূলে নন্দনন্দন শ্যাম।
পাড়ন—ধন্য ধন্য নন্দনন্দন নয়নানন্দ, ধন্য ধন্য নন্দগ্রাম॥
ফুকার—ও কি নন্দকুল পূর্ণচন্দ্র গো, কি যে মধুর মুরতিখান;
আহা শ্যাম শ্যাম শ্যাম, কি মধুর নাম, মাতাইল মনপ্রাণ।
নামে মধু রূপে মধু, হাসিতে ঝরিছে মধু,
বাঁশীতে ভরিয়ে মধু, কুলবধুর ছাড়ায় কুলমান॥
মিল—আবার কুলের ভয় কি দেখাস গো সখী,
আমি হব কুল কুলঙ্কী, আর বলিস নে কুলের নাম।
মুখ—দুকুলে কেউ নাই গোকুলে, তাই ত কুলে দিয়েছি প্রণাম॥
ডাইনা—তোরা সব কুলে করিস নে কুল কুল
অকূলে পড়লে কি সখী কুলে দিবে কূল,
যাউক পতির কুল যাউক সতীর কুল,
দেহতরীর হউক অনুকূল, অকূলের কাণ্ডারী শ্যাম।
খাদ—কবে আমার পূর্ণ হবে মনের মনস্কাম॥
ফুকার—কবে ভজিব মজিব প্রেমেতে ত্যজিব এ সমুদয়,
আমার ধরম করম যশ অপযশ, কুলশীল লাজ ভয়।
কবে আমি ব্রজধামে, বসব কালাচাঁদের বামে,
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী নামে, কবে আমার হবে পরিচয়॥

মিল—আহা কি সৌন্দর্য কি মাধুর্যময়, এ সংসর্গ যার ভাগ্যে হয়—
চতুর্বর্গে তার কি কাম ॥
অন্তরা—কি যে অপরূপ রূপ, রসের স্বরূপ হেরিলেম দুটি চক্ষে,
আমায় ধর ধর ধর, হেরে জলধর, জলাধার রহিল কক্ষে ॥
পাই যদি অমূল্য রতন, যতন করিব মনের মতন,
ঠিক যেমন সেই যক্ষের ধন, করিব রক্ষে।
কোটি শশী যে শীতল, তা হতে সুশীতল, পদতল রাখিব বক্ষে ॥
পরচিতান—সদা রঙ্গে রব এ মানুষের সঙ্গ যদি পাই।
পাড়ন—মিছে করে কুল কুল, এ কুল সে কুল যাবে দু'কুল,
আর হবে না কোন কূলে ঠাঁই ॥
ফুকার—ঘরে শ্বাশুড়ী কুলের নাগিনী, কুলের ননদী বাঘিনীর প্রায়;
আবার বোলতা ভীমরুল, পতি পিতার কুল, সর্বদা দংশিছে তায়।
কুলের কুক্কুর শত শত, ঘুরে বেড়ায় অবিরত,
কেওয়া ফুলের কাঁটার মত, কুলীনের কুবাক্য বাজে গায় ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

ফুকার—বললে, চেয়ে দেখ সেই কেমন মানুষ, আর দেখি নাই এমন মানুষ,
গড়েছে কোন জগদীশ? শুধুরূপ দেখেই ভুলেছিস।
আগে দেখ না করে পরখ, আয়ান আর এই ধেনু চারক,
দুয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সুধা কোনটা বিষ ॥
ফুকার—বললে, মন পেয়েছে রসিক সুজন, নিরজনে থাকবি দুজন—
সতীর পতি শশাঙ্ক, কেন মাখবি তায় মৃগাঙ্ক?
পতি মজলে অসতর্কে, উপপতি প্রেম সম্পর্কে,—
দেখে হাসে শশী হাসে অর্কে, ত্রৈলোক্যে হয় কলঙ্ক ॥
ফুকার—বললে, মিলেছে সুজনে সুজন, কুলে থেকে কুলের কুজন,
কুল কুল করুক সকলি; এই কি সতীর রীতি দেখালি।
কুলবতী থেকে কুলে, প্রীতি শ্রদ্ধা পুষ্প তুলে,
স্বীয় প্রাণপতির শ্রীপদমূলে, ভক্তিতে দেয় অঞ্জলি ॥
অন্তরা—বললে, বাঁশীতে-হাসিতে মধু ভোলে কুলবালা,
রাধে, মধু নয় ত বিষের ভাণ্ড, হাসি নয় ত ফাঁসীর খেলা ॥
পূর্ব-রাগের পূর্ব-ভাগে,
দুষ্টের প্রেমও মিষ্টি লাগে, ভাবে বিহ্বলা।
শেষে কালা হবে কাল ভুজঙ্গ, অঙ্গে উঠবে বিষের জ্বালা ॥

ফুকার—অদ্য কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে, রাধা যদি ডুবে মরে,
কলঙ্ক ব্রজ বধূর ; হবে অপবিত্র ব্রজপুর।
আমরা তাই অগস্ত্য হব, কলঙ্ক সাগর শোষিব,
তোরে নিষ্কলঙ্ক করে লব, বধিয়ে কলঙ্কাসুর ॥

মান—১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান—দুর্জয় মানে মজে শ্যাম প্রতি বাম শ্যাম-প্রেয়সী।
পাড়ন—আর ত হেরবে না কালরূপ, কালরূপ কাল স্বরূপ,
দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরূপ হল রাই রূপসী ॥
ফুকার—শ্যাম শশী হায় হায় চুড়া বাঁশী দিয়ে রাই পদে,
পড়ে বিষম বিপদে ;
কেঁদে বলে ত্রাহি ত্রাহি, কেবলম্ তব কৃপা হি,
অমানীকে মানং দেহি, স্থানং দেহি, দেহি ও পদে ॥
মিল—রাধার কুঞ্জেতে প্রবেশিতে দেখে সব অপ্রীতি—
বৃন্দাদূতী কয় রাধার প্রতি, বিস্ময় বাক্যে তখন।
মুখ—বলগো বিধুমুখী, কেন অধোমুখী, শ্যামকে বিমুখী—
মুখে নাই গো সুখ দুঃখের বচন ॥
ডাইনা—হায় কি অভাবে ভাবান্তর, সবাকার অন্তর নিরন্তর নিরানন্দ।
কেন ভাস্কর উঠে না পুষ্কর ফোটে না, অলি লোটে না মকরন্দ।
ছিলি যার প্রেমে বাধ্য, সে হল কি অবাধ্য,
কেন পাদপদ্মে প'ল অদ্য, পদ্মপলাশলোচন।
খাদ—পশ্চাতে প'ল বাধা, কুঞ্জে আসি যখন ॥
ফুকার—মরি হায় হায় গো, কি সাধে বিষাদে মজলি রাই,—
দুঃখ কার কাছে জানাই।
চন্দ্র উদয়ে কুমুদিনী, সাদাই থাকে আমোদিনী,
সূর্য উদয়ে কমলিনী, কেহ ত মলিনী দেখে নাই ॥
মিল—কেন সাজলি রাই শুভঙ্করী মূর্তি ভয়ঙ্করী,—
ত্বরায় করে দে এ কিঙ্করীর, এ সন্দেহ মোচন ॥
অন্তরা—গঙ্গা আজ বিমুখী কেন সাগর সঙ্গমে,
কেন শুকের মুখ দেখে না শারী, সুখ নাই মরমে ॥
ময়ূর ত্যজল ময়ূরিণী, ভ্রমর ত্যজল ভ্রমরিণী,
মেঘ ত্যজল আজ চাতকিনী কি ব্যতিক্রমে ॥

পরচিতান—হায় হায় সব বিপরীত কেন দেখি এ নিকুঞ্জেতে।
পাড়ন—জানি চিরদিন আশ্রিতা, লতা আর বনিতা।
অদ্য স্বর্ণলতা তমাল ত্যজল কি জন্যেতে ॥
ফুকার—মরি হায় হায় গো, সান্নিপাত নাই কিসের মহাশ্বাস ;
এমন কে করে বিশ্বাস।
পবিত্র আসনে নিষাদ, সাধে সাধে কেন বিষাদ,
ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস ॥

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—দুর্জয় মান আবৃতা ধীরাপ্রীতা, ভানুসুতা কথা কয়।
পাড়ন—তোরা চোরকে ক'স্ চুরি করতে, গৃহীকে ক'স্ চোর ধরতে,
মরতে মরতে দু'য়ের মরতে হয় ॥
ফুকার—আগে মানের শিক্ষা দিলি দূতী, অতি মানে মানের ক্ষতি,
বলিস ত নাই সে সময়, কেন আজ বলিস তার বিপর্যয়।
প্রেম রতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয় না যতন,
শেষে মানে প্রেমকে করে নূতন, মীনকেতন সচেতন হয় ॥
মিল—তোর কথায় আজ করব নাকি মানের অপমান,—
কি আছে মানের সমান, অবলা নারীর সম্বল।
মুখ—কি দুঃখে যে অধোমুখী, তোরা কি জানিস না সে সকল ॥
ডাইনা—পদ্মপলাশনে ন ক্যান প'ল আমার পায়,
না জানিস তো চন্দ্রাবলীর কাছে শুনে আয়।
প্রিয় বন্ধুর অদর্শনে, প্রাণ বাঁচে কি মান বিহনে,
দায় ঠেকে বিচ্ছেদ আগুনে, ঢেলে দিলেম মানরূপ জল।
খাদ—চন্দ্রাবলীর দোষে হল সরলে গরল ॥
ফুকার—বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনী,
জানি এসব ঘটনা, তা তো সকল সময় ঘটে না,
এ চাঁদের গৌরব রাত্রে বটে, দিনে যখন সূর্য উঠে,
যদি কলঙ্কী চাঁদ মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে না ॥
মিল—সূর্যোদয়ে কি কমলিনী হয় না মলিনী,—
মেঘে ঢাকলে দিনমণি, ক্যান্‌লো ফুটে কমল ॥
অন্তরা—সাগর সঙ্গমে বিমুখী নয় গো গঙ্গা সুরধুনী।
বান ডাকে শ্যাম ( প্রেম ) সাগরে, গঙ্গা আছে উত্তরবাহিনী ॥

চাতক রৈল মেঘের আশে, মেঘ বরিষে অন্য দেশে,
চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, বল দেখি শুনি।
প্রলয় ঝড়ে চাতকিনী, খাইতে নারে মেঘের পানি,
মাঝে মাঝে প্রাণে বাজে, শ্যামবিরহ বাজের ধ্বনি ॥
পরচিতান—কেন তমাল ত্যজিল স্বর্ণলতা জানিস তো সকল।
পাড়ন—ও সে চন্দ্রাবলীর কামঝড়ে, তমালে মাথা নাড়ে,
ছিঁড়ে পড়ে স্বর্ণলতার দল ॥
ফুকার—এখন মহাপ্রসাদ পরিহরি, সাধে কি লো আমি করি,
একাদশীর উপবাস, করলি না বুঝে সই উপহাস।
পাত্রে প্রসাদ পাই না খুটে, সব গিয়েছে চন্দ্রার পেটে।
এখন প্রসাদ শূন্য ভাণ্ড চেটে, পূর্ণ হয় কি অভিলাষ ॥
ফুকার—বললি, সাধে সাধে কেন বিষাদ, ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ;
একাদশী কে রহে; যায় এ রজনী বিরহে।
দ্বাদশীর শেষ না আসিতে, পারে না পারণা হতে—
তোরা জানিস না গোস্বামী মতে, পারণা হয় পরাহে ॥
মিল—ভয়ঙ্করী মূর্তি কেন হল ধরিতে, বিচ্ছেদ অসুর নাশ করিতে,
পাতিয়াছি এ কৌশল ॥

মান বৈরাগী—১নং হরিচরণ আচার্য

চিতান—একদিন চন্দ্রার কুঞ্জে নিশি ভুঞ্জে, বাঁকা শ্যামরায়।
পাড়ন—দেখে নিশা অন্ত, অস্তগত নিশাকান্ত,
কাঁদতে কাঁদতে রাধাকান্ত, রাধার কুঞ্জে যায় ॥
ফুকার—মরি হায়, রাধা রাধা বলে বদনে, গিয়ে রাধার কুঞ্জ সদনে ঘুরিয়ে বেড়ায়,
রাধার সখী সব, শুনে সুমধুর রব, বলে কোন সাধু ঐ যায়।
কেমন রাধা প্রেমের অনুরাগী, রাধা নামে নিশি জাগি,
সখী, মাস কীর্তনের কোন্ বৈরাগী, ভোরে রাধানামের কীর্তন গায় ॥
মিল—রঙ্গদেবীর সঙ্গে কুঞ্জদ্বারেতে দেখা,
বলে কপালেতে সিন্দুর মাখা, কোন্ ধর্মের কোন মর্মে পাও।
মুখ—মাস কীর্তনের কোন বৈরাগী, রাধানামের সাধা কীর্তন গাও ॥
ডাইনা—শ্রীগুরুর আজ্ঞাতে তোমার, কি নাম ধর কোন্ পরিবার,
সদাচারী নাকি হও সহজ,
মোহন্ত কি টল বৈরাগী, দণ্ডবৎ আজ দেও হে পদরজ।
উপাসনার সুফল দাত্রী, পেয়েছ কি কাম গায়ত্রী,
সেবার দাসী আশ্রয় পাত্রী, কয়টি আছে বলে যাও।
খাদ—কোন্ ময়ালে আছ, বলে সন্দেহ ঘুচাও ॥

ফুকার—মরি হায়, তুমি গত নিশি কীর্তনে, দশায় পড়লে কোন স্থানে,
কি ভাবের উচ্ছ্বাস ;
কেউ নাই রক্ষিত, কণ্টকে ক্ষত, গাত্রে চিহ্ন সব প্রকাশ।
কোথায় অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে, ছিলে সাধনের প্রসঙ্গে,
কে পরাইল কাল অঙ্গে, এমন কালরূপের বহির্বাস।
মিল—অঙ্গেতে নাই গোপী চন্দন, গঙ্গা মৃত্তিকা—
কপালেতে সিন্দুর মাখা, কোন্ ধর্মের কোন মর্মে পাও ॥
অন্তরা—কে হে অল্প বয়সের বৈষ্ণব।
মোরা যথা তথা যাই, কোথাও দেখি নাই,
তোমার মত এমন অকৈতব।
কাল যে পাড়াতে, যে ধনির বাড়িতে, শুনলেম মহোৎসবের মহারব।
নিয়ে সে পাড়াপড়শী, না ডুবিতে নিশি—
কর এসে বাসী মহোৎসব ॥
পরচিতান—বড় সুপ্রভাত শুভ দর্শন, বৈষ্ণবের বদন, তারকব্রহ্ম রাম নাম।
পাড়ন—পরিণামের বল হরিনাম, ছেড়ে কর কি মনস্কাম রাধা সংকীর্তন ॥
ফুকার—মরি হায়, গেয়ে ভোরের সুরে রাধা নাম, তুমি পদব্রজে ব্রজধাম,
করতেছ ভ্রমণ ;
এই গোপের কুলে যাবট গোকুলে, আছে বহু ভক্তগণ।
ভক্ত আয়ান ঘোষ বাথানে যাবে, সূর্যোদয়ে দেখতে পাবে ;
ষোড়শোপচাবে হবে, বৈষ্ণব সেবার আজই আয়োজন ॥
মিল—একদিনে মহোৎসব যদি ঘটে দুই স্থানে—
রক্ষা করতে নিমন্ত্রণে, দুই স্থানে কি প্রসাদ পাও ॥

ঐ—জবাব **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—করে রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে ত্রিভঙ্গ ব্যঙ্গ চাতুর্য।
পাড়ন—আমি অটলভাবে টল দেই অটলবিহারী—চতুর্বর্গের ফল করি অগ্রাহ্য ॥
ফুকার—আমি অনেক দিন হয় ভেক নিয়েছি, বসতি করি ব্রজপুর,
কৃপা রাই চরণ প্রভুর ;
তোমাদের গোপীর পাড়া, ভিক্ষার্থে হলেম খাড়া,
দেখে চক্রাবক্রা মার্কা মারা, সবে কয় কানুদাস ঠাকুর ॥
মিল—আমি রাধা নামের সাধা কীর্তন গাইতেছি মুখে—
আমার বাসনা অনেক দিন থেকে, রাধাকে করতে এলেম দরশন ॥
মুখ—শুন গো রঙ্গ দেবী, তুমি কথা বল মন মতলবি, না জেনে কারণ ॥

ডাইনা—আমার আশ্রয় পাত্রী আছে কিনা, তোমাদের বিশেষরূপে নাই তা জানা,
হয়েছি রাধা পরিবার ;
হল অনাশ্রয়ের দোষে সেদিন নিরাশ্রয় আমার।
রাখব না আশ্রয় পাত্রী, জপ করব কাম গায়ত্রী,
আমি প্রেম ভিখারী তীর্থের যাত্রী, তাইতে এসেছি মধুর বৃন্দাবন।
ফুকার—আমায় কে দিল কাল বহির্বাস, সেই কথা শুনি আজগুবি,
তবে শোন রঙ্গদেবী ;
কাইল ঠেকলেম সাধুর পেঁচে, বৈষ্ণব ভোজন হয়েছে,
আমায় এই বহির্বাস দান করেছে, প্রেমতলা চন্দ্রা বৈষ্ণবী ॥
ফুকার—বললে, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত চিহ্ন, আমাকে বল মহাভাগ,
তোমরা বৃথা কর রাগ ;
পাড়ার বৌ চন্দ্রাবলী, গৃহী বৈষ্ণবী বলি,
করলেম তার সঙ্গেতে কোলাকুলি, এই আমার মধুর প্রেমের দাগ ॥
ফুকার—বললে বাসী মহোৎসব করিতে প্রভাতে আসা কি হল,
তাতে দোষ আছে কি লো ;
প্রসাদ হইলেও বাসী, তবু চায় ব্রজবাসী,
আমি সে আশায় নিকুঞ্জে আসি, প্রসাদের পচাও ভাল ॥
ফুকার—বললে, আয়ান ঘোষে জানলে শেষে, পূর্ণ করিবে মনোসাধ,
বড় ঘটাবে প্রমাদ।
জেনে বৈষ্ণব মহাজন, যদি সে করায় ভোজন,
আমি জানিয়ে ভোজনের ওজন, মন মতন করব আশীর্বাদ ॥

## ভোর—খেদোক্তি রামকুমার সরকার

চিতান—শ্যাম আশায় রাই শশধর, সাজায় বাসর নিকুঞ্জে গিয়ে।
নিশি অবসানে চেয়ে গগন পানে, বলে রাই সখীগণে—
অতি কাতর হৈযে ॥
আর ত নিশি নাই, নিশি নাই, চেয়ে দেখ্ গো সই,
হৈল গগনেব চাঁদ অস্ত ঐ, চেয়ে দেখ্ গো সই।
সখী মধুর লোভে হয়ে কাতর, গুন্ গুন্ স্বরে ডাকে ভ্রমর,
চক্ষে দেখে সুখের রজনী ভোর, শুক শারি সুখে ডাকে ঐ ॥
ধুয়া—লম্পট শ্যামের আশা, হলেম নৈরাশা,
যার আশাতে জাগলেম নিশি,
আমি কার আশায় এসে কুঞ্জে,
কল্লেম বাসর তুইলে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে।

আমি যার জন্যে গাঁথলেম হার,
এ হার গলে দিব কার, মনে ভাবলেম গো সার ;
বুঝি আজ হতে কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী।

খাদ—গেল বিফলে যামিনী, জাগলেম ধনি, নিধুবনে আসি ॥
আমি অভাগী যার লাগি হলেম প্রেমাকুল,
ত্যজে বনাচারী হারাই কুল, হলেম প্রেমাকুল।
আমার সে সাধে বিষাদ ঘটিল, বিচ্ছেদ বিষে জীবন গেল,
( সইরে ) এ দুঃখিনীর ভাগ্যে হলো,
লম্পট শ্যাম বন্ধু ডম্বুরের ফুল ॥
গেল বিফলে যামিনী, এলো না চিন্তামণি, ওগো প্রাণ সজনী ;
হলো অগস্ত্য মুনির মত কালশশী।

অন্তরা—প্রাণ সখি গো ! কেন বা লম্পটের কথায় ভুইলে,
নিলেম কলঙ্কেরি বোঝা মাথায় তুইলে।
যার আশাতে কল্লেম শয্যা,
শ্যাম এলো না পেলেম লজ্জা,
তারে পেলেম কই ;
যেমন জল বিনে চাতকী, তাই হল সখী,
এই ছিল আমার কপালে ॥ ( খণ্ডিত )

## জলছায়া—পূর্বরাগ

চণ্ডী ঠাকুর

চিতান—হেরে অপূর্ব ভাব পূর্বরাগের স্বভাব, মধুর পূর্বরাগে।
পাড়ন—যৌবন নদীতে উঠিল প্রেমের তরঙ্গ
অঙ্গেতে অনঙ্গ জাগে ॥

১ম ফুকার—একদিন বেলা অবসান কালে, কেলি কদম্ব ডালে, রসিক শেখর ;
মুরলীধরে মুরলী ধরে করে মধুস্বর। হায় গো—
রাই রঙ্গিনী রঙ্গ ভরে, সঙ্গিনীগণ সঙ্গে করে,
গিয়ে দাঁড়াল যমুনার তীরে, হেরে জলের ছায়ায় জলধর ॥

মিল—রাধার জলাধার খসে পড়ল—সজল কক্ষে,
প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি মধুর বাক্যে, বলে ওগো বৃন্দে সখী।

মুখ—কালিন্দীর কাল জলে, জলদবরণ কে দাঁড়াল,
তোরা দেখ গো সখী ॥

ডাইনা—হেরে রূপের লহরী, প্রাণ উঠল শিহরি, হরি কটি জিনি,
পীত ধটীতে শোভা করে ক্ষীণ কটিখানি,
নির্মল সরোবরে, পরিমল শোভা করে,
একবার পাইলে তারে, দিতেম হৃদে রাখি।
খাদ—এমন রূপ কাল জলে তোরা দেখেছিস্ কি ॥
২য় ফুকার—উহার তনু কিবা মনোহর, শশধর জিনি অধর, সুধা বরষে;
এমন পিরীতি মাখা রসে।
অতল বিতল সুতল নিতল, রসের মানুষ এই রসাতল,
হল যমুনার জল এত শীতল, শীতল চরণ পরশে ॥
অন্তরা—জলে ঢেউ দিস না লো, দিস না লো সই, দেখে লই ঐ রূপখানি।
সখী এই যমুনা নদী, তাহে শ্যাম গুণনিধি,
কোন্ বিধি মিলাল আনি ॥
কাল জলের ভিতর, নব জলধর, আমি হলেম চাতকিনী।
যদি জলের হিল্লোলে, রূপ মিশে যায় জলে,
তোরা হবি পাতকিনী ॥
পরচিতান—নিত্য স্বর্ণঘটে কালিন্দীর ঘাটে যেতেম জলেব জন্যে।
পাড়ন—একি অপরূপ এক রূপের মানুষ আমি দেখি--
আর কি দেখে না অন্যে ॥
৩য় ফুকার—উহার মাথে শোভে চাঁচর চুল, মস্তকেতে চাঁপা ফুল চূড়ায় সুশোভন,
বলি কি তুচ্ছ ময়ূরেব পুচ্ছ, এত উচ্চতরে আরোহণ।
অলকা তিলকা বিন্দু, কপালে সিন্দুরের বিন্দু,
শোভা করে বিন্দু বিন্দু, হৃদ আকাশের তারাগণ ॥

সখীসংবাদ—বৃন্দার উক্তি লোকনাথ চক্রবর্তী

চিতান—চন্দ্রার কুঞ্জে, নিশি ভুঞ্জে কৃষ্ণ দয়াময়।
পাড়ন—সারা নিশি জাগিয়ে, শেষে বিদায় মাগিয়ে,
প্রেম অনুরাগে প্রভাতকালে, রাইকুঞ্জে উদয়।
লহর—যেয়ে কুঞ্জদ্বারে বৃন্দা কয়, কি জন্য হে দয়াময়,
এসেছ হেথায়; হায় হায় রে!
অধরে নাই মধুর হাসি, কে করেছে মনোদাসী,
(যেমন) গ্রহণান্তে উদয় আসি, পৌর্ণমাসীর শশীর প্রায় ॥
মিল—আজ কেনে নিকুঞ্জ পানে ঘন ঘন চাও,
যাও হে বন্ধু ফিরিয়ে যাও, এদিক পানে চাইও না ॥

মহড়া—বারে বারে বারণ করি, চোরা কুঞ্জে যাইও না ॥
ধুয়া—কাল তিথি ছিল একাদশী, ব্রত কল্লেন রাই রূপসী, নিশি কল্লেন ভোর ;
এসে প্রভাতকালে উদয় হলে, চন্দ্রার মনোচোর।
ঘুমায়েছেন কমলিনী, শ্রীমতী মৃগনয়নী,
মান সাগরের জলে করবেন দ্বাদশীতে পারণা।
খাদ—কাঁচা ঘুমে আছেন প্যারী, কাছে যাইও না ॥
লহর—( ওহে ) বন্ধু কোথায় চলেছ, কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছ,
কাল ছিলে কোথায় ; হায়, হায় রে !
কে দিল সিন্দুরের দাগ, কে করেছে অঙ্গরাগ,
( এমন ) সাধের প্রেম সোহাগের দাগ, হায় মরি, কি শোভা পায় ॥
( খণ্ডিত )

## পূর্ব্বরাগ—বংশীধ্বনি

**লাল মামুদ**

চিতান—সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই।
পাড়ন—এমন কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,—
বংশীধ্বনি করিলেন কানাই ॥
লহর—শুনে সেই বাঁশরী, ধৈর্যহারা রাই কিশোরী,
পড়িলেন ঢলে, অমনি ধেয়ে সখি সকলে ;
কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে,
এমন হ'লে কি কারণে, বল গো মন খুলে ॥
মিল— ললিতার কণ্ঠে ধরি কমলিনী কয়,—
নারীর প্রাণে কত সয়, নিদারুণ বাঁশীর আকর্ষণ।
মহড়া—আর যেন বাজায় না বাঁশী, শ্যামকে যেযে কর গো বারণ ॥
ধুয়া—শুনলে শ্যামের মোহন বাঁশী,
আমি যে কি সুখে ভাসি, তোরা জানিস নে ;
দারুণ শ্যামের বাঁশী পশিয়া প্রাণে ;—
কুলমান কলঙ্কের ভয়, লজ্জা ধৈর্য আর যত হয়,
সকলি মোর কাড়িয়া লয়,—আমি হই পাগলিনীর মতন।
খাদ—পরাধিনী নারী আমি, ঘরে গুরুজন ॥
লহর—যদি ননদিনী কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী,
শুনে এ সকল,—তবে হবে বড় অমঙ্গল,
আমায় দেখ্‌লে ধৈর্যহারা, অমি হাতে লবে খাঁড়া
দায় হইবে রক্ষা করা, জীবন কেবল ॥

মিল—দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ,
কুলনারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন।
ঝুমুর—সখি আর সহিতে নারি।
শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী ॥
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে,
বল না কি করি ?
শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি,
বুঝি না বাঁচি কি মরি ॥
পরচিতান—সুধা বিষে আছে মিশে, বাঁশরী রবে।
পাড়ন—আমার যে যন্ত্রণা প্রাণ জানে, আর কেউ জানে না,-
বল সখি কি উপায় হবে ?
লহর—বাঁশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান,
বিষে পুড়ে যায়, এখন বল কি হবে উপায় ;
মনে কয় যে দিবানিশি, শুনি শ্যামের মধুর বাঁশী,
মধুর সঙ্গে বিষে আসি, পরাণ পোড়ায় ॥

### বাসকসজ্জা-নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি — লোচন কর্মকার

চিতান—কালা আসবে বৈলে নিশাকালে, রাই অতি মনের সাধে।
পাড়ন—কৈরে বাসরসজ্জা, সুখের সুখশয্যা, ফুলশয্যা কল্লেন শ্রীরাধে ॥
লহর—তুইলে রাধাপদ্ম কৃষ্ণকেলি, মল্লিকা মালতী বেলী,
নবকলি তুইলে নানা ফুল, ও যার সৌরভে হয় প্রাণাকুল,
হায়, জানে না রাই এমন হবে, সাধের কালা ছেড়ে যাবে,
ফুলের শয্যা বাসী হবে, মজাবে দু'কুল ॥
মিল—যেয়ে সুচিত্রা চিত্রলেখা ললিতা, রাধার সাক্ষাতে গো—
মলিন বদনে সবে কেন্দে বলে।
মহড়া—কেন গাঁথ মালা, ও রাই রাজবালা, কালা যায় মধু মণ্ডলে ॥
ধুয়া—তুমি নির্জনে বনে গিয়ে, বনফুল তুইলে,—
মালা গেঁথেছ রাই, নিশিতে শ্যামবন্ধুর গলে দিবে বৈলে ;
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা,
এখন তোর ফুলের মালা, দিবে কার গলে।
খাদ—মালা গেঁথেছ রাই চিকন চিকন ফুলে ॥

লহর—তোমার মালা হৈল কাল ভুজঙ্গ, দংশন করবে কোমল অঙ্গ,
শ্যাম ত্রিভঙ্গ ব্রজে রবে না, সাধলে কালা শুনবে না ;
হায় রাধে, বৃথা হৈল কুসুম তোলা, সাঙ্গ হৈল ব্রজলীলা,
আর তোমার বনফুলের মালা, গলে পরবে না ॥
অন্তরা—ফুল তোলা সার হৈল তোমার রাজনন্দিনী।
গেঁথেছ বনফুলের মালা, মন মতন চিকন গাঁথুনী ॥
কার লেগে গেঁথেছ মালা, মালা হৈল জপমালা,
ব্রজে রবে না রবে না চিকন কালা ;—
তুমি চিন্তা কর যার, ঐ যমুনা পার,
ঐ দেখ তোমার চিন্তামণি ॥

## মাথুর

কালিচরণ দে

চিতান—বৃন্দা যেয়ে মধুপুরে, করজোড়ে কৃষ্ণের কাছে কয়।
পাড়ন—কৃষ্ণ হে, বড় দুঃখ পেয়ে এলেম হেথা,
জানাইতে দুঃখের কথা, শুন যদি বলি সমুদয় ॥
লহর—তুমি বলতে যারে প্রাণেশ্বরী, যারে অতি আদর করি, রাখিতে বুকে,
এখন তুমি কে আর সে বা কে ;
বুকের মানুষ শোকে পোড়া, ভূমে পড়া আধা মড়া,
( তুমি ) সুখেতে আছ মথুরা, একবার দেখলে না তাঁকে ॥
মিল—তোমার দেখার আশায় প্রাণ রয়েছে, আর কিছু নাই বাকী,
চল শীঘ্র কমলাঁখি, দেখতে তোমার রাধিকায়।
লহড়া—এই নিবেদন মদন মোহন, করি এখন, তোমার রাঙ্গাপায় ॥
ধুয়া—রাধার ঘটেছে দুর্দশা যত, বলে আর জানাব কত,
মড়ার মতো পড়ে সদায় রয়,—
জাহ্নবী যমুনা ধারা দুটি চক্ষে বয়,
শত ডাকেও কথা না কয়, মুখের দিকে মাত্র চায়।
খাদ—দু'দিনে চার দিনেও নাহি, দু'টা অন্ন খায় ॥
লহর—ছিল স্বর্ণলতা রাধিকা, কৃষ্ণ তোমার প্রাণাধিকা,
আমরা জানি,—ওহে শ্যাম চিন্তামণি ;
সহকার তরু বিনে, ভূমে পড়ে নিশিদিনে,
শুকাইছে দিনে দিনে, কণ্ঠাগত পরাণি ॥

মিল—দিতে সেই সমাচার এলাম আমি কৃষ্ণ গুণধাম,
দাসীর প্রতি হইও না বাম, চল শীঘ্র শ্যামরায়।
ঝুমুর—এখন দেখবে কিহে মদনমোহন, যেয়ে।
ব্রজের শোভা মনোলোভা, সব গেছে ফুরায়ে॥
শুকশারী নীরব আছে, ভ্রমর যায় না ফুলের কাছে;
ধেনু আছে চেয়ে।
নাই যে কোকিল পাখির কুহু কুজন, থাকিয়ে থাকিয়ে॥
পরচিতান—কড় কষ্ট পেয়ে, এলাম ধেয়ে, তোমায় নিয়ে যেতে বৃন্দাবন।
পাড়ন—কৃষ্ণ হে, এই ছিল কি গোপীর লেখা,
বিচ্ছেদ বিষে শ্রীরাধিকা, অকালেতে ত্যজিবে জীবন॥
লহর—এখন, তুমি গেলে বাঁচবে রাধা, রাধা না কি তোমার আধা,
বলেছ আগে; তোমার সে কথা আর কোথায় লাগে;
পড়ে রাধার চরণতলে, ভাসছ কঁদিন নয়ন জলে,
মাথায় নিছ চরণ তুলে, সে সব কি মনে জাগে॥
মিল—বলবার কথা অনেক আছে, এখন তা বলার সময নাই,
চল আগে ব্রজেতে যাই;—আবার এইস মথুরায়॥

## সখী সংবাদ—রাধার আক্ষেপ

রামগতি শীল

চিতান—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময়।
পাড়ন—তাঁরি আশাতে—বৃন্দে-চিত্রে-ললিতে,
মন সাধে নিকুঞ্জ সাজায়॥
১ম ফুকার—তুলে চাঁপার কলি গন্ধরাজ ফুল, সন্ধামণি মালতী বকুল,
তুলে মনসাধে বনফুল।
টগর বেলী শেফালিকা, কৃষ্ণচূড়া কাঠমল্লিকা,—
কৃষ্ণ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল॥
মিল—না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে,
সখীগণের বদন চেয়ে, বলতেছে ললিতের কাছে ;
মুখ—আর নিশি নাই, প্রাণ সইলো—
শ্যামের আসার আশা কি আছে॥
২য় ফুকার—বঁধু আসবে বইলে, মন সাধে কুসুম তুলে,
গেঁথেছিলাম হার, মনে বাসনা ছিল আমার;
বকুল বেলী শেফালীতে, হার গেঁথেছি বিনা সুতে;
ভুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতেম তাঁর॥

ডাইনা—যাঁর আশাতে কুঞ্জে বসি, জাগিয়ে পোহালেম নিশি,
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই ;
আশা তরুর তলে বসে, ছিলাম সখি ফুলের আশে,
অভাগিনীর কর্ম দোষে, ডাল ভেঙ্গে সব ফুল নিয়াছে ।
মুখ—আর নিশি নাই প্রাণ সইগো —
শ্যামের আসার আশা কি আছে ?
ঝুমুর—করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী ; ঐ পোহাল নিশি ।
যার আশাতে করলেম শয্যা,
সে আইল না পেলেম লজ্জা, হলেম উদাসী ॥
আমার অঙ্গে নাই সে বল, কি করিব বল,—
যে জ্বালা জ্বালাইল কাল শশী ॥

## শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ

রামনাথ ভুঁইমালী

চিতান—শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ করলেন প্যারী ।
পারন—কুঞ্জ-ভঙ্গের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়, খুঁজলেন বাঁশরী ॥
লহর—বাঁকা ত্রিভঙ্গ সশংকিত হইয়ে অতি ;
সন্দেহ করিলেন রাধার প্রতি,
অতি সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে,
কেঁদে বল্লেন ধীরে ধীরে, ( আমার ) বাঁশী দাও রাই-শ্রীমতি ।
মিল—রাইগো, বাঁশি আমার সর্বস্ব ধন, তুমি জান,
এ দাস এ ধনে বঞ্চিত হলে কি উপায় বল ।
মহড়া—মোহন বাঁশী দাও রাই, এখন বিদায় চাই,
সুখের নিশি প্রভাত হোল ।
ধুয়া—প্যারী, জাগল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে,
করে গুন, গুন, গুন ভ্রমর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ।
মনের সুখে হাসে, হেরে প্রাণেশে,
তাই দেখে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হোল ।
খাদ—লক্ষ্য সাধনের মুখ্য যন্ত্র বাঁশী ছিল ॥
লহর—ওগো রাধে গো, বাঁশী বিনে ভাসি অকূলে,
বেঁচে কাজ কি আমার গোকুলে ;
গোষ্ঠে গেলে গহন বনে, কোকিল পঞ্চমতানে, ডাকি তোমায়,
বাঁশীর গানে আমি ভাসি সুখ সলিলে ॥

অন্তরা—সাধনের ধন বংশী রতন, অযতনে গেল।
নিয়ে এই মুরলী ঠাকুরালী, গোকুলে মোর ছিল ॥
কত না সাধন করে, পেয়েছিলাম বাঁশরীরে,
হায় মরি কি হোল ॥
লহর—ওগো রাধে গো, বাঁশীর প্রতি কেন তোমার মন ?
কুলবধুর কিবা প্রয়োজন ?
একে তুমি পরাধিনী, ঘরে আছে ননদিনী,
বাঁশী দেখলে রায়-বাঘিনী, করবে কত জ্বালাতন ॥

**সখী সংবাদ—কৃষ্ণের নাগরী বেশ** **গোবিন্দ ঠাকুর**

চিতান—রাধার মানের দায়ে বিরহে, কাতর বাঁকা বংশীধারী।
পাড়ন—বৃন্দার উপদেশে, নবীনা নাগরী বেশে,
এসে মানকুঞ্জে উদয় হইলেন বনবিহারী ॥
লহর—তখন হরিকে কালিশ জ্ঞানে, ভ্রান্ত হয়ে গোপীগণে,
প্রণাম করে পায় ; সেই রূপের প্রভায় সবে মোহ যায় ;
গললগ্নী কৃতবাসে, অতি মৃদু মৃদু ভাষে,
গোপীগণ কয় দেবীর পাশে, স্থান দিও গো রাঙ্গা পায় ॥
মিল—তোমার যে সব সঙ্গিনী, ডাকিনী যোগিনী, কোথায় বল শুনি ;
কও শুনি, শিবের সঙ্গে কেন ছাড়া হইলে।
মহড়া—এগো মহেশানী, হইয়ে উদাসিনী, কেন এলে এ গোকুলে ॥
ধুয়া—তুমি ক্ষণকাল নাহি ছাড় শিবের সঙ্গ,
তুমি মহাদেবী মহাদেবের অর্ধ অঙ্গ ;
আজ কি ভাব তাও বুঝি না, করেতে ক'রে বীণা,
হইয়ে দীনা ক্ষীণা কাঁদছ রাধা বলে।
খাদ—তোমার প্রাণেশ্বর মহেশ্বর কৈ রেখে এলে ॥
লহর—তুমি ত্রিলোচনী দুঃখহরা, মুক্তকেশী অসিধরা,
জগত জননী ; তুমি শিব রানী শিব ঘরণী ;
আজ কেন গো হরাঙ্গনা, অসি ছেড়ে ধরলে বীণা,
( বলে ) কৃপা কর শ্রীরাধিকে, কাঁদছ অসিত বরণী ॥
ঝুমুর—জানি ভয় পেয়ে কালিকে, লোকে তোমায় ডাকলে, বিপদ থাকে না।
তুমি মুক্তিদাত্রী, জগৎকর্ত্রী, তোমার কেন এ বিড়ম্বনা ॥
নমস্তে সর্বানী, ঈশানী ইন্দ্রানী, নমোনমঃ ত্রিনয়না।
তুমি উগ্রচন্ডা উমা, ভৈরবী ভীমা, তোনার নামে ঘুচে ভব যন্ত্রণা ॥

## মানভিক্ষা

কিঙ্কর শীল

চিতান—করে চন্দ্রালয় কৃষ্ণচন্দ্র নিশি গত।
পাড়ন—রাধার কুঞ্জে এসে, ভোরের বেলায় কাঙাল বেশে,
দাঁড়াইলেন শ্যাম চোরের মতো ॥
লহর—দেখে রাধার মান কম্পমান, হলেন শ্যামরায়,
পতিত ধরায় ; মানের দায়, হায় হায় গো—
সেধে কেঁদে দেখলেন কত, মানিনীর মান হয় না হত,
যুক্তি কল্লেন রাধানাথ, ধরতে রাধার পায় ॥
মিল—তখন শ্রীহস্তে শ্যামরায়, কাতরে ধরতে যায় চরণ কমলে,
তাই দেখে বৃন্দা বলে রাধার কাছে।
নহড়া—চরণ ঢেকে রাখ, মনোচোরার ভঙ্গী দেখ,
ধূলায় পড়ে কাঁদতে আছে ॥
ধুয়া—পীতধড়ার অঞ্চল ঐ দেখ গলে বেঁধে,
বলে ত্রাহি ত্রাহি কৃপাং কুরু, এগো রাধে ;
মানের দায় শ্যাম নীলপদ্ম, রাই তোরে করতে বাধ্য,
করপদ্মে তোর চরণপদ্ম, ধরতে গেছে।
খাদ—চেয়ে দেখ না এগো রাধে, শ্যামচাঁদের কি দায় ঘটেছে ॥
লহর—ঐ দেখ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদে গুণধাম,
শ্যাম রাধা রাধা নাম, জপে অবিরাম ; হায় গো—
মান দেখে তোর অখণ্ডিত, শঙ্কায় হয়ে শঙ্কিত,
রাহুগ্রস্ত শ ের মতো, বিপদগ্রস্ত শ্যাম ॥
ঝুমুর—ধনী এই হইল তোর মানে।
সে যে পড়েছে তোর চরণ তলে, যারে ইন্দ্র চন্দ্রে মানে ॥
কাজ কি শ্যামের অপমানে, ক্ষমা দে তোর দুর্জয় মানে,
মোর কথা মাইনে।
সে যে হৃদয়েরি ধন, কালীয়া রতন,
অযতনে তারে আর কান্দাস্‌নে ॥

## মালাগাঁথা

বিজয়নারায়ণ আচার্য

চিতান—শ্যামের আসার আশায়, মধুর প্রেম পিপাসায়
নিকুঞ্জ সাজায় সখীগণ।
পাড়ন—বাসর শূন্য হেরে, কি জানি কি মনে করে,
কিশোরীর চিত্ত উচাটন ॥

ফুকার—লয়ে সঙ্গেতে সকল সঙ্গিনী, অতি সাধে রাধে বিনোদিনী,
মালা গাঁথে কালার দায়, বিধি কখনে কে জানে কি ঘটায়,
নিত্য নিত্য রাজবালা, বিনা সূতে গাঁথে মালা,
আজ হঠাৎ একি হল জ্বালা, গাঁথা মালা খসে যায় ॥
মিল—তখন শ্রীরাধিকে চিন্তামাখা মুখে, বলে অতিশয় মনের দুঃখে,
হায় হায় একি হল ॥
মুখ—সখি ললিতে গো, বুঝি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল ॥
ডাইনা—গাঁথি প্রতিদিন ফুলের মালা হয় না ছিন্ন,
আজ কেন এমন হয় গো, এ ত নয় মঙ্গলের চিহ্ন ;
নাচে ডান চোখের পাতা, কি কব দুঃখের কথা,
নিত্য ফুল তোলা মালা গাঁথা, আমার ফুরাল।
খাদ—বিধি হরিষে গো, বিষাদ ঘটাইল ॥
ফুকার—আমার কোন গ্রহ হল বক্র, রাহু কেতু গুরু শনি শুক্র,
বিধির চক্র বুঝা ভার, এমন জীবনে কখনি ঘটে নি আর।
অতিশয় যতন করে, দেখিয়াছি সখী বারে বারে,
না জানে কি কর্মের ফেরে, খসে পড়ে ফুলের হার ॥
মিল—প্রাণবল্লভ এলে আজ কি দিব গলে,
বলে অতিশয় মনের দুঃখে, এখন মরণ ভাল ॥
সখি ললিতে গো, বুঝি আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল ॥
অন্তরা—হল মালা গাঁথা সারা।
আর কি তুলবো বনফুল, সৌরভে অতুল,
গোকুল মাঝে হয়ে আকুল পারা ॥
আর কি কৃষ্ণ সঙ্গ সুখে, আনন্দ পুলকে, হয়ে রব আত্মহারা।
আর কি কুসুমের সাজে, রসিক রসরাজে,
সাজাইবে প্রাণ সখী তোরা ?
পরচিতান—আমার মনের গতি, হল চঞ্চল অতি, মতি স্থির রয় না ললিতে।
পাড়ন—আমার যে ভাবনা, মনে আমার যে বেদনা,
পারি না ভাষায় বর্ণিতে ॥
ফুকার—আমার কি হল গো প্রাণসখী, সকল সংসার শুধু আঁধার দেখি,
হঠাৎ একি ভাবান্তর, সুখের সময়ে ভয়ে কাঁপিছে অন্তর।
আকস্মিক মনের ভাবে, আসে এমন আমার অনুভবে,
সখী বাকী দিন মোর দুঃখে যাবে, কাঁদিতে হবে নিরন্তর ॥

**সখী সংবাদ—ষট চক্র** **অম্বিকা সরকার**

চিতান—রাধার দশা দেখতে পেয়ে, ব্যাকুল হয়ে, শ্রীবৃন্দে ত্বরায়।
পাড়ন—গিয়ে মধুপুরে, কৃষ্ণের পদে প্রণাম করে,—
ধীরে ধীরে সকাতরে কয় ॥
ফুকার—এলাম তোমায় নিতে মথুরাতে, ত্রিভঙ্গ কানাই,
বড় বিপদে পড়েছে রাই,—
ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূন্য পিঙ্গলা,
হংসিনী হংস চপলা, রাধার সুষম্নাতে নাই ॥
মিল—গান্ধারী আর হস্তী জিহ্বা, জিহ্বার বিরুদ্ধ,
হয়েছে রাইর কণ্ঠ রুদ্ধ, শঙ্খিনীর বলে।
মুখ—কৃষ্ণ মনোরঞ্জন, কর রাধার বিপদ ভঞ্জন,
সদয় হয়ে এ নিদান কালে ॥
ডাইনা—শ্রীদামের শাপ খণ্ডে গেছে, বিচ্ছেদ বিকার নাশ হয়েছে,
ও শ্রীহরি ; বায়ু পিত্ত কফের নাড়ী চঞ্চলা ভারী ;
ত্রিদোষে করতেছে উৎপাত, জ্ঞান হয় যেন ঘোর সান্নিপাত,
এমন সময় হে রাধানাথ, একবার চল গোকুলে।
খাদ—রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে বলে সকলে ॥
ফুকার—রাধাব নাসারন্ধ্রে চন্দ্রার কেন্দ্রে ঘন বহে শ্বাস,
তার জীবনের আর নাই বিশ্বাস ;
রজঃ মিশেছে রবির তেজে, পঞ্চ প্রাণ নাই বায়ুর বীজে,
আয়ুব ঘরে ``পা যে, ক্রমে হচ্ছে হ্রাস ॥
মিল—শিবনেত্র প্রায় রাধার নেত্র হয়েছে এখন,—
প্রকাশ পেল মৃত্যুর লক্ষণ, সব এই কালে ॥
অন্তরা—দেখলাম আয়ুর সংখ্যা হিসাব করি।
আমরা যত ব্রজ নারী, রাধার সে রোগ চিনতে নারি।
করেছি শান্তি স্বস্ত্যয়ন, নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ণ, নাম করে শ্রবণ,—
তাতে শান্তি হয় না রোগ, প্রাণ যাবার উদ্যোগ,—
শ্বাসের ঘরে যোগ নাই চিত্রা নাড়ী ॥
পরচিতান—অরুণ বরুণ আদি, নিরবধি রাধার বিপক্ষ।
পাড়ন—রাধার দ্বাদশ নক্ষত্রেতে মিশি, কেউ হল না রাধার স্বপক্ষ ॥
ফুকার—রাধে একবার উঠে একবার বসে, ঘন মূর্ছা যায়,—
যেন বাতুল-বাণ রোগের প্রায় ;
ক্ষণে ক্ষণে বিভীষিকা, চক্ষে দেখে শ্রীরাধিকা,
ক্ষণে ক্ষণে অনামিকা, ছেড়ে তিন নাড়ী লুকায় ॥

### ঐ—জবাব  রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—হায় হায় তুমি ব্রজের বৃন্দাদূতী, আমি ব্রজের সেই কেশব।
পাড়ন—আমার প্রেমের পাত্রী রাধিকে, জিনে মৃত্যু ব্যাধিকে,
যমে তাকে করতে নারে শব ॥
ফুকার—রাধার ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূন্যে পিঙ্গলা,
হংস চঞ্চলাও নাই; বলিস মিথ্যা কথা আমার ঠাঁই।
ইড়া আর পিঙ্গলা নাড়ী, একুশ হাজার ছয় শ' কুড়ি,
জপে হংস দিবা বিভাবরী, তা না হলে মরত রাই ॥
মিল—গান্ধারী আর হস্তী জিহ্বা বাম দক্ষিণ কানে,
রাধিকার নাই কোনও বিপদ, শ্যামের সম্পদ রাধিকার চরণ ॥
ডাইনা—শ্রীরাধার রোগ চিনতে নারিস হল কালাজ্বর,
শ্যাম নামের ঔষধি দিবি মরমের ভিতর;
রবি নিলে রজের কলা, আর হবে না রজস্বলা,
করবে নিষ্কাম রাজ্যে প্রেমের খেলা, এই দিলি শুভ সংবাদ ॥
ফক্কার—রাধার পঞ্চতত্ত্বে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ, চাঁদের কলা পনের দিস্,
চল্লিশ হবে যোগ করে, (ধরল এক কলা সহস্রারে),
বামের চার লয় শূন্যের ভিতরে,
ষোল নাম যে প্রেমের আকর, শ্রীরাধা জপে নিরন্তর,
দিলে পিরীতির তিন তাহার ভিতর, ঊনিশ তো হতে পারে ॥

### সখীসংবাদ—মান  মহেশচন্দ্র সেন

চিতান—নিকুঞ্জে শ্যাম আসবে বলে, সঙ্গে নিয়ে সাধের সঙ্গিনী।
পাড়ন—এসে নিধুবনে, কমলিনী শ্যাম বিহনে,—
আসার আশে পোহায় রজনী ॥
লহর—হেরে চিন্তামণি নিশি ভোরে কমলিনী, হয়ে মানিনী,—
দিয়ে বিধুমুখে নীল বসন, ঢাকলেন চাঁদ বদন।
(একবার) চেলে নাই রাই বদন তুলে, বক্ষভাসে চক্ষের জলে,
(তাতে) মনের আগুন দ্বিগুন জ্বলে, দহিছে জীবন ॥
মিল—(দেখে) কালবরণ কালাচান্দে, রাইকমলিনী, হয়ে মানিনী
মনের খেদে কেন্দে বলে, কৈরে অতি করুণা।
মুখ—ও বিশাখা প্রাণসখী, মনে রে সুধাব কি—
কাল রূপ আর চক্ষে হেরব না।

ধুয়া—কালার প্রেমে মন সঁপিলে, বিসর্জন ঐ কুলেশীলে,
একুল ওকুল দু'কুল যায়—
হলেম কৃষ্ণ প্রেম কলঙ্কিনী, কুলে থাকা দায়,
কুটিল কালা বংশীধারী ঘঠালে কি যন্ত্রণা।
খাদ—কালরূপ সই কাল হইল, দুঃখে বাঁচি না ॥
লহর—ত্যাজব কাল আঁখি, কাল কেশ মুড়াব সখী কৈরেছি এ পণ,
( সই গো ) কাল কোকিল, কাল মেঘে, হেরব না কখন ॥
( আমি ) যাব না কালিন্দীর জলে, কাল রূপ নেহারি বৈলে,
ত্যাজ্য করব কাল বৈলে, শ্রীঅঙ্গের ভূষণ ॥
মিল—গেল কুল মান, শঠের প্রেমে বিচ্ছেদ ভাল—সহে না প্রেম গঞ্জনা ॥
অন্তরা—সঁপে কুলমান, নিঠুর কালার প্রেমে সজনী।
গেল নারীর মান, হলেন তাই অপমান, গোকুলে নাম কলঙ্কিনী ॥
সে লম্পট বংশীধারী, তাই মজালে কুলনারী, কৈরে ছল চাতুরী।
মনে এই বাসনা, আর হেরব না নিদয় শ্যাম চিন্তামণি ॥

## বিরহ আগুন—১নং ( বা সদর )  রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন, সহস্রগুন রাধিকার বক্ষে।
পাড়ন—ছুটল আগুনের বাণ, কে তাহা করিবে নির্বাণ,
দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষে ॥
ফুকার—রাধার বক্ষ মাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল,
নাইরে বল, জল বিনিময়, নয়নে অনল।
উপসর্গ দীর্ঘশ্বাসে, দীপ্তানল ঢালে বাতাসে,
রসময়ের রসের আশে, বিবর্ণ রাইস্বর্ণ শতদল ॥
মিল—অতিভগ্নদেহ আগ্নেয়গিরি, কাতর স্বরে কিশোরী,
উদ্গারে দীপ্ত অঙ্গার।
মুখ—জ্বলে আগুন হৃদয় মাঝে, পারি না যে সহিতে সই আর ॥
ডাইনা—কোথা গেলে জুড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী,
চিনিতে না পারি আমি, দিবা রজনী। ( সবই দেখি দীপ্তিময় ) আমার নাই মরণ, নাই মরণের ভয়। সবই দেখি····যে পথে চলিত বন্ধু, সে পথের ধূলি, দুঃখের কালে বক্ষে মাখি, শীতল জলে গুলি। ( আমার তবু তো প্রাণ জুড়ায় না লো ) সকল পুড়ে গেল লো জ্বলে গেল ) তবু ত প্রাণ····মনে ভাবি মনোমোহনের পরশ রস আছে, সতত আলিঙ্গন করি, কত কত গাছে। ( দেখি গাছ ভরা বিরহ বিষে গো )

তাল তমাল শাল রসাল বকুল, সবাই আমায় করল ব্যাকুল,
কোন কালে পাব কি কূল—এ বিচ্ছেদ অকূল পাথার।
খাদ—ত্বরিতে তরিতে করি কত পরকার ॥
ফুকার—সখী যে বনে শ্যাম আমায় নিয়ে করিত ভ্রমণ,
অনুক্ষণ ভুলে তথায় করি অন্বেষণ।
যেন তারে দেখি দেখি, ও ভুলের দেশে ভাল থাকি,
ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী, আগুনে আবৃত বৃন্দাবন ॥
মিল—আমি কত করি মরিবার কারণ, এ ঘটে ঘটে না মরণ,
মরার দেশ কি হলেম পার ॥
অন্তরা—আমার শ্যাম প্রেম পরশমনি—বুকে পেলে জুড়াইত বুক।
আমি আর কবে হেরিব সে চাঁদমুখ ॥
সখি গো, ভালবাসার বাসা দিলেম, যতনে পুষিয়েছিলেম,
হৃদয়-পিঞ্জরে শ্যাম-শুক।
হৃদয়-পিঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শুক পাখি গিয়েছে উড়ে,
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ ॥
( ও সখী গো ) জাতি কিদ্যা কুলমান, জীবন যৌবন মন প্রাণ,
সকলি দহিল সর্বভূক।
একা মাত্র আমি আছি, এত পোড়ায় কেন বাঁচি,
আমার কেন বা পোড়ে না 'আমি'-টুক ॥
পরচিতান—সখী দিব্য অগ্নির সপ্ত জিহ্বা ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
আমার এ আগুনে কত জিহ্বা কেবা জানে,
সহে না নয়নে প্রাণে, অসহ্য দহন ॥
৩য় ফুকার—বন্ধুর রূপের ধ্যানে পূর্ণ করি হৃদি শতদল, হই শীতল ;
ধ্যান ভাঙিলে আবার সেই অনল।
জল নয় সে সুশীতল করে, আগুন নয় পোড়ায় আমারে,
এত কাঁদায় জনম ভরে, তবু তারে চাই কেন সই বল ॥
মিল—আমার তোরা ব্যতীত ব্যথার ব্যথীত নাই,
তাই তোদের পায় ধরে জানাই—
করতে ইহার প্রতিকার ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—দেখে রাই রঙ্গিনীর উন্মাদনা, অমনি সঙ্গিনীগণ কয়।
পাড়ন—তোরে বলবো কি বিধুমুখী, কৃষ্ণসুখে তুই সুখী,
কেন দেখি হেন বিপর্যয় ॥

১ম ফুকার— বললে, সবাই আমায় করল ব্যাকুল, কোন কালে পাব কি কূল,
বিচ্ছেদের অকূল পাথার ;
যদি বিচ্ছেদ সাগর হবি পার।
সাজাইয়ে দেহতরী, প্রেমানুরাগ বোঝাই করি,
রাই তোর ধৈর্য্যকে করে কান্ডারী, পার হয়ে যা পারাবার ॥
মিল—আঁধারের পর আলোরাশি বিধাতার বিধান,
কান্নার পরে হাসির তুফান, দুঃখান্তে সুখ কার না হয়।
মুখ—দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা, দুঃখবিনা সুখী কেহ নয় ॥
ডাইনা—কোথায় গেলে পাবি তারে, শুনতে চাইলি রাই ;
কান্তের জন্য কাঁদিস্ শুধু, অন্তর্দৃষ্টি নাই।
প্রেমময় শ্যামসুন্দরে, পাবি না হাটে বন্দরে,
আছে তোর হৃদি কন্দরে, মন-মন্দিরে মনোময়।

খাদ—প্রেমিকে করে না কভু প্রেম বিরহের ভয় ॥
ফুকার—বললে, ভুলের ঘোরে ভাল থাকি, ভুল ভাঙ্গিলে দেখি সখী,
শ্রীবৃন্দাবন অগ্নিময় ;
রাধে, করিস না আগুনের ভয়।
সৌভাগ্য বাতাসে যবে, শ্যাম জলধর উদয় হবে,
প্রাণের সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন মেঘের বরিষায় ॥
ফুকার—বললে, হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুকপাখি গেল উড়ে ;
পোষা পাখি থাকে যার ;
উড়ে গেলেও আসে আবার।
আসা পানে চেয়ে থাকিস্, আবেগে নাম ধরে ডাকিস্,
পাখির অপেক্ষাতে খুলে রাখিস, হৃদি পিঞ্জরের দুয়ার ॥
ফুকার—বললে, এত কাঁদায় জমন ভরে, তবু কেন চাহি তারে,
যার জন্যে যার প্রাণের টান ;
ছোটে নয়ন গঙ্গায় প্রেমের বান।
যত কাঁদায় বন্ধু তোরে, ততই সে বাঁধা পড়ে,
হয় না জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, প্রেমের কান্নার অবসান ॥

## বিরহ আগুন—২নং (বা দোসরা) রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—সখী তোরা আমায় কত রকম দিলি উপদেশ।
পাড়ন—ও সব উপদেশ জল সিঞ্চনেও নাই কিঞ্চিৎ ফল,
প্রেমের অনল, ক্রমে প্রবল, হবে না লো শেষ ॥

ফুকার—বন্ধুর অবিচ্ছিন্ন চিন্তার ধারা ঘৃতাহুতির প্রায়,
অগ্নি পায়, প্রবল হয়ে আমাকে পোড়ায়।
পিপাসায় যখনে জ্বলি, ও—আশা দেই তার জলাঞ্জলি,
যতই ভাবি ভুলি ভুলি, পোড়া মন তার রূপ ধরে দাঁড়ায় ॥
মিল—তারে ভুলে যাব ভাবিলে মনে, সেই চিন্তায় সহস্র গুনে,
আমার এই আগুন বাড়ে।
মুখ—তোরা আমায় বলে দে তো, আমার মতো
সে ও কি পোড়ে ॥

ডাইনা—যে যাহারে ভালবাসে, তার আশে তার কাঁদে প্রাণ; আমায় ভালবাসে কি না, করতে নারি অনুমান ॥ (প্রাণে প্রাণ বান্ধিয়া) আমায় কাঁদায় না কি সে কাঁদিয়া। আমার মত যদি এত পুড়িত আগুনে, সাধ্য কি তার, একবার একবার না দেখে নয়নে। (সে কি বেশী পোড়া সইতে পারে গো) (নইলে কেমন করে রইতে পারে গো) আমি যেমন পরাধীনা, সে তেমন নয় লো। আসিতে দাসীর পাশে, কারে করে ভয় লো ॥ (আমি কাঁদি সখী সে কি জানে গো) (এ ঢেউ লাগে কি সেই প্রাণের প্রাণে গো) আমারে কাঁদায়ে সখী, আমার চেয়ে সে কি সুখী, আমি তার কি, সে আমার কি, তাহার কি মনে পড়ে।

খাদ—মনের মানুষ মন হতে কি কোন দিন ছাড়ে ॥
ফুকার—সখী অভিমানে দুর্জয় মানে কাঁদালেম যত,
সে নাথ কাঁদিলে প্রাণ কেঁদে উঠিত।
মলিন দেখলে মুখ-শশী, তার চেয়ে পুড়িতাম বেশী,
যারে এত ভালবাসি, সে কি হবে না প্রেম আশ্রিত ॥
মিল—তারে এত ডেকে পেলেম না দেখা—
বেঁধে রাখল কোন্ প্রেমিকা, কঠিন প্রেম নিগড়ে ॥
অন্তরা—সখী আমার এই বুকের আগুন নিভে কি যাবে মরিলে;
আগুন কোন্ মহাজন সৃজন করিলে ॥
ও সখী গো, এ দেহের হলে পঞ্চত্ব, পঞ্চে মিলে পঞ্চ তত্ত্ব,
প্রেমের আগুন কোন্ তত্ত্বে মিলে।
ও সখী গো, এ আগুন যে তত্ত্বের অতীত, জানে না কেউ ব্যথার ব্যথীত,
আমার চিৎ জড়িত, এই তড়িৎ জালে।
ও সখীগো, যদি লো সই তাহার বুকে, এই আগুনের কিছু থাকে,
পরলোকে দরশন পেলে।
ও সখীগো, এই আগুন নিভিতে পারে, জন্মমৃত্যুর পরপারে,
যদি সেই আগুনে এই আগুন মিলে ॥ ও সখীগো····

পরচিতান—সখী পুড়ে পুড়ে আমার দেহ হয়ে গেল ছাই।
পাড়ন—আর এই দেহের দ্বারা, হবে না তার সেবা করা
বাঁধন খুলে দে লো তোরা, বিদায় হয়ে যাই॥
ফুকার—সখী আবার যদি পুনর্জন্মে পাই মানব দেহ,
এই লেহ ভুলিয়া তো রব না কেহ।
এই আগুন তার বক্ষে দিব, ও····পরকে আপন করে নিব,
নাশ হইব, না সহিব এ হেন দুরূহ বিরহ॥
মিল—সখী যে দেশে সেই নিঠুরের বাসা,
প্রাণে নিয়ে প্রবল আশা, সেই দেশে যাব উড়ে॥

ঐ—জবাব    নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—কেন আবার দেখি বিধুমুখী এত হলি উতলা।
পাড়ন—আছে মথুরাতে বন্ধু তোর, সেই দুঃখে হলি কাতর,
ধৈর্য্য ধর গো রাই রাজবালা॥
ফুকার—বললে, ভুলি ভুলি মনে করি, কেন তারে ভুলতে নারি,
বলে দে আমার নিকট, রাই তুই ভুলে যা ভুলের কপট।
বন্ধু কি তোর ভোলার পাত্র, মুদে দেখ তোর যুগল নেত্র,
রাই তোর চিত্তপটে আঁকা চিত্র, চিত্ত চোরের চিত্রপট॥
ফুকার—বললে, মলিন দেখে মুখশশী, তার চেয়ে কাঁদিতেম বেশী,
তুই কাঁদিস যাহার আশে; সেও কাঁদতেছে তোর উদ্দেশে।
যার জন্যে যে কেঁদে মরে, সে কি না কাঁদিয়ে পারে,
বন্ধু থাক না সাত সমুদ্রের পারে, এই ঢেউ যাবে সেই দেশে॥
ফুকার—বললে, পরজন্মে পেয়ে দেহ, ভুগিতে না হয় বিরহ,
প্রেম রাজ্যের এ রীতি নয়; রাধে করিস না বিরহের ভয়।
গ্রীষ্মের পরে এলে বৃষ্টি, হর্ষপূর্ণ সারা সৃষ্টি,
তেমনি বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টি, মধুর হতে মধুময়॥
ফুকার—আবার বললি আমি কাঁদি সে কি লো জানে—
সখী তারই কান্নার ঢেউ লেগেছে—তোর নয়ন কোণে;
মনে মনে সে কেঁদে আকুল।
প্রাণ বঁধুয়া প্রেম বারিধি, তুই তো রাধে শাখা নদী,
সাগরে বান ডাকে যদি, ভরে ওঠে নদীর কূল॥
মিল—মন্মথ প্রেমাশ্রিত তোর প্রেমরসে;
থাকুক না সে দূর বিদেশে, অন্য রসে রসবে না।
মুখ—তুইও পুড়িস সেও পোড়ে, পুড়ে পুড়ে নির্মল হয় সোনা॥

ডাইনা—বললি, তোরে কাঁদায়ে কি সুখী নাকি সে,
মন্মথ স্নাতপূত তোর কান্নার রসে।
প্রেমাগুনে পুড়ে দুজন, করেছিস নিষ্কামের ভজন,
বন্ধু খাতক তুই মহাজন, প্রেমের কান্নায় সেই দেনা ॥
খোঁচ—প্রেমাগুনে পোড়ায়ে দে কামের কামনা ॥

**সখী-সংবাদ ( রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন )—১ রাজেন্দ্রনাথ সরকার**

চিতান—কাঁদে কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই।
পাড়ন—ভ্রমে দ্বাদশ বনে, প্রিয়তমের লীলাস্থানে,
ভাবে ডুবে নাই রে মনে, সে যে ব্রজে নাই।
ফুকার—নিষ্কাম প্রেমের বেগ এমন, এ দেশে ছেড়ে মন,
কোন এক অচিনা নগরে গিয়ে করিছে ভ্রমণ ;
দেখে যোগ বিনে জ্যোতির্ময় দিবা, গোপিনীর সৌভাগ্য কিবা,
করে কৃষ্ণ প্রেমের সেবা, আত্মজ্যোতিঃ ভাবে সাধারণ ॥
মিল—মিলন লালসে, নয়ন জলে ভাসে রাধার বয়ন,
কবে নিকুঞ্জ শয্যায় শয়ন, বলে শ্যাম প্রেয়সী।
মুখ—আমায় বলগো সখী, দিন যেতে আর কত বাকি,
শীঘ্র নিশিতে পাব নাকি, আমার নিশির শশী ॥
ডাইনা—আমার প্রাণ যে মানে না ধৈর্য, বিনা সে প্রাণেশ্বর,
এই তো এক দিনে, জ্ঞান হয় মনে, যেন শত বৎসর ;
জোড় করে দিবাকরে, বল তোরা সকাতরে,
ডুবে যাক তার বাসর ঘরে, আসুক সুখের নিশি।
খাদ—( এই ) আলোকে আমার চক্ষে লাগে অগ্নিরাশি ॥
ফুকার—আমার আলোকে আঁধার, বিনে গুণাধার,
ও তার মিলন নিশির সুর বাসি আলোকের আধার ;
আমার এ উত্তাপ হল না সহ্য, পিপাসায় পরাণ অধৈর্য,
ময়ূরপাখা সখার পূজ্য, আমার বুকে বাতাস দে লো তার ॥
মিল—তোরা কেমনে ধৈর্য ধরিস, এমন করিস না তো,
আমি একাকী আমার মতো, এত কাঁদি হাসি।
অন্তরা—যবে মিলন মাধুরী, আস্বাদন করি,
সে সুখ-শর্বরী পলকে পোহায়।
আমি সে বিনে সেবিনে দিনে, তাই বুঝি দুর্দিনে,
আমায় পেয়ে তার অধীনে, আগুনে পোড়ায় ॥

হেরি মরুভূমির মৃগীর সমান, জীবনের ভানে আগুনের বাণ,
হল না হল না দিবা অবসান, প্রাণ গেল পিপাসায়।
নিদাঘে কি দাগে লাগে দারুণ বেদনা,
তাতো অরুণে বোঝে না করুণ কান্নায় ॥
পরচিতান—আমার উপসর্গের উপসর্গ সুদীর্ঘ দিবস।
পাড়ন—আলিঙ্গনে বন্ধু, ভরে দিল হৃদয় সিন্ধু,
এই তাপেতে নাই একবিন্দু, সেই পরশের রস ॥
ফুকার—আমি যখন তারে পাই, সকল ভুলে যাই,
আবার এলে তারে, মনে করে বলে দিস সবাই ;
যেন দিনের মধ্যে একবার এসে, রসময় আমার পরশে,
সে বিনে আর পোড়া দেশে, জুড়াতে তো আমার কেহ নাই ॥
মিল—সখী দিবাকে ভালবাসে এদেশে সর্বজন,
সে তো নয় আমার বন্ধুর বরণ, তাইতে মন্দ বাসি ॥

ঐ—জবাব — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—তখন রাই রঙ্গিনীর বাক্য শুনে সঙ্গিনীগণ কয়।
পাড়ন—তোরে বলব কিগো কিশোরী, ব্রজে নাই সে শ্রীহরি,
তাইতে হেরি, ভাবের বিপর্যয় ॥
ফুকার—রাই তোর বন্ধু গেল মধুপুরে, হারা হয়ে প্রাণবন্ধুরে,
দারুণ বিরহের সময়, কৃষ্ণ ভাবাবেশে তন্দ্রা হয় ;
ভাবের তন্দ্রার সূক্ষ্মগতি, আত্মায় জাগে আত্মজ্যোতি,
তখন জ্ঞান থাকে না দিবারাতি, বিশ্বব্যাপী মহাজ্যোতির্ময় ॥
মিল—তোর প্রাণে নাই ভাবের আবেশ দিবসের শেষে,
শ্যামকুঞ্জে মিলিতে এসে, ভ্রান্তিতে কাঁদতেছিস রাই।
মুখ—যামিনী গভীরা সময়, ভামিনী তোর কি ভাব দেখতে পাই ॥
ডাইনা—আবার বললি একদিনে জ্ঞান হয় শত বৎসর,
মনে নাই কি শত বৎসর গেছে প্রাণেশ্বর ·
নয় সে দিবা নয় সে রাতি, কোথায় দেখলি সূর্যের ভাতি,
ওসব রাই তোর আত্মজ্যোতি, এ সূর্যের আর অস্ত নাই।
ফুকার—বললি, এ উত্তাপ আর হয় না সহ্য, ময়ূর পাখা সখার পূজ্য,
তাই দিয়ে সই দে বাতাস, তাতে এ উত্তাপ হবে না নাশ,
ত্রিতাপের তাপ যাবে বলে, সে তাপ নাশে এ তাপ এলে,
এ তাপ যাবে না অনন্তকালে, এ তাপ যে স্বতঃ প্রকাশ ॥

ফুকার—বললি, দিনের শেষে একবার এসে, সে যেন আমায় পরশে,
বলে দিস গো সখীগণ, রাই তুই খুঁজে দেখ তোর নিজের মন ;
বন্ধুর প্রেমরসের পরশে, নিত্য প্রেম সুধা বরষে,
সে তোর প্রেম স্বরূপে প্রাণে হাসে, আবার কিসের আলিঙ্গন ॥

## রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন—২নং রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—আমার স্তর ছেড়ে নিরন্তর, অন্তর করিছে বিশ্রাম।
পাড়ন—তোদের কথা শুনে, বুঝি আমি বাহ্যজ্ঞানে,
পেলেম বিরহ দহনে, চরম পরিণাম ॥
ফুকার—পেলেম দেশ ছেড়ে সে দেশ, লাঘব হল ক্লেশ,
আবার তোদের টানে এইখানে মন করেছে প্রবেশ ;
আমার বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে,
একা আমি আছি কেনে, পোড়া আমি'র হবে না কি শেষ ॥
মিল—পোড়ায় অহরহ বিরহ অগ্নির মহাজ্যোতিঃ ;
পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণাহুতি, আজও শেষ হল না।
মুখ—তারে পাব বলে, শত বৎসর মরি জ্বলে,—
সখী বলগো আমি না ম'লে, তারে পাব কিনা ॥
ডাইনা—সখী কাল আসবে বলে কালাচাঁদ গিছে চলিয়ে,
সে কাল আছে কি গিছে, তোরা আমায় দে বলিয়ে ;
এ প্রাণ যার প্রেমে পোড়ে, সে প্রাণ কার কঠিন ক্রোড়ে,
আমার এ আগুন ভুবন পোড়ে, সে দেশ কেন পোড়ে না।
খাদ—না পুড়লে আমার পোড়া, সে তো বুঝিবে না ॥
ফুকার—আমায় ছেড়ে সে নিঠুর, আছে বহুদূর,
আজও তার প্রাণে বাজে না আমার মুমূর্ষুর এই সুর ;
আমার সোনার তনু পুড়ে কালা, কালার নাই সে পোড়ার জ্বালা,
পুড়িলে সে এত বেলা, কালা দেহ হইত গৌর ॥
মিল—সখী সে বিনে কুসুম শয্যা, আমার অগ্নিশয্যা,
আমার পুড়েছে কুল লজ্জা, তার আর নাই নিশানা ॥
অন্তরা—আমি জুড়াইবার লাগি, যোগীর রাজ্যে জাগি,—
যোগামৃতের ভাগী, হলেম না সেখানে।
আমি শ্যাম বিয়োগে মহাযোগে, মহারোগে জ্বালায়,
আমায় আলোকমালার খেলায়, জ্বালায় আগুনে ॥

অকূল পাথারে তারে যদি পাই, দু'কূল হারালে আকুলতা নাই,
তার মাঝে যদি আমারে হারাই, সুখ স্মরণে মরণে।
মনের অনুরাগে, প্রাণে জাগে, যে দেশে তার ছবি,—
যেন সেই দেশেতে ডুবি, ভাবের তুফানে ॥
পরচিতান—আমার নিরানন্দে আনন্দ দেয়, বন্ধুর প্রেম আগুন।
পাড়ন—ও তার ব্যবহারে, কত মন্দ বাসি তারে—
আবার যে প্রাণ কেমন করে, স্মরণে রূপ গুণ ॥
ফুকার—কোন দেশে গিয়ে জুড়াব হিয়ে,—
এমন শান্তিধাম কি লাভ হবে না, পোড়া শেষ হয়ে ;
যথা দুই দেহ হয়ে এক দেহ, যোগ করিয়া মনের সহ,
প্রেমের কেলি প্রেমোৎসাহ, করবো দু'জন সকল ভুলিয়ে ॥
মিল—আমি যে দেশে গিয়েছিলেম, আমার বন্ধুর খোঁজে,
পেলে সেই দেশে রসরাজে, আমার যায় যাতনা ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—কেন আবার দেখি বিধুমুখী, এত উতলা তোর মন।
পাড়ন—ও তোর বন্ধু আছে মধুপুর, মনের ভ্রান্তি কর না দূর,
প্রাণের ঠাকুর পাবি দরশন ॥
ফুকার—বললি, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, একা আমি বই কেমনে,
এ আমি সই কিসে যায়, রাই তুই শ্যাম পাবি আমি'র কৃপায় ;
তোর মাঝে শ্যাম পাকা-আমি, তুই ভাবিস তুই একা আমি,
রাই তোর আমি থাকলে জগৎ স্বামী, আবার এসে ধরবে পায় ॥
মিল—সুখ দুঃখ আর কান্না হাসি প্রেম রাজ্যের রীতি,
তবে কেন রাই শ্রীমতী, ত্যজবি প্রাণ অভিমানে।
মুখ—মড়ার বাকি আছে বা কি, প্রেমের মড়া লয় কি শমনে ॥
ডাইনা—আবার বললি, প্রেমাগুনে পুড়ে মরি সই.
যে দেশে প্রাণ বন্ধু আছে, সে দেশ পোড়ে কই ;
মাধুর্যের নায়িকা তোরা প্রেমানলে নিত্য পোড়া,
ঐশ্বর্যের রাজ্য মথুরা, পুড়বে না প্রেম আগুনে ॥
ফুকার—বললি, বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে,
একা আমি কেন রই, তবে কোথা যাবি রসময়ী ·
শ্যাম গিয়েছে তুইও যাবি, মথুরাতে যুগল হবি,
তবে কার হাতে আজ সঁপে দিবি, সেবাদাসী প্রাণ সই ॥

ফুকার—বললি, এ প্রাণ যাহার প্রেমে পোড়ে, সে জানি কার কঠিন ক্রোড়ে,
আছে সখী বল না, কেন আগুনে দেশ জ্বলে না ;
শ্যাম গিয়েছে যেই দেশে, আগুন লাগলে সেই দেশে,
কৃষ্ণ প্রেমবারির শীতল পরশে আগুনে ফল ফলে না ॥
ফুকার—বললি, দুই দেহ এক দেহ হবি, প্রেম কেলি উৎসবে র'বি,
এক দেহের আর বাকী কি, সে যোগ হবার বাকী আছে কি ,
রাধা পাত্রী কৃষ্ণ পাত্র, প্রেমের মিলন অহোরাত্র,
খুলে দেখ তোর যুগল নেত্র, চিত্ত চোর কমলাঁখি ॥

পূর্বরাগ—চিত্রপট ( ১নং বা সদর )    নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—নারীর বাল্য আর পৌগণ্ডের শেষে, কৈশোরে কিশোরী বেশে,
জীবনে যৌবনে আসে, ও প্রেমরসের জোয়ার।
পাড়ন—তখন ধুলোখেলা চায়না প্রাণে, মন ভ্রমে আশার বিমানে,
অজানা কোন দেশের পানে, ও লক্ষ্য যেন তার ॥
ফুকার—একদিন যমুনার তটে, বসে বংশী বটে, রাস-রসময় কালা,
মধুর মুরলী বাজায়ে, গোকুল মজায়ে, খেলিছে রসের খেলা।
বাঁশী স্বরে যেন অমৃত মিশ্রিত, শুনে ধ্বনি বাঁশী মুখ বিনিসৃত,
কুল লজ্জা ধৈর্য হয়ে বিস্মৃত, জলে চলে কুলবালা ॥
মিল—জলের ঘাটে বংশী বটে হেরে শ্রীহরি, বিশাখা সেই চিত্র করি,
ও দেখাইল রাইকে এনে।
মুখ—চিত্রপটে চিত্র দেখি, রাই বলে বিশাখা সখী,
এ কি দেখি জেগে স্বপনে ॥
ডাইনা—চিত্রপটে চিত্র হেরি, মত্ত হল চিত্ত করী,
বল দেখি গো চিত্রকরী, এ বিচিত্র চিত্র কার।
রূপ দেখে গিয়েছি ভুলে, এ রূপ তুলিতে তুলে,
আমায় কিনে নিলি বিনা মূলে, দিয়ে হেন উপহার ॥
ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সুচারু, বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু,
কল্পনাতীত কল্পতরু, ছিল কার হৃদি-নন্দনে।
খাদ—কে পূজিত এ মূরতি প্রীতি চন্দনে ॥
ফুকার—সখী চিত্রপটে এঁকে, দেখালি আমাকে, কাহার রূপ মাধুরী,
নাকি মনের-মানসে, গড়ে এ মানুষে, করিলি হেন চাতুরী।
অধরের হাসি অমিয় ক্ষরিত, প্রতি অঙ্গে যেন অনঙ্গ জড়িত,
নয়নে পূরিত বিদ্যুৎ তড়িত, পরাণ করিল চুরি ॥

মিল—যে চোখে দেখিয়ে তাহার এঁকেছিস চিত্র,
পবিত্র হয়েছে নেত্র, অপরূপের দরশনে ॥
অন্তরা—ও তুই সখী সাথে, জল ভরিতে, কোন ঘাটেতে গিয়েছিলি।
পথে পেয়ে রত্ন করে যত্ন, আমাকে আনিয়ে দিলি ॥
ও সখী গো, দেখে যাহার প্রতিকৃতি, হল মোর চিত্ত বিকৃতি,
দেখে তার স্বরূপাকৃতি, কেমনে রলি।
সখী আমি হলে, যেতেম গলে, পাষাণ বলে ফিরে এলি ॥
পরচিতান—সখী, এতরূপ, মানুষের থাকে, কে দেখেছে এই ত্রিলোকে,
কর্মগুণে চর্ম চোখে, পেলি দরশন।
পাড়ন—তোরা আমায় নিয়ে চল সে ঘাটে, দেখে আসি বংশীবটে,
সে রূপ যদি ভাগ্যে ঘটে, জুড়াব নয়ন ॥
ফুকার—কত সুন্দর করিয়া, উহারে গড়িয়া, বিধাতা দিয়েছে সখী,
আমার কুল লজ্জা ভয়, গেল সমুদয়, সে রূপ মাধুরী দেখি।
কত শত চিত্র দেখি চিত্রপটে, তা হতে এ চিত্র বিচিত্রই বটে,
এঁকে দেগো সখী মম চিত্তপটে, গোপনে লুকায়ে রাখি ॥

ঐ—জবাব নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান—দেখে রঙ্গময়ীর বিচিত্র ভাব দুঃখে বিশাখা বলে।
পাড়ন—দেখে চিত্রপটে এ চিত্র, কেন শিহরে গাত্র,
পদ্ম-নেত্র পূর্ণিত জলে ॥
ফুকার—আমি নিরজনে আনমনে, আঁকিয়াছি হেন ধনে,
ভাবলেম আমি আঁকার পর, এতো রাই বরবর্ণিণীর বর।
ও সুন্দর আর তুই সন্দরী, মিলবে যেন হবগৌরী,
ওকে হৃদিপীঠে স্থাপন করি, নয়ন জলে পূজো কর ॥
মিল—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বলে সকলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হলে,
প্রেমের মান রয় না কখন।
মুখ—মধুর প্রমে কত ব্যথা, কত বাধা কত না বন্ধন ॥
ডাইনা—তোর হৃদি কাননে ছিল, কল্প-বৃক্ষ শ্যাম;
ডালে মূলে উপাড়িয়া ফেলিল শ্রীদাম।
শ্রীদামের শাপ ঝঞ্ঝাবাতে, উড়ে এসে গোলোক হতে,
তোর তরে এই গোকুলেতে, হয়েছে নন্দ-নন্দন।
খাদ—আর এক কথা শুনে আমার মন করে কেমন ॥

ফুকার—বললে, নাকি তোর মনের মানসে, গড়িলি হেন মানুষে ;
তুচ্ছ মনের কল্পনায়, সখী এ মূর্তি কি আঁকা যায়।
দেখলে রূপের অভিব্যক্তি, মন ভুলে যায় মনন শক্তি,
রেখে কৃষ্ণ পদে নিষ্ঠা ভক্তি, এঁকে দেখালেম তোমায় ॥
ফুকার—বললে, অঙ্গে অনঙ্গ জড়িত, নয়নে যেন তড়িত ;
বিদ্যুতেরে তড়িৎ কয়, উহার ঝলক দেখলে করে ভয়।
বিদ্যুৎ বিকাশ হলে পরে, সঙ্গে সঙ্গে বজ্র পড়ে,
পড়লে বিরহ-অশনি শিরে, প্রাণ হারাবি সুনিশ্চয় ॥
ফুকার—বললে, আমি হলে যেতেম গলে, ফিরে এলি পাষাণ বলে ;
তুইতো প্রেম-তরঙ্গিনী, না হয় আমি হলেম পাষাণী।
এই পাষাণের বক্ষ চিরে, নদনদী বয় এ সংসারে,
যদি পর্বতে না বরফ পড়ে, জন্মে না স্রোতস্বিনী ॥
ফুকার—বললে, চিত্তপটে দেলো আঁকি, হৃদয়ে লুকায়ে রাখি ;
ঘুচায়ে মনের কপট, রাই তোর মনের মানুষ সন্নিকট।
কাজ কি তোর বাহিরের চিত্র, মুদে দেখ না কমলনেত্র,
রাই তোর চিত্তপটে আছে চিত্র, চিত্ত-চোরের চিত্রপট ॥

**পূর্বরাগ—চিত্রপট (২নং বা পালট)** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—বললি, এঁকে শ্রীনন্দ নন্দনে, আজ আমার হৃদিনন্দনে,
আনন্দ মুরতি এনে, করলি পীঠস্থান।
পাড়ন—ও যার এত প্রীতি দরশনে, কি জানি হয় পরশনে,
বিরহ প্রেম শরাসনে, দহিছে পরাণ ॥
ফুকার—সখী নামটি উহার কৃষ্ণ, নাম শুনে সতৃষ্ণ, হয়েছে পরাণ পাখী ;
তোরা নিয়ে চল আমারে, গিয়ে উড়ে উড়ে, বন্ধুরে নয়নে দেখি।
প্রেম রাখিব পাখার পঞ্জরে পঞ্জরে, নাম লিখিব দেহের পাঁজরে পাঁজরে,
কোটি জন্ম যেন শ্রীপদ পিঞ্জরে, বন্দিনী হইয়ে থাকি ॥
মিল—যা পড়াবে তাই পড়িব, ধরব কৃষ্ণ বুলি,
নৃত্য করব পাখা তুলি, বলে কৃষ্ণ হরে হরে।
মুখ—প্রেম শিকলে পড়ব আঁটা, শ্যাম কলঙ্ক কুলের খোঁটা,
লাগুক মিঠা শ্রুতি বিবরে ॥
ডাইনা—ব্রজবাসীর কি সৌভাগ্য, কৃষ্ণ কৃপা পাবার যোগ্য,
অহোভাগ্য মহোভাগ্য, ব্রজকৌ নন্দক শ্যাম।
বাৎসল্য প্রেম বিলাইতে, নন্দকে ডাকিলেন পিতে,
নন্দরানী মায়ের হাতে, উচ্ছিষ্ট খান বাঁকাশ্যাম ॥

সৌখ্য দিয়ে সখার শিরে, শিক্ষা দেয় ব্রজবাসীরে,
দাস্য প্রেমে এ দাসীরে, রাখুক সেবাদাসী করে ।
খাদ—প্রেমনগরে শ্যামনাগরে রাখব আদরে ॥
ফুকার—ও তুই ধন্য বিশাখীকে, ধন্য তোর আঁখিকে, ও রূপ ধরিয়ে ছিল ;
দিয়ে গোবিন্দ সুন্দরে, অন্ধের মন্দিরে, আঁধারে জ্বালালি আলো ॥
বাসনা মিটে না পটে দিয়ে আঁখি,
আঁখির বাসনা হতে কোটি আঁখি,
কত পুণ্যে যেন, তোর ও দুটি আঁখি, দেখে তিরপিত হল ॥
মিল—যে আঁখিতে দেখে এলি অপরূপের রূপ,
আমার আঁখি হলে সেরূপ, ডুব দিতেম শ্যাম রূপসাগবে ॥
অন্তরা—ও তুই কৃতসিদ্ধা চিত্রবিদ্যা শিখেছিস কোন সাধনে।
ঐ রূপ চক্ষে দেখে, মনে এঁকে, চিত্রে লিখে দিলি এনে ॥
সখীগো, মন পেলে মননাশক্তি, প্রাণে পায় প্রণয়ন শক্তি,
শ্যামস্বরূপের অভিব্যক্তি, জাগায় পরাণে ॥
আমার দিঠিশূন্য দুটি নেত্র, ব্যর্থ হল শ্যাম দরশনে ॥
পরচিতান—সখী মানুষ দেখে মানুষ ভোলে, এমন মানুষ কয়জন মিলে,
এ সুজনেব ভজন ফেলে, কেমন করে রই ।
পাড়ন—সখী এ সংসারে মানুষ যত, সবই কি মানুষের মত,
মানুষ মিলে শত শত, মনের মানুষ কই ॥
ফুকার—কিবে জিনিয়ে কজ্জল, বরণ উজ্জল,—তোরা যদি বলিস কালো,
তবু শ্বেত রক্ত পীত, অন্য বর্ণ যত, তা হতে এ কত ভালো ।
কালো মেঘের কোলে, খেলে সৌদামিনী,
অমানিশার কোলে পূর্ণিমা যামিনী,
এ কালোর কোলে, হলে গৌরাঙ্গিনী, ভুবন করিতো আলো ॥

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—তোর যে মূর্তি দেখে আর্তি বাড়ে, প্রাণে প্রবল প্রেমক্ষুধা ।
পাড়ন—তোরে দিতে হবে প্রেম শিক্ষে, দাঁড়াইয়ে বিপক্ষে,
করবি রক্ষে আত্মমর্যাদা ।
ফুকার—রাধে তুই হবি তার সহযাত্রী, সামর্থ্যা প্রেমের পাত্রী,
করতে হবে প্রেমসাধন, করবি অধিকার সমান আসন।
রূপগুণে ক্যান ডরাবি, প্রেম-পাণি ক্যান শিকল পরাবি,
তারে মাঝে মাঝে পায় ধরাবি, তুই ধরবি ক্যান তার চরণ ॥

মিল—জপমালা তোর শ্রীকৃষ্ণ নাম, তার মালা রাধা—
যুগল নামের প্রেম সুধা, আমাদের প্রেম ক্ষুধায় দিস্ ।
মুখ—তোষিবি সরল ব্যবহারে, আমরা তোরে করি লো আশিস্ ॥
ডাইনা—দাস্যপ্রেমে শ্যামের বামে র'বি কি কারণ,
দাসীরা কি করতে পারে মধুর প্রেম সাধন ;
আগে করে দেখাদেখি, প্রাণে করে মাখামাখি,
প্রেম নামে ওই শ্যাম শুক পাখী, হৃদয় পিঞ্জরে পুষিস্ ।
খাদ—ষোল আনা ধরা উচিত আমার পরামিশ ॥
ফুকার—বললি, দেখে রূপের দীপ্ত আলো, কত পুণ্যে তৃপ্ত হল,
বিশাখা লো তোর নয়ন ; আমার তৃপ্তি ত হয় নাই মন মতন,
চিনি না তোর পাপ কি পুণ্য, সে ঘরে দিয়াছি শূন্য,
হব হরি প্রেমে পরিপূর্ণ, পাই যদি যুগল চরণ ॥
ফুকার—আবার বলে গেলি রাই রঙ্গিনী, কালার কোলে গৌরাঙ্গিনী,
হলেই শোভে ভাল ; কিন্তু সে ভাল বেশী না লো ।
দুই বর্ণ থাকলে দুই পাশে, মিলন মাধুরী বর্ণই আসে,
যদি লাল কালোতে যায় লো মিশে, সেই কি ভালর ভাল ॥

**মাথুর—ব্যাঙ্গোক্তি—১ নং নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—একদিন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কথা করে মনে,
কৃষ্ণপ্রাণা ধরাসনে, হলো অচেতন ।
পাড়ন—তখন সান্ত্বনা দিয়ে রাধারে, বৃন্দে উদভ্রান্ত অন্তরে,
কান্তে আনতে মধুপুরে, করিল গমন ॥
ফুকার—তখন শ্রীবৃন্দে মথুরায় এসে, যুক্ত করে মথুরেশে,
করিয়ে প্রণাম, বলে কেমন আছ বাঁকাশ্যাম ।
আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মথুরাপতি,
নগণ্যা গোপিনী জাতি, বৃন্দাদূতী নাম ॥
মিল- তোমার নূতন দেশে নূতন এসে, নূতন দেখি স'বি,
দেখে নূতন রাজ্যের ছবি, মুগ্ধ করেছে আমায় ।
মুখ—নূতন দেশের নূতন রীতি, নূতন রাজার নূতন নীতি,
দেখি মথুরায় ॥
ডাইনা—দেখলেম মথুরার নন্দন বনে, শ্যাওলা চন্দনের সনে,
দ্বন্দ্ব করে নিশি দিনে, শ্যাওলা হলো গন্ধরাজ ।
মণিমুক্তা পাখে রাখি, কাক সেজেছে ময়ূর পাখি,
রানী হলো অষ্টবাঁকী, রাখাল হলো মহারাজ ।

শৃগাল হলো পশুর রাজা সিংহ পড়লো ফেরে,
আগুন কাঁপে শীতের ডরে, বরুণ কাঁদে পিপাসায়।
খাদ—উই পোকায় তুলিয়ে মাটি গিরি ঢাকতে চায়॥
ফুকার—তোমার নূতন দেশের সবই নূতন, কাঞ্চন ফেলে কাচের যতন,
রতন সমতুল, ফুটলো উলুবনে সরষের ফুল। বাঁকাশ্যাম ···
ঘর বেঁধে সাগরের কূলে, তৃষ্ণা মিটাও কুয়ার জলে,
কেওয়া গাছে মেওয়া ফলে, তালগাছে তেঁতুল॥
অন্তরা—দেখলেম দেশের কি দুর্দশা, তুচ্ছ মাকড়সা,
জালে বাঁধে মত্ত মাতঙ্গ।
হল দাসী রাজরানী, রানী ভিখারিনী,
সুমেরু লঙ্ঘিছে পতঙ্গ॥
মুষিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে, খদ্যোতে জিনিল চাঁদে,
সর্পভূক গরুড়ের কাঁধে, নাচে সদা ভূজঙ্গ।
হল যুবা জিতেন্দ্রিয়, কামনা অপ্রিয়,
বৃদ্ধের অঙ্গে জাগে অনঙ্গ॥
পরচিতান—তোমার নূতন দেশের নূতন ধরন, নূতন রানীর নূতন বরণ,
নূতন দেশের করণ কারণ, সবই বিচিত্র।
পাড়ন—যেমন শনি রাজা কুজ মন্ত্রী, অন্ধ পুরুত বোবা তন্ত্রী,
বেতাল গায়ক কানা যন্ত্রী, সকল সুপাত্র॥
ফুকার—দেখলেম হীরা বিকায় জিরার দরে, সুখ বসন্তে কাকের স্বরে,
প্রেমিকের উৎসব গেল দিন গুণে কোকিলের রব। বাঁকাশ্যাম····
অপরূপা হয় কুরূপা, অন্ধ কুঁজা হয় সুরূপা,
বাঁদীর গলায় চাঁদী রূপা, রানীর পরাভব॥

ঐ—জবাব                    রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—আমার বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী দেখা দিলি মথুরায়।
পাড়ন—ভুলে প্রেমময়ীর প্রেম চিৎরূপ, শিখেছিস ঠাট্টা বিদ্রূপ,
কিরূপ কথা বলিস রাজসভায়॥
ফুকার—বললে, আমি অচিনা যুবতী, চিনবে কি মথুরাপতি,
কিসে হলি না চিনা; আজকাল তোর ভাবে নয় নাচি না,
প্রেম নয়নে দেখে যারে, জীবনে কি ভুলে তারে,
বরং কামুকে ভুলিতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা॥

মিল—ব্রজবাসী দেখলে পরে চক্ষে আসে জল—
তুই যে কি অগাছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রায়।
মুখ—বৃন্দাবনে নিত্য নূতন, সব পুরাতন খেলা মথুরায় ॥
ডাইনা—ব্রজপুরে শীতের ডরে মরে কামাগুন,
জল পিপাসায় মরে ব্রজে অপ্রেমিক বরুণ।
স্বর্ণলতা রাই কিশোরী, লতার উপর কুচগিরি,
সেই গিরি অতিক্রম করি, ত্রিভঙ্গ পতঙ্গের প্রায়।
খাদ—তাল গাছে তেঁতুল ফলেছে, দেখেছিস কোথায় ॥
ফুকার—বললে, নূতন দেশে সবই নূতন, কাঞ্চন ফেলে কাচের যতন,
কাচ এত মন্দ কিসে ; উহার মান বাড়ে স্থান বিশেষে।
ঝাড়লণ্ঠন সব কাচের নির্মাণ, স্বচ্ছতায় সোনার চেয়ে মান,
দিলে কাচের বাক্সে সুবর্ণের স্থান, ভাল দেখে মানুষে ॥
ফুকার—বললি, ঘর বেঁধে সাগরের কূলে, তৃষ্ণা মিটাই কুয়ার জলে,
রাজবাড়ির যে জলের কল তোরা ঘাটে যাস দরিদ্রের দল।
মেয়েলোক তুই অপদার্থ, জ্ঞান নাই লো তোর ষত্ব ণত্ব,
তুই তো জানিস না সাগরের তত্ত্ব, সব সাগরে থাকে লবণ জল ॥
ফুকার—বললে, মূষিকের ভয় বিড়াল কাঁদে, ব্রজে রাধার প্রেম ফাঁদে,
আয়ান গৃহে বিড়াল হই, ইঁদুর হল রাধে রসময়ী।
কাঁদলেম তাহার পাছে পাছে, তোর তো সকল জানা আছে,
এসব ব্রজলীলায় হয়ে গেছে, মথুরায় তাই আছে কই ॥
ফুকার—আবার বলে গেলি নানা ছন্দে, খদ্যোতে জিনিল চাঁদে,
অমাবস্যার শশধর, হয় না জোনাকীর নিকটে দর।
ডেগুগাছের পাতে পাতে, জ্বলি বসে আঁধার রাতে,
জ্বলে লক্ষ বাতি এক সঙ্গেতে, সে যে চাঁদ হতে দেখতে সুন্দর ॥
ফুকার—ও তুই বলে গেলি কথার বান্ধে, সর্পভূক গরুড়ের কান্ধে,
ভুজঙ্গ করে নৃত্য, ও তোর এ কথা নয় অসত্য।
বিষ্ণু গেলে শিবের কাছে, গরুড় থাকে বিষ্ণুর নিচে,
সাপ ত শিবের মাথায় আছে, এই দেখ স্থান মাহাত্ম্যে প্রভুত্ব ॥
ফুকার—বললে, বাঁদীর গলায় চাঁদি রূপা কুবুজা বাঁদী স্বরূপা,
চাদি রূপা ছিল তার, সে তাই করিয়াছে পরিহার।
ত্যজ্য করে রূপা সোনা, নিত্য করে উপাসনা,
ব্রজের খাঁটি সোনা কেলেসোনা, এই সোনা তার গলার হার ॥
মিল—উলু বনে সর্ষে ফুল তো হতেই পারে, উলুর খোলা আবাদ করে,
যদি কেউ সর্ষ বুনায় ॥

**মাথুর—ব্যাঙ্গোক্তি—২ নং** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—বন্ধু বুঝলেম তোমার কথার সূত্র, হলে তোমার কৃপার পাত্র,
আঁধারে পূর্ণিমার রাত্র, ভক্তের আঙিনায়।
পাড়ন—বন্ধু ধন্য তোমার কৃপার পাত্রী, ধন্য তার সাধন গায়ত্রী,
দাসী হল কাশীর যাত্রী, তোমার করুণায় ॥
ফুকার—বন্ধু বললে ভাল শুনলেম ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল,
সকলে বলে ; ভাল হল কুঁজীর কপালে। বাঁকাশ্যাম··
অন্নাভাবে চিড়াও ভাল, দুগ্ধাভাবে ক্ষীরাও ভাল,
বিপত্নীকের বুড়াও ভাল, ঠেকা কাজ চলে ॥
মিল—যেমন মধ্যাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঔষধি প্রয়োগে—
দেবের খাদ্য দৈবযোগে, ডাকিনীর ভোগে লাগাও।
মুখ—যা নাই ঘটে কোন দেশে, ঘাট ভুলে অঘাটে এসে,
অঘটন ঘটাও ॥
ডাইনা—দেখলেম জোনাকী জ্বালিয়ে বাতি, ঢাকিল বিদ্যুতের জ্যাতি,
কুঁজীব গলায় গজমোতি, শ্রীমতি হল শ্রীহীন ;
কুব্জা হল রঙ-এর বেগম, অঙ্গে মাখে ঘৃত মাখম,
চামচিকায় ধরেছে পেখম, ময়ূব হল পুচ্ছহীন।
রাই কাঁদে যমুনার ঘাটে, কুব্জা বসল খাটে,
যে খাটে যারে না খাটে, সেই খাটে তারে খাটাও।
খাদ—বামন দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে চাঁদ ধরাতে চাও ॥
ফুকার—শুনি এক ফোঁটা চন্দনের গুণে, কুঁজীর গানে মুগ্ধ প্রাণে,
আছ মধুপুর, শোন কান পেতে তানপুরার সুর। বাঁকাশ্যাম
কোন দোষে হে শ্রীগোবিন্দ, গোপীর চন্দন হল মন্দ,
কুব্জার চন্দনের গন্ধ, এতই কি মধুব ॥
মিল—তোমার কুব্জার কুঁজের নৈবেদ্যে পড়ল চন্দন ফোঁটা—
তাইতে পেয়ে এত মিঠা, পূজার আগে ভোগ লাগাও ॥
অন্তরা—আমরা বনবিহারিণী বনের হরিণী, বৃন্দাবন বনে কাল কাটাই।
তোমার মথুবার ঐশ্বর্য, আমাদের অসহ্য, সজ্জা দেখে বড় লজ্জা পাই ॥
হাতিখানা, অশ্বখানা, জেলখানা আরো পিলখানা,
চৌদিকে নহবৎখানা, খানার কোন অভাব নাই।
তোমার নূতন প্রেমের খানা, সখের মিহিদানা,
দেখাও রানীখানা, দেখে যাই ॥

পরচিতান—শুনি কাঠকাটা কাঠুরের ছেলে, দৈবে এক মাণিক্য পেলে,
কুলের কথা যায় সে ভুলে, মনে থাকে কই।
পাড়ন—যেমন চুনবেচা রাউড়ীর মেয়ে, রাজার কাছে দিয়ে বিয়ে,
চুন দেখিলে থাকে চেয়ে, মনে করে দই ॥
ফুকার—বন্ধু রাখাল ছিলে ভূপাল হয়ে, বাঁকার তুল্য বাঁকী পেয়ে,
বাম ভাগে বসাও ; দেয় না গরবে মাটিতে পাও। বাঁকাশ্যাম …
ধূলশয্যাতে রাই রূপসী, ফুলশয্যাতে কংসের দাসী,
দাসীর ভাগ্যে সেবাদাসী, আর বেশী কি চাও ॥

ঐ—জবাব — হরিচরণ সরকার

চিতান—আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে আমার মন হল বিরস।
পাড়ন—যেমন আগলা ঝগড়া লাগায়ে, ঘুমের মানুষ জাগায়ে,
কাটা ঘায়ে দিলি লেবুর রস ॥
ফুকার—বললে, অন্ন বিনে চিড়া ভাল বিপত্নীকের বুড়া ভাল,
ঠেকা কাম চালায় নাকি ; বৃন্দে না বুঝে তুই বলিলি কি।
বস্ত্র বিনে ছেঁড়া তেনা, মিশ্রী বিনে গুড়ের পানা,
যেমন অন্ন বিনে ঘাসের দানা, লঙ্গরখানা মন্দ কি ॥
মিল—ভক্ত বৎসল দয়াল হরি বলে সকলে,
ভক্তের মান্য না রাখিলে কলঙ্ক হয় ধরাধাম।
মুখ—তা না হলে কেমন করে, থাকে আমার ভক্তবৎসল নাম ॥
ডাইনা—রাসেশ্বরী রাই কিশোরী ধূলাতে লোটে,
কংসের দাসী কুব্জা তারে খাটে কি খাটে।
আমায় পতি পাবার তরে, কামনা সাগরে মরে,
পূর্বজন্মের সাধন জোরে, রানী করে রাখিলাম।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে অবাক হইলাম ॥
ফুকার—বললে, গোপীর চন্দন কিসে মন্দ, কুবুজার চন্দনের গন্ধ,
বেশী কিসে হল সই, কই কই মনের কথা তোরে কই।
ভক্তি চন্দন জ্ঞানের পাটায়, ঘষে রাখবি বিবেক বাটায়,
মেখে মন তুলসীর সঙ্গে ছিটায়, তাইতে কুব্জার বাধ্য হই ॥
ফুকার—বললে, ধূলায় লোটায় রাই রূপসী, দাসী পেল সেবার দাসী,
কি বলতেছিস্ কার নিকট, ও যে কর্মফলের ধর্মঘট।
দাসী হল রাজমহিষী, ছিল কান্না পেল হাসি,
যারে আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, দাসী নয় ও কাশীর মঠ ॥

**পূর্বরাগ—চন্দ্রগ্রহণ** **অম্বিকা পাটনী**

চিতান—ভানুসুতার কূলে, কানু দাঁড়াইলে, কেলিকদম্ব মূলেতে।
পাড়ন—হেলায়ে নিতম্ব, কক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কুম্ভ,
চল্লেন রাই অম্বু আনিতে ॥
ফুকার—তখন তরুণী তনয়া রাই, তপনতনয়ায় যায়,
তপ্ত কাঞ্চন কায়। হায়—
নীলাম্বরী কটিদেশে, জ্ঞান হয় যেন রাহু এসে,
পূর্ণ শশী অর্ধ গ্রাসে, যেন ভাবাকাশের গায় ॥
মিল—তখন অপরূপ রূপের ছবি হেরে চক্ষে,
বাঁকা সখা কয় বিনয় বাক্যে, সুবল সখার কাছে।
মুখ—চেয়ে দেখরে সুবল, কবে দেখেছিস বল,
দিবাভাগে চাঁদ উঠেছে ॥
ডাইনা—যেন জিনিয়ে গগন চাঁদ, উদয় অপূর্ব চাঁদ, পেয়ে পৌর্ণমাসী,
কত কোটি চাঁদ ঐ চাঁদে রয়েছে মিশি।
এমন চাঁদ রাহু এসে, রেখেছে অর্ধগ্রাসে,
দেখ রে দিবসে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে।
খাদ—দিবায় চন্দ্রগ্রহণ কোন দেশে কখন দেখেছে ॥
ফুকার—ভাইরে যদিও সে অর্ধচাঁদ রাহুতে করেছে গ্রাস,
নাই তার জ্যোতির হ্রাস। হায়—
নয়ন পথে আলোকরাশি, হৃদয়ে পশিল আসি,
অন্তরের জ্ঞান-তমসী, ভাইরে করেছে বিনাশ ॥
মিল—থেকে অন্তরে বিনাশে অন্তরের অমা,
বল রে কোন বিধি এ চন্দ্রমা গড়িয়েছে।
অন্তরা—বল রে চাঁদ কোন দেশে ছিল।
কোন দেশের চাঁদ কি উদ্দেশে, দিবসে এই দেশে এলো ॥
হেরে তারে মন-চকোরের ধরেছে ক্ষুধা,
কতদিনে পাব চাঁদের সম্মিলন সুধা।
আর কবে দেখেছিস রে চান, চাঁদ নয় নয়ন-ধরা ফান,
রাহুর প্রাণ কি এতই পাষাণ, এমন চাঁদকে গ্রাস করিল ॥
পরচিতান—ঐ চাঁদের আলোকে ঝলকে ঝলকে, পলকে পুলকে পরাণ।
পাড়ন—চাঁদের অনুরেণু, তা হতে পরমাণু,
তার তুল্য নয় রে গগন চান (চাঁদ) ॥

ফুকার—ভাই রে এমন চাঁদ রাহুগ্রাসে পাষাণ প্রাণে মানে কি ;
রাহুর সাধ্য কি। হায়—
ইচ্ছা হয় ভাই ঐ চাঁদেরে, রাহু হতে এনে ধরে,
বক্ষ চিরে হৃদ মাঝারে, আমি ভরিয়ে রাখি ॥

ঐ—জবাব **মনোহর সরকার**

চিতান—বাঁকা সখার বাক্য শুনে সুবল সখা কয়।
পাড়ন—তোরে বলব কি রে প্রাণ কানাই, কি দেখে কি ভাবলি ভাই,
দিবসে কি চাঁদের উদয় হয় ॥
ফুকার—ভাইরে, শুধালি তুই আমার কাছে, দিবসে কি চাঁদ উঠেছে,
বললি কি বাঁকা সখা—নারীর রূপে তোর লাগল ধোঁকা।
সঙ্গেতে নিয়ে সঙ্গিনী, জলের ঘাটে যায় রঙ্গিনী,
ও তো চাঁদ নয় রে ভাই চাঁদবদনী, বিনোদিনী রাধিকা ॥
ফুকার—বললি, চেয়ে দেখ ঐ ভাবাকাশে, অর্ধচন্দ্র রাহুগ্রাসে,
কানাই আমার কথা শোন, ও তুই যেরূপ করলি দরশন।
অবগুণ্ঠনেতে ঢাকা, চাঁদবদনী শ্রীরাধিকা,
আধ বদন যায় রে দেখা, রাহু নয় ও নীলবসন ॥
ফুকার—বললি, ঐ চাঁদে জ্যোতি বিকাশে, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশে,
ও চাঁদ বড় মন্দ কর, ভাই তোর চোখ দুটোরে বন্ধ কর।
কলসী ভরা হয়ে গেলে, জল নিয়ে চাঁদ যাবে চলে,
তখন দেখতে পাবি নয়ন মেলে, ভিতর বাহির অন্ধকার ॥
ফুকার—বললি, ইচ্ছা হয় যে ঐ চাঁদেরে, বক্ষ চিরে রাখি ভরে,
সে কি রে ভাই পীতবাস, শুনলে লোকে করবে উপহাস।
ঐ চাঁদেরে ভালবেসে, বুকে নিবি কোন্ সাহসে,
শেষে কলঙ্ক রাহুতে এসে, তোরে শুদ্ধ করবে গ্রাস ॥
ডাইনা—ঐ চাঁদ ছিল কোন আকাশে শুনবি রসময় ;
আয়ান ঘোষের ভাগ্যাকাশে এ চাঁদের উদয়।
ঐ চাঁদের সুধার লালসে, যে চকোর রয় আশার আশে,
কাল-কুটিলা মেঘে এসে, শিরে করবে বজ্রাঘাত।
খাদ—সুধার আশা মিটবে না রে, জ্বলে পুড়ে হবি ভস্মসাৎ ॥

বিচ্ছেদ **অর্জ্জুনচন্দ্র দেবনাথ**

চিতান—ব্রজে গোপবালা অবলা সরলা প্রেমের খেলায় রত।
পাড়ন—মিলন সুখ তুলন, দুরূহ বিরহ বেদন, ভুজঙ্গ দংশনের মত ॥

ফুকার—দিয়ে বিচ্ছেদ জ্বালা, গেল কালা মথুরাধাম ;
নিয়ে অষ্ট সখী রাই কাটায় কেঁদে অষ্টযাম।
মুখ মলিন ছিন্ন গাত্র, ক্ষান্ত নয় ক্ষণমাত্র,
জ্বলে প্রাণ গলে নেত্র, প্রেমের এই পরিণাম ॥
মিল—তখন মালিনীর প্রতি বলে রঙ্গিনী বিষাদে,
সখী প্রেম করে সেধে সেধে, ভাগ্যে এ কি ছিল।
মুখ—যে জ্বালায় জ্বলে জীবন, সখী আমার এখন,
প্রাণে বেঁচে ফল কি বল ॥
ডাইনা—ভ্রান্ত কৃতান্ত আমায় ভুলে কি রইয়াছে সই ;
সবে ত্বরায় কর মৃত্যুর উপায়, পায় ধরে সবেরে কই।
মুখ ফাটে কইতে নারি, বুক ফাটে সইতে নারি,
বিচ্ছেদ যাতনা হতে সখী, আমার মরণ ভাল।
খাদ—শান্তি সুখে হয়ে বিমুখ দুঃখে কাঁদতে হলো ॥
ফুকার—পায় ঠেলে লোকলজ্জায় কুল মর্যাদা বিনাশি,
হয়ে রাজকুমারী রাখালের প্রেম ভালবাসি।
আশার ফল বিফল শুধু, আশায় নিরাশ করল বঁধু,
আমি সাধ করে ঘরের বধু, হলে পরের দাসী ॥
অন্তরা—সই গো ! মনের মানুষ বিনে সই, করি মনের দুঃখে বনে বসতি।
জানি অতীত কালে পতিত বন্ধু, প্রাণে জাগে পূর্ব প্রীতি ॥ গো—
সখীগো—বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেম আগে,
প্রাণে জাগে সেদাগেব মনোহরা মূরতি।
আমার সর্বস্ব ধন হরে নিল, করে দিবসে ডাকাতি ॥ গো—
পরচিতান—বিশাখায় আসিয়ে, আমাকে দেখাইয়ে, সখী এই চিত্রপট।
পাড়ন—ঐ রূপ দরশনে, দাসী হলেম শ্রীচরণে,
কে জানে এত যে লম্পট ॥
ফুকার—পিরীতি কি রীতি আগে মোর জানা ছিল না,
আমি ভেবে দেখলেম চৌদিকে ভীষণ ছলনা।
সুখে দুঃখ উপজিল, দুঃখের শেল বুকে র'ল,
ছল করে কালা গেল, কলঙ্ক গেল না ॥

ঐ—জবাব **হরিচরণ সরকার**

চিতান—দেখে রাই রঙ্গিনীর উন্মাদনা বলে মালিনী সখী।
পাড়ন—ও তোর বন্ধু গেছে মধুপুর, সে দুঃখে হলি কাতর,
ধৈর্য ধর গো রাই বিধুমুখী ॥

ফুকার—রাই তোর বঁধু গেছে মধুপুরে, পূর্বের কথা মনে করে,
কেঁদে হলি মৃতপ্রায়, ভাবি এই বুঝি প্রাণ যায় গো যায়।
ত্রিজগতে কার না পতি, বিদেশেতে করে গতি,
রাধে তোর মত আর কোন যুবতী, পতিশোকে প্রাণ হারায় ॥
মিল—উদ্বেগ কলহ কন্ডু সেবনে বৃদ্ধি, ধৈর্যতে কার্যসিদ্ধি,
এই কথা সবে জানে।
মুখ—পিরীতি করে ঘরে পরে, তোর মত রাই মরে কয় জনে ॥
ডাইনা—আবার বললি, মৃত্যুশয্যার করব আয়োজন,
ওগো রাধে তুই কি মোদের বিদায় দেওয়ার ধন।
তুই আমাদের আশা তরী, তোর আশাতে জীবন ধরি,
তুই থাকিলে আবার হরি, আসবে এই বৃন্দাবনে।
ফুকার—বললে রাখালের প্রেম ভালবাসি, ঘরের বধূ পরের দাসী,
হয়ে কত পেলেম দুখ, ও তোর লাজের মুখে ছাই পড়ুক।
ভালবাসার ভালবাসায়, কখন বা অকূলে ভাসায়,
এই যে একবার কাঁদায় একবার হাসায়, পিরীতের মজা ঐটুক ॥
ফুকার—বললে, দুঃখের শেল বক্ষেতে র'ল, ছল করিয়ে কালা গেল,
জ্বালা হ'ল অসম্ভব, কেন সেধে দিয়েছিলি সব।
সুখ দুঃখময় এ সংসারে, দুখ অন্তে সুখ কে না করে,
ওগো দুঃখ না থাকিলে পরে, সুখ হতো কি অনুভব ॥

## ঋণ সালিশী বোর্ডের মাথুর — তারক পণ্ডিত

চিতান—বৃন্দে গিয়ে মথুরামণ্ডলে, ব্যঙ্গচ্ছলে শ্যামকে বলে,
সুখময় হে তোমাকে শুধাই।
পাড়ন—জানি নিজের দেনার হিসাবনিকাশ, রাখে সব লোকে,
তোমার বুঝি জমা খরচ নাই ॥
ফুকার—ব্রজে সালিশ আদালত বসেছে, আইন হয়েছে পাশ,
তাতে বড় হাকিম বড়াই দিদি, নিকুঞ্জে এজলাশ।
বিশাখাদি কয়জন নারী, বিচার কার্যের সহকারী,
সেই খাতকের সুযোগ ভারী, যার পেশা হয় চাষ ॥
মিল—ডাকে ডাকে পাঁচ সাত নম্বর, ফাঁকে গেলে সারি,
এখন বিশেষ নোটিশ করতে জারি, আমি এলেম পরিণামে।
মুখ—নতুন আইনের বিধান মতে, ব্রজের সালিশ আদালতে,
নালিশ হল শ্যাম তোমার নামে ॥

ডাইনা—বন্ধু পড়ে কি হে মনে, মধুর বৃন্দাবনে,
রাধার প্রেম-ঋণে তুমি ছিলে ঋণী ;
তোমার উশুলের নাই লেশ, দিন হয়েছে শেষ,
বেশ খাতক তুমি, শঠের শিরোমণি।
খত দিলে স্বহস্তে দস্তখত করি, হাজিরা ইসাদী শ্রীরূপ মঞ্জরী,
ও কি ভেবেছ চিতে, তুমি পারবে কি না ঋণ শোধিতে ;
পদব্রজে তোমার হিতে, এলেম তোমায় সঙ্গে নিতে,
এই মামলার বর্ণনা দিতে, যেতে হবে ব্রজধামে।
খাদ—চাষার আছে বড় আশা নতুন নিয়মে ॥
ফুকার—তোমার পৈত্রিক ব্যবসা জানি মোরা, বেচতে দধি দুধ ;
পাবে অনুকূলে সেই গোকুলে, বেশ সাক্ষী সাবুদ।
গোচারণের সূত্রে ধবে, কৃষক হবে আইনের জোরে,
কিস্তি দিবে যাবে সেরে, রেহাই পাবে সুদ ॥
অন্তরা—রাখাল সাজে সেজে যেতে হবে নরবর।
জামাজোড়া, নতুন কৃষি আইনের ধারা, বাধা হয় বিস্তর ॥
গুণকীর্তি তোমার আছে সুপ্রকাশ,
রাধার খতের খাতক, রাধাচরণ দাস,—
হেসে বলব আমি, ইনি দাসীর স্বামী,
ঋণ লাঘব হবে, পাবে সময় বিশ বৎসর ॥
পরচিতান—তুমি সুসময়ে সঙ্গে গেলে, যুক্তি হবে সবে মিলে,
বুদ্ধি বলে অঘটন ঘটাই।
পাড়ন—মামলা হয় কি না হয়, এ ত নহে রহস্যের বিষয়,
অবশ্য তার তদ্বির করা চাই ॥
ফুকার—সামলা মাথায় উকিল আমলা, সেখানে কেউ নাই,
আমরা পাইক পেয়াদা কর্মচারী, যা-ই করি হয় তাই।
প্রথম বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বৎসরে,
দান দর্শনী অনুসারে, তারিখ দিয়ে যাই ॥

ঐ—জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান—মথুরায় চতুরার বাক্যে দুঃখে বলে রসময়।
পাড়ন—বৃন্দে এই দেখা আর সেই দেখা, বহুদিন হয় নাই দেখা,
দুখের দেখা দিলে এ সময় ॥

ফুকার—বসল সালিশী বোর্ড ব্রজধামে, নালিশ হল আমার নামে,
নোটিশ দিলে মধুপুরে ; থাকে চতুরাদের মুখের জোর।
বলে কয়ে সবার সাথে, আমি এলেম মথুরাতে,
তুমি ফেরারী কও কোন আইনেতে, এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর ॥
ডাইনা—এক আসামীর উপরেতে মামলা পাঁচ নম্বর,
এ মামলার শুনানী হবে শত বৎসর পর।
নিজে মামলা রেফার করে, নিজেই পাঠাও দ্বীপান্তরে,
যাবজ্জীবন আটক করে, মধুর প্রেমের ঘটকে ;
দরখাস্তের আসামী আমি, স্বীকার করি তোমার সম্মুখে।
খাদ—আরও একটি কথা শুনে বাঁচি না দুখে ॥
ফুকার—বললে, গোচারণের সূত্র ধরে, চাষী খাতক অনুসারে,
রেহাই দিবে যত সুদ ; দূতী আমি কি এত আবোধ।
যে দেনা মোর মনান্তরে, জানে না কেউ জনান্তরে,
শেষে যুগান্তরে রূপান্তরে, সে-ঋণ করব পরিশোধ ॥
ফুকার—বললে, প্রাথমিক বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বছরে,
দান দক্ষিণা সবিশেষ, পেলে থাকবে না আর কোন ক্লেশ।
জানি এই অফিসের বার্তা, যেমনি হর্তা, তেমনি ধর্তা,
এই অফিসের চেয়ারম্যান কর্তা, ঘুষখোরের হয় একশেষ ॥

## পাশাখেলা

উমেশ শীল

চিতান—বসে শ্যামের সনে একাসনে,, মন মিলনে সম্মিলনে,
আনন্দিত হয়ে মনে, পাশা খেলে রাই।
পাড়ন—বন্ধু ! তোমার ছক্কা আমার পাঞ্জা, দানে পাওয়া যাবে পাঞ্জা,
সাক্ষী থাকিবে কুলজা, দেখিবে সবাই ॥
ফুকার—তখন সখীগণ মধ্যস্থ রেখে কৃষ্ণ গুণাধার ;
খেলে উভয় মিলে পাশাখেলা আনন্দ অপার। হায়—
রাই বলে হে প্রাণ মাধব, হারিলে গলার হার দিব,
জিনিলে মুরলী নিব, প্রতিজ্ঞা আমার ॥
মিল—পাশাখেলায় হারল হরি, মরি কি আজগুবি,
ব্যঙ্গ করে রঙ্গদেবী, শ্যামের প্রতি ডেকে কয়।
মুখ—বল বল বংশীবদন, কেন তোমার বিরস বদন,
কি দুঃখে আজ কর রোদন, বাঁকা রসময় ॥

ডাইনা—খেলিতে এসেছ পাশা, দান পড়ে না ভগ্নদশা,
গেল তোমার সকল আশা, হলে বন্ধু অপমান।
ছিঃ ছিঃ নাগর একি করলে, নারীর সনে খেলায় হারলে,
কোন্ লাজে আজ এ গোকুলে, মুখ দেখাবে কালাচান ॥
গেল তোমার জাকদারী সব, রাই নিল মুরলী,
দিয়ে সখীগণে করতালি, বলে রাধারানীর জয়।
খাদ—ভাবিলে কি হবে বন্ধু, বিপদ মন্দ নয় ॥
ফুকার—তোমার বাঁশীর সনে হাসি গেল লজ্জাতে মরি,
যেমন চোরের বুদ্ধি সিঁদকাটিতে, ভেবেছ হরি। হায়—
বল বল কমলাঁখি, কেন ছল ছল আঁখি,
নুনের জাহাজ ডুবল নাকি, বুঝিতে নারি ॥
অন্তরা—আর বাঁশরী পাবে না কানাই।
এখন বাঁশরী বিহনে, শিক্ষা করে যতনে,
বনে গিয়ে বাজাও সানাই ॥
ব্রজের যত ব্রজনারী, শোনে কুলনাশা বাঁশের বাঁশরী,
কুল বধূর গিয়াছে বালাই।
তুমি যারে ভালবাসিতে, বাঁশীতে নাম সাধিতে,
বামেতে আর বসবে না রাই ॥
পরচিতান—বন্ধু নারীর সনে খেলায় হেরে, দাগ লেগেছে হাড়ে হাড়ে,
এখন আর দোষ দিবে কারে, পাপের প্রতিফল।
পাড়ন—তুমি জান না কি পাপের গাছে, সাপেতে বাসা করেছে,
তাইতে এ বাঁশী গিয়াছে, বাঁকা নীলকমল ॥
ফুকার—তুমি কাঁদলে আর বাঁশী পাবে না, ওহে কালাচাঁন;
আছে তোমার ঐ বাঁশের নমুনা, করি অনুমান। হায়—
রান্না ঘরে গিয়ে দেখি, যদি না পোড়ায়ে থাকি,
পেলে সে বাঁশ কমলাঁখি, তোমায় করব দান ॥

ঐ—জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান—শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণী কৃষ্ণ গুণমণি কয়।
পাড়ন—বসলে পাশাখেলা খেলিতে, হেলিতে আর দুলিতে,
ললিতাদি সখী সমুদয় ॥

ফুকার—বড় আশা করে খেলে পাশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা,
ভালবাসার বাঁশী যায়, তাতে ভালবাসা কিসে যায়।
উভয় পক্ষে পাশাপাশি, পাশা খেলায় যখন বসি,
দেখি তোমরা করে হাসাহাসি, একে পড়.অন্যের গায়।
মিল—পাঞ্জা ছক্কা প্রতিজ্ঞাতে পাশা খেলেছি,
নিজ ইচ্ছায় পাশা ঢেলেছি, বিধুমুখীর মুখ দেখি।
মুখ—শ্রীরাধিকার হাসির কাছে, বাঁশী আমার বেশী হল কি ॥
ডাইনা—পাঞ্জা পেল রাজপুতলী বলিস রাধার জয়,
তোদের সঙ্গে আমিও বলি, নূতন অভিনয়।
ছক্কা ফেলতে নাহি পারলেম, নিজের ইচ্ছায় বাঁশী ছাড়লেম,
যার কাছে সর্বস্ব হারলেম—বাঁশী এত বেশী কি।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে হয়েছি দুখী ॥
ফুকার—বললে. কেন ছলছল আঁখি, নুনের জাহাজ ডুবল নাকি,
নাকি ও কি হয়েছে, কেউ কি কোন মন্দ কয়েছে।
ভেবে প্রেম সাগরের বারি, আশা করে যাত্রা করি,
আমার নুনের জাহাজ রাইকিশোরী, মান-সাগরে ডুবেছে ॥
ফুকার—বললে, বাঁশ পেয়েছ রান্নার কালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে,
সে বাঁশ তোমায় দিব শ্যাম, তোদের খারাপ হবে পরিণাম।
খেলায় হলেন বাঁশী হারা, তাতে কি গো হাসি ছাড়া,
না হয় অদ্য হতে বাঁশী ছাড়া, ইসারায় সারাব কাম ॥
ফুকার—বাঁশ পেয়েছ রান্নাকালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে,
তোমায় দিব রসময়, তাতে তোদেরই হয় বিষময় ॥
খেলা গিয়েছে এক বাজী, তাতে নাইকো ধাপ্পাবাজী,
আমি বাঁশী দিলেন হয়ে রাজী, বাঁশী ত গজবাজী নয় ॥

## ভোটের মাথুর

ভগবতী ভুঁইয়া

চিতান—কৃষ্ণলীলা সূচী দেশকালপাত্র রুচি, নব্য ভাবের ঝঙ্কার।
পাড়ন—দ্বাপরে মধুর প্রেম, সুপবিত্র সুপ্রভ হেম,
দিলেম পাশ্চাত্ত্য রূপক অলঙ্কার ॥
ফুকার—ছিল মধুর প্রেম রাজত্ব, যোগমায়ার রাজধানী সে ব্রজধাম ;
হতো ফুলদোল ঝুলন, রথ রাসমিলন, নিত্য নিত্যলীলা নাম।
বিচ্ছেদ বন্ধ হল বিল, বৃন্দা বিশাখা নাই উকিল,
মথুরায় নূতন কাউন্সিল, গভর্নর সাজিলেন নিজে শ্যাম ॥

মিল—বৃন্দে দুঃখে যায় মথুরায়, বলে হে শ্যামরায়—
নূতন ভোটার লিস্ট কোন্ সেরেস্তায়, অফিস খোল আসি।

মুখ—বল বল কি কারণে নূতন ইলেকসনে,
ভোটার হয় না ব্রজবাসী ॥

ডাইনা—শান্ত দাস্য সখ্য মধুর বাৎসল্যের মোটে নাম নাই ;
ভোটার নয় নন্দ যশোদা, রাখাল গোপ-গোপিনী রাই।
কোন কুঞ্জের পথ কর নিয়ে, নাকি পাশা হল বি. এ.,
আবার কোন প্রেমের ট্যাক্স দিয়ে, ভোটার কুব্জা দাসী।

খাদ—হল রাধা তুলা কুঁজি কালা মিথুন রাশি ॥

ফুকার—ফেরী খেওয়া ঘাটে নৌকা সরঙ্গা, এবার পুরাতনে নূতন ফেসন,
দিলে নূতন ডাক্তারখানায় প্রেমের এম. বি. ঔষধের ভাল একসন্।
পুরাণ বুড়ীর নূতন দন্ড, কমলা পথ্য লাউ অন্ত,
কুঁজীর কুঁজ নিমিষে হস্ত, বুজমন্ত ডাক্তারের ইন্জেকসন্ ॥

মিল—ব্রজগোপীর কালাজ্বর, একশ' তিনের উপর,
দিতে ব্রহ্মচারী ইন্জেকসন, ডাক্তার কোথায় পাই তালাসি ॥

অন্তরা—বন্ধু ন,তন ধারায় নাই আর নয়ন ধারা,
এখন নাই পায় ধরার সেই আইন।
পাহাড়ের উঁচা টিলা করেছ ঢালামিলা,
খুলেছ নূতন রেলের লাইন ॥
বন্ধু হে, দাসখতের গিয়েছে মান, নূতন নূতন এমেন্ডম্যান,
খাড়া হুন্ডি দাড়ান ভাল পুরাণ ছাতায় ছাইন।
জুট মিলে পাটের কলে, মধুর মোম বাতি জ্বলে
হয়েছে সাদা পাটের বাইন ॥

পরচিতান—এখন খাতকে পায় সুযোগ, বিচ্ছেদ মন্ত্রীর উদ্‌যোগ,
ঋণ লাঘব আইন হয় পাস।

পাড়ন—কাঁপতেছে মহাজন, সালিশী বোর্ড হল গঠন,
মেম্বর সে তিনজন, শোক সন্তাপ নৈরাশ ॥

ফুকার—এখন খাতকে মহাজন চিনে না, নাচে না দিয়ে বাঁচিবে ঋণ,
যারা পরান্নে পালিত দেউলিয়া বিত্ত, আইনে যারা যোগ্রহীন।
দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার,
কাল কিস্তি ফুরায় না মিতার, মহাজনের চিতায় জ্বলবার দিন ॥

ঐ—জবাব — হরিচরণ সরকার

চিতান—তখন বৃন্দা দূতীর বাক্য শুনে, দুঃখে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
পাড়ন—আমার মাধুর্যেতে সুপ্রীমকোর্ট, ছিল না সালিশী বোর্ড,
হলেম বয়কট কপালের ফলে॥
ফুকার—আমার জন্ম হল মথুরাতে, পিতা নিয়ে গোকুলেতে,
নন্দালয়ে রাখিলেন, মূলে দাদা আমার উগ্রসেন।
মধুর প্রণয় রাধার সনে, মাধুর্যের ইউনিয়নে,
তখন তুমি ছিলে বৃন্দাবনে, প্রেম মহালের প্রেসিডেণ্ট॥
ফুকার—ছিল সদর থানা কদমতলা, প্রসিদ্ধ রাসগঞ্জের জিলা,
রাজধানী সে ব্রজধাম, আমি রাই রাজার কোটাল ছিলাম।
জানত না কেউ গণতন্ত্রে, সঙ্ঘবদ্ধ মনতন্ত্রে,
তাইতে দিবানিশি বাঁশী যন্ত্রে, জপ করিতেম রাধা নাম॥
মিল—স্বাধীন রাজ্য প্রেমমাধুর্য মধুর বৃন্দাবন—
পরাধীন রাজ্যেতে এখন, নামে মাত্র গভর্ণর।
মুখ—বিচ্ছেদের দায় আছি ঠেকা, পদচ্যুত শত বৎসর পর॥
ডাইনা—পঞ্চ প্রেমের মেম্বর আমি ছিলেম ব্রজপুর,
শান্ত, দাস্য, সখ্য আরো বাৎসল্য, মধুর,
গোলোকধামের সেসন কোর্টে, শ্রীদাম নামে ফৈরাদী জুটে,
লেভি ফণ্ডের ধর্মঘটে, বদলি মথুরানগর।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে ভাবি নিরন্তর॥

ফুকার—বললে, কোন প্রেমের বা ট্যাক্স দিয়ে, নাকি পাশ করেছে বি. এ,
বি এ. ফেল, আই. এ. কম. ঐ, তবু ভোটারে কুব্জারে লই।
যদি সুখ থাকে কপালে, ফেল করেও চাকরী মিলে,
কেহ পাশ করে কপালের ফলে, ভাত মিলে না শান্তি কই॥

ফুকার—বললে, ব্রজগোপীকার কালাজ্বর, হল একশ' তিনের উপর,
বৃথা করিস ভাবনা, আমি বৃন্দাবনে যাব না।
কাল তুলসী মস্তকে দিস্, শ্যামলতা বুকে ডলিস,
একটা কানাইর আগা গলায় বান্ধিস, কালাজ্বর আর রবে না॥

ফুকার—বললে, কমলা পথ্য লাউ অন্ত, কুঁজীর কুঁজ নিমেষে হন্ত,
কত ডাক্তার হল ফেল, কত ফেল গেল মালিশের তেল।
রোগ ধরিবার অকুলনে, আগে ছিল লাউ ঝুলনে,
শেষে হরি বৈদ্যের হাত বুলানে, লাউয়ের গাছে ধরছে বেল॥

ফুকার—বললে, দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার,
মনে কিগো জাগে না, মূলে মহাজনে ঠকে না ;
দেনা যদি হয় স্বকৃত, না হয় যদি অস্বীকৃত,
যে জন স্বনামে সব দেশ বিক্রিত, বাবার নাম তার লাগে না ॥

মানযোগী — কাশীনাথ নট্ট

চিতান—বৃন্দার উপদেশ, নিয়ে হৃষীকেশ, সেজে নবীন সন্ন্যাসীর বেশ,
প্রবেশ করলেন রাই কুঞ্জের দ্বারে।
পাড়ন—কক্ষে ভিক্ষার ঝুলি, রাধা নামের নামাবলি গায়,
রাধা বলে শিঙ্গা বাজায়, বয়ন ভাসে নয়নের নীরে ॥
ফুকার—পীতাম্বর, পীতাম্বর ত্যাগ করে,—
সাজলেন ব্যাঘ্রচর্মে কটি আঁটা, জটাভার শিরে। হায়—
বনফুলের মালা ফেলে, হাড়ের মালা দিয়ে গলে,
ভিক্ষাং দেহি দেহি বলে কয় বারে বারে ॥
ছাড়—যোগী সাজে রসরাজে, দেখে কুঞ্জের দ্বারে,
রঙ্গদেবী ব্যঙ্গ করে, বলে যোগী কোথা যাও।
ধুয়া—আছে কিনা পিতামাতা, আছে কি বনিতা ভ্রাতা,
সত্য কথা আমার কাছে কও ॥
ডাইনা—কেন এই নব্য বয়সে, চলেছ সন্ন্যাসে,
গৃহবাসে কি অশান্তি।
দেখে অঙ্গ ভঙ্গি বাঁকা, যায় না ধৈর্য রাখা,
ভস্মে ঢাকা হেমকান্তি।
কিসের অভাব ছিল, একটু হাসি মুখে বল,
বল কিসের অভাব হৈল।
বল কোন মতে কোন মন্ত্রে, কোন গুরুর নিকট, দীক্ষা পেয়েছিলে ;
তারকব্রহ্ম নামটি ভুলে, রাই বলে শিঙ্গা বাজাও।
খাদ—কোথা হতে এলে হেথা কোথায় যেতে চাও ॥
ফুকার—বেশ ভূষণ ঠিক যেমন শিবের প্রায়,
শিবের শিরে গঙ্গা সুরধুনী বিরাজে সদায়। হায়—
না জানি কোন উপলক্ষে, সব বিপরীত তোমার পক্ষে,
শিরের গঙ্গা এসে চক্ষে, বক্ষ ভেসে যায় ॥
ছাড়—যদি শিবের মত মুষ্টি ভিক্ষায়, তুষ্ট হয়ে থাক,
রাখ আমার কথা রাখ, কুচেরপাড়ায় চলে যাও ॥

অন্তরা—বল কি অভাবে, রয়েছ নীরবে, এভাবেতে কেন দাঁড়ালে ওখানে।
কথা রেখ না গোপন, কে আছে আপন, যথা প্রয়োজন, চলে যাও সেখানে ॥
যোগীবেশে একদিন এসে দর্শাগিরি,
পঞ্চবটি হতে সীতা করলো চুরি,—
অঙ্গভঙ্গি দেখি মনে মন্দ করি, কপট যোগী বলে হতেছে মনে ॥
সন্ন্যাসী না ব্রহ্মচারী সরল কথা বল।
এলে কি ধন হারাই, বল হা রাই হা রাই,
নাকি নুনের ভরা জলে ডুবে গেল ॥
জানি কৈলাসের শিব ত্রিলোচন, তোমার কেন দ্বিলোচন,
একটি লোচন মোচন কেন হল ॥
তুমি ত্রিপুরারি হলে পরে, ত্রিশূল থাকত তোমার করে,
বল তোমার ত্রিশূলে কোথায় রইল।
শিবের ঊর্দ্ধ নয়ন দেখতে ভীষণ, যোগী হে,—
তোমার কোমল নয়ন দেখতে ভাল ॥
নাকি খেয়ে ভাঙ্ ধুতুরা, নিশায় দিশাহারা,
এলে গোপের পাড়া, কুচপাড়া জ্ঞানে ॥
পরচিতান—তোমার শ্রীপদে করি প্রণিপাত, আজ আমার হল সুপ্রভাত,
সাক্ষাৎ পেলেম সাধু সন্ন্যাসী।
পাড়ন—জানি গিরি পুরী বন ভারতী, যোগীর অনেক মত—
রামাইয়াত নিমাইয়াত আদি, বল তুমি কোন তীর্থবাসী ॥
ফুকার—বৃন্দাবন ভক্তগণ অগণন,—
কিন্তু একনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নাই কেউ আয়ানের মতন। হায়—
সে বাড়িতে যদি যাবে, মানমর্যাদা রক্ষা পাবে,
ষোড়শ উপচারে হবে, সেবার আয়োজন ॥

ঐ—জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান—শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণী, অমনি কপট যোগী কয়।
পাড়ন—সখী তোরা ত অসৎযোগী, হয়ে যোগের উদ্‌যোগী,
যোগ কবে সে যোগী হতে হয় ॥
ফকার—যখন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পার, তোমরা কি আর বুঝতে নার,
চতুরা সব গোপীকায়; কেন যোগী সাজে সাজাই কায়।
যোগী সাজে অঙ্গ ঢাকা, সারতে নারি নয়ন বাঁকা,
শত বসন দিয়ে দিলে ঢাকা, আগুন কি আর ঢাকা যায় ॥

ছাড়—কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা বদরিকাশ্রম,
ভ্রমণে ভেবে পরিশ্রম, রাই আশ্রমে চলেছি।
ধ‍ুয়া—বলব কি গো দ‍ুখের কথা—মনে বড় ব্যথা পেয়েছি ॥
ডাইনা—শ্রীমতির মান ভাঙতে আমার দ‍ুর্গতি বিশেষ,
ব‍ৃন্দাদ‍ূতীর উপদেশে, সাজলেম যোগীর বেশ ;
কটি আঁটা ব্যাঘ্রছালে, ভিক্ষার ঝ‍ুলি কক্ষস্থলে,
মানং দেহি দেহি বলে, মানক‍ুঞ্জেতে চলেছি।
খাদ—আরো একটি কথা শ‍ুনে ব্যথা পেয়েছি ॥
ফুকার—বললে, সব বিপরীত আমার পক্ষে, শিরের গঙ্গা এসে চক্ষে,
বক্ষ ভাসে কি দোষে ; সত্য বলতেছি তোমার কাছে।
গঙ্গাকে চাই শিরে ধরতে, গঙ্গা চায় মোর পায়ে পড়তে,
শেষে চক্ষ‍ু দিয়ে সরতে সবতে, ম‍ুখ ভাসিয়ে ব‍ুক ভাসে ॥
ফুকার—বললে, আয়ান ঘোষের বাড়ি যাবে, ষোড়শ উপচারে হবে,
সেবার আয়োজন আমার ; আমার এত সেবার নাই দরকার।
মানে হইল মাথা আউল, মান ভাঙ্গিতে সাজলেম বাউল,
পাই না ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসেব ষোড়শ উপচার ॥
ফুকার—বললে, সন্ন্যাসীর বেশ কবে ধারণ, রাবণ করল সীতাহরণ,
তোমার ও সে ব্যবহার ; তাইতে সন্দেহ হল তোমার।
মান-রাবণ রাই-জানকীরে, নিযে যাচ্ছে হরণ করে,
আমি মান-রাবণকে নিধন করে, রাই-সীতা করব উদ্ধার ॥
ফ‍ুকার—বললে, সন্ন্যাসীর '·শ করে ধারণ, রাবণ করল সীতা হরণ,
তোমারও ত সেই চিহ্ন, হলে দর্শনে মনঃক্ষ‍ুন্ন।
শ্রীব‍ৃন্দাবন হল কাশী, আমি সাজলেম শিব সন্ন্যাসী,
আমার অন্নপ‍ূর্ণা রাই র‍ূপসী, ভিক্ষা দিক আজ·প্রেমান্ন ॥

## চেনাচিনির মাথুর — হরিচরণ সরকার

চিতান—রেখে ধরাতে রাধিকায়, উদয় সে মথ‍ুরায়, গিয়ে ব‍ৃন্দে দ‍ূতী।
পাড়ন—তখন না চিনে শ্রীপতি, বলে ব‍ৃন্দের প্রতি,
কোথায় বসতি, কি নাম তোমার, আমায় বল সতী ॥
ফ‍ুকার—অমনি ব‍ৃন্দে কয় শ্যাম চিন্তামণি, কোন দিনের চিনাচিনি,
গ‍ুণমণি হলে অচিনা, সে চিনা এ চিনা, অতি প্রাচীনা।
যার সনে যার দ‍ুখের চিনা, স‍ুখ পেলে সে হয় অচিনা,
পারঘাটে বেশ মাঝির চিনা, পার হলে হয় অচিনা ॥

মিল—চিনা মানুষ হলে অচিনা, কেবা ব'সে দিবে চিনা,
কাজ কি অকাজের চিনা।
মুখ—অচিনাকে চিনার কি কাম, চিনবে কি শ্যাম হলেম অচিনা ॥
ডাইনা—উৎকট রোগ সঙ্কটে, প্রাণ বিয়োগ আশঙ্কা ঘটে,
তখন ঘটে বৈদ্যের সনে চিনা ;
যখন বৈদ্যে বলে ব্যারাম শক্ত, দায় ঠেকে হয় প্রভু ভক্ত,
রোগমুক্তে বৈদ্য হয় অচিনা।
রান্নার বেলা চুলার চিনা, খেলার বেলা ধুলার চিনা,
বিয়ের বেলা কুলার চিনা, তোমার চিনা সেই চিনা।
খাদ—মানের ভয়ে অচিনা লোক হতো হে চিনা ॥
ফুকার—জানি স্বীয় স্বার্থে শঠের চিনা, নিঃস্বার্থে চিনায় অচিনা,
ক্ষণস্থায়ী খলের যে চিনা, তোমাতে আমাতে দেখি সেই চিনা।
যোগের বেলা যাত্রী চিনা, প্রেমের বেলা পাত্রী চিনা,
প্রসবকালে ধাত্রী চিনা, প্রসবান্তে কি চিনা ॥
মিল—আর কত শ্যাম দিব হে চিনা, স্বকার্য সাধনে চিনা,
কাজের শেষে কি চিনা ॥
অন্তরা—ছিল সে কালের এক কালের চিনা, কালগুণে হলেম অচিনা।
যখন চিনা মানুষ হও অচিনা, আমরা আর বুঝি প্রাণে বাঁচি না ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্নজল চিনা, তৃপ্তি সাধন হলে অচিনা,
কাঁটা ঠেকলে গলে বিড়াল চিনা, কাঁটা নেমে গেলে কিসেব চিনা ॥
পরচিতান—দেখি এই ভবে অনেকে, আপনি আপনকে ভুলে হয় অচিনা।
পাড়ন—পরকে চোর বলা প্রবৃত্তি, পরের অপকীর্তি,
নিজের অপযশ চৌর্যবৃত্তি, নিজের নাইকো চিনা ॥
ফুকার—যেমন রসাল বৃক্ষে কাকের চিনা, ফল বিহীনে হয় অচিনা,
যুবকের বেশ যুবতী চিনা, এ যৌবন যায় যখন আর কিসের চিনা।
আষাঢ় শ্রাবণে এক চিনা, ভাঙ্গা নৌকায় তালির চিনা,
লেখার বেলা কালির চিনা, লেখার শেষে কি চিনা ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—ও তুই বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী, এখন এলি মথুরায়।
পাড়ন—দেখে প্রেমময়ীর প্রেম চিদরূপ, শিখেছিস্ ঠাট্টা বিদ্রূপ,
কিরূপ কথা শুনালি আমায় ॥

ফুকার—বললে পারের বেলায় মাঝির চেনা, পার হলে পর হয় অচিনা,
কি বললি তুই অপ্রমাণ ; আমার তরীর জন্য কাঁদে প্রাণ।
ব্রজ গোপীর যৌবন-তরী, কত যাওয়া আসা করি,
দেখলে এখনো চিনিতে পারি, পাছা নেচা গলুই টান ॥
ডাইনা—রোগের বেলায় বৈদ্য চেনা, বললি কি সখী,
কড়ি দিয়ে বড়ি খেলে, চেনার দরকার কি ;
রাঁধুনী রাঁধিবার জন্য, করে থাকে চুলার মান্য,
রান্না ভিন্ন চুলার জন্য, কান্না করে কোন নারী।
খাদ—আরো কিছু কথায় কৌতুক করেছ ভারী ॥
ফুকার—বললে, যোগেব জন্য বেলায় যাত্রী চেনা, প্রেমের বেলায় পাত্রী চেনা,
কথা বলেছ খাঁটি, কেবা শীতে চায় শীতল পাটি।
যোগ বিনে কেউ তীর্থে যায় না, রোগ বিনে কেউ ঔষধ খায় না,
যেমন রস ফুরালে মান্য পায় না, আষাঢ়ে আমের আঁটি ॥
ফুকার—বললে, লেখার বেলায় কালির চেনা, লেখার পরে হয অচেনা,
ছুটিতে হই দিক্‌বিদিক্, আবার আসিছে ভর্তির তারিখ।
প্রেম পাঠশালায় আমি ছাত্র, তোদের যৌবন মসীপাত্র,
আবার লেখা যাবে দেখা মাত্র, দোয়াত কলম রাখিস্ ঠিক ॥

## চোখ ধরা

**দুর্গাচরণ সরকার**

চিতান—একদিন প্রাণবল্লভের আসার আশে, নিভৃত নিকুঞ্জে এসে,
বিনোদিনী ভাবসে বসে, অধোবদনে।
পাড়ন—তখন শ্রীনন্দের নন্দন হরি, নন্দ ভবন পরিহরি,
বলে প্রাণেশ্বরী রাইকিশোরী, চললেন বিপিনে ॥
ফুকার—বনের পশুপাখি সব সকলি নীরব, শ্রমি সব করে বিশ্রাম,
হেথা ভাবে বিনোদিনী, বন্ধু গুণমণি, দুখিনীরে হল বাম। হায়—
বিরহ যাতনা কত না যে বুকে, বিধুমুখী বসে ভাবে অধোমুখে,
তখন আস্তে ব্যস্তে এসে হস্ত দিয়ে চোখে, পিছনে বসিল শ্যাম ॥
ছাড়- তখন বিচলিতা রাই শ্রীমতী,
বলে সে অচিনার প্রতি, হয়ে অতিশয় বিস্ময়।
ধুয়া—কে তুমি পুরুষ না নারী, তোমাকে চিনিতে নারি,
কইতে নারি সইরে নারি—দাও হে পরিচয় ॥

ডাইনা—নবজলধর আশে, চাতকিনী আছি বসে,
প্রেমপিয়াসে মরি মরি।
কেন দু'করে চাপিলে আঁখি, নয়ন ছাড় বয়ন দেখি,
বুঝতে নারি এ কি ছলচাতুরী ॥
হতো যদি নারীজাতি, বুঝত শ্যাম নারীর রীতি,
স্বার্থপর পুরুষের জাতি, নাহি সে কলঙ্কের ভয়।
খাদ—কি উদ্দেশে কি মানসে, এলে এ সময় ॥
ফুকার—আমি ফুকারি কাঁদিতে, নারি কোন মতে, ঘরে শ্বাশুড়ী ননদী,
তাইতে সুজনে কুজনে, কেহ নাহি জানে, নির্জনে বসিয়ে কাঁদি।
হায়, দুর্বলা অবলার আছে কি সম্বল, বন্ধুর জন্য কেঁদে
ফেলি আঁখির জল,
কেন চক্ষে দিলে ঢাকা ও করকমল, কে তুমি হলে প্রতিবাদী ॥
অন্তরা—কে তুমি! তোমায় আমি চিনিতে নারি।
একদিন সঙ্কেত কানন আসিতে, বলেছিলে নিশিতে,
কুল লজ্জা পাসরি ॥
এল না এল না কালা, দুরূহ বিরহ জ্বালা,
সইতে নারি অবলা নারী।
আমি বসে কাঁদি বিরসে, কেন তোমার পরশে,
আমার অঙ্গ উঠল শিহরি ॥
পরচিতান—বন্ধুর অদর্শনে যেঁ বিপদ, একমুখে আর বলব কত,
মণিহারা ফণীর মত, পথ পানে চাই।
পাড়ন—আমি কি ভাবিলেম হল বা কি, সত্য বল কমলআঁখি,
না না ছিঃ ছিঃ, কারে কি শুধাই ॥
ফুকার—আমি থাকিয়ে ভবনে, শুনিয়ে শ্রবণে, বন্ধুর মোহন বাঁশী।
এলেম ত্বরিত গমনে, নিকুঞ্জ কাননে, কুল লজ্জা বিনাশি। হায়—
অকূল পাথারে পাব বলে কুল, ছাড়লেম সতী কুল ছাড়লেম পতির কুল,
এখন শ্যাম বুঝি আমায় হল প্রতিকুল, তাইতে অকূলে ভাসি ॥

ঐ—জবাব রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান—শুনে নয়ন-ধরা রাধার বাণী, কৃষ্ণ গুণমণি কয়।
পাড়ন—রাধে তুমি যার আসার আশে, ভাব নির্জনে বসে,
সে এসে ধরেছে নয়নদ্বয় ॥

ফুকার—বললে, কে তুমি পুরুষ কি নারী, তোমাকে চিনিতে নারি,
বিরহিনী নারী রাই, তোমার একথা শুনে ডরাই।
গোলোকধামে ছিল চিনা, সে চিনার দুঃখ ঘোচে না,
ব্রজে সে চিনা ঠিক আছে কি না, চোখ ধরে পরীক্ষা চাই ॥

মিল—ভাবিনী ভাবনা তোমার যার জন্যে এত, সে এসে চোখ ধরেছে ত,
চিন্ময় বস্তু সে নিশ্চয়।

মুখ—রমণী পুরুষ-পরশে, অনায়াসে পায় সে পরিচয় ॥

ডাইনা—স্বার্থপর পুরুষের রীতি, একি বললে রাই,
শুদ্ধ প্রেমে ব্রজধামে, প্রেম বই স্বার্থ নাই।
শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চানন্দ,
দর্শনে যার প্রেম সম্বন্ধ, গন্ধেই তারে চিনে লয়।

খাদ—আরো একটি কথা শুনে দুঃখ অতিশয ॥

২য় ফুকার—বললে, হস্ত দিযে চক্ষু ঢেকে, প্রতিবাদী তুমি বা কে,
কেন এত প্রতিকূল, প্রতিকূল হলে কি দিত কোল।
ভাষায় যখন বারি শোষে, কূল দেখা যায় চারি পাশে,
যখন মিলন বন্যায় চারদিক ভাসে, কেউ দেখে না নদীর কূল ॥

৩য় ফুকার—বললে, সতীর কুল পতির কুল ছেড়ে, কুল ত্যজে অকূলে পড়ে,
ভাসতেছে যায় পিয়াসায়, কেবা চোখ ধবেছে কি আশায়।
যুবতী রমণী যত্র, যুবকের সঙ্গে একত্র,
হওয়ামাত্র নিজেব গাত্র, আপন পুরুষ চিনতে পায় ॥

## সুবল সংবাদ

যামিনী দত্ত

চিতান—যায় শ্যাম ত্রিভঙ্গ রাখাল সনে গোচারণে।

পাড়ন—কানাই খেলতে খেলতে অন্তরঙ্গ সুবল সনে,
দেখতে দেখতে যায় চম্পক কাননে ॥

ফুকার—দেখে চম্পকের ফুল নয়নে, রাইর কথা পড়ে মনে,
ধরায় পড়ে শ্যামরায় ;
বুঝে অভিপ্রায়—সুবল রাইকে আনতে যায়।
যাবটের নিকটে গিয়ে, সময় বুঝে বুঝাইয়ে,
আপন বসন ভূষণ রাইকে দিয়ে—ত্বরায় কাননে রাইকে পাঠায় ॥

মিল—সযতনে কাননে গিয়ে বন্ধু করলেন কোলে—
চিনতে না পেরে চিন্তামণি বলে, সুবল-বেশী রাইকে।
মুখ—ওরে সুবল সখা, কেন এলি একা—
কেমন আছে রাই প্রাণাধিকা—কুশল কও আমাকে ॥
ডাইনা—ও তুই গেলি একা এলি একা, পেয়েছিস কি রাইয়ের দেখা,
বল সখা কেমন আছে আমার রাই।
কেন নীরব রইলি ও ভাই সুবল, ত্বরা করে কও তার কুশল,
রাইয়ের মঙ্গল সংবাদ শুনে, তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥
যাবটে গিয়ে সখা, নিশ্চয় পেয়েছ দেখা,
কেমন আছে রাই প্রাণাধিকা, খুলে কও আমাকে।
খাদ—কত যাতনা সখা দিলি আমার বুকে ॥
ফুকার—সুবল কই তোরে পায়ে ধরে, যা রে যা তুই আবার ফিরে,
যা রে তুই আয়ান ভবন, প্রাণ আর মানে না বিনে রাধার দরশন।
নামেতে যার ঝরে সুধা, নাম হতে প্রিয় যে রাধা,
সুবল যার নামে বাঁশরী সাধা, রাধা মধুর প্রেমের মহাজন ॥
অন্তরা—যে জ্বালা আমার অন্তরে রে সুবল, ব্রজেশ্বরী কিশোরী বিনে।
আমায় রয় না জীবন, হয় না মরণ রে সুবল—
রাধা অদর্শনে রে সুবল ॥
ও সুবল রে—যার নামে বাঁশরী সাধা, নন্দের বাধা বহি রাত্র দিনে।
আমার গোষ্ঠের খেলা কদমতলা রে সুবল—
যাহার কারণে রে সুবল ॥
ও সুবল রে, রাধা আমার প্রেমের গুরু, মন জানে আর জানে আমার প্রাণে।
আমার ব্রজেশ্বরী রাধা বিনে রে সুবল—
কাজ কি এ জীবনে রে সুবল ॥
পরচিতান—সুবল যে জ্বালা আমার চিতে রাধা বিনে।
পাড়ন—যাও রাইয়ের সন্নিধানে, রাই রইল সাবধানে,
যেন রাই বিনে মরি রে প্রাণে ॥
ফুকার—সুবল, আমি মরি ক্ষতি নাই, তবু সুখে থাকুক আমার রাই,
কই তোরে অকপটে;
আমার মধুর প্রেমের বাঁধা রে, যা ধারি তাই রাধারে,
কত কথা ভাই আজ আমার মনে উঠে।
শ্বাশুড়ী আর ননদিনী, পোষা দুইটি কালসাপিনী,
কেমন আছে প্রাণের বিনোদিনী, গিয়ে দেখে আস নিকটে ॥

ঐ—জবাব　　　　রমেশচন্দ্র আচার্য

চিতান—প্রিয় সখার বাক্যে, মনের দুঃখে,
সুবল-বেশী রাধা কয়।
পাড়ন—তুমি যাকে আনার উদ্দেশে, পাঠালে আয়ানবাসে,
তোমার পাশে, সে এসে উদয় ॥
ফুকার—বললে, একা গেলি একা এলি, রাইকে কোথায় ফেলে এলি,
বল সুবল শুনতে চাই, বুঝি চিনা মানুষ চিন নাই।
দুই অঙ্গেতে আধা আধা, গোষ্ঠ-মিলন নাই আর বাধা,
তোমার সুবলকে সাজোয়ে রাধা, সুবল বেশে এলেম রাই।
ছাড়—সুবল মুখে শুনতে পেয়ে তোমার সব সংবাদ,
সাক্ষাতে তোমার কালাচাঁদ, রাধাই মিলন হয়েছি।
ধুয়া—গোষ্ঠখেলায় চিকনকালা, নূতন খেলায় আমরা মেতেছি ॥
ডাইনা—আয়ান-বাসে কেমন আছে বিনোদিনী রাই ;
পরবাসে পরবশে কারো শান্তি নাই।
সুবল মুখে সংবাদ পেয়ে, রাধার সাজে সাজাইয়ে,
সুবলের সাজ অঙ্গে নিয়ে, আমি রাধা এসেছি।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে সুখী হয়েছি ॥
ফুকার—বললে, রাধা তোমার অঙ্গের আধা, রাধার প্রেমে তুমি বাঁধা,
রাধা প্রেমের মহাজন, যেন ঠিক থাকে শ্যাম সে ওজন।
আমার হৃদয় সিন্দুক করি, বন্ধু তোমায় রাখব ভরি,
ইহ পরকালে ছাড়াছাড়ি—হয় না যেন এ দু'জন ॥
ফুকার—বললে, বাধাপ্রেমে তুমি বাঁধা, রাধা তোমার অঙ্গের আধা,
বাঁধা আছ কালাচান ; তবে শুন একটু বিদ্যমান।
এত ভালবাস যাকে, সত্য কথা কও আমাকে,
কেন ফাঁকে ফাঁকে রাধার বুকে—হান তুমি বিচ্ছেদ-বাণ ॥
ফুকার—আবার শ্বাশুড়ী আর ননদিনী, পোষা দু'টি কালসাপিনী,
রাইকে জ্বালায় অহর্নিশ, ক'রে মায়ে ঝিয়ে পরামিশ।
সহস্র বৃশ্চিক ভুজঙ্গে, দংশনে যে জ্বালা অঙ্গে,
বন্ধু মিলন হলে তোমার সঙ্গে, সকল বিষই হয় নির্বিষ ॥

মাথুর　　　　বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান—হরির মথুরা গমনে প্যারী কাতরা অতি।
পাড়ন—গিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয় বৃন্দাদূতী ॥

ফুকার—ওহে বন্ধু তোমার ব্রজধাম, দেখে যাও তার পরিণাম,
ছিল কি আর হল কি, ভাবি আর কত আছে বাকি।
হায়গো, দিয়ে কত ভালোবাসা, ভেঙ্গে এলে বঁধু সুখের বাসা,
যেমন জল ছাড়া মীনের দশা, আরো দিনে দিনে যেন হবে কি ॥
মিল—সাধের বৃন্দাবন চন্দ্র বিনা অন্ধকারে ঢাকা,
ত্বরিতে চল হে সখা চোখের দেখা দিতে।
মুখ—বড় আশা করে এসেছি এই মধুপুরে,
চল বধু ব্রজপুরে এলাম তোমায় নিতে ॥
ডাইনা—ব্রজের রাখাল যত মৌন হয়ে আছে,
মাধবী মাধব বিনা শুকায়ে গেছে,
শুকায়ে গেছে গো, মাধবী মাধব বিনা—
নাই সে ভ্রমরের গুঞ্জন, নাই সে কোকিলের কুজন,
নাই সে ময়ূর ময়ূরীর মিলন, মধুর প্রেম পিরীতে।
খাদ—প্রলয়ের আগুন বহে মলয় মরুতে ॥
ফুকার—ওহে বন্ধু তোমা বিহনে, শুকশারী গহন বনে,
মৃতপ্রায় তারা সবে, এত জ্বালা কার প্রাণে সবে।
হায় গো, পাখি যত বসে নীড়ে, বক্ষ ভাসে তাদের দুঃখ নীরে,
তোমার ব্রজের যত দুঃখিনীরে, বন্ধু দুঃখ-নীরে কত ভাসাবে ॥
মিল—যত গাভী সব খায় না তারা তৃণ কি জল,
জ্বলে তোমার বিরহ অনল, সবার নীরস চিতে।
অন্তরা—আছি যে ভাবে এ ব্রজে প্রাণ সখা,
একবার চোখের দেখা দেখে যাও।
তোমার ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী—
তার দেখা কি পাও না পাও ॥
বঁধুয়া—প্রেম তরীতে নবীন নেয়ে, কতকাল বেড়ালে বেয়ে,
এখন কেন ফিরে নাহি চাও।
নিয়ে ভাব সাগরের মাঝামাঝি,
মাঝি কেন ডুবাও প্রেমের নাও ॥
বঁধুয়া—চন্দ্রাবলীর অপবাদে, ফেলে এলে যে বিপদে,
মনের খেদে ইহা যদি কও।
আমরা আর হব না প্রতিবাদী, বন্ধু যদি চন্দ্রার কুঞ্জে যাও ॥
পরচিতান—যদি রাজ্য ত্যজে ব্রজে নাহি যাবে হে সখা।
পাড়ন—তবে পুনঃ আর হবে না দেখা,
এই দেখা জনমের শেষ দেখা ॥

ফুকার—আছি মুখ পানে চাহিয়া, কি বুঝাও কি কহিয়া,
মনে কি পড়ে না শ্যাম, লিখলে রাধাপদে তব নাম।
হায়গো কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে, কাজ কি মোদের এ জীবনে,
আমরা গিয়ে যমুনার জীবনে, জীবন ত্যজব বলে মধুর কৃষ্ণ নাম॥

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—গাইতে ব্যথার গীতি বৃন্দাদূতী তুই আইলি মথুরায়।
পাড়ন—যারে প্রণামে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দূতী বৃন্দে,
সেই সম্বন্ধে প্রণাম করি পায়।
ফুকার—বললি, গোপিকার নাই সুখের আশা, বারি বিনে মীনের দশা,
ব্রজের গোপগোপী আদি, প্রেমের সাগরে নিরবধি,
বিচ্ছেদ-রবি প্রখর কবে, প্রেম শোষে না মীন মকরে,
বরং গোপিকার নয়ন আকরে, উথলে প্রেম-জলধি॥
মিল—চন্দ্র বিনে বৃন্দাবনে কই অন্ধকার হল,
সে দেশে রাই-চাঁদের আলো, আমি যাহার সুধা পাই।
মুখ—ঠেকেছি কর্ম বিবন্ধে, এখন বৃন্দে কেমন করে যাই॥
ডাইনা—আবার বললে শুকাল রাই মাধবীলতা,
আমার নয়নবারি নিয়ে—দ্রুত যা তথা;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, জল দিস লতার পাদমূলে,
যদিও সে থাকে দূলে, মরবে না মাধবী রাই।
খাদ—তোদের মতো আমিও তো কেঁদে দিন কাটাই॥
ফুকার—বললে, পাখি বসে শাখী শিরে, ভাসিতেছে আঁখি নীরে,
এই তো আমায় ফাঁকি দিস, কভু পাখি পায় না বিচ্ছেদ বিষ।
তোরা কাঁদিস কৃষ্ণ বলে, নয়ন ভরা থাকে জলে,
জলভরা চক্ষে চাহিলে, তোরা শুকনা জায়গায় জল দেখিস॥
মিল—প্রলয় আগুন হবে কেন মলয় পবন,
দান করে সে নবজীবন, এ ভব ভবনে পাই॥
অন্তরা—ভাব-সাগরে প্রেমের তরী, মরবে না এ তুফানে।
পরিণামে হরির কূলে, আনবে অনুকূল পবনে॥
মরিলে তরী সমস্ত, মহাজন হয় ক্ষতিগ্রস্ত—
কাণ্ডারী হয় ব্যতিব্যস্ত, অবস্থা জেনে।
উত্তাল তরঙ্গে তরী, ছেড়ে দিয়ে খেলা করি—
আমি আমার তরী হেরি, দুই তুফানের মধ্যখানে॥

ফুকার—বললি, তুমি যদি উপেক্ষিলে, ফিরে গিরে সে গোকুলে,
জীবনে দিব জীবন, ওলো অবোধিনী কথা শোন।
একবার জীবন দিলি মোরে, সে জীবন তো পাস নাই ফিরে,
দেওয়া জীবন যমুনারে, দিলে সে তাই করবে না গ্রহণ ॥

## বিচ্ছেদ—উদ্ধব সংবাদ

শ্রীনিশিকান্ত সরকার

চিতান—একদিন দ্বারকার রাজসিংহাসনে, শ্যাম বসে বিষণ্ণ মনে,
ব্রজের কথা পড়ে মনে, ঝরে দু'নয়ন।
পাড়ন—পেয়ে উদ্ধবকে তার কাছাকাছি, কেঁদে কয় আর কেন বাঁচি,
কি সুখে আব ভুলে আছি, ব্রজবাসীগণ ॥
ফুকার—উদ্ধব রে, সাধের বন সেই বৃন্দাবন—
অনেক দিনের পবে স্মবণ, করে কাঁদে আমার মন ;
রাজৈশ্বর্য সুহৃদ সখা, সুবর্ণময় অট্টালিকা,
সবই লাগে ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য এ জীবন ॥
মিল—তাল তমাল শাল ভাণ্ডীবনে ছিল গোষ্ঠবিহার—
বলাই দাদার শিঙ্গা ফুৎকার, শুনে ফিরে আসতো ধেনু।
মুখ—দেখে আয় রে ব্রজবাসে, তারা কেমন আছে,
আর কি ধবলী শ্যামলী নাচে, শুনে মোহন বেণু ॥
ডাইনা—যমুনার কূলে সঙ্গিনীগণ মিলে, জল নিতে আসিত কিশোরী,
আমি হেনকালে কদম্বের ডালে, নাম ধরে বাজাতাম বাঁশরী,
শুনিয়া সে ধ্বনি, রাধা বিনোদিনী, লোকলজ্জা ভয় পাসরি,
থাকত আমাপানে চেয়ে, পলক হারায়ে জলে ভেসে যেত গাগরী ;
ইন্দুমুখ দেখিয়া প্রেমের সিন্ধু দুলত বুকে,
বিষাদের বেদনা এঁকে, অস্তাচলে যেত ভানু।
খাদ—ডাকিত রাখাল সবে ঘবে চল রে কানু ॥
ফুকার—সেদিনের সে খেলা সবই অবসান,
আজো মাঝে মাঝে তেমনি করে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
রাধার ছবি চোখে ভাসে, তেমনি আমায় ভালবাসে,
প্রাণ বঁধুয়ার আসার আশে, হয়ে গেছে ম্লান ॥
মিল—দেখে আয় রে বৃন্দাবনে যত সখীসখা,
নমিত নিকুঞ্জ শাখা, ছড়ায় কি আর পুষ্পরেণু ॥
অন্তরা—উদ্ধব ব্রজে গিয়ে দেখে আয় রে কেমন আছে ব্রজবাসী।
কেন ব্রজের কথা মনে প'লে, আমি সদায় নয়ন জলে ভাসি ॥

কেমন আছে গোপগোপিনী, মা যশোদা আর রোহিনী,
সেই যমুনা প্রবাহিনী, হাসে কি তরঙ্গের হাসি।
কেউ কি কুঞ্জবনে গাঁথে মালা—ও তার সঙ্গে দিয়ে অশ্রুরাশি ॥
খেলার সাথী দ্বাদশ রাখাল, যার সঙ্গে কাটল শৈশব কাল,
তাল তমাল শাল রসাল বিশাল, সবই সমান ভালবাসি।
তারা কেমন আছে জেনে আয় রে—আর আমার ধড়াচূড়া মোহন বাঁশী ॥
পরচিতান—ভাই রে কেমন আছে পিতা নন্দ, কেমন আছে উপানন্দ,
বাৎসল্য প্রেমের সম্বন্ধ, গেছে কি ভুলে।
পাড়ন—এমন আনন্দের ধন গোবিন্দ যার, না দেখে প্রাণ বাঁচে কি তার,
জীবন কি করল পরিহার, যমুনার কূলে ॥
ফুকার—নিশিদিন প্রাণে চায় ও সেই ব্রজের সুখ,
প্রবল কালস্রোতে সুখের পথে বিধাতা বিমুখ।
ধনৈশ্বর্য কতই হল, তবু ত প্রাণ না ভরিল,
সুখ সম্পদে না জুড়াল, প্রেমের পোড়া বুক ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—তখন বাঁকা সখার বাক্য শুনে, দুঃখে উদ্ধব সখা কয়।
পাড়ন—তোমা বিহনে হে ব্রজেশ্বর, ব্রজবাসী নাবীনর,
দুঃখে কাতর, আছে অতিশয় ॥
ফুকার—দেখলেম গোপিনীর দুর্গতি যত, এক মুখে আর বলব কত,
তুমি নাই তাদের নিকট, তাদের জীয়ন মরণ ঘোর সঙ্কট;
তোমায় ভেবে প্রেমের পাত্র, ভাবাবেশে মুদে নেত্র,
তারা পূজা করে দিবা রাত্র, চিত্তচোরেব চিত্রপট ॥
মিল—শয়নে স্বপনে ধ্যানে ভবনে বনে, তোমার কথা করে মনে,—
নয়ন জলে বুক ভাসায়।
মুখ—পথপানে চেয়ে আছে, প্রাণ রেখেছে তোমারই আশায় ॥
ডাইনা—জল ভবিতে আসে যত ব্রজনাগরী,
দু'নয়নের জলে তাদের ভরে গাগরী;
সারি সারি গোপীকুলে, দাঁড়ায়ে যমুনার কূলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, ঝাঁপ দিতে চায় যমুনায়।
খাদ—কান্ত বিনে প্রাণ কি মানে, মুখের সান্ত্বনায় ॥
ফুকার—বললে, রাধার স্বরূপ-চক্ষে ভাসে, প্রাণ বঁধুয়ার আসার আশে,
মলিন হয়েছে এবে, তোমার কুটিল প্রেমের স্বভাবে;
চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদায় থাছে আমোদিনী,
তোমার রাই কুমুদী রয় মুদিনী, শ্যাম শশধর অভাবে ॥

ফুকার—বললে, এখনো কি ব্রজবালা, আগের মতো গাঁথে মালা,
বিচ্ছেদে যারে জ্বালায়, তারা কত না খেলা খেলায় ;
স্মরণ করে প্রাণকান্তে, মালা গেঁথে কাঁদতে কাঁদতে,
তারা তমাল দেখে কৃষ্ণ ভ্রান্তে, মালা পরায় তার গলায় ৷৷
প্রকার—আবার কোন গোপী মালা গেঁথে, ভাসিয়ে দেয় যমুনাতে,
করিয়ে কৃতাঞ্জলি, বলে শোন মালা তোরে বলি ;
প্রাণ বঁধুয়া রয় যে দেশে, সেই দেশে যা ভেসে ভেসে,
যেন গ্রহণ কবেন পীতবাসে, গোপিকার প্রেম অঞ্জলি ৷৷
অন্তরা—বললে, কেমন আছে ব্রজবাসী, সখাসখীবৃন্দ ।
তারা বনে বনে কেঁদে ফিবে, এমনি তাদের কপাল মন্দ ৷৷
করে নিয়ে ক্ষীর নবনী, কাঁদে মাতা নন্দবানী, আর পিতা নন্দ
তোমার প্রাণের আধা রাধারানী, কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ ৷৷
ফুকার—বললে, ভোগ ঐশ্বর্য কতই হলো, তবু এ বুক না জুড়াল,
ঐশ্বর্যের সুখ ফুবায় না, কিন্তু প্রাণের অভাব পুবায় না ;
ব্রজগোপীর প্রেম চাতুর্যে, ছিলে নিষ্কাম প্রেম মাধুর্যে
তোমার দ্বারকার এই ভোগৈশ্বর্যে, মাধুর্যের বুক জুড়ায় না ৷৷

## সখী সংবাদ

চিতান—হলো বৃন্দাবনবিহারী বিনে বৃন্দাবন আজ বৃন্দা শূন্য বন ।
পাড়ন—বনের মুখশ্রী হইল মলিন, শ্রীধাম শ্রীহীন, প্যারী অচেতন ।
ফুকার—সে সময় মুকুলে না ভুলে তুলে হাস,
গন্ধরাজে নাই সুবাস, ভ্রমরের নাই গুনগুনে উল্লাস ।
ফুটে না আর চাঁপা বেলী, ময়ূব ধায় না পুচ্ছ মেলি ।
জলধর কোলে বিজলী, তেমনি রাধিকার নাশিকায় বয় শ্বাস ৷৷
মিল—মধুর কৃষ্ণ নামেব ধ্বনি, রাই ধনির কর্ণে দেওয়ামাত্র,
স্বচেতনা রাই বলে শুন ও চিত্রা ।
মুখ—বন্ধু বিনে এ বিপিনে, এ জীবনে এই শেষের যাত্রা ৷৷
ডাইনা—সুবর্ণ লতিকা সম জানতাম বন্ধু এত দিন,—
পরিচয় পাওয়া গেল, বজ্র হতে হয় কঠিন ।
জানতেম না লো এত দিন, ভবে পুরুষ জাতি এতই কঠিন ।
বন্ধুর বিরহে মরিব জ্বলিয়া, দিস্‌ না লো তোরা বাধা—
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, বন্ধুকে বানাব রাধা ।
বন্ধু হবে রাই কিশোরী ; আমি বাজাব মোহন বাঁশরী ৷৷

বাঁশির গানে আনব বনে, করিয়া উতালা,
পিরীত করে ছেড়ে যাব, বুঝবে কেমন জ্বালা ॥
নইলে বুঝবে কিসে কেন আমি কাঁদি লো,
মুখে হা কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ বলে লো।
পঁ্যাচ—কালি দিয়া পতি কুলে, জল আনতে যমুনার কূলে,
কেন যেতাম কদমতলে, বুঝবে সে পূর্ণমাত্রা।
খাদ—কালার মন যে এত কালা, কই বল্‌লি চিত্রা ॥
ফুকার—চিত্রা লো, মুখে হাসি মনে তাঁর গরল,
এখন বুঝেছি সকল, বিষ বৃক্ষে ফলে কি সুফল।
হেন শাখী শাখা তলে, বসে শুধু অঙ্গ জ্বলে,
জলে গেলে আরও জ্বলে, মলয় হিল্লোল বাজে দাবানল।
অন্তরা—জানলে কি আর জীবন দিই তাঁরে।
যারে দিয়াছি দেহমন, তাঁর কি আর পেলাম মন, আপন কিসে কই তাঁরে ॥
নির্দয় নিঠুর কপট কালা, সে যে ছিল আমার গলার মালা লো—
কাল বলে সে গিয়াছে ছেড়ে।
আমি তাহার লাগিয়া মরিব জ্বলিয়া, প্রাণ দিয়া কি পাই তাঁরে ॥
পরচিতান—বন্ধু রূপে কাল গুণে ভাল, এই ছিল সই এত দিন জ্ঞানে।
পাড়ন—ছিল ধ্যানধরা যোগীর মত, জানতাম না তাঁর বিষ মাখা প্রাণে ॥
ফুকার—চিত্রা লো ছলেবলে হানল বিচ্ছেদ বাণ,
আমায় বলে যায় না কেন, অন্য জনে সাঁপিয়াছে প্রাণ।
দাসী হইতে যাইতাম সনে, বসাইতাম তাঁর দক্ষিণে,
নূতন যুগল দরশনে, নয়নযুগল পদে করতাম দান ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—তখন বিধুমুখীর বাক্য শুনে, অমনি চিত্রা সখী কয়।
পাড়ন—রাই তোর বঁধু আছে মধুপুর, না শুনে তার বাঁশীর সুর,
তোর এত দূরে ভ্রান্তি ভাল নয় ॥
ফুকার—বললে, ফোটে না আর চাঁপা বেলী, ময়ূর যায় না পুচ্ছ তুলি,
শ্রীদামের শাপ হলে শেষ, আবার আসবে ব্রজে হৃষীকেশ ;
ফুটে উঠবে কুসুম কলি, মধু লোভে জুটবে অলি,
আবার ময়ূর নাচবে পুচ্ছ তুলি, প্রেমের বন্যায় ভাসবে দেশ ॥
ফুকার—বললে, মুখে হাসি মনে গরল, বিষবৃক্ষে হয় না সুফল,
ঠেকে বুঝি শিখেছিস্, আমরা দিয়েছিলেম পরামিশ ;
আগে দেখ রাই করে পরখ, আয়ান আর এই ধেনু চারক,
দুইয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সুধা কোনটা বিষ ॥

মিল—জীবন যৌবন আর দেহমন দিয়েছিস যারে,—
আগে না চিনিয়ে তারে, করলি কত অপমান।
মুখ· ·কাঁদালে কাঁদিতে হবে, পেতে হবে দানের প্রতিদান ॥
ডাইনা ·পুরুষ জাতি পাষাণ অতি বললি কি লো রাই,
তোর প্রাণে কি বিধুমুখী কঠিনত্ব নাই ;
বন্ধু গেল চন্দ্রার ঘরে, মান করিয়ে নিশি ভোরে,
পায় ধরে কাঁদালি তারে, তুই পাষাণ না সে পাষাণ।
খাদ—পাষাণে কি তুলতে পারে মোহন বাঁশীর তান ॥
ফুকার—বললে, কালি দিয়ে পতির কুলে, কেন যেতেম কদমতলে,
কালার প্রেমে মজলি রাই, আমরা জোর করে কি নিয়ে যাই ;
আগুনের রূপ দেখলে পরে, পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে,
শেষে মরতে হয় তার পাখা পুড়ে, তোর দশাও ঘটল তাই ॥
ফুকার—বললে, আমি মরে কৃষ্ণ হব, শ্যামেরে রাধা বানাব,
শ্যামকে রাধা করবি তো, শেষে উল্টো ফাঁদে পড়বি তো,
রাই হয়ে শ্যাম মান করিলে, ধড়ার অঞ্চল দিয়ে গলে,
মঞ্জময়ী মানং বলে, পায় ধরিতে পারবি তো ॥
ফুকার—বললি, ব্যবহারে অঙ্গ জ্বলে, জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে,
শ্যাম পিরীতির রীতি ঐ, তোরে বলব কি গো প্রেমময়ী ;
যে প্রেমিকার হৃদকমলে, শ্যাম পিরীতির আগুন জ্বলে,
সাত সাগরের জল ঢালিলে, প্রেমের আগুন নিভে কই ॥

## বসন্ত

[ বসন্ত রাগিণী কবিওয়ালারা শ্রীপঞ্চমী পূজোর আগে গায় না। "বসন্ত" সকল দলে গাওয়াও হয় না। কারণ এই গানে সুরারোপ অতি কঠিন বলে অনেক গায়ক এই গান ঠিক মতো আদায় করতে পারে না। বসন্ত গান কৃষ্ণলীলারই অন্তর্ভূক্ত ; সুতরাং বিপক্ষ কবিয়ালকে গানের জবাব দিতে হয়। এ শ্রেণীর গানগুলিও দক্ষ কবিয়ালগণ জোড়ায় জোড়ায় রচনা করেন—অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এক নং গানটি গাইলে প্রতিপক্ষ কবিয়াল তার জবাব গাওয়াবে। সে জবাবের সূত্র ধরে প্রথম পক্ষ দুই নং গান গাইলে, দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়ালকে পুনরায় তার জবাব গাওযাতে হয়। ]

### শ্রীরাধার বসন্ত—১ হরিচরণ আচার্য

চিতান—বসন্তকালে বকুলে বসে কোকিল কুহরে।
পাড়ন—জাতী যূথী সেঁউতি বেলী, ফুটলো কুসুমের কলি, অলি ঝঙ্কারে ॥
ফুকার—দিয়ে সুখের কালে মুখে মুখ, বসে সারি সারি শারী শুক সুধা বরষে,
সুখ সঙ্গীত রসে বয় মলয় বাতাসে।
এ মধুর মাধবের কালে, হা মাধব হা মাধব বলে,
কাঁদে মাধবী আজ মাধবীতলে, প্রাণের বান্ধব নাই দেশে ॥
মিল—রাই ডেকে কয় ললিতাকে মরমের ব্যথা,—
আমার মনের দুঃখের কথা, শুনবি যদি আয় গো আয় ॥
মুখ—প্রাণ সখী গো, সুখের দিন গিয়েছে আমার—
সে দিন কি আর হয় গো পুনরায় ॥
ডাইনা—এ সুখ বসন্তকালে, বাসন্তী ফুল যত্নে তুলে,
পরাইতেম বন্ধুর গলে, বিনা সুতের হার।
আমার বন্ধুয়া বাজাত বাশী, আমরা যত সেবাদাসী,
সুযন্ত্রে সাধিতেম বসন্তবাহার ;
ভ্রমর ডাকত গুন্‌গুন্ স্বরে, কোকিল করত কুহুস্বর ;
থাকত চিত্তসুখে নৃত্যগীতে, মত্ত বসন্তের আসর ;
বিনে কিশোর সেই প্রাণেশ্বর, সব অসার মৃত শবের প্রায়।
খাদ—কত যাতনা সখী প্রাণে সহা যায় ॥
ফুকার—এই না সুখ বসন্ত সুখের দিন, আমার সেই একদিন আর এই এক দিন,
কৈ সে সুসময় ; বুঝলেম প্রাণান্ত সময়, হায় কেহ কারো নয়।
আপন করতে পরস্য পর, আপন যারা তারা সব হল পর,
বুঝলেম হিয়ার মাংস কেটে দিলে পর, কভু পর কি আপন হয় ॥

মিল—পারিস যদি তারে এনে সকালে দেখা,—
দেখে না কি চক্ষের দেখা, যার জন্যে যার প্রাণ যায় ॥
অন্তরা—রইতেম কত সুখে বন্ধুর সনে, সুখ বসন্ত সুখের দিনে।
আমার গত সুখের কত কথা, থেকে থেকে পড়ে মনে ॥
সখী গো সখী ! বারি নিয়ে স্বর্ণ কুম্ভে, যেদিন আসিতেম বিলম্বে,
কদম্বেরই মূলে কিংবা যমুনা পুলিনে।
বন্ধু ধ্যান মগ্ন যোগীর মত চেয়ে থাকত পথপানে ॥
পরচিতান—স্বার্থপর পুরুষের রীতি, স্ত্রীজাতির মজায় জাতিকুল।
পাড়ন—তারা ঠিক যেমন ভ্রমরের প্রায়, মধু খেয়ে উড়ে যায়,
. পড়ে থাকে ফুল ॥
ফুকার—আমার বন্ধু থাকতে ব্রজধাম, আমার ছিল আদরিনী নাম,
হয়ে প্রেমাধীন, আমার ঘটিল দুর্দিন ;
হায়, আমি কোন দিন মান করে ফিরালে আঁখি,
রাধাকুণ্ডে মরতে যেত নাকি,
আমার সেই বন্ধু আজ এই হল নাকি, হায় হায় পুরুষ কি কঠিন ॥
মিল—বসন্ত কয় হরিচরণ কাজ কি আর রয়ে,
এই বসন্তের কণা নিয়ে সকাল সকাল হও বিদায় ॥

**শ্রীরাধার বসন্ত—২** **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—আশায় রাখতে প্রাণ, আশা দান, তোরা করলি প্রাণ সই।
পাড়ন—পেয়ে কুব্জার ভালবাসা, ভেঙ্গেছে আশার বাসা,
তার আসার আশা আর কই ॥
ফুকার—সখী, ত্বরায় করে আয় গো আয়, আমার দুঃখে জীবন যায় গো যায়,
মন দিয়ে তাই শুন ; করতে গুণাগুণ, হায় বিধাতা বিগুণ।
বন পোড়া যায় সবে দেখে, মন পোড়া যায় দেখবে বা কে,
রাখে কুমোরের পুইন কর্দমে ঢেকে, জ্বলে ভিতরে আগুন ॥
মিল—হায় আমার কপালের লেখা অতি বিচিত্র, করে দে নারায়ণ ক্ষেত্র,
রাই ত তোদের হয় বিদায়।
মুখ—কালের চরিত্র, সম্পদকালে বহু মিত্র, বিপদে বান্ধবের পরিচয় ॥
ডাইনা—শুধু নয় তার রূপটি কাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
কাল ভালবেসে হল দু'কূলে সঙ্কট ;
এই ত বিষম দশা, দশম দশার সময় অতি সন্নিকট।
স্বীয় স্বীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি,
মনসহ দেহধর্ম প্রাপ্ত হোক সব সমাধি,

হরিপ্রেমে মরি যদি, পাই যেন হরি পদাশ্রয়।
খাদ—আগে ত জানি না শ্যামের কঠিন হৃদয় ॥
ফুকার—কৃষ্ণপ্রেমের পোড়া এই দেহ, তোরা আগুনে পোড়াসনে কেহ,
থাকিস নিকটে ; যখন পঞ্চত্বঘটে, হায় কই করপুটে।
শবদেহ সকলে নিয়ে, যমুনায় দিস বিসর্জিয়ে,
দেহ ভাসতে ভাসতে লাগে যেন, গিয়ে ও সেই মথুরার ঘাটে ॥
মিল—এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা থাকে যেন মনে,
আর যেন কেহ কারো সনে, করে না গো প্রেম প্রণয় ॥
অন্তরা—আমায় ধরাধরি করে তুলে, হরি হরি বল সকলে।
রাখিস অর্ধাঙ্গ শ্যামকুণ্ডের জলে, অর্ধাঙ্গ তুলসীতলে ॥
সখীগো সখী, হয়ে এলো অবশ অঙ্গ, আর হল না কৃষ্ণসঙ্গ,
তোরা যত অন্তরঙ্গ নে অন্তর্জলে।
একবার হরিধ্বনি দে গো সবে, হরিদাসীর অন্তিমকালে ॥
পরচিতান—জনমে যত না যাতনা তোদেরে দিয়েছি সখী।
পাড়ন—যেন মরে জন্ম লই ব্রজে, জন্মে জন্মে আমি যে, তোদেরই থাকি ॥
ফুকার—তোদের ফুবাল সব ভাবনা, ম'লে রাধা নাম কেউ ত লবে না,
জগতের মধ্যে যাইস না, রীতির অবাধ্যে, হায় ভাবের বিবুদ্ধে।
মথুরায় যাইস তার সন্নিধান, আদ্যশ্রাদ্ধের করে বিধান,
করিস হরি বলে আমার পিন্ডদান, আমার হরি পাদপদ্মে ॥

**উদ্ধব সংবাদ বসন্ত—১** **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—শ্রীদাম শাপে ব্রজ ছেড়ে মধুপুরে আছেন শ্রীকান্ত।
পাড়ন—হৈল বিরহীর প্রাণ বিনাশের হেতু,এল ঋতু বসন্ত ॥
ফুকার—নূতন শোভা জলেস্থলে কালের কি আশ্চর্য গুণ,
বৃক্ষের পত্র সব তরুণ।
যত বাসন্তী ফুল বনে ফুটল, সৌরভেতে অলি জুটল,
কৃষ্ণের বুকে জ্বলে উঠল, রাধা বিচ্ছেদেব আগুন ॥
মিল—বিরহেতে ব্যাকুল প্রাণ অতি, কেঁদে কয় উদ্ধবের প্রতি, দুঃখের বিবরণ।
মুখ—ওহে উদ্ধব সখা হে, সুখ বসন্তে সুখের চিহ্ন,—
আমার কেন হয় না উদ্দীপন ॥
ডাইনা—কোকিল করে কুহু ধ্বনি, যেন বজ্রপাতের ধ্বনি করি যে শ্রবণ,
হায় হায় প্রলয়কালের অনল যেমন, অঙ্গে লাগে মলয় পবন।
সরোবরে কমল ফুটে, বিষাক্ত বাণ চক্ষে ফুটে,
জেগে জেগে মনে উঠে, মথুরা বৃন্দাবন।
খাদ—তুমি বিনে বন্ধু নাই রে, কে বুঝে বেদন ॥

ফুকার—সুখে মুখে মুখ দিয়ে শারী শুকে কথা কয়,—
সুখ বসন্ত সময়।
হায়! হায়! দুই প্রাণে একত্র মিশে, প্রেমিক থাকে প্রেম সন্তোষে,
যার প্রিয় লোক নাইরে দেশে, জীবনে কিসে ধৈর্য হয়॥
মিল—তুমি বিনে কে করে বিহিত, এদেশে আর এমন সুহৃৎ,
নাই রে কোন জন॥
অন্তরা—সখা এ সুখ বসন্ত দিনে, আমার ব্রজের কথা পড়ে মনে।
সখা হে, মদনকুঞ্জে মিলনকুঞ্জে, ফুল বিছায়ে পুঞ্জে পুঞ্জে,
চর্চিত করিয়ে চন্দনে॥
গোকুলের সব কুলবালা, বিনা সুতে গেঁথে মালা,—
মোদের যুগল সেবা করিত যতনে॥
পরচিতান—মনোলোভা বনের শোভা, তাইতে আবার বসন্ত সময়।
পাড়ন—আমি হারা হয়ে শ্রীবৃন্দাবন, হেরি সকল শূন্যময়॥
ফুকার—ফুটল জাতী ফুটল যুথী, সেঁউতি মালতী বকুল;
হইয়ে প্রেমেতে আকুল।
হায়! হায়! জলে স্থলে ফুলের গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে,
আমার মন-ভ্রমরে কান্দে, বিনে রাধাপদ্ম ফুল॥

## বিষ্ণুপ্রিয়ার বসন্ত

হরিচরণ আচার্য

চিতান—এল শীতান্ত সুখ বসন্ত, অতি সুখবন্ত, সুখের কবিগান।
পাড়ন—আমার বাসনা অবিরত, নবদ্বীপ লীলামৃত, কিঞ্চিত করিতে পান॥
ফুকার—শুভ শ্রীপঞ্চমী হল গত, শুক্লা ত্রয়োদশী সমাগত,
শ্রীমন্ত বসন্তের যশ, ফলে ফুলে নূতন রস, হায় বিরহী বিরস।
মনে পড়ে শ্রীবৃন্দাবন, সেদিন সন্ন্যাস নিল গোরা জীবনের জীবন,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রথম যৌবন, হায় হায় বয়স মাত্র চতুর্দশ॥
মিল—গৌর বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাসে চক্ষের জলে,
কাঞ্চনমালাকে ডেকে বলে, অতি মনের দুখে।
মুখ—সখী কাঞ্চনমালা, দুঃসহ বিরহ জ্বালা,
অহরহ প্রবলা—এই অবলার বুকে॥
ডাইনা—এই যে দুরন্ত বসন্ত, বসন্তে প্রাণকান্ত হলেন সন্ন্যাসী,
সোনার নবদ্বীপ প্রদীপ শূন্য দেখি দিবানিশি।
আর কি সই সেদিন পাব, মনের সাধ পুরাইব,
আর কি পোড়া বুক জুড়াইব, প্রভুর চাঁদমুখ দেখে।
খাদ—বুকে দুঃখের আগুন, জ্বলছে আমার থেকে থেকে॥

ফুকার—যখন স্নান করতে যাই গঙ্গা নীরে, তখন কেন যেন মনে পড়ে,
যমুনায় স্নান করতে যাই ;আমি আমাকে শুধাই ;
হায় আমি কি সেই রাই।
ন'দের পথে করলে ভ্রমণ, ভাবি ব্রজে নাই রে আমার রাধারমণ,
শ্যাম বিরহে রাধা যেমন, হায় হায় আমার দশা ঘটল তাই ॥
মিল—গঙ্গা তীরের বটবৃক্ষ দেখে, ভাবি এ বংশীবট,
বংশীবদন নাই এ কি শঙ্কট, জীবন কিসে থাকে ॥
অন্তরা হায় হায় দুরন্ত বসন্তে, সই কান্ত নাই দেশে—
আমি কি সুখে থাকি নদীয়াপুর।
তাঁরে সবে বলে দয়াল অতি, কেন দাসীর প্রতি নিঠুর ॥
কে জানে অবলার প্রাণ কি করে সখি ! কে বা দুঃখ করে দূর।
নব যৌবনের অঙ্কুরে ভাঙ্গলো, আমার প্রেমের অঙ্কুর ॥
পরচিতান—যত নদীয়ার নাগরীগণ, সবে দুঃখে মগন, ধৈর্য ধরে কিরূপে।
পাড়ন—সুখের তরঙ্গ আর কি আছে, এক বিনে সব গিয়েছে,
সুখ নাই নবদ্বীপে ॥
ফুকার— সখি ! কোকিল ভ্রমব মলয় পবন, আমায় অহরহ জ্বালায় জীবন,
এ বসন্তের প্রথম মাস, গেল সকল সুখের বিলাস, হায় ! এ কি সর্বনাশ।
সুখ বসন্তের এই দুইমাসে, সতীর বিদেশের পতি দেশে আসে,
অভাগিনীর কর্মদোষে, পতি জন্মের মত ত্যজল গৃহবাস ॥

**মদন বসন্ত** **জয়চন্দ্র মজুমদার**

চিতান—শীত অন্তে বসন্ত ঋতু বাসন্তী খেলায়।
পাড়ন—পেয়ে রাজার আদেশ পঞ্চশর, করে নিয়ে পঞ্চ শর,
শাসিতে শর ব্রজধামে যায় ॥
ফুকার—কুঞ্জমাঝে কুঞ্জেশ্বরী সহচরী সহ সুখশয্যায়,
মধুর বসন্তে অশান্ত প্রাণে কাঁদতেছে সদায়।
এমন সময় দুষ্ট মদন, স্বকরে করে শর চালন,
প্যারী বলে মধুসূদন, এই বিপদে রহিলে কোথায় ॥
মিল—সম্মুখেতে মদনেরে করে দরশন—
কিশোরী কয় ওরে মদন, হলি কি পাষাণ।
মুখ—ওরে যা ফিরে যা মদন, দুঃখিনীর মনের আবেদন,
বল গিয়ে তোর রাজার বিদ্যমান ॥
ডাইনা—দুরহ বিরহ জ্বালা একে ত অবলার প্রাণ,
জ্বালার উপর দিতে জ্বালা, হানিস কিরে পঞ্চ বাণ ;

কৃষ্ণ শোকানলে জ্বলে পুড়ে দেহ হল ছাই,
অশান্ত এই ব্রজধামে দেখ কারো শান্তি নাই ;
মদন রে তোর রাজার দোহাই, আমার কথা মান।
খাদ—প্রজার পীড়ন নয় রাজার বিধান ॥
ফুকার—বৎসরের এই দুই মাস মাত্র, আধিপত্য থাকে তোর রাজার,
তাতে কড়া হুকুম, করতে জুলুম, হলি আগুসার।
এই দুটি মাস হলে গত, হবি বে তুই পদচ্যুত,
তাই দেখাস ক্ষমতা এত, ব্যাধের মত করিস অত্যাচার ॥
মিল—চিরদিনই জানি তোবা হুকুমের চাকর,—
খাঁড়া ধরিস মবার উপব, নাই আর পরিত্রাণ ॥
অন্তরা—নিষ্কর রাজ্য এই ব্রজধাম জানাই সম্প্রতি।
মোদের জীবন যৌবন সর্বস্ব ধন হইল ডাকাতি।
মদন রে—বল গিয়ে তোদের রাজারে, ডাকাতিব মাল মধুপুরে,
যদি গিয়ে আনতে পারে, মোদেব কি ক্ষতি।
মদন সে দেশেতে যাওয়া দুষ্কর, তস্কব, ভূপতি ॥
পরচিতান—দেখ রে চেয়ে ব্রজের দশা অতি ভয়ংকর।
পাড়ন—ছিল রাজার সুখে রাজ্যের সুখ, প্রজার ছিল না দুখ,
বিধি বিমুখ রাজা দেশান্তব ॥
ফুকার—যে দিন হতে ব্রজ ছেড়ে, গিয়েছে রে শ্যাম কমলাঁখি ;
নাই সে ফুলের মধু, নাই সে ভ্রমর, নাই সে শুকপাখি।
যমুনাতে জল আনা নাই, কদমতলাতে যাওয়া নাই,
জটিলা কুটিলার আব, নাই ডাকাডাকি ॥

## বসন্ত — বিজয়নারায়ণ আচার্য

চিতান—নূতন স্বভাবের শোভা, মরি কিবা শিশির অন্তে।
পাড়ন—কিবা রসালে মুকুলের ভার, দৃশ্য অতি চমৎকার, নূতন বসন্তে ॥
ফুকার—প্রকৃতির বন বাগানে, ফুটল কুসুম স্থানে স্থানে, জুটল অলিকুল,
তুললো রোল, কি অতুল, পেয়ে ফুটন্ত ফুল ;
বাসন্তী ফুল নানা জাতি, শোভার সম্পদ সে সব অতি,
মল্লিকা রঙ্গন মালতী, জাতী যূথী গন্ধরাজ বকুল ॥
মিল—গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ,
বহিছে মলয় পবন, সুধীর গতি মন্হর।
মুখ—বিরহিনী নারী বিনে, কে জানে বসন্ত দিনে, যে করে অন্তর ॥

ডাইনা—ধরিয়া ললিতার গলে, কমলিনী কেঁদে বলে, শুনলো প্রাণ সই,
দুরন্ত বসন্ত জ্বালা, আর বা কত সই ;
কোকিল পাখি কুহু তানে, হলাহল ঢেলে দেয় কানে,
মদনের পঞ্চ বাণে, প্রাণে হানে নিরন্তর।
বিরহিনী নারী বিনে, কে জানে বসন্ত দিনে, যে করে অন্তর।
খাদ—এ সুখ বসন্তে আমার কান্ত দেশান্তর ॥
ফুকার—বলেছিলে যাওয়ার কালে, আসিব ফিবে সকালে, ব্রজে পুনরায়,
সেই আশায় দিন যায়, এল না শ্যামরায় ;
আশার দিন ত হল গত, আসার আশে থাকব কত,
কত চাব আশা পথ, পিপাসিতা চাতকিনীর প্রায় ॥
মিল—কত জন্মে কত কর্মে করেছি কি পাপ,—
না জানি ভুগিব সন্তাপ, কত জন্ম জন্মান্তর ॥
ঝুমুর—ও সই, কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবনে, আমি কেন প্রাণে বেঁচে আছি।
মরে যাই ক্ষতি নাই, আমি মরিলে পরাণে বাঁচি।
সরল জানিয়ে তারে সঁপেছিলাম সমাদরে, জীবন যৌবন যাঁচি।
কুলমান করলেম দান, তার দোষগুণ নাহি বাছি ॥
পরচিতান—দিন রজনী বিচ্ছেদ বিষে, হা হুতাশে কিবা প্রয়োজন।
পাড়ন—আমার কাজ কি এ ছার জীবনে, শ্যামকুণ্ডেব জীবনে দিব বিসর্জন ॥
ফুকার—কোন দিন আসিলে ফিরে, দাসীর কথা মনে করে, রসরাজ কানাই,
বলে যাই তোমার ঠাঁই, বলো—রাই বেঁচে নাই ;
বসন্ত বিচ্ছেদ অনলে, শ্যাম বন্ধু শ্যাম বন্ধু বলে,
ডুবিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে, মৈল তোমার দীনদুঃখিনী রাই ॥

ঐ—জবাব **মহেশচন্দ্র কবিভূষণ**

চিতান—হয়ে বিষাদিতা, কয় ললিতা, রাধাকমলে।
পাড়ন—ও সই শীতান্তে বসন্তের প্রায়, দুঃখ অন্তে সুখ পায়,
শুনতে পাই বলে ॥
ফুকার—আমাদের আদরের ধন হবে নিতে, বৃন্দাবনে এসেছিল চোর,
সে অক্রুর, হয়ে কি ক্রুব, করলো সব ভগ্নচুব ,
মগ্ন ছিলাম কৃষ্ণসুখে, শোক শেল হানিয়া বুকে,
সহসা গোকুলে ঢুকে, প্রাণবন্ধুকে নিল মধুপুর ॥
মিল—ক্ষান্ত হও কমলমুখী, দেখি কিবা হয়,
হতে পারে কুহু মলয় 'উহু' নামেরি ঔষধ।
মুখ—মনে মনে ভাব কান্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ ॥

ডাইনা—আজ দেখ সব লক্ষণ, তৃণদল করে ভক্ষণ, কুরঙ্গদলে,
এ রঙ্গ কি দেখ্‌ছ বন্ধু মথুরায় গেলে ;
শ্যামা শিখী শারী শুক, করতেছে ক্রীড়া কৌতুক,
আশ্বাসে বাঁধলো বুক, আসবে বলে প্রেমাস্পদ ।
খাদ—মরতে হয় মরিব সবে, ঘুচিবে আপদ ॥
ফুকার—চাই না কিছু ভালবাসার, প্রেম যেন রাই এমনি দশার, সংসার মাত্র ঐ,
বন্ধু কই বন্ধু কই, হা হুতাশ সততই ;
থাকলেও বন্ধু খুব গোচরে, নাই বলে মন সন্দেহ করে,
অহেতুকী প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই জ্বালাতনই ॥
ঝুমুর—ও সই মাধবে মাধব আসিবে, দিবে মাধবীর বনে দেখা ।
এ হৃদয় তাই ত কয় হবে, না এলে পরাণে ঠেকা ॥
মদন জ্বালাতে মরি, আমরাও রাই প্রাণে মরি,
তুমি না মরিছ একা ।
সদা মন উচাটন, এ যে আছিল করমে লেখা ॥
পরচিতান—রমণীর শিরোমণি, কমলিনী শুনলো তোরে কই ।
পাড়ন—যখন ফুল ফুটনের হয় লো সময়, ফুলে ধরা ফুলময়,
কোন্ দিন না হয় সই ॥
ফুকার—ফুটে বকুল ফুটে বেলী, মল্লিকা টগর চামেলী, ফুটে সে রঙ্গন,
অতুলন সে কাঞ্চন, ফুটে চাঁপা চন্দন ;
পদ্ম কুমুদ কৃষ্ণচূড়া, রাধাপদ্ম মনোহরা,
করবী কনক ধুতুরা, রসে ভরা পুষ্প অগণন ॥
ফুকার—চিন্তা মোহ জাগরণ, কর ইহার যা করণ, মরণ ভাল নয় ;
মরলে ভয় অতিশয়, বন্ধু কার কাছে রয় ;
মৈলে পরে কেবা তারে, রত্ন জ্ঞানে যত্ন করে,
ক্ষীর সর দিয়ে করে, কে বন্ধুরে কোলে তুলে লয় ॥
মিল—বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভাণ্ডার,—
এ সময়ে বন্ধু কি আর, ব্রজে না বাড়াবে পদ ।
মনে মনে ভাব কান্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ ॥

**বসন্ত** **চন্দ্রকান্ত আচার্য**

চিতান—দেখে শীতান্ত সুখ বসন্ত ঋতু এল ভবে ।
পাড়ন—ভ্রমর ভ্রমে ফুলে, কোকিলায় ডাকে বকুলে, কুহুকুহু রবে ॥
ফুকার—ছুটিল মলয় সমীরণ, সঙ্গে নিয়ে অন্তরঙ্গগণ, এল ঋতুরাজ ;
নিয়ে নব নব সাজ ; হায় করতেছে বিরাজ ।

সুখ বসন্ত সুখের দিনে, পূর্বের সে সুখ পড়ে মনে,
রাধে ঢলে পড়ল ধরাসনে, বিহনে সে রসরাজ ॥
মিল—চেতন পেয়ে ধবে তখন সঙ্গিনীগণে—
বিনোদিনী কেঁদে বলে, যেন উন্মাদিনী প্রায় ।
মুখ—প্রাণ সখী গো সখী, কি সুখে প্রাণ দেহে রল,
বল দেখি আমায় ।
ডাইনা—নিঠুর হয়ে অক্রুব মুনি, এল মধুর বৃন্দাবন ;
দুঃখের ছুরি বুকে মারি, নিল অবলার জীবন ।
সে বিনে সেবিনে, সখী তোরা কি তাই জানিস নে,
এত দিন হয়েছে গত, তবু তাবে আনিস নে ।
সখী আমায় আব কাঁদাসনে, এনে দে গো শ্যামরায় ।
খাদ—কত আর যাতনা সখী প্রাণে সহা যায় ॥
২য় ফুকার—আমাব দুঃখে বক্ষ ফেটে যায়, তুই গিয়ে সে মথুরায়, ত্বরায় তারে আন ;
সখী আমার কথা মান, কর গো সুবিধান ।
সিন্ধু বিনে মকরিণী, ইন্দু বিনে চকোরিণী,
বারি বিন্দু বিনে সে চাতকিনী, বল কিসে রাখে প্রাণ ॥
অন্তবা—শ্যাম বিনে এই বৃন্দাবনে কি সুখে বই পবাধিনী ।
বুকে দুঃখেব আগুন, জ্বলে দ্বিগুন, হলমে কি দোষে অপবাধিনী ॥
সখী গো সখী—বন্ধুরে পেল কুবুজায়, কি জানি তারে কি বুঝায়,
একবার গিয়ে জেনে আয় সজনী ।
বন্ধুর সেবা সুখেব যোগ্য কিনা, মধুপুরেব কুব্জাধনি ॥
পরচিতান—বিনে শ্যামবরণ, সম্বরণ যায় না নয়ন বারি ।
পাড়ন—এই ছিল কপালে, কাঁদতে হল কৃষ্ণ বলে, হায় আমি কি করি ॥
৩য় ফুকার—এই না সুখ বসন্ত সুখের কাল, সখী আমার কি দুঃখের কপাল,
দেখি দিন যায়, আমি কি করি উপায়, হায় সখী বল আমায় ।
কোকিল ডাকে কুহু কুহু, আমি করি উহু উহু,
হানে আমার বক্ষে মুহুর্মুহু, যেন শক্তিশেলের প্রায় ॥

## বসন্ত—রতি-মদন রহস্য — ভগবতী ভৌমিক

চিতান—মধুর বসন্তে শান্ত রসে দিক দিগন্ত অনন্ত সন্তোষে ভরা ।
পাড়ন—বহে মলয়ানিল মণ্ডিত চন্দন সুগন্ধিত, কুসুম সুষম নন্দিত,
কি সুন্দর বসুন্ধরা ॥
ফুকার—ব্রজের মধুর প্রেম নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আনন্দ বিনিন্দ শ্রীবাস,
কামগন্ধহীন পুলক চৈতন্য, কন্দর্প বিকাশ,

নয়ন গোলক সাদায় কালো, রাধা মণি কৃষ্ণ আলো,
মরম রাসিক বান্ধবিক ভাল, ঐ আমার পক্ষে সুখেন্দু বিকাশ ॥
মিল—মিলন কুঞ্জের দ্বারে মদন পেল বহু লাজ,
রতি বলে কে বাঁধলো আজ হস্তে গলে কোমরে।
মুখ—ধনু বিন্ধন তনু, কে ভাঙলো আজ ফুলের ধনু,
পরাজয় হলে কার সমরে ॥
ডাইনা—কি আশায় মিশিল তারা, আকাশে অমৃতপারা,
নিশা যেন দিশাহারা, হাসে ঊষা গোধূলি,
কি উল্লাসে দশদিশি, নাচে যেন মিশিমিশি রবি শশী বদলি,
আঁখি লাজে ঢুলুঢুলু, শুক শারীর নাচ পুলুপুলু,
কোকিল দিচ্ছে উলুউলু, বিদ্রূপ করে ভ্রমরে।
খাদ—তোমায় সম্মান করে নর আর কিন্নর অমরে ॥
ফুকার—দম্ভে কম্পে চম্পক লতিকায়, সামান্য শামায়, কয় সামাল স্বামী,
তুঙ্গবিদ্যার ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে মরার প্রায় আমি,
বিশাখার বিষ বিগলিতা, ললিতার চোখ লাল সলিতা,
ইন্দুলেখা ইন্ধন জ্বলিতা, বৃন্দার নিন্দা চিত্রার ইতরামি ॥
অন্তরা—ওগো সুসময় কুসুমাঞ্জলি, নিকুঞ্জে রঞ্জে মঞ্জরী,
আছ পঞ্জর ভাঙ্গা খঞ্জের মতন, মনো দুখে আছ কুঞ্জরী।
বঁধু হে, যার কুঞ্জেতে ছিলে দ্বারী, সে রঞ্জক কি গিরিধারী,
এরা কে মালার আধারি, বাজায় খঞ্জরি।
আবার শিরের উপর খঞ্জন নাচে, গর্তে ঠেকেছে কুঞ্জরী ॥
পরচিতান—আমার সুখেতে ভাঙ্গিল মুখ, হাসে হিংসুক,
বিধি বিমুখ যে দুঃখ প্রাণে।
পাড়ন—হায় হায় প্রাণকান্তের মন নিদাপ, চৌদিকে ঘূর্ণিপাক,
কি বহ্নিতাপ, সুখ বসন্তের সন্নিধানে ॥
ফুকার—এক ধনী অতসী বরণী চরণ তরণী ধরণী ভাসায়,
আকাশের রোহিণী ভরণী নখরে হাসায়,
সিন্দুর চন্দন ললাট ঢালা, করে ধনু সাপের বালা,
অসি বাঁশী বৈষ্ণবী মালা, রাধাকৃষ্ণ কোলে নিল কোন কথায় ॥

**বসন্ত—মদন অধিষ্ঠান** **তারক পণ্ডিত**

চিতান—ঋতু বসন্তের আগমনে বৃন্দাবনে মদনের অধিষ্ঠান।
পাড়ন—বিরহিনীর প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে, করতেছে অব্যর্থ সন্ধান ॥

ফুকার—পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণে আঘাত পেয়ে পঞ্চ প্রাণে,
ধরাসনে ঢলে প'ল রাই, সঙ্গিনী সবাই ; হায় হায় -
কেহ বলে একি হল, কেহ বলে ম'ল ম'ল,
কেহ বলে হরি বল, হরিপ্রিয়া বুঝি বেঁচে নাই ॥
মিল—তখন মনের খেদে মদনের প্রতি, কেঁদে বলে বৃন্দাদূতী,
অতিশয় কাতর বাক্যে।
মুখ—করতে বিরহিনীর প্রাণ অন্ত, মদন তোরে কে দিল শিক্ষে ॥
ডাইনা—পুরুষ পাষাণ নারীর প্রতি, সদায় করে অবিচার,
পক্ষপাতী পুরুষ জাতি, তার কাছে নাই সুবিচার ;
বিধি পাষাণ বিধান পাষাণ, পাষাণ সব পুরুষের প্রাণ,
আগে ভালবেসে শেষে, বধে অবলার পরাণ ;
পাষাণ হতে অধিক পাষাণ, অবলা সরলার পক্ষে।
খাদ—কত শুনলেম কত দেখলেম স্বচক্ষে ॥
ফকার—ইন্দ্র পাষাণ কামের বশে, গৌতম সেজে নিশির শেষে,
সতীর কাছে মাগে রতিদান, সতীর সরল প্রাণ ;
পতি জ্ঞানে সতী পেয়ে, মন তুষেছে রতি দিয়ে,
গৌতম পাষাণ, পাষাণ হয়ে, অহল্যারে করেছে পাষাণ ॥
অন্তরা—পুরুষের কি পাষাণ হিয়া, দয়ামায়া নাই রে প্রাণে।
পুরুষ আগে ভালবেসে শেষে, বধে অবলায় পরাণে ॥
মদন রে—আজ যাবে কাল আসবে ক'য়ে, দুঃখের পাষাণ বুকে দিয়ে,
শ্যাম রইল মথুরায় গিয়ে, পড়ে না মনে।
মদন তা হতে তুই অধিক পাষাণ, রাই মরে তোর পঞ্চবাণে ॥
পরচিতান—এলি বসন্তের শর শাসনে, বৃন্দাবনে এই বসন্তকালে।
পাড়ন—গোপীর কণ্ট যত, এক মুখে আর বলব কত,
শুনলে পাষাণ যেত গলে ॥
ফুকার—সীমানা করে সাব্যস্ত, প্রেম পাতায় লিখে সমস্ত,
শ্যামের বন্দোবস্ত এ তালুক, মনে ভাবি দুখ ; হায় হায়—
মিছে কবে জবরদস্তি, অবলারে দিতে শাস্তি,
পাষাণে কর্দম নাস্তি, কি পাষাণে বাঁধলে পাষাণ বুক ॥

## মাথুর – বসন্ত

তারিণীচরণ নট্ট

চিতান—ঋতু বসন্ত কালক্রমে, ব্রজধামে এসে হল উদ্ভব।
পাড়ন—বাসন্তী উৎসবে, সুখী গোকুলবাসী সবে,
গোপীসবে যেন শবাকার সব ॥

ফুকার—বাসন্তী স‌ুখ পড়ে মনে, কমলিনীর কোমল প্রাণে, হানে পঞ্চ বাণ ;
বাণ কি বলবান—কেশব বিনে কে করে নির্বাণ।
বাণাঘাতে ধরাতলে, ভান‌ুস‌ুতা পড়ল ঢলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কণ্ঠাগত প্রাণ ॥

মিল—শ্রীমতীর দ‌ুর্গতি হেরে চতুরা দ‌ূতী,—
ধেয়ে গিয়ে দ্র‌ুতগতি, বলে মথ‌ুরায়।

ম‌ুখ—ওহে শ্যাম কমলাঁখি, তব অমঙ্গল দেখি,
সংবাদ নিয়ে এসেছি ত্বরায় ॥

ডাইনা—শ‌ুন বন্ধ‌ু মনোযোগে, মলয় বায়‌ুর প্রলয় বেগে,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে লেগে, ঘটল নির‌ুপায় ;
হল হেমাঙ্গিনীর হিমগাত্র, নয়নে পলক নাই মাত্র,
চেয়ে থাকে চিত্রপ‌ুত্তলিকার প্রায়।
থেকে থেকে ম‌ৃদ‌ু ম‌ৃদ‌ু, বন্ধ‌ু বন্ধ‌ু কয় ধনি,
ইচ্ছা হয় ত যেতে পার, দেখতে হলে রাই ধনি ;
প্রেম বিচ্ছেদে বিনোদিনী, জন্মের মত যায়।

খাদ—মরণ কালে দেখা না দিলে, আর কি দেখা হবে শ্যামরায় ॥

ফ‌ুকার—ফিরে দেখা পাই কি না পাই, রাই আমাদের পঞ্চত্বপ্রায়,
মনে যদি পায় গিয়ে কালকায়, দেখা দিয়ে এস রাধিকায়।
আসা মাত্র চক্ষে দেখতে, কেউ তোমায় বলবে না থাকতে,
স‌ুখ বসন্তে স‌ুখ দিয়ে রাখতে, এমন কে আছে তথায় ॥

মিল—আমার সনে গেলে আমি নিকটে রব,
ঠেকা হলে ক'রে দিব, সকালে বিদায়।

অন্তরা—তুমি এমন সময় না গেলে, প্রাণকেলে যাই বলে, ম'লে শ্রীরাধিকা প্রাণে।
বরং দিন যাবে শ্যাম কথা রবে, অভাগিনীর প্রাণে ॥
বন্ধ‌ু হে—এবার নাই আর অব্যাহতি, কিশোরীর শরীরের গতি,
যে দ‌ুর্গতি হেরেছি নয়নে।
দেখা আর হবে না কমলাঁখি, বিধ‌ুম‌ুখীর সনে ॥

পরচিতান—রাধার দ‌ুর্দশা হেরে চোখে, অন্যলোকে শ‌ুন বলতেছে কি।

পাড়ন—মনে হয় সন্দেহ, কমলিনীর প্রিয় কেহ,
বিদেশেতে এখন আছে নাকি ॥

ফুকার—প্রিয়জন থাকলে বিদেশে, ঐ প্রাণ যায় না তার আসার আশে,
বাঁচে না ম‌ূলে সকলে বলে, ত্বরা করে এলেম তাই ব'লে।
পড়ে আমরা ঘোর বিপদে, জানাইতে এসে পদে,
কষ্ট পেয়ে মরবে রাধে, বন্ধ‌ু তুমি না গেলে ॥

**বসন্ত** **হরিচরণ সরকার**

চিতান—অন্ত হয়েছে হেমন্ত শিশির, জগৎবাসীর হরষিত মন।
পাড়ন—ব্রজে ছন্নমতি দেখে শ্রীমতীর, দূতীর মথুরায় গমন ॥
ফুকার—নিরানন্দে কেন্দে কেন্দে, যমুনা পার হয়ে বৃন্দে মথুরায় উদয়,
গিয়ে শ্যামের প্রতি কয়, মোদের ব্রজের সংবাদ শুন রসময়।
ঋতুরাজা বলবন্ত, বৃক্ষসকল ফলবন্ত,
বৃন্দাবনে চল শ্রীকান্ত, সুখ বসন্ত সময় ॥
মিল—অনাচারী অবিচারী বড়ই দুর্জন, দিবানিশি তর্জন গর্জন,
করে বসন্ত রাজন।
মুখ—সুখ বসন্ত সুখের দিনে, কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনে,
কিসে বাঁচে গোপিকার জীবন ॥
ডাইনা—কোকিল ভৃঙ্গ শুকশারী, সারি সারি কবে গান,
শেলের মতো হানে প্রাণে, পঞ্চবাণের পঞ্চ বাণ ;
যে দিকে চাই কৃষ্ণ ভিন্ন, শূন্য হেরি বৃন্দাবন,
বিচ্ছেদানল হল প্রবল, কে করিবে নিবারণ ;
শ্রীপদ দিয়ে বিপদবারণ, কর হে বিপদ বারণ।
খাদ—গোপীর ভাগ্যে এই কি ছিল, সার হল মরণ ॥
ফুকার—মলয় পবন হিল্লোলে, বিচ্ছেদ আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, পুড়ে করে ছাই,
যদি যমুনাতে যাই, ভাবি প্রাণ ত্যজিয়ে এ জ্বালা জুড়াই।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, গ্রহণ করতে চায় না কেহ,
অসহ্য দারুণ বিরহ, বল কেমনে ঘুচাই ॥
অন্তরা—তোমায় নিতে আমায় বলেছে প্রাণকিশোরী—
শ্রীহরি বলি চরণে ধরিয়া।
দেখা আর হবে না রাধার সনে—
যায় যদি মরিয়া ॥ গো শ্রীহরি—
বন্ধু হে, যে জন যারে ভালবাসে, সে যদি না থাকে বাসে,
প্রাণে ধৈর্য মানে কিসে, গেলে ছাড়িয়া।
দিল কোন পাষাণে, পাষাণ হৃদয়, পাষাণে গড়িয়া ॥ গো শ্রীহরি—
পরচিতান—হল দুরন্ত এ কাল বসন্ত বিরহিনী রমণীর পক্ষে।
পাড়ন—আছে যে কষ্টে শ্যাম বৃন্দাবনবাসী, গেলে দেখাব স্বচক্ষে ॥
ফুকার—বসন্তে অশান্ত চিতে, ব্রজবাসীর শান্তি দিতে, চল হে কানাই,
আমরা আর কার কাছে দাঁড়াই ; যদি একা আমি ব্রজে ফিরে যাই।
যখন রাই বলবে আমাকে, কোথায় তারে এলি রেখে,
কেমন করে বলব রাধাকে, 'রাই তোর বন্ধু আসে নাই ॥

**বসন্ত** — **রাজেন্দ্রনাথ সরকার**

চিতান—মধুর বসন্তে রাই ডুবলো শ্যাম প্রেম সাগরে।
পাড়ন—কৃষ্ণ নাম কণ্ঠহার, পঞ্চরসে আহার বিহার,
নানা ভাব অলঙ্কার, ফুটলো কিশোরীর শরীরে ॥
ফুকার—রাধে সর্বত্র হেরিছে খেলা, নীলবরণ বিদ্যুন্মালা,
খেলিছে তুফান, ছুটলো প্রেমসাগরে বান। হায়—
আকাশে সমীরে নীরে, অভিনব ছবি হেরে,
দ্বিপ্রহরের রবিকরে, সুধাকরের করে করে স্নান ॥
মিল—প্রেমানন্দ ধরে না আর রাধার আধারে,
ডুব দিয়ে শ্যাম প্রেমসাগরে, সখীগণের কাছে কয়।
মুখ—কি আনন্দ কি আনন্দ, কি অপ্রতুল ফুলের গন্ধ,
ভূলোক হেরি শুধু আলোকময় ॥

ডাইনা—পরশ পরশে শুনি লৌহ হয় সোনা,
পুরুষের পরশে এমনি হয় কি ললনা,
পরশ পেয়ে চিন্তামণির, কমে না প্রেমনয়নের নীর,
কোন্ গুণে সই এ রমণীর, সবই হল প্রেমময়।
খাদ—এই আলোকের ঝলকে সই পলক হল লয় ॥

ফুকার—কাঁদি অহরহ নাই বিরহ, সদা যেন বন্ধুর সহ,
বন্দী আমার মন, করি প্রেম রাজ্যে ভ্রমণ। হায়—
আকাশ পানে থাকলে ছেয়ে, প্রেমে যায় সে শূন্য ছেয়ে,
বন্ধু আমার বাতাস হয়ে, কত রঙ্গে করে আলিঙ্গন ॥
মিল—ধরাতলে জলেস্থলে যত লহরী, সবার মধ্যে শোভা হেরি,
সবই আমার বন্ধুর জয় ॥

অন্তরা—দেখলো সই দামিনী, জাগে দিবা যামিনী, শ্যামরূপ বসনখানি পরিয়ে।
বিজলী বিজন বনে, বন্ধুয়ার আলিঙ্গনে, উঠিছে সহরষে শিহরিয়ে ॥
কত শত লতিকে, হেরে ব্রজপতিকে, প্রণমিছে মাথা নত করিয়ে।
কাননে কুসুমগুলি, পরশে তার অঙ্গুলি, হাসিতে হাসিতে পড়ে ঝরিয়ে ॥
নাচিয়া যমুনার জল, গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কল্‌কল্ সুস্বরে লহরিয়ে।
সে বিনে আর কেবা কার, নব রসে সবাকার, প্রাণহরি প্রাণ নিল হরিয়ে ॥
পরচিতান—আমায় এনেছে প্রেমনগরে, নব প্রেম নাগরে।

পাড়ন—যেন কত রসে আলিঙ্গন দিয়েছিল সে,
তাইতে দেখি বসে, কত লহর প্রেমসাগরে ॥

ফুকার—সখী তারুণ্য কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত জড়িত,
শ্যাম তড়িতাঙ্গে ; আমায় আকর্ষে রঙ্গে। হায়—
তরী যেমন বারির টানে, না জেনে ধায় সিন্ধুপানে,
আমি তেমনি আকুল প্রাণে, কোথা যাই তরঙ্গে তরঙ্গে ॥
মিল—যার পরশে এক নিমেষে সকলই নূতন,
সে যে আমার কেমন রতন, প্রেমগুণে ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—রাই রঙ্গিনীর বাক্য শুনে সঙ্গিনীগণ কয়।
পাড়ন—তোরে বলব কি গো রাধিকে, তুই কৃষ্ণপ্রাণাধিকে,
গুণাধিকে শোন গো পরিচয় ॥
ফুকার—হেমন্ত শিশির অন্তে, সুখ বসন্ত হল প্রতিকূল,
বনে অশোক বাসক কৃষ্ণকেলি, ফুটল বক বকুল।
মত্ত হয়ে ফুলের গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে,
গোবিন্দ প্রেমেব সম্বন্ধে, আনন্দে তোব মন প্রাণ আকুল ॥
মিল—তবে কেন রঙ্গিনী তোর হেন ভাবান্তর,
সুখ বসন্তে শ্যাম নটবর, রয়েছে আজ তোরই কাছে।
মুখ—তোর মতো রাই সৌভাগ্যবতী, যুবতী আর কেবা দেখেছে।
ডাইনা—আবার বললি বিধুমুখী, পরশের পরশে নাকি, লৌহ হয় সোনা,
রাধে সোনার আবার সোনা হতে কেমন বাসনা ;
তুই যে মোদের কাঁচা সোনা, সকল সোনার বাছা সোনা·
সোনারে বানাতে সোনা, পরশের কি শক্তি আছে।
খাদ—গোবিন্দ প্রেমের সম্বন্ধে সন্দেহ মিছে ॥

ফুকার—পরশ পেয়ে চিন্তামণির, নয়নের নীর কমে না কখন ;
রাধে নিত্য শুদ্ধ প্রেম পিরীতির রীতি ঐ মতন।
বিশুদ্ধ প্রেম যাব অন্তরে, নয়ন গঙ্গায় উজান ধরে,
জন্ম কিংবা জন্মান্তরে, আনন্দাশ্রু হয় না নিবারণ ॥

ফুকার—আবার বললি বন্ধুর সনে, প্রেমের মিলন বিরহ শূন্য,
রাধে প্রেমবিরহে প্রেমিকের প্রাণ, হয় না কো ক্ষুণ্ন।
দুঃখে হয় না নিরুৎসাহ, সুখেষু বিগতস্পৃহ,
সমভাব মিলন বিরহ, অহেতু প্রেম সাধনার চিহ্ন ॥

অন্তরা—তরী যেমন বারির টানে সিন্ধুপানে ধায়।
তেমনি শ্যামপ্রেমের তরঙ্গে নাকি, তোরে নিয়ে যায় ॥

অনুরাগের বৈঠা ধরি, বসে থাক গো রাই কিশোরী,
আপনি গিয়ে লাগবে তরী, ত্রিবেণীর সে মিলন মোহনায় ॥

## শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বসন্ত — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—হেমন্ত শিশির অন্তে সুখ বসন্ত ভবে অধিষ্ঠান।

পাড়ন—শারী-শুক পেয়ে সুখ, মুখে দিয়ে মুখ,
সুখ বসন্তে সুখে করে গান ॥

ফুকার—ত্যজে ব্রজের রসের খেলা, করতেছেন ঐশ্বর্যলীলা,
মথুরানাথ মথুরা ভুবন ; পেয়ে কাল হয়ে কাল, বসন্তের আগমন।
বসন্তের ভাব দরশনে, মলয় পবন পরশনে,
রাধার কথা করে মনে, ধরাসনে কৃষ্ণ অচেতন ॥

মিল—ক্ষণেক করে চেতন পেয়ে মথুরাপতি,
বলেন সহচরীর প্রতি, সহচরী বল রে বল।

মুখ—মম সর্বার্থসাধিকা, বল রে আমায় গুণাধিকা,
প্রাণাধিকা রাধিকার মঙ্গল ॥

ডাইনা—অহরহ দহে দেহ প্রেম বিরহ জ্বালাতে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, নির্বাণ হয় না জ্বলেতে ;
মন পাখিকে যদি বলি, বলরে পাখি রাধা বল,
নামে পড়ে ঘৃতাহুতি, দ্বিগুণ আগুন হয় প্রবল,
হারা হয়ে শ্রীরাধা বল, অঙ্গে নাই মোর আধা বল।

খাদ—রাধা আমার অঙ্গের আধা, অন্তিমের সম্বল ॥

ফুকার—রাধার প্রেমে পড়ে বাঁধা, ব্রজে বইতেম নন্দের বাধা,—
রাধা নামে সাধা বাঁশরী ; কি দোষে এ দাসে নিদয় রাই কিশোরী।
রাধা বিনে আপন বুঝে, ক্ষুধার কালে শুধাবে যে,
এমন কেউ রইল না ব্রজে, ইচ্ছা হয় যে বিষ খেয়ে মরি ॥

মিল—অবোধ মন মানে না প্রবোধ, রাধা বিহনে,
রাধার স্মৃতি পড়ে মনে, ধারা বহে চক্ষের জল ॥

অন্তরা—আমায় ত্বরায় করে বলে দে প্রাণ সজনী—
বল শুনি আমার শ্রীরাধিকার কথা।
আমি কার কাছে কই মনের ব্যথা,
ব্যথীত পাব কোথা ॥ গো সজনী—

সখীরে, দেখিয়ে শ্রীরাধাতন্ত্র, বশ করেছি জিহ্বা যন্ত্র,
রাধা মন্ত্র অন্তরেতে গাঁথা।
আমার অঙ্গের আধা রাধা বিনে—
জীবন ধরি বৃথা ॥ গো সজনী—
পরচিতান—এ সুখ বসন্ত দিনে রাধা বিনে মন করে কিরূপ।
পাড়ন——শয়নে স্বপনে ভবনে কি বনে, পড়ে মনে শ্রীরাধিকার রূপ ॥
ফুকার—সুখ বসন্তে সুখ পেয়ে, শারী মুখে মুখ দিয়ে,
মনোসুখে শুকে করে গান ; ভ্রমরে গুমরে ধরে বাসন্তী তান।
বসন্তে হয়ে সুশান্ত, রসিক থাকে রসবন্ত,
আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল যেমন কৃতান্ত সমান।

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—প্রেম উন্মত্ত শ্যামকে ধরি সহচরী কয়।
পাড়ন—দেখে সুখময় বসন্ত, কাঁদতেছ রাধাকান্ত,
তোমার মন ত এত ভ্রান্ত নয় ॥
ফুকার—তুমি কাঁদাইয়ে নরনারী, ব্রজপুরী পরিহরি, এলে হরি মথুরায়,
তুমি মাধুর্যের ধন ভুলে আছ, ঐশ্বর্যের মেলায় ;
পড়ে তোমার প্রেম ফাঁদে, গোকুলে গোপিনী কাঁদে,
কান্তা-প্রেম শর হৃদে বিঁধে, কাল বসন্তে তোমারে কাঁদায় ॥
মিল—রাধা বলে কেন হলে ধৈর্য হারা, রাধা তোমার প্রেমের মরা,
তোমার সে মরার আর নাই মরণ।
মুখ—প্রেম সাগরে দিন রজনী, রাই হংসিনী করে সন্তরণ ॥
ফুকার—বললে, রসনার বাসনা সদা, পান করিতে নামের সুধা,
নাম নিতে যেতে চায় প্রাণ ; নামরূপেতে আদ্যাশক্তি শক্তি করে দান ;
স্বপনে কি জাগরণে, যা গো রাধা নাম স্মরণে,
সদা তোমার হৃদয় বীণে, শুনায় তোমায় রাধানামের গান ॥
ফুকার—বললে, রাই বিনে নাই দেহধর্তা, বলে ব্রজের কুশল বার্তা,
মৃতদেহে দে জীবন,
গোকুল প্রেম সাগরের অতল তলে, আছে আজীবন ;
তুমি কাঁদ মধুর দেশে, রাধা কাঁদে ব্রজবাসে,
দু'য়ের মিলন কান্না রসে, হবে শেষে গুপ্ত বৃন্দাবন ॥
ফুকার—তুমি কেন বল রাধাকান্ত, আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল কৃতান্ত সমান,
ও প্রাণ প্রেমের অনুরাগে করলে, প্রেমময়ীকে দান।
তোমরা দু'জন এ সংসারে, জন্ম মৃত্যুর পরপারে,
কোন্ কৃতান্ত নিতে পারে, যাহার জীবন জীবনে মিলান ॥

মিল—হাসির চেয়ে কান্না ভাল প্রেমিকের কাছে ,—
· কান্নার শেষে হাসি আছে, বলিয়াছে জ্ঞানীগণ।

ডাইনা—আবার বললে অহরহ দহিছে দেহ—
বিরহ আগুনে পুড়ে মরে না কেহ;
প্রেম স্বরূপে হৃদয় থেকে, কাঁদায় তোমায় শ্রীরাধিকে,
মহাভাব মহাব্যাধিকে, কেন করবে অযতন।

খাদ—আধা বল রাধা বল তোমার হৃদয়ে গোপন ॥

অন্তরা—পোড়াইও না অন্তরঙ্গ নিজে পুড়িয়া।
নইলে এ আগুন উঠিবে তোমার বিশ্ব জুড়িয়া ॥
তুমি কাঁদ যাহার ভাবে, এ কান্না তার প্রাণে যাবে,
সে কেঁদে তোমায় কাঁদাবে, কান্না উঠবে বাড়িয়া।
তুমি ধৈর্য রাখ ঐশ্বর্য মাধুর্য ছাড়িয়া ॥

## "কবি" বা লহর কবি

[ 'কবি' হাস্যরসের আধার। এগুলিও উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক। হাস্যরসের আড়ালে কিছু কিছু গানে গ্রাম্যতা দোষ পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে আপাত তরলতা ও রঙ্গ রহস্যের আবরণে গুরু গম্ভীর সামাজিক সমস্যাদি নিয়েও 'কবি' রচিত হয়ে, এ ধরনের গানকে লঘু হাস্যরসের প্রভাবমুক্ত করেছে। উভয়পক্ষই একটি বা একজোড়া 'কবি' গেয়ে থাকে, এবং বিপক্ষ কবিয়ালকে তার জবাব গাওয়াতে হয়। ]

### ফুলের কবি—১ — হরিচরণ আচার্য

চিতান—আর রসের ছবি ফুলের কবি, সভাতে করতেছি উদয়।
পাড়ন—হল কুমুদিনী আমোদিনী পেয়ে ভাদ্র মাস,
করিয়ে উপহাস, পদ্মিনীকে কয়॥
ফুকার—আর কুমুদিনী নামটি আমার, তোর আমার একখানে বাড়ি,
আমি সরলা নারী ;—
সারাদিন ঘুমিয়ে থেকে, সব মধু জমিয়ে রেখে,
আমি জ্যোৎস্না রাতে প্রাণবন্ধুকে, মধু দান করি॥
মিল—আর পদ্ম দিদি, কেন তোমার দেখি অবিধি,
আছে রাত্রিতে আমাদের বিধি, বিধির বিধি পূর্বাপর।
মুখ—আমায় বল গো পদ্মিনী দিদি, বল গো বল,
শুনি তোর পিরীতের খবর॥
ডাইনা—আমরা সকল ফুলে তোরে মানি, তুইতো ফুলের মধ্যে মহারানী,
সূর্য মহারাজ ; ছিঃ ছিঃ বড় ঘরের কুৎসা কথা শুনতে বড় লাজ।
তোর দুঃখ চক্ষে হেরে, দুঃখে আমার মন পোড়ে,
থাকিস সারা রাত্রি একলা ঘরে, দিনে কেন দুই নাগর।
খাদ—আমার কাছে বল দেখি, আমি কি তোর পর॥
ফুকার—আর অন্য লোকে প্রণয় করে, কারো বা থাকে দুই তিন জন ;
করে ফাঁকে কাজ সাধন।
দিদি তুই কি সন্ধানে, দশ জনের বিদ্যমানে,
ও তুই দুই জনারে এক সমানে, কেমনে যোগাস মন॥
মিল—আর হিংসা কৈতব নাইকো কারো দোহার মন খুশী,
এই দু'য়ের মধ্যে কেবা বেশী, ভালবাসার হয় গো তোর॥
অন্তরা—আমি তোর ছোট বোন, পোড়ে মন,—তোর যেমন কেমন কেমন ব্যবহার।
দিদি তোর মত কই মিলে খুঁজে,—
তুই মোদের ফুলের মাঝে গোলবাহার॥

আর এক জনে, এক জনে পিরিত করে সুজনে,—
এমন দু'জন থাকে কার ; মরি হায় লো—
এই দু'য়ের মধ্যে কারে করলি দিদি,—তোর ল-এ আকার অনুস্বার ॥
পরচিতান—আর মন খুলে তোর মনের অর্থ, যথার্থ বল দেখি আমায়।
পাড়ন—ও তোর কীর্তি যত, বলব কত, হলেম জ্ঞান হত,
এমন কাজ তোর মত, কে করে কোথায় ॥
ফুকার—আর বড় ঘরে যেমনি করে, সব লোকে তেমনি করে কাজ ;
ইথে নষ্ট হয় সমাজ।
দিদি তোর দেখাদেখি, অশোক বাসক কেতকী,
আর ভূমিচাঁপা সূর্যমুখী, হয়েছে নিলাজ ॥

ঐ—জবাব হরিচরণ সরকার

চিতান—শুনে আজগুবি এক লহর কবি, মনেতে ভাবি অনিবার।
পাড়ন—করে কুমুদিনী কমলে দ্বন্দ্ব, কে ভাল কে মন্দ কে করে বিচার ॥
ফুকার—আমি নামটি ধরি কমলিনী সকলের কাছে আদর পাই,
কত পূজার কাম চালাই।
সারা রাত ঘুমিয়ে থাকি, সব মধু জমিয়ে রাখি,
করলি খচরা পিরীত বোচরা মুখী, তোর মধ্যে মধুর গন্ধ নাই ॥
মিল—ভবে সবাই জানে কমলিনী সাধ্বী সতী, সদা পতি পদে মতি গতি,
একমাত্র দিনপতি পতি সার।
মুখ—বললি কি কুমুদিনী, ও তুই রাত্রে থাকিস আমোদিনী,
দিনে নাই বাহার ॥

ডাইনা—বললি ল-আকার অনুস্বার কেবা, আমাকে বেশ করে পরিচয় দিবা,
তোর কাছে বলতে নাই কো মানা ঃ
আমার ল—আকার অনুস্বার বলতে, ন—আকারে না।
সূর্য যখন যায় অস্ত, কমল মুদিত সমস্ত,
যাদের সমান পিরীত উদয় অস্ত, তার আবার ল-আকারের কি দরকার।

খাদ—আর একটি কথা শুনে প্রাণ জ্বলে আমার ॥

ফুকার—বললি, দুই জনার মত এক সমানে, বল দিদি কেমনে রাখিস,
কথা শুনতে লাগে বিষ।
দুই নাগর আসলে কাজে, যদি বা ঝগড়া বাজে,
না হয় তুই এসে বোন মাঝে মাঝে, দুই একদিন সাহায্য করিস ॥

ফুকার—বললি, দুই জনার মন কেমনে রাখিস, বল দিদি শুনে জুড়াই বুক,

লজ্জায় দেখাস না লো মুখ।
দেখিস না ভ্রমর সবে, মধু খায় পুত্রভাবে,
থেকে আকাশেতে সূর্যদেবে, ভোগ করে ভালবাসাটুক ॥
ফুকার—বললে, ভুমিচাঁপা সূর্যমুখী, সুখী রয় বললি তার প্রমাণ,
ও তুই আমার কথা মান।
হোক না কেন সুন্দর গাত্র, জোটে না প্রেমের পাত্র,
তাতে মধু নাইকো বিন্দুমাত্র, দিনরাত্র থাকে এক সমান ॥
ফুকার—সূর্য নয় মোর প্রেমের পাত্র, দান করে উত্তপ্ত কিরণ,
ফুটে দিচ্ছি আচ্ছাদন।
সূর্য থাকে আকাশে, উত্তাপে বারি শোষে।
ভাবি জলকাদা শুকায়ে শেষে, গ্রীষ্মেতে নাশে এ জীবন ॥

ভল্লুকের কবি—১ হরিচরণ আচার্য

চিতান—আমি ভিক্ষাজীবি অক্রুর মুনি, দরিদ্রের শিরোমণি,
ভিক্ষাতে রক্ষা উদরটা।
পাড়ন—তোরে লোকে বলে মহামহিম মহিমা অপার—
কৃষ্ণ তুই আমার, গুণের ভাই-বেটা ॥
ফুকার—ও তুই প্রভাস তীরে করিস যজ্ঞ, দরিদ্রের ফিরল ভাগ্য,
নিমন্ত্রণ করেছিস ত্রিলোক, এল অনেক ভদ্রলোক।
এসে সব দেব গন্ধর্ব, সভার বাড়াল গর্ব,
আবার দেখি কি একটা অপূর্ব, এল এক ভুতুড়ে ভল্লুক ॥
মিল—হল কি অঘটন আনন্দের ঘটা, ও তোর প্রভাস যজ্ঞের বেশ শোভাটা,
সভাটার শোভাটার আর নাই কসুর।
মুখ—হাবলা বাবলা কথা কয় মুখে, এল কোন জঙ্গলা থেকে, বাংলা বাহাদুর ॥
ডাইনা—ওটা পাকিয়ে চক্ষু হাঁকিয়ে এসে, সভাটা জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে,
কত কি চাখিয়ে চাখিয়ে খায়,
ও সেই অঙ্গে ধুম্বা ধুম্বা লোম্বা দেখি, ভোম্বল দাসের প্রায়।
কইতে আমার ভয় করে, জামাই বলে কয় তোরে,
কথা সত্য করে বল দেখিরে, কৃষ্ণরে ভাল্লুক কিরে তোর শ্বশুর।
খাদ—ওটা দীঘ পাশে এক সমান, অপরিমান জোর ॥
ফুকার—যজ্ঞে ভল্লুক এল এল বলে, যত সব ছেলেপেলে,
মিলে সব ঢিলে মারে গায়, আমোদ লেগেছে সভায়।
কেউ হাসে খিটখিটায়ে, কেহ দেয় ধুলা ছিটায়ে,
ওটা ভ্রূকুটি দেয় কিটমিটায়ে, লাল চোখে মিটমিটায়ে চায় ॥

মিল—সভায় সুস্থির হয়ে বসে না মোটে, আবার পলকে পলকে উঠে,
চোখ দুটা ঝলকে যেমন মাণিক জোড় ॥
অন্তরা—বিয়া করলি ষোল হাজার, হাজার হাজার রাজার ঝি।
করলি কই বিয়ে ভল্লুকের মেয়ে, কই আমার সে মাতাজী ॥
এল রাজা সত্রাজিৎ, ভীষ্মক জগতে পূজিত,
তোর যত সব শ্বশুর জানি সবার কুলজী।
ও তোর ভল্লুক শ্বশুর কুলীন বেশী,—
সে বটে জানোয়ারগঞ্জের ব্যানার্জী ॥
পরচিতান—ভল্লুক একা একা যজ্ঞস্থলে, এল প্রভাসের কুলে,
সঙ্গে আর কেহ নাই সঙ্গী।
পাড়ন—যেমন অমাবস্যার চাঁদ উঠেছে, এই সভার ভিতর,
সাবাস্ সাবাস্ তোর, শ্বশুরের ভঙ্গী ॥
ফুকার—বাছা ভল্লুক যদি হয় তোর শ্বশুর, কেন মর্যাদার কসুর,
শ্বশুর তোর পশুর শ্রেষ্ঠ হয়, আমার এক কথায় সংশয়,
কুতকুতায় রাগের ভরে, ফুতফুতায় ভল্লুক জ্বরে,
আবার কেতকুতায়ে মানুষ মারে, আমার লাগে ভয় ॥

ঐ—জবাব                                        হরকুমার শীল

চিতান—তুমি কল্পনাতে অক্রুর খুড়ো, আমি হই কৃষ্ণ পীতবাস।
পাড়ন—তুমি যজ্ঞ সভায় দেখে শ্বশুর জাম্বুবানের রূপ,
বেয়াই বলে খুব, করলে উপহাস ॥
ফুকার—বললে, ভল্লুক নাকি আমার শ্বশুর—
এ কথায় কসুর কিছু নাই, যেদিন পাতালপুরে যাই ;
স্যামন্তক মণির তরে, গিয়ে ভল্লুকের ঘরে,
আমি জাম্বুবতী বিয়ে করে, হয়েছি ভল্লুকের জামাই ॥
ফুকার—বললে, ভল্লুকের গায় লোম্বা ভরা,—
তাই দেখে তোমার করে লাজ, ওটা শ্বশুর মশাই'র সাজ ;
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মিলে, দুরন্ত শীতের কালে,
তোমরা ঢুকলে বেয়াইর লোমের তলে, সারিবে ভোট কম্বলের কাজ ॥
ফুকার—তুমি বয়সে বুড়ো অক্রুর খুড়ো, এসেছ প্রভাস যজ্ঞেতে,
কেবল আমার ভাগ্যেতে ;
দুই বেয়াইর বলিহারি, শ্বশুরের লোম্বা ভারী,
আবার খুড়ো মশাইর লম্বা দাড়ি, মিলেছে যোগ্যে যোগ্যেতে ॥

ফুকার—বললে, ভ্রূকুটি দেয় কিটামিটায়ে তাই দেখে বাঁচ না ডরে,
পেয়ে বেয়াইকে ধারে ;
শ্বশুর মোর বড় রঙ্গী, পেয়েছে যোগ্য সঙ্গী,
তাইতে মুখটা অমন করে ভঙ্গী, সে একটু রঙ্গরস করে ॥
ফুকার—বললে, ভল্লুক শ্বশুর কুলীন বেশী, জানোয়ারগঞ্জের ব্যানার্জী,
ভাল দেখালে আঁজি ;
কুলীন বেয়াইকে ধরে, নিয়ে যাও তোমার ঘরে,
ও বেশ উকুন বেছে দিতে পারে, যদি হয় বেয়াইনের মর্জি ॥
ডাইনা—সভায় জাঁকিয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে, এসেছে ভদ্রসভায় ভদ্র বেশে,
জানে সে ভদ্রলোকের মান ;
ও যে রামের মন্ত্রী ষড়যন্ত্রী বুড়া জাম্বুবান।
তাইতে পাছে রেখে তাকিয়া, বসল সভায় জাঁকিয়া,
তোমার ডোর কৌপ্নীর বহর দেখিয়া, রাগ করে রক্তচক্ষু করে চায়।
খাদ—জান না অক্রুর খুড়ো, ও যে তোমারও এক যুগের বুড়ো,
প্রণাম কর পায় ॥

## হরিদাসের কবি—১ হরিচরণ আচার্য

চিতান—করতে হরিদাসের ভজন নষ্ট, রামচন্দ্র খান মহাদুষ্ট,
পাপিষ্ঠ বিশিষ্ট চেষ্টায়।
পাড়ন—দিয়ে হাজার টাকা চুক্তি করে বাজারে, রাজা এক বেশ্যারে পাঠায় ॥
ফুকার—অঙ্গে রত্নালঙ্কার যত্নে পরে, পেত্নী এক ফন্দী করে,
সুগন্ধি তৈল মাখায়ে চুলে :
যেন সাগর সেঁচে নগর বাঁধতে, নাগরী নাগরদোলায় দোলে। হায়-মরি হায়
রূপার মল পায়ে নাচে, চাঁপাফুল খোঁপায় আছে,
ঠাকুর হরিদাসের গোঁফার কাছে, বসল সে তুলসী গাছের তলে ॥
মিল—শুনে অলঙ্কারের ঝমঝমানি, বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
দুষ্টা রমণীর পানে চায় ; ঠাকুর হরিদাস কয় হায় মরি হায়—
আজ বনে করলে কি বনমালী।
মুখ—কে গো তুই মনের সুখে, বড় ঠেসঠমকে জাঁকজমকে এখানে এলি ॥
ডাইনা—আমার গাছের পাতায় ঝুপড়ী বাঁধা, নামেতে মনপ্রাণ দিয়েছি বাঁধা,
তোর রূপের ধাঁধায় গেলাম পড়ে,—
এমন গরীবের দুয়ারে কেন হাতির পাড়া পড়ে।
খুলে রেখে বক্ষের স্তন, আঁখি ঠারিস কি কারণ,
ওসব ফাৎরা লোকের সাত রাজার ধন, কি জন্য বৈরাগীরে দেখালি।
খাদা—ও তোর ঠোঁটখানা রাঙা যেমন শিঙা বুলবুলি ॥

ফুকার—গুরুর কৃপার পরে বত্রিশ বছর, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর,
এক মনে জপছি দিবারাতি,
আমি মনে মনে চুপে চুপে, হেরি সেই যুগল রূপের জ্যোতি।
যেরূপে মন লেগেছে, সেই রূপে চোখ ভুলেছে।
ও সেই অপরূপের রূপের কাছে, তোর রূপ তো জ্ঞানীর মার্গের বাতি ॥
মিল—পেয়ে মানব দুর্লভ জন্ম, সার করেছি নাম ব্রহ্ম,
এ জন্ম যেতেছে সুখে, ও সেই বৈষ্ণব ধর্মের নির্মল মুখে,
তোর কথায় দিব নাকি চুনকালি ॥
অন্তরা—যৌবন তো কালের ভাইল, আইজ আর কাইল—
কাইল গেলে পরশু দেখবি সরষের ফুল।
ও তোর যৌবন আশে নাগর আসে—
শেষ বয়সে হয়ে বসবি চক্ষের শূল ॥
ও তোর যৌবন গেলে গায়ের জ্বলে মনের আফশোসে
ছিঁড়বি কোল বালিশের খোল। মরি হায় রে—
শেষে পান বেচবি সিগারেট বেচবি—
আর কেবল শোন্ দিয়ে বাছবি পাকা চুল ॥
পরচিতান—ও তোর অঙ্গরাগের ভাবভঙ্গিতে, আর নয়নের ইঙ্গিতে,
আমি সব রঙ্গ বুঝেছি।
পাড়ন—আমি কি করি সরমে, মরি মরমে,
একি রামনামে ভূতের কেচমেচি ॥
ফুকার—যত ফইচ্কা ছোঁড়া কইচকা নাগর, আছে বেলপুকুর নগর,
ডোবে তোর কাম সাগরের জলে ;
আমি নিরাগী বৈরাগী মানুষ, শুঁঠা চাম মোটা মালা গলে। হায়-মরি হায়
কৌপনীতে আঁটা কটি, সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটি,
আমার সাধন ভজন করতে মাটি, তুই বেটি আইলি কোন্ আক্কেলে ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—তখন হরিদাসের কটু ভাষে, বেশ্যা কয় করে দণ্ডবৎ।
পাড়ন—শুনি আত্মবৎ মন্যতে জগৎ সকলে বলে,
নিজে সৎ হলে, জগৎ দেখে সৎ ॥
ফুকার—আমায় জ্ঞানির মার্গের বাতি বলে, আজ আমার মনে দিলে দুখ,
তুমি বিটলে ভদ্রলোক ;
এই নারীর রূপের ঘোরে, জনকের টনক নড়ে,
আবার দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করে, তুমি তো পাতকুয়ার মণ্ডুক ॥

ফুকার—জানি নিরাগী বৈরাগী যারা, করেছে কামকামনা ত্যাগ,
তোমার এত কেন রাগ ;
ডোর কৌপীন অঙ্গে পরা, ভিতরে কলুষ ভরা,
যেমন চরকা পরকা মার্কা মারা, সেজেছ তুলসীবনের বাঘ ॥
মিল—দেহের কাম কামনা ভোগ বাসনা না ঘুচাইয়ে,
শুধু কুনজরে চেয়ে চেয়ে, আজ আমার রূপের ফাঁদে দিলে পাও ।
মুখ—ওহে বৈরাগী ঠাকুর, আগে ভোগবাসনা না করে দূর, সাধু হতে চাও ॥
ডাইনা—বললে, গাছের পাতায় ঝুপড়ি বান্ধা, নামেতে মনপ্রাণ দিয়েছ বাঁধা,
মোর রূপের ধাঁধায় গেলে ভুলে,
তোমার অন্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে ।
তোমার চুল দাড়ি আর পরচুলা, দূরে করে দাও ওগুলা,
ওসব আচলা ঝোলা, নামের মালা
আমার এই কামের চুলায় পোড়া দাও ।
খাদ—নামের পাগল হলে কেন আবোল তাবোল কও ॥
ফুকার—আমার মুখের দিকে না তাকায়ে, কেন মোর বুকে দৃষ্টি যায়,
হেসে বাঁচি না লজ্জায় ;
সাধুর মন রয় যুগলে, খলে চায় তলে তলে,
যেমন সপ্ত স্বর্গের ঊর্ধ্বে গেলে, শকুনে গোভাগাড়ে চায় ॥
ফুকার—নারীর বুকের কাপড় রাখলে খুলে, চেনা যায় সাধু না লম্পট,
দেখে স্তনের চিত্রপট ;
বালক চায় দুগ্ধ খা'বে, সাধু কয় সুধা পাবে,
আবার কামুক লোকে দেখে ভাবে, ওটা তার বাপের চিতার মঠ ॥
ফুকার—না কি শোন দিয়ে বাছবো পাকা চুল; তা'বলে আমি কি ডরাই,
ঠাকুর করো না বড়াই ;
দেখ না আয় না ধরি, চুলদাড়ি শোনের নুড়ি,
তুমি সাধু বলে খাতির করি, তোমায়ও জড়ায় ছাড়ে নাই ॥
ফুকার—তোমার সাধন ভজন করতে মাটি, আসি নাই আজ তোমার কাছে,
আমার বাসনা আছে ;
তোমারই শিষ্যা হব, তোমারই কাছে রব,
আমার এই দেহ গড়ায়ে লব, নিষ্কামী বৈষ্ণবীর ছাঁচে ॥

**বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির কবি** **হরিচরণ আচার্য**

চিতান—করে চিন্তামণি বেশ্যাবৃত্তি, বিল্বমঙ্গল চক্রবর্তী,
তার প্রেমে মুগ্ধ অতিশয় ।

পাড়ন—ও তার পিতৃ শ্রাদ্ধের রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারে—
চিন্তার জন্য তার চিন্তা অতিশয় ॥

ফুকার—একটা মরা মানুষ চেপে ধরে, কলাগাছ মনে করে,
সাঁতরায়ে নদী দিল পাড়ি,
চিন্তার হাউলীর উপর সর্প ছিল, ঠাকুর তাই মনে করল দড়ি ।
অজগর সর্প ধরে, ছাদের উপরে পড়ে,
চিন্তা এই সমস্ত জানতে পেরে, কপালে মারল ঝাঁটার বাড়ি ॥

মিল—খেয়ে ঝাঁটার বাড়ি বিল্বমঙ্গল, ছেড়ে দুই নয়নের জল,
কাতরে চিন্তার প্রতি কয়, হায় হায়, জলের রেখা খলের প্রণয়,
শুনেছি সাধু শাস্ত্রেতে বলে ।

মুখ—হে দে গো চিন্তামণি, তোরা বেশ্যা জাতি কালসাপিনী, জানে সকলে ॥

ডাইনা—আমি মুগ্ধ হয়ে তোর পিরীতে, পারি না লোক সমাজে মুখ দেখাতে,
আজ আমার বাবার শ্রাদ্ধ করে,
চিন্তা তোর জন্যেতে চিন্তা হল, দুপুর রাতের পরে ;
অসাধ্য সাধন করি, আমি এলেম তোর বাড়ি,
ও তুই মিছামিছি পিছার বাড়ি, কি জন্য মারলি আমার কপালে ।

খাদ—লোকের যেমনি কর্ম তেমনি ফল সময়ে ফলে ॥

ফুকার—আমি ব্রহ্মকুলে জন্ম নিলেম, কুকর্মে কাল কাটালেম,
স্বধর্ম বিসর্জিলেম জলে ;
কেহ সোনার খাঁচায় কাক পুষিলে, সেই কাকে জাত বুলি কি ভোলে ।
চোর গেলে সাধুর কাছে, স্বভাব যায় পাছে পাছে, হায় হায়—
কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শত বার দুগ্ধ দিয়ে ধুলে ॥

মিল—যে জন অসৎ সঙ্গে থাকে সদা, বিষ কি আর হয় গো সুধা,
সর্বদা মনে রয় কষ্ট, করল হাজার টাকার বাগান নষ্ট,
ঠিক যেমন পাঁচ সিকার এক ছাগলে ॥

অন্তরা—সর্বদা হা হুতাশ বার মাস, বেশ্যাদের পালের বাতাস লাগলে গায় ।
সে তো মানুষ নয় মাইলানীর মেড়া,—
কেবল আসতে যেতে লাথি খায় ॥
তারা সোনা নিয়ে পিতল দিয়ে, শীতল হাত বুলায়,
কথায় প্রাণ ফাড়িয়া লয়, মরি হায়রে—
শেষে রক্ত মাংস চর্ম খেয়ে, তার পোঙ্গার হাড় দিয়ে শিঙা বাজায় ॥

পরচিতান—যে জন পতিব্রতা সতী ত্যজে, বেশ্যাদের প্রেমে মজে,
ভবে তার মতি অতি ভ্রম।
পাড়ন—ও সে দুষ্টা নারী যারে ধরে সংসারে,—
ঠিক যেমন পাপী ধরে যম ॥
ফুকার—যত বেশ্যাদের নাম চিন্তামণি, রাসমণি পরশমণি,
পাপ অঙ্গে মণিমুক্তা খচিত,
আর নিস্তারিণী দীনতারিণী, এসব নাম পেতেছে অযাচিত।
হায় হায় মরি হায়—
সংসারের কেমন রুচি, অশুচির নামটি শুচি,
তাদের রাক্ষসী, পিশাচী বুঁচি, এসব নাম থানায় লেখা উচিত ॥

ঐ—জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার

চিতান—বিল্ব ঠাকুরের রহস্যে রাগী, এই চিন্তায় বেশ্যা মাগী কয়।
পাড়ন—আমার ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে রে পাজী, ও তোর বুঝি দিব্য জ্ঞান উদয় ॥
ফুকার—ও তুই ব্রহ্মকুলে জন্ম নিয়ে কাজ করলি অতি জঘন্য,
তাইতে হলি নগণ্য ;
ত্যজে ব্রাহ্মণের প্রথা, বেশ্যার পায় বেচলি মাথা,
এদের লাথি গুতা ঝাঁটা জুতা, তোর কাছে গরম মিষ্টান্ন ॥
মিল—এখন বেশ্যা বলে নিন্দা করিস রঙ্গে ভঙ্গে,—
আগে পিরীত করতে বেশ্যার সঙ্গে, কার ব্যাঙ্গে বলেছিল কোন কালে।
মুখ—হেদে রে বিল্বমঙ্গল, ছেড়ে বেশ্যাবাড়ির এই অমঙ্গল, থাক গে জঙ্গলে ॥
ডাইনা—ও তুই দিনে করলি পিতৃশ্রাদ্ধ, এই রাত্রে নদী পার শাস্ত্রবিরুদ্ধ,
তাতে যে হয়েছে তোর পাপ ;
আবার মরাকে কলাগাছ ভাবলি, দড়ি ভাবলি সাপ।
আর যে অনুরাগ দিলে পর, জীবে পায় সে পরাৎপর,
দিলি সে অনুরাগ বেশ্যার উপর, এই পাপে পিছা মারলেম কপালে।
খাদ—তুই বেধেছিস মীনের মতো, এ জঞ্জাল জালে ॥
ফুকার—বললি, কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শতবার দুধ দিয়া ধুলে,
তুই তো ভুল করলি মূলে ;
আমার এই ঘরের পাছে, কামারের দোকান আছে,
দেখি সকল কয়লার ময়লা ঘোচে, জ্বলন্ত আগুনে দিলে ॥
ফুকার—বললি, বেশ্যাদের নাম চিন্তামণি, রাসমণি গঙ্গা যমুনা,
দিলি নামের নমুনা ;
স্বর্গের সব সুরবালা, বাজারের চারুবালা,
যেমন চিক চৌদান অনন্ত বালা, গালালে সবই এক সোনা ॥

## গাড়ির কবি—১ অম্বিকা পাটনী

চিতান—করতে কাব্যরসের নব্য কবি, ভাবে এক নব্য কবি,
নব্য ভাব নাই মনের মতন।
পাড়ন—অমনি ভাবতে ভাবতে ঝাঁপ দিয়ে ভাব সাগরে,
কবি লাভ করে, কবিত্ব রতন ॥
ফুকার—অমনি ভাবের চক্ষে নেহার করে, দেখতে পায় ভাব সাগরে,
চলছে ভাবের তরী,
বহে ভাবের স্রোত অবিরত, ভাবের বলিহারি। হায় হায় মরি হায়—
দৃষ্টি করে পুনর্বার, দেখে ভাবের ইষ্টিমার,
আবার কাঁপায়ে সাগরের পাড়, চলছে রেলের গাড়ি ॥
মিল—মনের কল্পনাতে কবিবরে, গিয়ে সে মধুপুরে,
অতিশয় মনের আনন্দে, কবি নিজে সেজে দূতী বৃন্দে,
গোবিন্দে জানতে শুধায় সমাচার।
মুখ—ব্রজধাম পরিহরি, এসে মথুরায় হয়েছ হরি, নূতন অফিসার ॥
ডাইনা—ছিল প্রেম সাগরে রাধা তরী, ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি,
চন্দ্রা ত ছিল ইষ্টিমার,
যা রে কামনদীতে চালাইতে, সারেং হয়ে তার।
হেথায় শিখে ড্রাইভারী, চালাও কুব্জা রেলগাড়ি,
বল জলপথে স্থলপথে হরি, এই তিনটার কোনটায় বেশী সুখ তোমার।
খাদ—মনে কি আছে হরি তরী ইষ্টিমার ॥
ফুকার—একে নূতন লাইনে নূতন গাড়ী, শিখে নূতন ড্রাইভারী,
যখন চালাও চোটে;
ওটার ফচফচানি শব্দ শুনি, ঘুমের মানুষ ওঠে। হায় হায় মরি হায়—
জোরে ইঞ্জিন চাপিলে, এক দমে কেমন চলে,
তলের বয়লারে কয়লা দিলে, ময়লা কেমন ছোটে ॥
মিল—যখন ঢিমেতালে চলে লাইনে, তৈল দিলে অয়েলম্যানে,
শ্যাম তোমার কল কেমন চলে,
একটু কোমরগঞ্জে বিশ্রাম দিলে, এক দমে করতে পার ক'মাইল পার ॥
অন্তরা—কও কও, কও কও, রসের নূতন ডাইভার।
এইটা কোন্ কোম্পানী বল শুনি,
ইস্টার্ন বেঙ্গল নাকি এ বি. আর ॥
সদরগঞ্জ হতে ঢাকা যেতে, থাকলে প্যাসেঞ্জার—
কত মাশুল লাগে তার। মরি হায় রে—

ওটার টিপনি কলে চিপনি দিয়ে—
কও শুনি রাত্রে চালাও কতবার ॥
পরচিতান—এইটা যখন ছিল কংসের বাড়ি, খাস্তামাল বস্তা ভরি,
চালাইত ঠেলাগাড়ির প্রায় ।
পাড়ন—তাইতে লোকে বলত কংস রাজার মালগাড়ি,
হল মেইল গাড়ি, শ্যাম তোমার কৃপায় ।।
ফুকার—একে গাড়ি চালাও নূতন লাইনে, অতিশয় সাবধানে, কল চালাইও কলে ;
দেইখ গরম জল ফস্‌কে গিয়ে, ফোস্কা পড়বে গালে। হায় হায় মরি হায়—
ঠিক থেক কামনদীতে, ত্রিবেণীর পোল পার হতে,
যদি পোল ভেঙ্গে পড় তাতে, ডুববে লোনা জলে ॥

ঐ—জবাব হরিচরণ আচার্য

ফুকার—তুমি নৌকা স্টীমার রেলের গাড়ি, কল্পনায় সাজালে এবার,
ধন্য কবিত্ব তোমার ।
শুনতে হয়েছ রেডি, শোন গোয়ালার লেডি,
পড়ে কোন ইস্কুলে এ· বি· সি· ডি, ইংলিশে এত অধিকার ॥
ফুকার—ছিল বৃন্দাবনে রাধাতরী, সে তরী হয়েছে অচল, এসব আমার কর্মফল ।
পাতাম লোহার বান ছুটে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে,
তরী পড়ে আছে অচল ঘাটে, দিন রেতে উঠে বিচ্ছেদ জল ॥
মিল—এলেম যে দিন হতে তরী ছাড়ি মধুপুরী,
পেয়ে কংস রাজার মালের গাড়ি, মেল গাড়ি তারে করেছি কানাই ।
মুখ—শুন গো বৃন্দে নারী, এখন ছাটনী ভাঙ্গা পাটনীগিরি, তরী যাওয়া নাই ॥
ডাইনা—ছিল বৃন্দাবনে রাধা তরী, এখানে কুব্জা আমার মালের গাড়ি,
চন্দ্রা ত ছিল ইস্টিমার ,
দূতী সবার চেয়ে ভাল ছিল, রাই তরী আমার ।
কাম-কোম্পানীর গাড়িখান, পাছার চেয়ে মাজা টান,
ওরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাগে চালান, রাই-তরীর মতন আমার বিশ্রাম নাই ।
ফুকার—বললে, বয়লারেতে কয়লা দিলে, ময়লা তার ছোটে হে কেমন,
আমি করি নাই ওজন ।
কাম আগুন সদা জ্বলে, গাড়ি চালাবার কালে,
ওটার টিপনী কলে চিপনী দিলে, বোধ করি ছোটে দুই চার মণ ॥
ফুকার—বললে, সদরগঞ্জ যেতে হলে কত বা মাশুল লাগে তার,
বৃন্দে জানা নাই তোমার ।
গেলে রাইগঞ্জের ঘাটে, ভাড়া লাগে না মোটে,
তারা বিনা পয়সায় টিকেট কাটে, যদি হয় রসিক প্যাসেঞ্জার ॥

ফুকার—বললে, টিপনী কলে চিপনী দিয়ে, রাত্রিতে চালাও কতবার,
বাঁধা নিয়ম নাই তাহার।
সকলের আছে জ্ঞাত, গাড়ি মোর অনুগত,
চালাই বাধ্য হয়ে সাধ্য মত; যে কয়বার ইচ্ছা হয় আমার ॥
ফুকার—বললে, গরম জলে ফোস্কা পড়বে, সাবধানে থেক হে কানাই,
বুন্দে সে ভয় আমার নাই।
রিফাইনের নল খসায়ে, ফিল্টারের মুখ ফসায়ে,
উহার স্টাইপের মুখে পাইপ বসায়ে, গরম জল তল দিয়ে সরাই ॥

## দোলযাত্রার কবি — হরিবর সরকার

চিতান—পেয়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, ব্রজের সব কুলবতী,
শ্রীপতির সঙ্গে সম্মিলন।
পাড়ন—সেজে ফুলের দোলা রসের খেলা, খেলে সখীগণ,
পরিহরি স্বামী পরিজন ॥
ফুকার—তখন হাত ধরাধরি করি সকল দাঁড়ায়ে দ্বিদলে,
রসে দোল দোল দোল বলে,
সুখে কিশোর কিশোরী, মিলন সর্বশর্বরী,
আহা শ্যাম নাগর আর রাই নাগরী, নাগর দোলায় দোলে ॥
মিল—গত যামিনী কামিনী যাচ্ছে স্বামী নিবাসে,
পথে কুটিলা তাই দেখতে পেয়ে,
বড়াইকে মন্দ কয় দ্বন্দ্ব করি।
মুখ—শ্যাম দিব্য লাগে লো বুড়ী, সত্য বল করিসনে গোপন চুরি ॥
ডাইনা—কেন সকল রাঁড়ের ধোপ কাপড়ের পাছার উপর দাগ,
কার গোল বাহারে বাহার মেরে ছাপ্পা দে দিছে ফাগ।
তোগো কোন নাগরে পাই ছিল লাগ,—
কে মেরেছে পাছা তাকিয়া পিচকারী।
খাদ—যত এক যোগালে গোয়ালিনী, তারাই সবে জানি তোর আজ্ঞাকারী ॥
ফুকার—শুনলেম কালকে রেতে, জঙ্গলেতে জয় জোকারের ধ্বনি,
আমি ভাবলেম মনে যাব বনে, এই সকল আমদানী।
কতবার রুখে রুখে, দাদাকে বললেম ডেকে,
কাল নিদ্রাগত মরার মত ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি ॥
মিল—এখন কালগুণে ফাল্গুনে হল বসন্ত প্রকাশ,—
জানি ভ্রমর করে ফুলের তালাস, ফুল কভু খোঁজে না ভ্রমর ভ্রমরী ॥
( খণ্ডিত )

**হরিদাসের কবি** **রজনী সরকার ( ছোট )**

চিতান—এবার কলির জীব করিতে তারণ, ব্রজের ধন গৌর অবতার।
পাড়ন—জীবের চিত্ত অন্ধকার বিনাশিতে, নদীয়ায় পূর্ণ শশধর ॥
ফুকার—এবার জীবের জন্য শ্রীচৈতন্য, এনেছে প্রেম সুধা রতন,
করে সবারে যতন। হায়—
দেখিলে আচণ্ডালে, সাদরে করে কোলে,
এবার হিন্দু যবন ব্রাহ্মণ মিলে, এক দলে করে সংকীর্তন ॥
মিল—ও সেই কীর্তন শুনে মোমিনগণে, মনে পায় দুঃখ,
বলে হরিদাসকে করে লক্ষ্য,—দেখিলাম ইসলাম ধর্মের অনাদর।
মুখ—হরিদাস বল দেখি রে, মিলে নিমে নিতে আদ ছিরে, কিসের করিস শোর ॥
ডাইনা—শুনেছি হিন্দুশাস্ত্রমতে, কোন বিধি নাই ধর্ম ছাড়িতে, কেতাবেও বলে—
ও তুই কার মতে মিশায়ে নিলি, দুধ মাছে অম্বলে।
হিন্দু যবন এক দলে, নাচতেছিস হরি বলে,
তোরা এ অবস্থায় প্রাণে মলে, তোগো কি পোড়াবে, না দিবে গোর।
খাদ—স্বধর্ম ত্যজে কেন বিধর্মের আদর ॥
ফুকার—জন্মে কাজীর ঘরে, কাজের কাজ না করে, সাজ ধরে বলছিস হরি বল ;
লয়ে মৃদঙ্গ মাদল। হায়—
যাবি না দরগাখোলা, হয়েছিস্ হরিবোলা,
লয়ে নামাবলী তিলকমালা, তিন বেলা করিস গণ্ডগোল ॥
মিল—যেমন দামোদর ঘোষ'সের বেটা পঞ্চানন্দ দাস,
করে গাধা ঘোড়ায় রতি বিলাস, শেষে তার বাচ্চারে বলে খচ্চর ॥
অন্তরা—তোদের এই অকাজে সমাজে দিয়েছে নিমার পিতার হুঁকা বাদ।
শুনি ঘরে পরে ন'দেপুরে, করে এই পরিবারের পরিবাদ ॥
আর হিন্দুর সাথে প্রেমে মেতে ত্যজেছিস নামাজ,
তোর জন্য হয় জগা ঠাকুর জল অচল সমাজ, হল দুদিগ অপরাধ।
নাই আর এদের জায়গা গয়াধামে, তোরে রাখবেনা মক্কায় মহম্মদ ॥
পরচিতান—তোরা স্ত্রী পুরুষে একত্তরে সুর ধরে, এক সঙ্গে নাচিস্।
পাড়ন—রেখে ঝুঁটি শিরে, গোঁফে গিরে, তালকানা,
আমরা ঠিক পাই না, মরছিস্ না আছিস ॥
ফুকার—ত্যজে নিজ উপাধি হলি ব্রহ্মধি, দিয়েছিস পর ধর্মে যোগ,
করে স্বধর্ম বিয়োগ। হায়—
দোদিল বান্দা কল্মা চোর, না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর,
থেকে স্বামীর ঘরে নন্দাইর আদর—পাবি কি স্বর্গ না দোজোখ ॥

## জটিলার জ্বরের কবি — অক্ষয় আচার্য

চিতান—রাইকে কষ্ট দিতে দুষ্ট ভেবে চিতে, গোকুলের বুড়ী জটিলায়।
পাড়ন—হঠাৎ মাথা বেঁধে কেঁদে কেঁদে নানা ছন্দে—
রোগের ভাব জানায়।
ফুকার—ঘরে নাই সে আয়ান, ব্যারামের ভান, করে জটিলায়;
কপট কাতরে উদ্দেশে ডেকে শুধায়।
বলে কি জ্বর কেমন প্রতাপ, অন্তর্দাহ দেহে নাই তাপ,
তরুণ জ্বরে করুণ প্রলাপ, শীতের কি তাপ, বস্ত্র সয় না গায়॥
মিল—উঠে পড়ে ধায় পাকায় নেত্র, যেমন বিষমক্ষেত্র,
ডেকে আয়ানকে বৌর চরিত্র, বলে মনের খেদে।
মুখ—আমার শেষকালে বেশ ছিল এ-কপালের জোর,
আয়ান রে তোর, বৌর প্রসাদে॥
ডাইনা—তুই তো বাথানে গেলি সেই দিন বাড়ি হইতে;
হঠাৎ ধরে কি বিষম জ্বরে, এসে আচম্বিতে।
ছটফট করতেছি ঘরে, কার তালাস কেবা করে,
বৌ ত এক দণ্ড রয় না ঘরে, আছে তার আমোদে।
খাদ—এখন মইলে বাঁচি, কাজ কি বৃথা বিসম্বাদে॥
ফুকার—আয়ান বলবো কি রে মাথার কিরে, আমার কথা রাখ;
আমায় বিদায় দিয়ে, বৌ নিয়ে তুই সুখে থাক।
ঘরের শত্রু আমরা দু'জন, হয়েছি বৌর হিংসার ভাজন,
কেউ জানে না বধূর ওজন, দেশ জুড়ে ত আমাদের নামডাক॥
মিল—বধূ না জানে এমন বিদ্যা নাই জগতে—
পারে ইসারায় লোক ভুলাতে, দেখা শুনা বাদে॥
অন্তরা—বৌ ত তোর রাজার মেয়ে, কম কি সে রানীর চেয়ে,
আমার কাজ করলে কি তার মান থাকে।
এই আমার অদৃষ্টের ফল, দেয় না বৌ এক ফোঁটা জল,
বল কেন বৌ ঘরে আনে লোকে॥
সাবান তৈল চিরুনী আয়না, কিনে এনে দিলি তুই,
সারা দিন বৌ নটী সাজে, আমরা কি তার সেই সব ছুঁই।
দুই একটু বললে পরে, চোখা নাক বাঁকা করে,
বলে ভূতে পেল নাকি বুড়ীকে॥
পরচিতান—গেলি রে কুষ্মাণ্ড, নাই তোর কাণ্ডাকাণ্ড, বৌর কাণ্ড হয় যত ইতি।
পাড়ন—হল রাগের বৃদ্ধি নাই তোর বুদ্ধি,
তুই বলিস তোর বৌ সাধ্বীসতী॥

ফুক্যর—আমার দাঁত পড়েছে চুল পেকেছে, এমন দেখি নাই ;
আমার পোড়া মুখ, তোর কাছে কি বলব ছাই।
বলব কি রে সে প্রসঙ্গ, ও পাড়ার ছুঁড়িদের সঙ্গ,
কাকের ডাকে কাঁপে অঙ্গ, কালভুজঙ্গ ধরতে পারে রাই ॥

**মোহিনী কবি** **চন্দ্রকান্ত আচার্য**

চিতান—ভাগের বণ্টন সুধা বণ্টন, করতেছেন চক্রী চক্রধর।
পাড়ন—তিনি মায়া করে সিন্ধুতীরে সাজিলেন মোহিনী,
ভোলায় কয় ধরিয়ে যুগল কর ॥
ফুকার—আমায় বুড়া বলে বসতে বিয়ে, সন্দেহ করিস না লো বিনোদিনী,
ও তুই বিধবা হবি না। হায় হায় গো—
প্রলয় জলধিতলে, ব্রহ্মাণ্ড ডুবে গেলে,
তবু সিন্দুর থাকবে তোর কপালে, আমার তো মরণ হবে না ॥
মিল—আমি প্রেম কাঙালী, জ্বালায় জ্বলি দারিদ্রানলে,
এক দিন গরল খেলেম মরব বলে. পোড়া যম আমারে তো ছুঁল না।
মুখ—কথা কও ফিরে চাও প্রাণ, ডাকি কাতরে—
আমারে বঞ্চিত কইর না।
অন্তরা—কোলে আয় লো প্রাণ কপাট খুলে রাখি বক্ষোপরে।
তোরে চকচৈক্যা চিক গড়াইয়া দিব, পরবি বক্ষ জুড়ে ॥
নগদ লওনা যত যোত্র, সকল করে একত্র, দানপত্র তোমার বরাবরে।
আমি দাস হয়ে বাস করব তোমার, চরণ সেবা করে ॥
পরচিতান—যদি আমায় দেখে না হও রাজী, একান্ত সতীনের ডরে।
পাড়ন—আমি এক মাগীরে মাথায় করে ব্রহ্মাণ্ডে বেড়াই—
সুখ ত নাই, দিই বল ছেড়ে ॥
ফুকার—আমার আরেক ভার্যা দেখতে কালী, ঘুটঘুটে আঁধারের তুলনা,
ছুঁড়ির স্বভাবটা ভাল না। হায় হায় গো—
পাগলা বাই মাথায় ঢুকে, যথা যাই তথা ডাকে,
তারে ডাক দিলে পর চড়ে বুকে, পরনে কাপড় থাকে না ॥ (খণ্ডিত)

**সুখ-দুঃখের কবি** **রাজেন্দ্রনাথ সরকার**

চিতান—এক জন চিন্তাশীলের হৃদয় মধ্যে, লেগে গেল তর্কযুদ্ধে,
অনৈক্য সুখ দুঃখ দুই ভাই।
পাড়ন—আগে সুখ বলে ভাই দুঃখ রে তুই বড়ই নিকৃষ্ট, অতি পাপিষ্ঠ দুষ্ট,
আর আমি মিষ্ট সবার ঠাঁই ॥

ফুকার—দুঃখ কেউ তো ভালবাসে না রে, তবু তুই সবার ঘরে,
জোর করে ঢুকিস ;
এত অনাদরে, কিসের তরে, সংসারে থাকিস। হায়—
সুখেরে সবাই সেবে, তবুও পায় না জীবে,
যদি তোর মত আমারে ভাবে, মরিতে সেই দিন খাব বিষ ॥
মিল—তখন দুঃখ হয়ে মূর্তিমন্ত, হনুমন্তের প্রায়,
কত তত্ত্বপূর্ণ সত্য জানায়, ভাবিয়া দেখলে পরে দুঃখের জয়।
মুখ—আমি কি সূক্ষ্ম দুঃখ, ও সুখ তুমি গৌণ আমি মুখ্য,
মুমুক্ষু চক্ষুষ্মানে কয় ॥
ডাইনা—দেখ দুঃখে না পড়িলে পরে, কে কবে লাভ করেছে পরাৎপরে.
আমি হই ধ্রুব মোক্ষদাতা ;
একটু স্মরণ কর ধ্রুব প্রহ্লাদ, ভক্তবৃন্দের কথা।
আর সুখের মুখে দিয়ে ছাই, ভক্তেরা কয় দুঃখ চাই,
আমি সুখী মারি দুঃখী বাঁচাই, চরমে পরমেতে করাই লয়।
খাদ— দুঃখী ভিন্ন সুখী কেউ প্রেমিক ভক্ত নয় ॥
ফুকার—নিজে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, করেছিল আমার সঙ্গ, বলে জয় রাধে ;
ছেড়ে সুখের হাসি দিবানিশি, দুঃখেতে কাঁদে। হায়—
তুলসী দাস ব্যাস বশিষ্ট, আমাকে কয় বিশিষ্ট,
এই যে যিশুখ্রীষ্ট এত মিষ্ট, সে কেবল আমার প্রসাদে ॥
মিল—আমি তোমারই আশ্রিত হলে, বিশ্রী হয়ে যাই,
ও যার সখা হয়ে একা দাঁড়াই, সে জীবে ত্যজিবে অনিত্যালয় ॥
অন্তরা—দেখ না বর্তমান, তার প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী ছিল আমার দাস।
যদি সুখী হইত, গৃহে রইত গো, করত না সারাজীবন কারাবাস ॥
গান্ধীর দুঃখময় জীবন কি মিঠে, সুখময় হলে, তারে কে করত তালাস।
গান্ধীর জীবনীতে ভবিষ্যতে সুমধুর করবে দেশের ইতিহাস ॥
কেবল আমার উপর স্বার্থপর সব, লম্পটে চটে, তাদের ঘটে আত্মনাশ।
দেখ আমার কৃপায় রূপ সনাতন গো, শেষ কালে বৃন্দাবনে করে বাস ॥
পরচিতান—ঠাকুর বিল্বমঙ্গল আমার জন্য, প্রাপ্ত হয়ে বৃন্দারণ্য,
শেষ জীবন ধন্য হয়ে যায়।
পাড়ন—আমি পাপীর ঘাড়ে চাপি যখন, তখন হয় সাধু,
পায় সে নাম প্রেমের মধু, সুখেতে শুধু, পরমধন হারায় ॥
ফুকার—আমি দুঃখ হয়ে নির্মলি বীজ, জ্ঞানজলে ষড় সরসিজ, বিকশিত করাই ;
এরূপ স-মল স্রোতস্বিনীর জলে আর কেউ পারে নাই।

সীতা যে পুণ্যশ্লোকা, আমি তার বুকের খোকা,
হল শ্রীকৃষ্ণে লয় শ্রীরাধিকা, এই দুঃখ বক্ষে দিয়ে ঠাঁই ॥
মিল—রাজা যুধিষ্ঠির আর শ্রীরাম আমার করেছে যতন—
তোমার ভক্ত রাবণ দুর্যোধন, শেষকালে আমার কোলে আশ্রয় লয় ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—সভার সভ্য লোকে নব্যভাবে শুনিলেন দুঃখের পাঁচালী।
পাড়ন—নাকি দুখের চেয়ে সুখ হয় তুচ্ছ, উচ্চে রও দুখ,
ফুলিয়ে বুক, পুচ্ছ নাচালি ॥
ফুকার—বললি, সুখের চেয়ে দুঃখ শ্রেষ্ঠ, একথা করি না বিশ্বাস,
দুখে ঘটায় সর্বনাশ।
পড়ে দুঃখের কবলে, কেউ প্রাণ দেয় অনলে,
আবার কেহ ডুবে গঙ্গাজলে, কেউ মরে গলে দিয়ে ফাঁস ॥
মিল—যত যোগী ঋষি ব্রহ্মচারী দুঃখের পরে,
থাকে কাম্য সুখের আশা করে; অন্তিমে লভিতে সুখের সোপান।
মিল—শোন দুখ বলি তোরে, ও তোর মুখের মতো তর্ক হেরে, হলেম ম্রিয়মান ॥
ফুকার—বললি, ব্যাস বশিষ্ট যিশুখৃষ্ট, দুঃখ তোর যশোগীতি গায়,
সে ও সুখের প্রত্যাশায়;
কাম্য সুখের অভাবে, অনিচ্ছায় দুঃখ সেবে,
ভাই রে তোর আদর করে সবে, দায় ঠেকে ঔষধ খাওয়ার প্রায় ॥
ফুকার—বললে, সুখ ভুলে মহাত্মা গান্ধী, ভোগ করে কারাবাসে দুখ;
সে চায় দেখতে সুখের মুখ।
ভারতের দুঃখরাশি, ঘুচাতে গান্ধী আসি,
হয়ে দেশের দুঃখে কারাবাসী, লাভ করেন স্বাধীন স্বর্গসুখ ॥
ফুকার—বললে, বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণ পেল, হয়ে এই দুঃখের পক্ষপাত;
তাতে সুখের যায় নি জাত।
অনিত্য সুখের আশে, বিল্ব যায় ব্রজবাসে,
যখন নিত্য প্রেমে চিত্ত পশে, দুঃখেরে করে পদাঘাত ॥
ফুবকার—বললি সীতা ছিল পুণ্যশ্লোকা, তুই ছিলি তার বুকের খোকা,
পড়ে তুই কুপুত্রের কবলে, জনম দুখিনী সীতার সুখ নাই কপালে।
অন্তঃসত্ত্বা ছিল সীতা, বিনা দোষে নির্বাসিতা,
আবার বনবাসে অপহৃতা, শেষে প্রবেশ ঘটল পাতালে ॥
ফুকার—করে দুঃখের সঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ, একথা শুনেছিস কোথায়;
তারে প্রেম সুখে মাতায়।

ঠেকে রাই প্রেম ফাঁদে, দুঃখে নয় সুখে কাঁদে,
নিয়ে সেই আদর্শ গৌরচাঁদে, প্রেম সুখে জগতকে কাঁদায় ॥

**বাল্য বিধবার কবি রাজেন্দ্রনাথ সরকার**

চিতান—গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে, বাল্যকালে দিল বিয়ে, পৌগণ্ডে হল বিধবা।
পাড়ন—নিয়ে যতি ধর্ম মাছ মাংসাদি করে না আহার,
মনের ব্যথা তার বুঝিবে কেবা ॥
ফুকার—পোড়া কালে ত আর চিনে না রে সধবা বিধবা নারী,
এল সেই দেহে যৌবনের জোয়ার, সাজিল কিশোরী।
অদম্য কামোৎসাহে, প্রকৃতি পুরুষ চাহে,
তা তো প্রকাশ্যে আর হবে না হে, সমাজ যে ঘোর অত্যাচারী ॥
মিল—ও তার মনাগুনে চিতের মাঝে জ্বলিছে চিতা,
তখন সেই তাপে হয়ে তাপিতা, পিতাকে বলে সেই পোড়ারমুখী।
মুখ—আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্যবিধবা, আমি এই নরকে থাকি ॥
ডাইনা—আমায় লোকে কেন বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খশাড়ী,
কেন নাই সিঁথির সিন্দুর টুক ;
আমি এ জন্মে পাব না কেন সংসারের সার সুখ।
কও দেখি কি যাতনায়, বক্ষ ফেটে যেতে চায়,
এত নরকাগ্নি পবিত্রতায়, এই বিধান ঈশ্বরের সৃষ্টি নাকি।
খাদ—আর এই নরকের ভোগ আমার কতকাল বাকী ॥
ফুকার—বাবা যখন আমার বিয়ে দিলে, বুঝি না বিয়ের কি দরকার ;
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলংকার।
এই যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশিতে,
হল যে বিবাহ তোমার মতে, সেই বিয়ে তোমার না আমার ॥
মিল—আমি এখন বিয়ের মর্ম বুঝি, কর্মে ঠেকিয়ে,
যদি এখন আমায় না দাও বিয়ে, তবে তো আগের বিয়ে চালাকি ॥
অন্তরা—শুনি রামমোহন রায় এ ধরায় নিবারণ করেছে সতীদাহ।
করলে তারই মতের অনুসরণ গো, কি কারণ দেও না পুনর্বিবাহ ॥
আমার মন যে সদায় সঙ্গোপনে পুরুষের সহ, করে নিত্য উৎসাহ ॥
বাবা জ্ঞানে কি জানিতে পাও না গো, যৌবনের যাতনা কি দুঃসহ ॥
পরচিতান—হল তোমার মতে আমার বিয়ে, আমাকে আগুনে দিয়ে,
কোন জ্ঞানে তুমি কর সুখ।
পাড়ন—তুমি বাপ হয়ে প্রেমভঙ্গ পাপে, আমায় দিলে তাপ ;
করি অভিশাপ, আমার মা মরুক ॥

ফুকার—হল কাম কি প্রেমে আমার জন্ম, বাবা গো স্মরণ করা চাই,
তুমি বীজে জন্মালে কালে বিকাশ হল তাই।
অকৈতব কৈতব বিন্দু, হল গরলের সিন্ধু,
তা ও দেখে না রে অন্ধ হিন্দু, স্ত্রীলোকের বন্ধু কেহ নাই॥
মিল— যদি বিধবা বিবাহ দিতে না পার কেহ,
তবে দিও না বাল্যবিবাহ, সবাবে যতনে বলে রাখি॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—শুনে বিধবা দুহিতার কথা দুঃখে তার বৃদ্ধ পিতা কয়।
পাড়ন—আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, সমাজ বন্ধনে,
পাপের ক্রন্দনে আমার লাগে ভয়॥
ফুকার—জানি অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী, নববর্ষা চ রোহিণী,
বৈদিক ঋষিদের বাণী;
বয়স হলে দশের উর্ধ্ব, কন্যাদান হয় না শুদ্ধ,
আমি সেই নিয়মে হয়ে বাধ্য, তোমাকে বিয়ে দেই মণি॥
ফুকার—বাছা জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, এ সকল বিধাতার কৌশল,
মানুষ নিমিত্ত কেবল;
বৈধব্য যার কপালে, খণ্ডে না কোন কালে,
আবার মালা দিয়ে মড়ার গলে, সাবিত্রীর সিন্দুর হয় উজ্জ্বল॥
মিল—আছি সমাজের শৃঙ্খলে আঁটা হিন্দুগণ সবাই,
যদি ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব চালাই, তা হলে সমাজ বন্ধন থাকে না।
মুখ—সমাজের চক্ষু অন্ধ, ভবে বিধবার যে কপাল মন্দ, তা তো দেখে না॥
ডাইনা—তুমি হয়েছ বাল্য বিধবা, তাই নাকি দোষী হল তোমার বাবা,
এ কথা বলা কি খাটে · জানি অদৃষ্টে লিখনং যস্ত অবশ্য ঘটে।
আর যৌবনে বিয়েব পতি, নেয় যদি মৃত্যুপতি,
তবে কে পুরায় সে পতির ক্ষতি, যুবতী মন বেঁধে কি থাকে না।
খাদ—আরো একটি কথা শুনে মনে ভাবনা॥
ফুকার—বললি, এই বিয়ে তোমার না আমার, কি কথা বললি তুই খুকী,
কর্তা হতে চাও নাকি;
পিতৃ বীজ মাতৃ রজে, জন্ম পাও মহীমাঝে,
আমার বস্তুর কর্তা আমি নিজে, দেহে তোর স্বত্ব আছে কি॥
ফুকার—আবার রাগ করে অভিশাপ দিলি, আজ নাকি মরিতে তোর মায়,
তাতে তোর বা কি জুড়ায়;
আজ যদি তোর মা মরে, কাল এক মা আসবে ঘরে,
শেষে সতাই মায়ের জাঁতায় পড়ে, নুন ছিটা পড়বে কাটা ঘায়॥

ফুকার —তোরে কামে জন্ম দিলেম বলে, বাছা তুই হোস নে কামান্ধ,
কাম প্রেম নিত্য সম্বন্ধ ;
আগে পায় কামের বৃত্তি, কামে হয় প্রেমোৎপত্তি,
যখন কাম কামনায় হয় নিবৃত্তি, জীবে পায় বিমলানন্দ ॥
ফুকার—বললে, কেন আমায় বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খ শাড়ী,
কেন নাই সিঁথির সিন্দুরটুক ;
ও গো হিন্দু ধর্মের মর্ম মতে করতে হয় ঐটুক।
ভগ্ন হল লগ্ন যোগ, শাপগ্রস্ত কি পাপ সংযোগ,
দেখ পুত্র শোক আর স্বামী বিয়োগ, মানুষের পূর্ব জন্মের কর্মফল ॥

**কণ্ব মুনির কবি** **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—একদিন নিত্যময় শ্রীবৃন্দাবনে, রাজা নন্দের ভবনে,
আসিলেন নন্দ তপোধন।
পাড়ন—মুনি ক'রে ব্রত একাদশী উপবাসী রয়,
এলেন নন্দালয়, পারণার কারণ ॥
ফুকার—তখন নন্দরানী সযতনে, পাদ্যার্ঘ্য আসন এনে, আদরে মুনিরে বসায়,
অমনি করতে রন্ধন মুনির নন্দন,
আনন্দে রন্ধনশালে যায়। হায় হায় মরি হায়—
মুনি রাঁধিয়ে ওদন, যখন করে নিবেদন,
অমনি নন্দ নন্দন মধুসূদন, মুনির সেই রান্না অন্ন খায় ॥
মিল—তাইতে কণ্ব মুনির অন্ন মরে গোয়ালার ছুঁতে,
মুনি ভোজন করেন না কিছুতে, তাই দেখে উপানন্দ ডেকে শুধায়।
মুখ—বল হে মুনি ঠাকুর, জীবের ছুতিস্পর্শ না হলে দূর, ব্রহ্মত্ব কি পায় ॥
ডাইনা—দেখি চাউল জল অগ্নি মিলনে, রন্ধনে অন্ন হয় তা সবে জানে,
চাউল নাকি লক্ষ্মী স্বরূপিনী ;
আবার জল নারায়ণ অগ্নি ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণের এই বাণী।
ও সে ব্রহ্ম লক্ষ্মী নারায়ণ, এ তিনের তো নাই মরণ,
তবে ভিন্ন জাতির ছোঁয়ার কারণ, কেন সে অন্ন ব্রহ্মের জাতি যায়।
খাদ—অশুচিও শুচি হয়, মহতের কৃপায় ॥
ফুকার—শুনি ব্রাহ্মণে গায়ত্রী পড়ে, পবিত্র স্বভাব ধরে, সবারে করবে পরিত্রাণ,
যত অশুচিরে শুচি করে, আদরে বক্ষে দিবে স্থান। হায় হায় মরি হায়,
ঘোর পাপী হলে পরে, গঙ্গায় পাপ ক্ষালন করে,
যদি গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সে গঙ্গা পাতকুয়ার সমান ॥
মিল—শুনি ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মাগ্নিতে এ বিশ্ব পোড়ে,
যদি ছুঁৎমার্গ পোড়াতে নারে, সে আগুন আলেয়ার আগুনের প্রায় ॥

অন্তরা—ঠাকুর ব্রহ্মকুলে জন্ম নিয়ে জান না বেদের ভারতী।
জানি সর্বভূতেষুচাত্মানং, হায় গো ততোনবি চিকিৎসতি ॥
সমস্ত মানবের মাঝে, ঈশ্বরের সত্ত্বা বিরাজে,
যে জনে সে তত্ত্ব বোঝে, সেই মহামতি।
যদি সর্বব্রহ্মমিদং জগৎ, তবে কেন কর জাতি জাতি ॥
পরচিতান—দেখি বর্তমান ব্রাহ্মণের কীর্তি, ত্রিবিধ ফুৎকার বৃত্তি,
জীবিকা অর্জনের পসার।
পাড়ন—শিষ্যের কর্ণে ফুৎকার গুরুগিরি, শঙ্খে ফুঁ যাজক,
চুলায় ফুঁ পাচক, ত্রিধা বৃত্তি সার ॥
ফুকার—আছে তোমাদের এক কর্মনিষ্ঠা, দেব-দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
করিতে তোমরা মূর্তিমান ;
তোমবা নিজে হযে জন্ম অন্ধ, দেবতারে করো চক্ষুদান। হায় হায় মরি হায়
মরা জল মরা ভাতে, পার না জীবন দিতে,
কেবল চাল কলা ঠকাযে নিতে, মিথ্যা ঐ প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভান ॥

ঐ—জবাব **নারায়ণচন্দ্র বালা**

চিতান—তখন উপানন্দের বাক্য শুনে, রাগে কণ্ব মুনি কয়।
পাড়ন—জানি গুণকর্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ সদাচার,
তাইতে অধিকার চার বেদের উপর ॥
ফুকার—বললে, ভিন্ন জাতিব ছোঁয়ার কারণ কেন যায় অন্ন ব্রহ্মের প্রাণ,
যারা ব্রাহ্মণের সন্দন।
সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন, চার বেদের অগ্রগণ্য,
খেলে তামসপ্রধান জাতির অন্ন, থাকে না সত্ত্বগুণের মান ॥
মিল—তুমি বিদ্যাশূন্য বুদ্ধিশূন্য জাতিতে গোয়াল,
থাক গোহালে চিরকাল, তোমায় আর বেশী কথা বলব কি।
মুখ—বলব কি উপানন্দ, বেদের মূল না জেনে করে দ্বন্দ্ব,
দেও মাথা ঝাঁকি ॥
ডাইনা—জানি চাউল জল অগ্নির মিলনে, অন্ন হয় তা সবাই জানে,
এই অন্ন ব্রহ্মস্বরূপিনী, তুমি কয়দিন হতে হলে বাছা এত ব্রহ্মজ্ঞানী।
চন্দনে আর বিষ্ঠাতে, ব্রহ্ম আছে সব তাতে,
তবে ভাত ব্রহ্ম পারবে না খেতে, দুই এক দিন বিষ্ঠা ব্রহ্ম খাও দেখি।
খাদ—এসব নয় তো জল মিশানো দুধের চালাকি ॥
ফুকার—বললে, অশুচিরে শুচি করে ব্রাহ্মণে বক্ষে দিবে স্থান ;
এ যে পাত্রে ব্যবধান।

ঘট গড়ায় কুম্ভকারে, একটা রয় পূজার ঘরে,
থাকে আর একটা পায়খানার দ্বারে, দুই ঘট কি হবে এক সমান ॥
ফুকার—যদি গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সে নাকি পাতকুয়ার সমান,
তবু ক্ষেত্র ব্যবধান।
গঙ্গা রয় সব সলিলে, একথা সবাই বলে।
তবু খানা ডোবা কুয়ার জলে, কোন দিন হয় না গঙ্গাস্নান ॥
ফুকার—বললে, সমস্ত মানুষের মাঝে, ঈশ্বরের সত্ত্বা বর্তমান,
তবু গুণে ব্যবধান।
কেহ বা গরু ছোলে, কেহ বা দাড়ি ছাড়ে,
যে জন পূজা করে পৈতা গলে, তিনজন কি হবে সমান ॥
ফুকার—বললে, চাল কলা ঠকায়ে নিতে, করে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভাব,
তোমার ভাল নয় স্বভাব ;
ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়ে, কুশ বানায় কুশা ছিঁড়ে,
যারা লক্ষ্মী জন্মায় যজ্ঞ করে, তাদের কি চাল কলার অভাব ॥

ঐ—জবাবের প্রতি জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—অদ্য কণ্ব মুনির জবাব শুনে সভান্তে শান্তি পেলেম বেশ।
পাড়ন—কেবল হুজুগে বাহবা নিলে হয় না কবিত্ব—
আগে মূল তত্ত্ব করতে হয় নির্দেশ।
ফুকার—বললে, গরু ছালে পৈতা গলে, দুই জাত কি পাবে তুল্যমান,
তুমি নিতান্ত অজ্ঞান।
রুইদাস গরু ছালে, কৃষ্ণ তার চামের তলে,
তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ মিলে, হয় কি সে চামারের সমান ॥
ফুকার—বললে, তামসপ্রধান জাতির অন্নে, ব্রাহ্মণের জাত থাকে কোথা,
তোমার নাই পবিত্রতা ॥
পরশে পরশ করে, লোহারে সোনা করে,
যদি পরশকেই জং-এ ধরে, সেটা কি পরশ না পুতা ॥
মিল—ঠাকুর এ সংসারে মানুষ জাতি, কেহ ঘৃণ্য নয়,
যদি গুণ কর্মে উন্নত হয়, জঘন্য জাতও হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ।
মুখ—বলব কি কণ্বমুনি, তুমি মুনি না মালটানা মুণী, কও শুনি স্পষ্ট ॥
ডাইনা—আমায় বিষ্ঠা ব্রহ্ম খেতে বল, তোমার উচ্ছিষ্ট হতে বিষ্ঠাও ভাল,
তার কারণ তুমি অনাচারী ;
ঠাকুর তোমার চেয়ে শুদ্ধাচারী, গুহক আর শবরী।
যারা মানুষকে ভাবে ঘৃণ্য, জাত্যাভিমানে আচ্ছন্ন,

এমন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের অন্ন, শূকরের বিষ্ঠা হতেও নিকৃষ্ট।
খাদ—আর এক কথা শুনে আজ, মনে হয় কষ্ট ॥
ফুকার—বললে, কুশা ছেঁড়ে কুশী গড়ে, বাল্মীকির তপোবল দেখাও ;
তুমি তেমন যদি হও।
গোয়ালার ছোঁয়া ভাতে, পার না জীবন দিতে,
বুঝি তুল্য দিয়ে চাঁদের সাথে, জোনাকী পাছাটা নাচাও ॥
ফুকার—নাকি লক্ষ্মীকে জন্মাতে পারে দেখালে ব্রাহ্মণের বড়াই,
তাতে তোমার কি রে ভাই।
তাঁরা সব শুদ্ধাচারী, তার সনে তোমার আড়ি,
যেমন মামায় করে চৌকিদারী, আমি কি ফৌজদারী ডরাই ॥
ফুকার—বললে, তামসপ্রধান জাতির অন্নে, ব্রাহ্মণের হয় মানের হানি,
তুমি এত সম্মানী ?
গোয়ালা তো জাত ভাল না, ভিখ মাগো কেন বল না,
ওদের চাউলে দোষ হল না, ভাত হলেই জাতের ফুটানি ॥
ফুকার- নাকি অস্পৃশ্য হয় গোয়াল জাতি, তাই নাকি হয়ে অসন্তোষ,
তাদের জাতির প্রতি রোষ।
গোয়ালে ছুঁইয়া দিলে, জাত মরে ভাতের কালে,
ওদের দই ক্ষীর তো ভালই চলে, এটুকুই ঢেম্‌না বাম্‌নের দোষ ॥

## জল-কুম্ভের কবি — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—গোঁসাই নবোত্তমের ভক্তিকাব্য, শুনিবেন সভায় সভ্য,
যত সব নব্য মনীষী।
পাড়ন—মুচীর অশুচি পরশে একদিন, জলকুম্ভ মরে,
অমনি জলের উপরে ঘৃণায় রাগ করে, বলে কলসী ॥
ফুকার—তখন কলসী হয়ে অসন্তুষ্ট, জলকে কয় তুই কি দুষ্ট
পাপিষ্ঠ কম জাত,—
নইলে আমার মতো কাহারও এত, উন্নত বরাত। হায়—
আমি এই কলসী বেশে, পূজা পাই দেশে দেশে,
তোরে আশ্রয় দিয়ে ভালবেসে, তোর দোষে আমার গেল জাত ॥
মিল—তখন কলসীর বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে বলে জল,
ও তো মূর্খের মতো বাক্য সকল, তোর সনে তর্ক করে স্বার্থ কি।
মুখ—কলসী তুই কি সে বেশী, ভবে তুই দোষী না আমি দোষী,
ভেবে দেখ দেখি ॥

ডাইনা—তোরা কলসী গ্লাস হুঁকা পণ্ডিতে, আমাকে আবদ্ধ করে গণ্ডীতে,
সমাজে করলি কলুষিত,
নইলে নদীর জলে দধির জলে আমার মান্য কত।
আমি গাঙে ছিলাম গঙ্গাজল, সঙ্গ দোষে হই নকল,
নইলে অজ্ঞানন্ধ হিন্দুসকল, সচল জল অচল করতে পারত কি।
খাদ—জীবন স্বরূপ জীবনের জীবন মরে কি ॥
ফুকার—যখন সাগর বক্ষে অসীম ছিলাম, সসীম জীব প্রণাম সেলাম,
কত করতো পায় ;
গঙ্গে সদ্য পাতকসংহন্ত্রী, এই বলে মন্ত্রগীতি গায়। হায়—
ভাণ্ড তোর ভণ্ডামিতে, জলের হয় দণ্ড পেতে,
আমায় মুক্তি দে তোর গণ্ডী হতে, উঠি গে পণ্ডিতের মাথায় ॥
মিল—যখন উষ্ণ হয়ে গ্রীষ্ম এসে এ বিশ্ব পোড়ায়,
সবার পোড়ার জ্বালা জলে জুড়ায়, হোক না সে পুণ্যাত্মা কি পাতকী ॥
অন্তরা—মাটি তোর খাঁটি জন্ম হ'ল এই জলের মলে।
তাইতে তোয়ং উৎপদ্যতে মহী, চিরদিন রইস, এই জলের তলে ॥
অম্বুর বলে পূর্ণ কুম্ভ মান্য পাও বটে,
অম্বু শূন্য হলে কুম্ভ দম্ভ যায় ছুটে—দেখলে অযাত্রা ঘটে ; মরি হায় রে—
ও তুই জলটানা মালটানা মুটে,—
তোর কি আর বড়াই খাটে ভূতলে ॥
পরচিতান—ভবে জল মরে না ভাণ্ড মরে, না বুঝে অবিচারে,
আমার দোষ ধরে নাস্তিকে।
পাড়ন—আমি মর অমর ভূচর খেচরে, সবাকে বাঁচাই,
করে আমার গুণ যাচাই—নিজে শিব গোঁসাই রাখেন মস্তকে ॥
ফুকার—দেখি কলসী তুই ভ্রান্ত সান্ত, জলের গতি অনন্ত,
অন্ত পাওয়া ভার ;
আমার জাতি অন্ত করতে নারে, ডোম হাড়ি চামার। হায়—
চল অচল বক্ষে ধরি, পাপীর পাপ ক্ষালন করি,
এখন সান্তের দায় অনন্ত মরি, ভ্রান্তের এই সিদ্ধান্ত বিচার ॥

ঐ—জবাব নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান—জলের বাক্য করে লক্ষ্য, কুম্ভ কয় জলের বিদ্যমান।
পাড়ন—ও তোর বিষের মত কথাগুলি সয় না শরীরে—
মানীর বিচারে, আমার বেশী মান ॥
ফুকার—যখন পাত্রছাড়া রও না বারি, জল ছাড়া পাত্রের আদর কই,

আগে জলের কথাই কই,
অখণ্ডে থাক বড়, সংস্পর্শ দোষে মর,
যখন পাত্র ছাড়া রইতে নার, তার বেশী মান্য পাবা কই ॥
মিল—তবে পাত্রদোষে গেল জাতি কেমনে বলিস,
যখন পাত্র ভিন্ন রইতে নারিস, দিয়েছিস্ স্বাধীনতা বিসর্জন।
মুখ—হয়ে পরের পরাধীন, বলিস কোন আক্কেলে আমি কুলীন,
বে-আক্কেলের মতন ॥
ডাইনা—আমি বলতে পারি দম্ভ করে, আমাবে গড়ায়েছে কুম্ভকারে,
তখন ত ছিলেম আমি ভাল ;
বারি তুই আমার ভিতরে এসে, আমার জাতি গেল।
মেথর বেটার ছোঁয়া জল, কোন গুণে তুই হবি চল,
ও তোর সঙ্গদোষে এই প্রতিফল, আমিও তোরই মতো পরাধীন।
খাদ—তোর কথাতে যেন মোর মন করে কেমন ॥
ফুকার—আমি জন্ম নিলেম মাটি হতে, আগে রই কুম্ভকার বাসে,
কোন জাতির পরশে,—
হয় না মোর মানের হানি, যত্নে লয় সবে কিনি,
বারি তোরে যখন মধ্যে আনি, মারা যাই সংসর্গ দোষে ॥
ফুকার— বললে, মুক্তি দে তোর গণ্ডি হতে, গণ্ডির পর কেন এত রোষ,
যখন পাতকুয়াতে রোস্।
পোড়া ইঁট কুয়ায় ঘেরা, তাতে জল যাস্নে মারা।
বেটা আমিও তো পোড়া চাঁড়া, বল দেখি আমাব কিসের দোষ ॥
ফুকার—বললে, জল দিয়ে পাড়ায়ে মোরে, পোড়ায়ে গড়ে কুম্ভকার,
তাতে দুঃখ নাই আমার ;
অধৈর্য হই না দুঃখে, তাইতো তার উপলক্ষে,
থাকি সুন্দরী রমণীর কক্ষে, আমার ন্যায় সুখের কপাল কার ॥
ফুকার—নাকি অম্বুশূন্যে কুম্ভ হলে অযাত্রায় ঘটে দুর্গতি,
তুই তো অজ্ঞানী অতি ;
মিছে কইস যাত্রা যাত্রা, জানিস না যাত্রার মাত্রা,
যেদিন শেষের দিনের ক্লেশের যাত্রা, আমি হই সে যাত্রার সাথী ॥
ফুকার—বললে, আমি থাকি শিবের শিরে, পেয়েছিস্ সঙ্গ গুণে মান ;
সব জল হয় না এক সমান ;
মুত্রের জল আর নয়ন জল, সেও জল এও তো জল,
করে নয়নজলে সাধন সফল, মুত্রের জল ছুঁইলে করে স্নান ॥

## পাঁঠা বলির কবি — হরিচরণ সরকার

চিতান—ও সে রঙ্গপুরের সিংহবাড়ি, পূজিছে শুভঙ্করী,
শরতের ছাবিবশে আশ্বিন।
বাড়ির বুড়াকর্তার ব্যথার ব্যারাম, কণ্ঠাগত প্রাণ,
ও সে হয়েছে অজ্ঞান, উঠল কফের টান, প্রথম পূজার দিন।
ফুকার—বলে শম্ভুবাবু জ্যেষ্ঠপুত্র, করিতে নারায়ণ ক্ষেত্রে, বাহিরে আন,
আমার সংসারে অমঙ্গল হবে, ঘরে মরে না যেন।
ক্ষ্যাপারাম চাকর বেটা, ডেকে কয় ঠাকুর জ্যেঠা,
থাকতে এত সুন্দর দালানকোঠা, উঠানে বের কর কেন ?
মিল—তোমায় শিশুকালে কোলে তুলে হয়ে আমোদী—
বলত আয় তো রে বাপ চাঁদ ধরে দি, সুখেতে মুখেতে চুমা দিত।
মুখ—বল হে শম্ভুবাবু, কেন মৃত্যু দেখে কর্তা প্রভুর অনাদর এত॥
ডাইনা—একটা পাঁঠাকে করে উৎসর্গ, ধরে করেতে শাণিত খড়্গ,
আনন্দে দিয়ে বলিদান ;
দিলে সরার উপর মড়ার রক্ত মায়ের বিদ্যমান।
অস্পৃশ্য হাড়ি মুচি, মরা পাঁঠাতে রুচি,
তোমার বাবার শবদেহ অশুচি, এটা কি পাঁঠা হতেও ঘৃণিত।
খাদ—কেন রান্নাঘরে রান্না নাই, কান্নায় দিন গত॥
ফুকার—যদি বুড় কর্তায় না মরিত, ভক্তি মনেতে কত পুরুষ নারীতে,
এনে ধ্বংস পাঁঠার মাংস যত, পাক করিত বাড়িতে।
সেই মড়ার মাংস তরুণ, বাবুজী বিচার করুন,
কেন এই মড়া মরিবার দরুন, ছুঁৎ গেল পাকের হাড়িতে॥
অন্তরা—জানি না মানুষসব মানুষ শব, দেখিলে এত কেন অসন্তোষ।
পাঁঠার মাংস মহাপ্রসাদ, হাঁড়ি ছুঁলে রাঁড়ির দোষ॥
মরা ছুঁলে কর স্নান, দেও না শীতল পাটিখান,
দেও না ভাল বালাপোষ।
পাক করে খাও ঢাক বাজাইয়ে, মরা পাঁঠার মধুকোষ॥
পরচিতাম—বাবু প্রাণপণে করেছে চাকুরী, কিনেছে জমিদারী,
হয়েছে সুখেরই সংসার।
পাড়ন—তোমার সেই বাবাকে দিতে চাও না, সাধের লেপ তোষক,
সে সব প্রাণতোষক, তোমার কোন্ বাবার তৈয়ার॥
ফুকার—পালন করেছে বাৎসল্যভাবে, বিষ্ঠাকে চন্দন ভেবে, মূত্র ভেবে জল ;
দিল জন্ম দিয়ে ধর্ম শিক্ষা, এই বুঝি তার কর্মফল।

শ্মশানে মশাল লয়ে, কি জানি মন্ত্র কয়ে,
কেন মুখ দেখে বিমুখী হয়ে, বাম হস্তে কর মুখানল ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—তখন ক্ষ্যাপারাম চাকরের বাক্যে, দুঃখে শম্ভুবাবু কয়।
পাড়ন—ও তুই অশিক্ষিত, আমার বাড়ির তিন টাকার চাকর ;
বেটা এই কি তোর রহস্যের সময় ॥
ফুকার—বললে, থাকতে এত দালান কোঠা, কর্তায় বাহিরে কি কারণ,
নারায়ণ ক্ষেত্রের আয়োজন ;
প্রাণ যদি যায় পাঁচতলায়, ছাড়ে না ত্রিতাপ জ্বালায়,
মরলে গোবিন্দবল্লভার তলায়, অন্তে পায় গোবিন্দ চরণ ॥
মিল—ছিল এতদিন এই বদ্ধ ঘরে বাবার বসতি,
এখন মুক্তির পথে আত্মার গতি, তারে আর বদ্ধ ঘরে রাখব কেন ?
মুখ—ক্ষ্যাপারাম কুতর্ক ছাড়, আমার মরা বাবার করতে সৎকার,
মানুষ ডেকে আন ॥
ডাইনা—বললি, পাঁঠা হতে বাবা ঘৃণ্য, বেটা তোর কথায় হলেম মনঃক্ষুন্ন,
বিষণ্ণে রয়েছি বিরসে ;
ও তুই কোন জ্ঞানে তুলনা দিলি পশুতে মানুষে।
আর উৎসর্গ বলির পাঁঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা,
তারে অপবিত্র বলবে কেটা, তোর মত পাঁঠার বেটার এমনি জ্ঞান।
খাদ—আর এক কথা শুনে আজ হলেম ম্রিয়মান ॥
ফুকার—বললি, বুড়া কর্তায় মরার দরুন পাকের হাঁড়িতে গেল ছুঁৎ ;
তুই তো অনার্য্য এক ভূত।
যা কিছু বাবার সৃষ্টি, তাতে আজ ভূতের দৃষ্টি,
করলে ব্রাহ্মণে শান্তি জল বৃষ্টি, এই সকল দ্রব্য হবে পূত ॥
ফুকার—বললি, মড়ার সঙ্গে শীতলপাটি, লেপ তোষক দেই না কোন দোষে,
দিলে বাবায় পায় কিসে।
দেই যদি শীতল পাটি, লেপ তোষক ঘটি বাটি,
সে সব শ্মশানেতে হবে মাটি, নয় নিবে মুর্দাফরাসে ॥
ফুকার—বললে, কাটা পাঁঠা রইল শুচি, তা হতে মড়া বাবা ঘৃণ্য বুঝি,
বেটা তুই অশুচি কও কারে,
লোকে পবিত্রতা রক্ষার তরে, অশৌচ পালন করে।
আর উৎসর্গ বলির পাঁঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা,
ও তো মাংস নয় রে পাজী.বেটা, মহাপ্রসাদ কয় তারে ॥

ফুকার—কেন বাম হাতে দেই মুখে আগুন, জান না বেদবিধির কৌশল ,
পেতে শ্মশান যজ্ঞের ফল ।
সেজেছি প্রেতকর্মা, বিধি দেয় স্মৃতিশর্মা,
আছে বামাঙ্গে বসতে ব্রহ্মা, বামহস্তে তাইতে দেই অনল ॥
ফুকার—নাকি জাঁক করে খাই ঢাক বাজায়ে, এই মড়া পাঁঠার মধুকোষ ;
তাইতে তোর মনে আফশোষ ।
আমরা হবিষ্যধারী, মাছ মাংস খেতে নারি,
নিয়ে কোষ দুইটা তুই তোদের বাড়ি, তোরা সব গোষ্ঠীসুদ্ধ চোষ ॥

## সারদা-রামকৃষ্ণের কবি নারায়ণচন্দ্র বালা

চিতান—তোমার সারদা সুন্দরী আমি; প্রাণনাথ রামকৃষ্ণ ঠাকুর ।
পাড়ন—তোমার প্রভাবেতে নবযুগের অবতারণায়,—
কেহ পারে নাই উঠতে এত দূরে ॥
ফুকার—তুমি সর্বধর্মের মর্ম জান, করেছ সর্বসিদ্ধি লাভ,
নাই আর জাগতিক অভাব ।
ইষ্ট শিব কালী কৃষ্ট, মহম্মদ বুদ্ধ খৃষ্ট,
জানি তোমার কাছে সবই মিষ্ট, সতত প্রাণে মহাভাব ॥
মিল—তুমি সবার প্রিয় বস্তু, তোমার প্রিয় সব,
কেন স্ত্রীলোকের নাশিলে গৌরব, এই কি পরমহংসের বিবেক বাণী ।
মুখ—তোমারে শুধাই আমি, কেন এত তুচ্ছ লিখলে তুমি,
কাঞ্চন আর কামিনী ॥
ডাইনা—ভবে সতী নারী আছে যত, তুমি ত জ্ঞান কর নরকের মতো,
তা তোমার কথায় আছে জানা ;
আবার বিয়ে করতে অনেকেরে, করে থাক মানা ।
ভবে এলে যা হতে, রতি নাই আর তাহাতে,
যদি আবার হয় ভবে আসিতে, কোন পথে আসবে তখন কও শুনি ।
খাদ—তোমার বাক্যে অনেকেই দিচ্ছে জয় ধ্বনি ॥
ফুকার—তুমি নির্মল প্রেমের সুনিয়মে, কর নাই রমণী সঙ্গম,
করে ইন্দ্রিয় সংযম ।
নারী আর পুরুষ দুই জন, হলে পর মধুর মিলন,
নারীর ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন, পুরুষের মাথা হয় গরম ॥
অন্তরা—তোমার ত নাই সোনা বাসনা, ভালবাস না সোনা আর নারী ।
দেখ এই দুই রতন সঙ্গে থাকতে, করুণা করেন কিনা শ্রীহরি ॥
ছিল সীতার পিতা জনক ঋষির কনকের পুরী,

হেমের মধ্যে প্রেমে আসত, নয়নের বারি ;
কিসে তায় নিন্দা করি।
রায় রামানন্দ প্রেমানন্দে, রঙ্গেতে সঙ্গে রাখত সুন্দরী ॥
পরচিতান—সতী নারীর প্রেম যে অতি মিঠা, তা কভু পায় না অপ্রেমিক।
পাড়ন—দেখি মুখে মুখে সাধু হয়ে বসে সকলে,
নারীর রূপ দেখিলে, মাথা রয় না ঠিক ॥
ফুকার—যদি পতির মন না জোগায় সতী, সে নাকি হয় পাপের ভাগী,
জুড়ে লয় রাগারাগি।
সাধ পেয়ে বদ পুরুষে, অসম্ভব সম্ভোগ দোষে,
ভোগে ধাতুর ব্যথা মদনকাশে, শেষে তার দোষী হয় মাগী ॥

## বেয়াই'র বিয়ের কবি — বিজয়কৃষ্ণ সরকার

চিতান—একজন গরীব মানুষ কেশব ভুঁইয়ে, সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে,
দীনতায় হীনতায় পূর্ণ মন।
পাড়ন—অনেক চিন্তার পরে, বুড়া বরে কন্যা দিতে চায়,
ও তার অভাবের দায়, নয় শ' টাকা পণ ॥
ফুকার—ও সেই খবর পেয়ে বর জুটল এক, কজ্জলবর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত,
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে, বৌ মরেছে হঠাৎ।
বয়স তার ষাট ঊর্ধ্বে, হার মেনে সংসার যুদ্ধে,
ভোগে আমবাত রোগে মধ্যে মধ্যে, পড়ে গেছে নিচের পাটির দাঁত ॥
মিল—ও সে মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর শুনতে পেয়ে তাই—
এসে নিমাই বালা বরের বেয়াই, বরকে দেয় মিঠাকড়া সান্ত্বনা।
মুখ—তোমাকে করি মানা, এমন সরিকনাশা জরিমানা, দিতে যেও না ॥
ডাইনা—তুমি টাকা দিলে হাজার খানেক, বন্ধু-বান্ধব নিন্দা করে অনেক,
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায় ;
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাত তোমায়।
আর ভাবে থাকলে সমতা, প্রাণে জাগে মমতা,
বেয়াই তোমার নাই কোন ক্ষমতা, না বুঝে ভাব ছাড়া ফাল দিওনা।
খাদ—আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিও না ॥
ফুকার—বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ, ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই ;
হয়ে যোগযুক্ত বিষয় মুক্ত স্বভাব কালজয়ী।
দিনের দিন দিন ফুরাল, কাল পেয়ে কাল ঘনাল,
তোমার চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, বেয়াই তোমার "—" পাকিল কই ॥

মিল—মোহের উন্মাদনায় সেজেছ ভাই উন্মত্ত বারণ,—
তোমায় বারে বারে করি বারণ, মরণ পথে চরণ আর বাড়াইও না ॥
অন্তরা—তোমার এই সখের জ্বালা সুখের মালা, স্বাদ করে গলেতে পরিও না।
তুমি মন্ত্রহারা যন্ত্রছাড়া গো, ভুল করে এই মরণ মরিও না ॥
তুমি পাকা চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা করলে ভাই,
তোমার টাক বন্ধ করবার কোন বন্দোবস্ত নাই—
ভারতে ঔষধ মেলে না।
তুমি বাইরে যত সাজ পর গো, যন্ত্রের কাজ চোখ ঘুল্লিতে সারে না ॥
আর নারী চক্র বিষম চক্র বোঝা খুব মুশকিল,
তোমায় বাইরে যে টুক ভালবাসবে দিয়ে গোঁজামিল ;
তুমি তাও কি বুঝলে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের যেমন দশা গো, পরে খায় ঘরের সব মাখন ছানা ॥
রচিতান—যারা জ্ঞানী মানুষ মহীতলে, দেশকালপাত্রভেদে চলে,
বেদে বলে পণ্ডিত তারে।
পাড়ন—যত বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান—
তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে ॥
ফুকার—কেন বার্ধক্যে ষোড়শী এনে, বঁড়শী গলে বাঁধতে চাও ;
তোমার বড় ছেলের বিয়ের বয়স, তারে বিয়ে দাও।
সংসারের বিষম বিষে, এ জ্বালা জুড়াবে কিসে,
নিয়ে সৎ গুরুর সৎ পরামিশে, দেশের মানুষ দেশে চলে যাও ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—অমনি বেয়াইর বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে তার বেয়াই কয় তখন।
পাড়ন—আমি শীতে গ্রীষ্মে বুড়াকালে যত কষ্ট পাই,
জান না বেয়াই, জ্বালাটা কেমন ॥
ফুকার—আমার পুত্রকন্যা থাকতে কেন—
বিয়া করি বুড়াকালে ; আমার শিক্ষিত ছেলে ;
করিতে বাবার তত্ত্ব, রাখল এক বুড়া ভৃত্য,
আমার ভোগের বস্তু রোগের পথ্য—এসব কি একটিং-এ চলে ॥
মিল—এই যে বৃদ্ধস্য তরুণী ভীষণ, আমিও জানি—
তবু টাকা দিয়ে কিনে আনি, এ আমার গিন্নী নয় সেবাদাসী।
মুখ—যতদিন থাকব বেঁচে, আমার যত্ন করবে থাকবে কাছে—খোকনের মাসী ॥
ডাইনা—আমি বেতালে ফাল দিলাম না কি,—
তাল বেতাল তুমি বেয়াই জান বা কি, বেয়াইনে যৎকিঞ্চিৎ জানে ;
আমায় তালের খোঁজে মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে আনে।

যখন বেয়াইনে হেলেদুলে, বেহাগ রাগে তাল তোলে,
ও তার তবলা বাঁয়ার ঢাকনা খুলে—আনন্দে আমি বাজাই দশকুশী ॥
খাদ—পাকা হাতের টোকায় মোর বেয়াইন বেশ খুসী ॥
ফুকার—আমায় দোয়াজবরে মেয়ে আনতে বুদ্ধিটা দিয়েছ ভারী,
আগে বিয়েটা সারি,—
নূতন বৌ ঘরে এলে, বেয়াইনকে কয়ে বলে,
এসো তুমি আমি দুই জন মিলে, আমাদের বৌ বদল করি ॥
ফুকার—আমি যে অভাবে বিয়ে করি—
তোমারও সেই অভাব পড়ুক, দয়াল গোবিন্দ করুক,
কি অভাব হলে পরে, বুড়োরা বিয়ে করে,
তুমি বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে, কাল আমার বেয়াইনে মরুক ॥
ফুকার—আমার পাকা চুলে টাক ধরেছে—
টাকে কি বিবাহ ঠেকায়, বিয়ে করে মোর টাকায়।
টাকার এমন সম্বন্ধ, বাছে না ভালমন্দ,
একটু পেলে পরে টাকার গন্ধ, অন্ধেও চক্ষু মেলে চায় ॥
ফুকার—যারা অভাবের দায় কন্যা বেচে—
এ রকম আছে দুই চারজন, নাই তার জামাই কেনার পণ।
কষ্ট পায় ভাত কাপড়ে, কেউ না সাহায্য করে,
কাজেই কন্যা দিয়ে বুড়া বরে, দূর করে দারিদ্র্য পীড়ন ॥
ফুকার—আমার সব পেকেছে "—" পাকে নাই,
কেমনে তোমার হয় দেখা, আমার "—" আছে ঢাকা,
কাইল আমার বেয়ানেরে, পাঠাইও আমার ঘরে,
তিনি দেখে যাবেন পরখ করে, "—" আমার কাঁচা না পাকা ॥
ফুকার—আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে—
আমার আসন্ন সময়, হঠাৎ গিন্নী বিয়োগ হয় ;
ধনে জনে গৃহপূর্ণ, লোকে কয় গৃহশূন্য।
আমার যথাগৃহ তথারণ্য, এক ভিন্ন সবই শূন্য রয়,

## পান-সুপারীর কবি — শ্রীনিশিকান্ত সরকার

চিতান—দেখে সুপারীর মন তিন শ' টাকা, এ যুগের এক শ্রীরাধিকা,
বলে তার প্রাণবল্লভের ঠাঁই।
পাড়ন—বিনে পানসুপারী নারীর পরাণ বাঁচে কি মতে,
প্রায় তো খিল ধরলো দাঁতে, পড়িয়ে তোমার হাতে,
জীবনে সুখ নাই ॥

ফুকার—যত সুরসিকা পাড়া ভরে, পান খেয়ে উজ্জ্বল করে, অধরের হাসি ;
তাইতে পানিতোয়ার রস হতেও পান বড় ভালবাসি।
মিশেছি নারী দলে, রই কেন কথার তলে,
আমি পান না খেলে মন্দ বলে, নিতাই'র মা নিমাই-এর মাসী ॥
মিল—এসব কথা শুনে স্বামীর মনে জাগল ব্রজরস,
তখন প্রিয়ার অঙ্গ করে পরশ, ডেকে কয় শুন গো বিধুমুখী।
মুখ—রয়েছে নেশার বাধ্য, পানের গুণ জান কি আদ্য মধ্য,
কোন্ রসে কিসে হও সুখী ॥
ডাইনা—পানের শিরা বুদ্ধি বিনাশিনী, সুপারী কামরসের করে আমদানি,
পর্ণাগ্রে পাপোৎপত্তি হয় ;
আবার চুন খেলে বলবীর্যের হানি, ভেষজতন্ত্রে কয়।
জীর্ণ পান আয়ু হরে, ধন নষ্ট শিকড়ে,
পঞ্চপ্রাণোত্যক্ত তিক্ত করে, মন হয় না কৃষ্ণপ্রেম অভিমুখী।
খোঁচ—জ্ঞান বিনা নেশার অধীন ধনী দীনদুখী ॥
ফুকার—দেখ পান খেয়ে কেউ গান ধরিলে, রসনায় রস উথলে, পড়ে লোকের গায়,
তাইতে কথায় বলে পান খেলে পর, পণ্ডিতের জিহ্বা আড়ায়।
পান না খায় যে মেয়েটি, মুখে রয় মুক্তা ফুটি,
যত পান বিলাসীর দাঁতের পাটি, পুরাতন গাবের আঁটির প্রায় ॥
মিল—এই যে দাঁত নড়া দাঁত পড়া সবই পান গুয়ার দোষে,
ধরে অল্পকালে দন্তরসে, সাধে কি প্রাণপ্রিয়া তোমায় বকি ॥
অন্তরা—পান গুয়া গাঁজা মদ কি বিপদ, অনেকের স্বাস্থ্যসম্পদ হয় মাটি।
পানে ক্ষুধা মন্দ খোরাক বন্ধ গো—
দাঁত রসায় যৌবনে লাগে ভাটি ॥
দেখ, পান না থাকলে তেজপত্র খায়, কিংবা তার ডাঁটা,
আবার সুপারীর অভাবে আনে মান্দারের কাঁটা—
কিংবা খেজুরের আঁটি।
কারো দাঁত পড়ে অভ্যাস ছাড়ে না গো—
সার করে ছেঁচ্‌না পুতার খটখটি ॥

পরচিতান—অশেষ দোষের আকর পান সুপারী, ছেড়ে দাও সব বঙ্গনারী,
ঐ ব্যয়ে স্বদেশকে জাগাই।

পাড়ন—মোদের অনাবশ্যক দ্রব্যের মূল্যে, ভাবনা কি বেশী,
যদি না চাও প্রেয়সী,—
মনের দাম ছয়শ' আশি হলে ক্ষতি নাই ॥

ফুকার—আমি সার করেছি 'ইকনমি', সবে হোক এ পথগামী, বলি সবারে,
দেখ পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে।
সাধু সজ্জনের উক্তি, বৈরাগ্যে ঘটে মুক্তি ;
ভবে মিতব্যয়ী হয় যে ব্যক্তি, দারিদ্র্যে ধরে না তারে ॥

ঐ—জবাব — নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—তখন রসিক স্বামীর বাক্য শুনে, রসিকার মনে বাড়ে রোষ।
পাড়ন—আমার পান সুপারীর বাজে খরচ কমাতে বুঝি,
কৌশলে আজি, পানের দেখাও দোষ ॥
ফুকার—আমি চিনতেম না এই পান সুপারী, তুমিই তো আমাকে চিনাও,
যে দিন বিয়ে করতে যাও।
উদ্বন্ধন কালে দেখি, বেদ্‌ব্রাহ্মণ সাক্ষী রাখি,
দিয়ে পান সুপারী হরিতকী, আঁচলে গ্রন্হি বেঁধে দাও ॥
ফুকার—আমি চাই না কিমাম জর্দা দোক্তা,—
খাই একটু পান আর সুপারী, তাতে তোমার মুখভারি।
পান খাওয়া যে শিখেছে, না খেলে প্রাণ কি বাঁচে,
একদিন পান না পেয়ে মান করেছে, হাসির মা নিশির শাশুড়ী ॥
মিল—দিয়ে বরণডালায় পান সুপারী করে বৌ বরণ,
ভবে যত সব মঙ্গলাচরণ, পান ছাড়া পরিপূর্ণ হয় নাকি।
মুখ—করঙ্গ পূর্ণ করি, দিলে তার উপরে পান সুপারী, গোবিন্দ সুখী ॥
ডাইনা—নাকি পানের নেশায় বাধ্য হলাম, লক্ষ্মীমা'র পাঁচালীতে শুনতে পেলাম,
স্নান করে মুখে দিলে পান ;
নিজে লক্ষ্মী বলেন সেই নারী হয় আমারই সমান।
তুমি বাসি বদন না ধুয়ে, চা খাও বিছানায় শুয়ে,
এমন ভাগাড়চোষা নেশার চেয়ে, মুখশুদ্ধি পানের নেশা মন্দ কি।
খাদ—দেবের ভোগে যা লাগে তার আর নিন্দা কি ॥
ফুকার—নাকি পান খেলে দাঁত কালো করে—
সে ডরে পান যারা না খায়, গেলে পতির বিছানায় ;
বাঘমুখা গন্ধ ছাড়ে, পতি শোয় উল্টা ফিরে,
শেষে পতির মন ভুলাবার তরে, দায় ঠেকে লিপস্টিক মাখায় ॥
ফুকার—তুমি আমায় বল পানবিলাসী, খোঁজ করে দেখ ব্রজপুর ;
পানের মান্য কত দূর।
হলে গোবিন্দের খাওয়া, পরায়ে চন্দন চুয়া,
শেষে মুখ শুদ্ধিতে লাগে দেওয়া, সুগন্ধি তাম্বুল আর কর্পূর ॥

ফুকার—যখন পানে চুনে ঐক্য করে, তার সঙ্গে মিশাই খয়ের গুলি—
সে স্বাদ কেমনে ভুলি।
খয়েরে দাঁত শক্ত করে, চুনে কীট ক্রিমি মারে,
পানের রসে অগ্নিমান্দ্য সারে, ঠোঁট করে রাঙ্গা বুলবুলি ॥
ফুকার—বললে, সুপারীর অভাবে কেহ, খেঁজুরের আঁটি খেতেছে ;
কৃপণ স্বামী যার আছে।
খরচ কমাবার তরে, সুপারী বন্ধ ক'রে,
কিনে খেঁজুর আঁটি সস্তা দরে, তোমার ন্যায় অর্থপিশাচে ॥

## নাথুরাম—নৌশের আলির কবি পুলিনবিহারী সরকার

চিতান—আমি যশোর জিলার নৌশের আলি, গান্ধী ভক্ত চিরকালই,
ভারতের মুক্তি কামনায়।
পাড়ন—আমি অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী অনেক বার,
বন্দী মহাত্মার মহামহিমায় ॥
ফুকার—তুমি মহারাষ্ট্রের খুব শক্ত মহাবীর নাথুরাম,
আবার গান্ধী শিল্প আশ্রমে থেকে বলতে সীতারাম।
আজ প্রমাণ পাই প্রত্যক্ষে, পেয়ে ইংলণ্ডে শিক্ষে,
কেন গুলি মেরে গান্ধীর বক্ষে, ভারতের ঘটালে দুর্নাম।
মিল—তুমি কোন্ অপরাধ পেয়ে করলে মহাত্মার বিনাশ,
উঠল বিশ্ব জুড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস, পায় সবে মরণ সম যন্ত্রণা।
মুখ—নাথুরাম বল বল, কোন দোষে মহাত্মা পেল এরূপ লাঞ্ছনা ॥
ডাইনা—হিন্দু মুসলমানের মিলন লাগি, মহাত্মা মহাযোগী,
একুশ দিন অনাহারে ছিল,
তুমি কোন দোষে মহাত্মারে দেশের শত্রু বল।
আর নোয়াখালী পাঞ্জাবে, বৃদ্ধ ঋষি যান যবে,
কত শত্রু এসে মিত্র ভাবে, করে মহাত্মার অর্চনা।
খাদ—আর অন্ধে কভু মাণিকের যতন জানে না ॥
ফুকার—গান্ধী ডাণ্ডি অভিযানকালে, বিদেশী সঙ্গী সর্বজন,
তারা বোমা কামান উপেক্ষিয়ে, করিল ভীষণ আন্দোলন।
অহিংসা মন্ত্র ধরে, দেশ নিল স্বাধীন করে,
এরূপ হিংসা নিন্দা বর্জন করে, দেশ স্বাধীন করেছে কয়জন ॥
অন্তরা—ভারতের সুসন্তান অবসান, সেই জন্য কাঁদে রে ভারতমাতা।
মোদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে গো, জ্বলতেছে মহাত্মার চিতা ॥

যত পুরুষ নারী, হিন্দু মুসলিম, জৈন শিখ খৃষ্টান,
তারা অনুতাপে তনু ত্যাগে করে অনশন ;. মরি হায় রে—
তোমার সান্ত্বনার কি মন্ত্র আছে গো—
নাথুরাম দাও দেখি সেই বক্তৃতা ॥

পরচিতান—শুনে মহাত্মার মরণের কথা, মরমে পেয়ে ব্যথা,
দুঃখেতে করে হাহাকার ।
পাড়ন—বলো তোমার মতো কয় কুড়ি নাথুরাম হলে,
ওজন দিলে, সমান হয় মহাত্মার ॥
ফুকার—দিয়ে আত্মসুখে জলাঞ্জলি পথেঘাটে কাটায়েছে কাল,
রেখে সুখময় জীবনকে দুঃখে, চেয়েছে দেশের সুমঙ্গল ।
রিভলভার করে ধরে, গুলি চালাও বক্ষোপরে,
এইরূপ মহাত্মারে প্রাণে মেরে, দেশের কি করলে সুমঙ্গল ॥

## পাপ-পুণ্যের কবি — হরষিত ভট্টাচার্য

চিতান—শুনে চূড়ামণি যোগের কথা, সোনাগাছির বনলতা,
আনন্দে গঙ্গাস্নানে যায় ।
পাড়ন—দেখে লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গায় নেমেছে. ভাবের তুফান উঠেছে,
সবে গাহিছে গঙ্গা মাঈ কী জয় ॥
ফুকার—বেশ্যা দাঁড়ায়ে গঙ্গাতীরে, ভাসিলে আঁখিনীরে, বলে জোড় হাতে ;
আমি জন্মাবধি পাপের বোঝা বয়েছি মাথে ।
পাপ আমার অঙ্গে ছিলি, তোর জ্বালায় কতই জ্বলি,
দিয়ে এক ডুবে আজ জলাঞ্জলি, উঠিব পুণ্যময় রথে ॥
মিল—তখন পাপ হয়ে মূর্তিমন্ত রক্তাক্ত আঁখি,
বলে মোর সাথে করে চালাকি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে যেতে চাস ।
মুখ—আমার নাই আদি অন্ত, আমি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার দাস ॥
ডাইনা—স্বর্গের ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র, আর যত ভক্ত মুনি জ্ঞানেন্দ্র,
সবে মোর সেবে শ্রীপাদপদ্ম ;
যত স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ কোন্ জীব পুণ্য শুদ্ধ ।
আর আমার সেবা করিলে, সে থাকে রাজার হালে,
আমায় গঙ্গাজলে ফেলে গেলে, তোর ভাগ্যে ছেঁড়া কাঁথা বার মাস ।
খাদ—মোর জ্বালায় মরবি জ্বলে, করবি হা হুতাশ ॥
ফুকার—আমি রাবণ রাজার সঙ্গী ছিলাম, ত্রিলোকে প্রণাম সেলাম, করত তাঁহারে,
থাকত বায়ু বরুণ, কুবের-অরুণ, যম তার দুয়ারে ।

পেয়ে মোর কৃপা দৃষ্টি, বাড়ল তার আর্য কৃষ্টি,
শেষে পড়ে রায়ের পুণ্য দৃষ্টি, সব গেল কালের গহ্বরে ॥
মিল—আমায় ভালবেসে সুখে ছিল হিরণ্যকশিপু,
হয়ে প্রহ্লাদের পুণ্য তার রিপু, তার সেই সুখের বপু করল গ্রাস ॥
অন্তরা—আমার এই শুভ মূর্তি সুখ ভর্তি, এ বিশ্বে আমি মাত্র সুমহান।
আমার ভৃত্যবর্গে সুখের স্বর্গে গো, আনন্দে করে আমার গুণগান ॥
দেখ অন্ধ জ্ঞানে আমায় মন্দ বলে ইতরে,—
আমার ডরে জন্ম ধরে এই ধরাপরে, যুগে যুগে ভগবান।
করে জন্মাবধি সুখের সেবা গো, শেষকালে কংসরাজ পেল নির্বাণ ॥
আর ব্রহ্মপুত্র গয়া গঙ্গা কাশী নবদ্বীপ,
জ্বলে পাপীর আঁধার দূর করতে সহস্র প্রদীপ, আমায় করতে অপমান
তবু সর্বতীর্থ পাপে পূর্ণ গো, ধন্য রে ধন্য মোর অক্ষুণ্ন মান ॥
পরচিতান—যদি আমায় তেমন ভালবাসিস, পাবি মোর শুভ আশিষ,
নিরামিশ লাগবে না খাওয়া।
পাড়ন—কভু বন্ধুর সঙ্গে মনোরঙ্গে সিনেমায় যাবি, কত ট্যাক্সি হাঁকাবি,
গাঁয়ে লাগাবি বসন্তের হাওয়া ॥
ফুকার—দেখ শত শত নরনারী, আমার ভজনা করি, লভে পরমধাম ;
শূন্যে সস্তা পুণ্যের বস্তা কেবল জীবাত্মার ব্যারাম।
কলিতে জগা মাধাই, আমাকে ভজল দু'ভাই,
তাদের সুখের স্বর্গের মধ্যে নিতাই, শিখাল হরেকৃষ্ণ নাম ॥

ঐ—জবাব — নিকুলেশ্বর সরকার

চিতান—শুনে পাপের কথা, পেয়ে ব্যথা, বনলতা পাপেরে বলে।
পাড়ন—আমি ভুল করিয়ে কুল ছাড়িয়ে এলেম তোর মন্ত্রণায় ;
আজ সে যন্ত্রণায়, মোর অঙ্গ জ্বলে ॥
ফুকার—আগে যৌবন মদে হয়ে মত্ত, ছিল না ধর্মাধর্ম জ্ঞান ;
পাপ তুই ছিলি বলবান।
যৌবনে লাগল ভাটি, গেল মদ তবলার চাটি,
এখন গঙ্গাতে স্নান করে উঠি, আর কি পাপ তোরে দিব স্থান ॥
মিল—তোর যে পাপীর বাড়ি আদর ভারী, সে শুধু স্বার্থেরি আশে ;
হলে স্বার্থ সাধন অবশেষে, কেউ কি পাপের পানে ফিরে চায়।
মুখ—পাপে তাপিত অঙ্গ, পায় যদি সাধু সঙ্গ, পাপ থাকে না গায় ॥

ডাইনা—যত ধনী মানী ব্যভিচারী, ভক্তিবিহীন অনাচারী,
সকলে তোরে ভালবাসে ;
ভবে কেউ করে না পাপের আশা, গেলে নিত্যের দেশে।
আর তুলসী সেবা গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণপূজা ইষ্টধ্যান,
যথায় কালাকালী রাম নামের গান,—
পাপ রে তোর আধিপত্য নাই তথায়।
খাদ—আলো ফেলে অন্ধকারে কেউ কি যেতে চায় ॥
ফুকার—বললে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস ;
পাপে বংশ হল নাশ।
রামের বাণ খেয়ে বুকে, রামরূপ চক্ষে দেখে,
শেষে লাথি মেরে পাপের মুখে, সুখে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
ফুকার—বললি, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, পাপী রাবণের ছিল দাস ;
কথা করি না বিশ্বাস।
চণ্ডী যার দ্বারের দ্বারী, দেবতা আজ্ঞাকারী ;
যদি পাপ থাকত রাবণের বাড়ি, যম কি তার কাটত ঘোড়ার ঘাস ॥
ফুকার—বললি, জগা মাধাই ছিল দু'ভাই, তুই না কি ছিলি সেই দেশে ;
গউর নদীয়ায় এসে,—
যত পাপ করে ছিল, নাম দিয়ে দূর করিল,
তাদের লোহার দেহ সোনা হল, প্রেমদাতা নিতাইর পরশে ॥
ফুকার—এই যে দিবা রাত্র জোয়ার ভাঁটা, পাপ পুণ্যে গড়া এ সংসার ;
তাতে পাপ নয় প্রশংসার।
পাপে অনর্থ ঘটে, কয়েক দিন মজা লোটে,
যখন জ্ঞানের বাতি জ্বলে উঠে, থাকে না পাপের অন্ধকার ॥
ফুকার—আমি কামরূপা কামিনী হয়ে, জন্ম নিয়েছি ধরাধাম ;
কত করলেম পাপের কাম।
পাতক হয়েছে ভারি, পান করলেম গঙ্গা বারি,
এখন ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি, জপ করিব দীনবন্ধুর নাম ॥

**শুক-শারীর কবি** **উপেন্দ্রনাথ সরকার**

চিতান—হল ঘোর অন্ধকার অর্ধনিশি, নিদ্রিত সব গোকুলবাসী,
মানে মগ্না রাই রূপসী নিকুঞ্জে বনে।
পাড়ন—হয়ে সৃষ্টি কর্তা কৃতাঞ্জলি, মান পূজায় দিতে অঞ্জলি,
প্রভাতে নীল পদ্ম তুলি দিল চরণে ॥
ফুকার—শিরে পুষ্পদল মণ্ডিত চূড়া জিনি চন্দ্রমা,

আছে অচল নেত্রে অলস গাত্রে সোনার প্রতিমা, হায় হায় গো—
যে পুষ্প চয়নে সদ্য, বিমুখী রাই মানে বদ্ধ,
পদে পেয়ে সেই নীলপদ্ম, না দিচ্ছে ক্ষমা ॥
মিল—শাখী শাখে শোভে দম্পতি বিরহ সন্তাপে,
দারুণ দ্বন্দ্ব মনস্তাপে ডেকে বলে শুক।
মুখ—ওগো শারী দে গো সাড়া, কোন পাষাণে গড়া নারীর বুক ॥

ডাইনা—বাসন্তী বকুল বেলী, গন্ধরাজ মালতী যূঁই,
শেফালী চন্দন চাঁপা পরশে রাই হাসত কই।
কেবল বলত ইসারায়, আমার নীল শাড়ীর নীল কমল চায়,
রোহিনী শ্রীকান্ত যেমন নীলাকাশে হাসে,
নীল পদ্ম বক্ষেতে তেমন রাধারূপে ভাসে,
শারী এই কি তোর সেই বিনোদিনী লো, যে জন কৃষ্ণপ্রেমের পাগলিনী—
যার কৃপাবিন্দু লাভে হয়ে অভিলাষী,
বিষয় বৈভব ত্যজে ভৈরব শ্মশানবাসী,
দেখি সেই ধন রাধার পায়ে লুটায় লো, যারে ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে—
ভক্তগণে যে নীল পদ্ম স্থান দিতে চায় হৃদিপদ্মে,
সেই নীল পদ্ম রাধার পদে, রাধার অধো দিকে মুখ।

খাদ—পিপাসায় তটিনী তটে রাই কেন বিমুখ ॥
ফুকার—শারী আজ হতে চিনিলাম নারী প্রেমহীনা তোরা,
নইলে শিবের বুকে এলোকেশী কেন দেয় পাড়া।
স্বর্গবাস যার হয় অযোগ্য, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র,
সেই নীল পদ্ম পূজার অর্ঘ, রাই পদে পড়া ॥

অন্তরা—শারী আজ হতে চিনিলাম নারী, কোমল নয় এ বড়ই কঠিন ;
তাই পুরুষে পাসরে নিশিদিন ॥
দেখি রাধার মূর্তিখানা, ভেবেছিনু কাঁচা সোনা,
ভক্তি অর্থে বললাম শারী কিন। ওগো শারী লো—
বিরহ তাপ মান হাঁপরে, যেই দিল কামারে,
এখন বুঝা গেল গিল্টি করা টিন ॥

পরচিতান—শারী দেখ না চেয়ে দু'টি চোখে, ঊষা আশার ছবি আঁকে,
পূবাকাশে থেকে থেকে, খেলে রাঙ্গা ঢেউ।

পাড়ন—হবে এর পরে যে অরুণ উদয়, দেখে সবে মান অভিনয়,
নারী কুল যে প্রেমে নির্দয়, মজবে না আর কেউ।

ফুকার—আগে জেনেছিলাম রমণীর প্রেম যেমন সুধার ধার ;
যদি ভাগ্য বলে লভে পুরুষ, মৃত্যু জয় হয় তার।
তা নয় তা নয় বুঝলাম সকল, রমণীর প্রেম নাগের গরল,
মজে যদি পুরুষ সকল, পুড়ে হয় ছারখার ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—শুনে শুকের মুখে দুখের কথা, অমনি ডেকে কয় শারী।
পাড়ন—আছে সংসারে যত পুরুষ, সবই কি ভাল মানুষ,
কেন বলো পাষাণী নারী ॥
ফুকার—অদ্য রাইকে দিয়ে আসার আশা, চন্দ্রার কুঞ্জে নিয়ে বাসা,
নিশি কাটায় বাঁকাশ্যাম, তাতেই রাধারানী হয়ে বাম।
মান করেছে মন বিষাদে, মান ভাঙ্গিতে কালাচাঁদে,
এখন দায় ঠেকে পায় ধরে কাঁদে, লম্পটের এই পরিণাম ॥
মিল—সতী নারী আপন পতি রাখে শাসনে—
সে সাহস নাই যাহার প্রাণে, সতী নয় সে সংসারে।
মুখ—লম্পট পুরুষ শাসন করে, তাইতে কি পাষাণী কও তারে।
ডাইনা—ব্রজ বধূর মধুর প্রেমে সাধু শ্যামরায়,
একাদশীর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খায়।
পাষাণী নয় রাই রূপসী, বাহিরে রাগ ভিতর খুসী,
আর যেন শ্যাম কাগোশশী, না যায় সে চন্দ্রার ঘরে।
খাদ—আশাভঙ্গ অপরাধী দোষী বিচারে ॥
ফুকার—বললে, ও শারী তুই দেগো সাড়া, কোন পাষাণে নারী গড়া,
অন্তরেতে গরলময়, তোদের পুরুষ কিসে সরল হয় ;
দময়ন্তী ত্যজে নলরাজে, শ্রীবৎস চিন্তাকে ত্যজে,
রাম যে সীতা দিল বনমাঝে, এরা বুঝি পাষাণ নয় ॥
ফুকার—বললে, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র, সে হল রাই পদে অর্ঘ্য,
নারীর নাইকো দোষের ওর, কেন এত অল্প বুদ্ধি তোর,
রাধা নাম মস্তকে রেখে, কৃষ্ণ নাম যে পায়ে লেখে,
যদি সে পায় অর্ঘ্য হয়েও থাকে, সেও তো তার ভাগ্যের জোর ॥
ফুকার—বললে, প্রেম-বিরহে মান-হাপরে, পোড়ায়ে রাধা সোনারে,
ভাবলি না কি গিল্টী টিন, শুক রে রাধাকৃষ্ণ নয় রে ভিন।
আশাভঙ্গ মনের দাগায়, মানের গিল্টী ঝালা লাগায়,
দেখবি পোড়ালে মিলন সোহাগায়, খাঁটি সোনা চিরদিন ॥

ফুকার—বললে, বুঝেছি বুঝেছি সকল, রমণীর প্রেম সাপের গরল,
যারা প্রেম-সাপুড়ে হয়, তারা করে না সে বিষের ভয়।
অসংযমী পুরুষ যারা, কালের বিষে মরে তারা,
যারা জানে নিষ্কাম বিষের ঝাড়া, বিষ করে অমৃতময় ॥
ফুকার—বললে, ব্রহ্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে, সে পড়ে রাধার চরণে,
প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার, ওদের চরণ মস্তক একাকার,
ব্রহ্মারও আরাধ্য হরি, তাঁর আরাধ্যা রাই কিশোরী,
জীবের ভবসমুদ্র পারের তরী, সাধন সিদ্ধির মূলাধার ॥
ফুকার—বললে, শিবের বুকে দিয়ে পাড়া, কেন দাঁড়ায় ভবদারা,
নারী কি পাষাণীব প্রায়, পুরুষ নারীর পেটে জন্ম পায় ;
তত্ত্ব জেনে শূলপাণি, মাথায় রাখেন সুরধুনী,
আবার বক্ষে রেখে দাক্ষায়ণী, নারী জাতির মান বাড়ায় ॥

## সিনেমার কবি

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

চিতান—দেখি কল্পলোকের গল্প নিয়ে, কবি যায় কবি গেয়ে,
ভক্তিতে শুনেন সভ্যগণ।
পাড়ন—কত সত্যমিথ্যা কাটাকাটি হয় দিনে রাতে
জ্ঞানী সেই পথে সত্যের পায় দর্শন ॥
ফুকার—একজন নব্য বাবু ট্যাক্সি হতে, নামিল প্রায় সন্ধ্যাকালে,
অমনি একটি পয়সা দাও গো বাবু,—এসে এক ভিখারিণী বলে ;
জল তাহার চোখের কোণে, চাইল না তাহার পানে,
বাবু তিন টাকার এক টিকেট কিনে, ঢুকতে যায় সিনেমা হলে।
মিল—একজন ফকির ছিল রাস্তার পরে, এই দৃশ্য দেখে—
ও সেই বাবুর প্রতি বলে ডেকে—ঠাকুর হে আমি জিজ্ঞাসি তোমায়।
মুখ—ওগো ব্রাহ্মণের ছেলে, কেন মন্দির ফেলে সন্ধ্যাকালে, ঢুকবে সিনেমায় ॥
ডাইনা—তোমরা ত্যাগ করে ব্রহ্মগায়ত্রী, এই নির্জীব ছবিতে ভোর কর রাত্রি
ভুলেছ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ;
কেন পয়সা খরচ করে শিখবে, প্রেম পিরীতির গান।
তোমরা করে কুপরামর্শ, কি করেছ আদর্শ,
কিসে মানবাত্মার হয় উৎকর্ষ, সে কি এই নগ্ন রূপালী পর্দায়।
খাদ—তোমরা জড় চিন্তায় বড় হও, জড় বৃক্ষের প্রায় ॥
ফুকার—শুনি স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, এই যদি মনীষীদের মত,
যত মানব হল মহামানব, ধরিয়ে সেই পথ, হায় হায় হায় মরি হায়—

আমাকে বল দেখি, মানবের স্বধর্ম কি,
তোমরা কোন আদর্শ বুকে রাখি, রচনা করলে ভবিষ্যৎ ॥
মিল—তোমরা চলচ্চিত্রে কি বিচিত্র পেয়েছ শিক্ষা,
সবে কোন্ মন্ত্রে নিয়েছ দীক্ষা—কি ভিক্ষা মাগো তাহার দরজায় ॥
অন্তরা—সিনেমার লাইনে আইনে, এই দেশের কি হয়েছে উন্নতি।
তোমরা অনুরক্ত যত ভক্ত গো—সর্বাধিক সংখ্যায় যুবক যুবতী ॥
করে হিন্দী বাংলা ইংলিশ ছবির নগ্নরূপ দর্শন,
সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে করে চিত্ত আকর্ষণ,
যত বোম্বের প্রোডাকসন্, মরি হায় রে—
কেহ কোলের ছেলে ফেলে আসে গো, বাৎসল্যের একি চরম দুর্গতি ॥
শুনি পবিত্র প্রয়াগের তীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গম—
স্পর্শে উদ্ধার করে কীট পতঙ্গ স্থাবর আর জঙ্গম,
নেমে নাম পেলে সঙ্গম, মরি হায় রে—
শুনি বোল রাধা বোল সঙ্গমের বোল গো—
এই নাম আর স্নান করে হোক সদ্গতি ॥
পরচিতান—আগে এই দেশে কত সুখ ছিল, তিন টাকা দর চালের কিলো,
কেনা থাক শুনলে করে ভয়।
পাড়ন—যত গরীব মরে অনাহারে, ক্ষুধার পীড়নে,
ধনীর নয়নে চলচ্চিত্রের জয় ॥
ফুকার—তোমার সম্মুখে ঐ ভিখারিণী, শুষ্ক মুখ রুক্ষ মাথার কেশ,
তোমার অন্তরের স্নেহ দয়া মমতা, কে করল নিঃশেষ ; হায় হায় মরি হায়—
দরিদ্রে দয়া ধর্ম, বুঝলে না তাহার মর্ম,
তোমরা তদ্বিপরীত করে কর্ম, উচ্ছন্নে দিলে সোনার দেশ ॥
মিল—দেখি বৈজয়ন্তী নার্গিসাদি সুচিত্রা উত্তম,—
এই সব আদর্শ করে সর্বোত্তম, দিনরাত্রি মত্ত রও তার সাধনায় ॥

ঐ—জবাব **নকুলেশ্বর সরকার**

চিতান—তখন ফকির বেটার ফিকির শুনে দুঃখেতে ঠাকুর বলতেছে।
পাড়ন—তোরা ভিখারী আর ভিখারিণী দুইটি মাণিকজোড়,
চিটিং ব্যবসা তোর, ভালই চলতেছে ॥
ফুকার—আছে তোর মত ভিখারী যারা, গায় খেটে করে না রুজি,
মাত্র ভিক্ষাই পুঁজি ;
পড়ে থাকিস ফুটপাতে, ভাঙ্গা ইঁট দিয়ে মাথে,
কেহ একটি পয়সা দিলে হাতে, অমনি কইস ধন্য বাবাজী ॥

ফুকার—দেখি বর্তমান প্রগতির যুগে সিনেমা দোষের কিছু নয়,
ওটা সুশিক্ষার বিষয়।
সাগরে রত্নভরা, হাঙ্গরে পায় না সাড়া,
আছে প্রকৃত জহুরী যারা শুক্তিতে মুক্তা বেছে লয়॥
ফুকার—কোন ভক্তিমূলক ছবির কথা, লোক মুখে যখন হয় প্রকাশ,
আমার জন্মে অভিলাষ।
ব্রাহ্মণের কর্ম সেরে, সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়ে,
এসে ঢুকেছি সিনেমা ঘরে, দেখিতে ভক্ত হরিদাস॥
ফুকার—বললে, লেংটা ছবি দেখে নাকি সিনেমায় ঢুকে যাই আমি,
তাতে কিসে হই বদনামী,
লভিতে মহৎ কৃপা, দেখতে যাই ঊর্ধ্বতপা,
ও সেই লেংটা সাধু বামাক্ষেপা, আরো সেই ত্রৈলঙ্গস্বামী॥
ফুকার—আমি ভিখারীকে দেইনা ভিক্ষা, যত ভিখারী এই ধরায়,
ওদের গলদ রয় গোড়ায়,
মানুষ ঠকাবার তরে, পঙ্গু হয় ভঙ্গী করে,
কেউ ভিক্ষা যদি না দেয় তারে, রাগ করে লম্বা ঠ্যাং বাড়ায়॥
ফুকার—কেহ ছল করে ভিখারী সেজে, করতেছে ভিক্ষা করার ভান,
বাড়ি দোতলা দালান,
চুন মেখে সেজে কুষ্ঠী, নকল রোগ করে সৃষ্টি,
এই সব ব্যবসাদার ভিখারীর গোষ্ঠী, করতে হয় জেলখানায় চালান॥
ফুকার—বললি, মানবের স্বধর্ম কিবা, তুমি আজ কর তাই প্রকাশ,
শোনো ধর্মের ইতিহাস;
ত্যাগ দয়া দান আর ধর্ম, মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম,
কিন্তু অপাত্রে দান ঘোর অধর্ম, তাতে হয় নরককুণ্ডে বাস॥
ফুকার—কেউ কোলের ছেলে ঘরে ফেলে, যদিও যায় সিনেমায়,
মায়া ভোলে কি তার মায়;
সিনেমায় মন কি বান্ধে, মন কয় ছেলে কান্দে,
ছুটে ঘরে এসে মনানন্দে, শতবার মুখে চুমা খায়॥
ফুকার—বললি, ছেলে ফেলে সিনামায় যায়, বাৎসল্য স্নেহের কি বালাই,
ঘরে ঘরে দেখতে পাই,
সন্তান রাখিয়ে ঘরে, গিন্নীরা চাকরী করে,
ছেলে রক্ষা করে ঝি চাকরে, তাদের কি বাৎসল্য প্রেম নাই॥
মিল—দেখি গণ্যমান্য ব্যক্তি যত আছে জগতে,
তারা নীর ফেলে ক্ষীর বেছে নিতে, সাধ করে ঢোকে গিয়ে সিনেমায়।
মুখ—বল কি ফকির বেটা, তোর চরিত্র যে বড়ই ঠেঁটা, ভাবে বুঝা যায়॥

ডাইনা—কেন ভিখারীকে দেই না ভিক্ষা, আমি বেশ দেখে শুনে পেলেম শিক্ষা,
যত ভিখারী দলে দলে ;
ওদের অন্তরেতে অসুর বুদ্ধি, গলায় মালা দোলে।
ভিক্ষা করার ছল করি, ঘুরে যায় বাড়ি বাড়ি,
শেষে রাত্রে এসে করে চুরি, বেটারা গাছের খায় তলার কুড়ায় ॥

## ভাগ্য ও কর্মের কবি শ্রীঅমূল্যরতন সরকার

চিতান—একজন কবির কাছে দ্বন্দ্ব নিয়ে, ভাগ্য আর কর্ম গিয়ে,
কে বড় সূক্ষ্ম বিচার চায়।
পাড়ন—অমনি ভাগ্য বলে আমার বলে, কর হে শ্রবণ—
যত উচ্চাসন জগৎজনে পায় ॥
ফুকার—শুনে ভাগ্যদেবের আত্মগর্ব, গর্ব করিতে খর্ব,
কবি কয় কর্ম পক্ষ ধরে—
যত বুদ্ধিনাশা বিত্তশূন্য, তারাই ত তোর প্রশংসা করে।
ভাগ্য তোর ভরসাতে, কয়জন খায় দুধে ভাতে,
কেবল কাল গত হয কল্পনাতে, মজুরের কাজ করে হুজুরে ॥
মিল—যত বেদাচারী পুরাণ পাঠক কর্মের পূজারী—
তারা ভাগ্যকে উপেক্ষা করি, কর্ম করে সব সময়।
মুখ—রাখিতে পুরুষাকার, কৃষ্ণ অর্জুনকে কয় বারংবার, চমৎকার বিষয় ॥
ডাইনা—কত ক্রমোন্নতি দেখ চাইয়া, যত বৈদ্যুতিক উৎপন্ন ক্রিয়া,
রকেটে চন্দ্রে অভিযান ;
আবার বেতার যন্ত্র টেলিভিসন উদ্ভিদের পরাণ।
নিত্য নব সন্ধানে, নব যাত্রীদলগণে,
কত নতুন আলোক বইয়ে আনে, ঝলকে বিশ্বকে করে বিস্ময়।
খাদ—ভাগ্য রে তুই অযোগ্য বিজ্ঞ লোকে কয় ॥
ফুকার—ছিল ভাগ্য ধরে সিরাজউদৌল্লা, দুধ ভাতে চিনি কলা,
গেল তার সুখের বালাপোষ ;
যদি কর্মী হয়ে কর্ম করত, পরাজয়ে হত না আফশোস।
রোমানের সৈন্যদলে, স্কটল্যাণ্ডকে নেয় দখলে,
শুধু ভাগ্য ধরে বসে থাকলে, রাজ্য কি পেত রবার্ট ব্রুস ॥
অন্তরা—বিধির বিধান নীতিশাস্ত্র কর্ম করতে জন্ম ধরায়।
যারা অলসত্যাগী কর্মযোগী, দেশের গৌরব তারাই বাড়ায় ॥
চাষীর কর্ম লাঙ্গল চষে, জীবন সঞ্চার ফলের রসে,
চাষ না করে থাকলে বসে, ফসল কিসে পায় ॥

করে দ্বাদশীতে একাদশী, পাকের হাড়ি রৌদ্রে শুকায় ॥
পরচিতান—হয়ে অধ্যাত্ম কর্মে উন্নত, মানবে পায় দেবত্ব,
সুভাষ বোস, গান্ধী, সি. আর. দাশ।
পাড়ন—রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর জগদীশচন্দ্র,
কবি রবীন্দ্র, বিশ্বে জয় প্রকাশ ॥
ফুকার—ছিল শুক শাক্য পরাশরে, বেদব্যাস মুনিবরে,
ভাগ্য তুই মন দিয়ে তাই শোন,
তাদের জন্ম কথা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, রুদ্ধ হয় শ্রবণ।
কর্মের জয় যাবে কোথা, ব্যাস হলেন বেদের কর্তা,
পেল দেবাধিক বিশিষ্টতা, বশিষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ॥

ঐ—জবাব নকুলেশ্বর সরকার

চিতান—তুমি নব্যদেশের সভ্য কবি, আজগুবি কবিত্ব তোমার।
পাড়ন—হয়ে কর্মের পক্ষ রুক্ষ বাক্য ভাগ্যকে শোনাও,
এখন শুনে যাও, ভাগ্যের কত দর ॥
ফুকার—অদ্য অদৃষ্ট আর কর্ম নিয়ে তুমি খুব পড়লে ফাঁপরে,
দুইজন থাকে এক ঘরে।
কর্ম হয় পুরুষ জাতি, অদৃষ্ট হয় প্রকৃতি,
দুইয়ের না হলে অভিন্ন প্রীতি, কর্মে কি ফল প্রসব করে ॥
ফুকার—জানি ক্ষেত্র হল পুরুষাকার, অদৃষ্ট হল মেঘের জল,
দুইয়ের মিলনে হয় ফল,
চাষীরা জমি চষে, বীজ বোনে ফলের আশে,
যদি কাল মত মেঘ না বরষে, পুড়ে যায় সোনালী ফসল ॥

মিল—তুমি অন্ধের মত দ্বন্দ্ব কর অদৃষ্টের সাথে,
তাইতে ভাত জোটে না ছেঁড়া পাতে, দিন রাতে কুঁড়ে ঘরে কর বাস।
মুখ—বলব কি ওহে কবি, বসে নির্জনে কল্পনার ছবি, আঁক বার মাস ॥
ডাইনা—দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানী যত ইতি, তাদের যে কর্মগুণে ক্রমোন্নতি,
আমিও যাই তা স্বীকার করে,
কিন্তু কর্মের জোরে ভাগ্যলিপি খণ্ডাতে না পারে।
তারা যানবাহন তৈরী করে, দেশ বিদেশ সফর করে,
কেহ ভাগ্য দোষে পুড়ে মরে, দেখ না অদৃষ্টের কি পরিহাস।
খাদ—ভাগ্যবন্ত জানতে পায় ভাগ্যের ইতিহাস ॥
ফুকার—কেহ কাঠ কাটিতে বনে গিয়ে, গুপ্তধন করে লয় উদ্ধার,
পায় সে ভাগ্যের পুরস্কার।

কেহ বা ব্ল্যাকমার্কেটে, লাখে লাখ টাকা লোটে,
কিন্তু অম্লপিত্ত রোগের চোটে, তার ভাগ্যে জোটে না আহার ॥
ফুকার—আবার মাছ ধরতে পোলো হাতে, কত লোক খালে বিলে যায়,
কেহ রুই কাতলাও পায় ।
ভাগ্যে না থাকলে পরে, মাছ পাওয়া থাকুক দূরে,
কেহ কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফেরে, শিং মাছের কাঁটা ফুটে পায় ॥
ফুকার—বললে, রবি হল কবি শ্রেষ্ঠ নাকি কর্মের সাধনে,
সেও অদৃষ্ট মানে ।
কত সব শ্রেষ্ঠ কবি, আঁধারে রইল স'বি,
কিন্তু নোবেল প্রাইজ যে পেল রবি, সেও তার অদৃষ্ট গুণে ॥
ফুকার—বললে, সুভাষ বোস আর চিত্তরঞ্জন, কর্মেরই পূজারী সবাই,
দেখ ভাগ্যের কি বালাই ।
যে কর্মের জন্য তারা, ভোগ করে বৃটিশ কারা ।
কিন্তু স্বাধীন দেশে বসত করা, তাঁদের ভাগ্যে নাই ॥
ফুকার—খেয়ে দুধকলা সিরাজউদৌল্লা, নাকি অদৃষ্ট গুনেছে,
সে কি আগে জেনেছে ।
বিশ্বাস করে স্বজনে, ঠকে ইংরাজের রণে,
কয়টা ঘর সন্ধানী বিভীষণে, খাল কেটে কুমীর এনেছে ॥
ফুকার—বললে, দেশকর্মী মহাত্মা গান্ধী, দাসত্ব শৃঙ্খল খুলিতে,
জীবন কাটায় জেলেতে ।
দেশ স্বাধীন হল যবে, আনন্দ করে সবে,
গান্ধীর ভাগ্যে ছিল মরতে হবে, নাথুরাম ধূর্তের গুলিতে ॥
ফুকার—বললে, ভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে, রবার্ট কি পেত সিংহাসন,
রাজ্য যেতে কত ক্ষণ ।
রাম বসবে সিংহাসনে, ত্রুটি নাই আয়োজনে,
সে যে রাত প্রভাতে যাবে বনে, কে জানে ভাগ্যের বিড়ম্বন ॥
ফুকার—বললে, কর্মের গুণেতে বশিষ্ঠ, হয়েছেন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ,
তবু অদৃষ্টের শাসন ।
ভাগ্য ছিল না ভাল, কল্মাষপাদ রাক্ষস হল,
ও সেই রাক্ষসে ধরিয়া খেল, বশিষ্ঠের শতেক নন্দন ॥
ফুকার—ছিল কংগ্রেস কর্মী যারা যারা, বিশ বৎসর দেখায় কর্মের জয়,
এবার কর্ম কোথা রয় ।
কামরাজের দাম কমেছে, অতুল্য'র মূল্য গেছে,
আবার প্রফুল্ল যে ফেল পড়েছে, এসব কি ভাগ্যলিপি নয় ॥

# টপ্পা

[ 'কবি' বা লহর কবি ও তার জবাব গাওয়া পর্যন্ত এক পালা কবিগানের অন্তত অর্ধেক সময়, অর্থাৎ প্রায় ছ' ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। এরপর বাকী ছ' ঘণ্টা ধরে চলবে টপ্পা-পাঁচালী এবং যোটের পাল্লা। গানের উদ্যোক্তা কিংবা আসরের শ্রোতাদের নির্দেশ মতো প্রথম দলের 'সরকার' কোন বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে এবং বিপক্ষ কবিয়ালকে বিপরীত ভূমিকায় রেখে টপ্পা ( প্রশ্ন ) করেন; এবং সে সঙ্গে ধুয়া ও ছড়া-পাঁচালী সহযোগে টপ্পার বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। অনুরূপভাবে আরোপিত ভূমিকাধারী বিপক্ষ কবিয়ালও টপ্পার জবাব দেন এবং তৎসহ ধুয়া ও ছড়া-পাঁচালী মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। একপালা কবিগানে দুই জন কবিয়ালের অন্ততপক্ষে চার বার টপ্পা কাটাকাটি চলে। কবিগানে টপ্পা ও তার জবাবকে চাপান-উতোর বলা যায়। একে 'বেড়' দেওয়াও বলা হয়। কবিগানের এই অংশে কবিয়ালদের তাৎক্ষণিক রচনা শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য ও বাক্‌বৈদগ্ধের পরিচয় মেলে।

এখানে প্রদত্ত টপ্পা ও জবাবগুলির অধিকাংশ কবি নকুলেশ্বর সরকার ও হরিচরণ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিছু ক্ষেত্রে টপ্পা পাওয়া গেছে, কিন্তু বিপক্ষ কবিয়ালকৃত জবাব পাওয়া যায় নি; আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষ কবিয়ালকৃত টপ্পার জবাব এঁদের কাছে পেয়েছি, কিন্তু টপ্পাগুলি পাই নি। কোন কোন ক্ষেত্রে টপ্পা-জবাব দুটোই পাওয়া গেছে। বলাবহুল্য, এসব টপ্পা-জবাবের সঙ্গে বহু নামী কবিয়াল জড়িত আছেন। ]

## সন্দীপন বনাম শ্রীকৃষ্ণ

সন্দীপন ( প্রশ্ন )—আমি সন্দিপন নাম ধরি রই অবন্তীনগর।
আমার বিদ্যা বৈ আর নাই বৈভব, টোলেতে আছে ছাত্রসব,
প্রধান ছাত্র তুই কেশব, সব গুণের আধার ॥
ও তোর চন্দ্রবদন দর্শন করে, দুরন্ত সন্তানের শোক ভুলে রই;
শ্রীকৃষ্ণরে আমি তোর, বিদ্যাশিক্ষার গুরু হই।
করলি চৌষট্টি দিন টোলে বাস, চৌষট্টি বিদ্যা অভ্যাস,
বিদ্যাতে হলি জগৎজয়ী।
আমার মরা পুত্র বাঁচাইলি—
বল দেখি, এ বিদ্যা তুই শিখলি কই?

শ্রীকৃষ্ণ (জবাব)—তোমার নিজ ভাগ্য ফলেই মরা পুত্রের প্রাণ ফিরে পেয়েছ।

সন্দীপন (প্রশ্ন)—বললে, তোমার ভাগ্যে পেলে ছেলে, গুরু মহাশয়,
আমার পুত্র ম'ল বহুদিন, সৌভাগ্য হল না এদ্দিন,
তুই এলি আর ফিরল দিন, আশ্চর্যের বিষয় ॥

যদি আমার গুণে পুত্র পেলেম,—
তবে তুই দক্ষিণা দিলি কি ?
শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না আমার সঙ্গে চালাকি।
আর শিখলি বিদ্যা দিনকানা, দিলি কি তার দক্ষিণা,
সে বিদ্যায় কার্য হবে কি।
আমার মরা পুত্রের প্রাণ দান করে—
তুই দক্ষিণা দিলি কি ?
শ্রীকৃষ্ণ (জবাব)—তোমার নিজ গুণেই মরা পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছ,
আমার কোন কৃতিত্ব নেই।
সন্দীপন (প্রশ্ন)—তুমি বললে আমার গুণে মরা পুত্র বাঁচালে।
যে দিন বিষবারি করিয়ে পান, গোকুলে রাখালের যায় প্রাণ,
মরা দেহে পেল প্রাণ, কার কৃপাবলে ?
আবার বৃন্দাবনে কার গুণেতে, কৃষ্ণ রে খেয়েছিলি দাবাগুন ;
শ্রীকৃষ্ণ রে, তোর মধ্যে আছে কোন্ দৈবগুণ ?
ধরে বাম করেতে গোবর্ধন, রক্ষা করলি বৃন্দাবন,
ইন্দ্রের মুখেতে কালিচুন।
আবার অস্ত্র ছাড়া শুধু হাতে—
মথুরায় রজকেরে করলি খুন ॥
শ্রীকৃষ্ণ (জবাব)—তুমি ত্রিজগতের গুরু, আমারও গুরু, ব্রহ্মাণ্ডের গোঁসাই।
সন্দীপন (প্রশ্ন)—বললে, ত্রিজগতের পালক আমি ব্রহ্মাণ্ডের গোঁসাই।
ও তুই হোস বাঞ্ছাকল্পতরু, তুই তো এই জগতের গুরু,
আমারে কেন কইস গুরু, ত্রিভঙ্গ কানাই ॥
ও তুই নিজে যদি জগদ্‌গুরু, কৃষ্ণ রে তোর বা গুরুর কার্য কি ?
শ্রীকৃষ্ণ রে করিস না, আমার সঙ্গে চালাকি।
ও তুই আপনি যদি নারায়ণ, ভাগ্যে পেলেম দরশন,
ধনপুত্রে কার্য আছে কি।
তবে দান কর ঐ অভয় চরণ, আমি বক্ষের ধন বক্ষে রাখি ॥
( এই টপ্পাটি হরিচরণ আচার্য রচিত বলে প্রকাশ )

## জগা—গৌরাঙ্গ

প্রশ্ন ঃ—আমি নগর কোটাল জগা আমার হস্তেতে অসি।
তুমি ছিলে ব্রজেন্দ্র নন্দন,
গৌর রূপ করেছ ধারণ,
মজায়েছ বৃন্দাবন—বাজায়ে বাঁশী ॥

তোমার বাঁশী আর এই অসির মধ্যে—
কও দেখি কি পার্থক্য শুনতে চাই।
বাঁশী না অসি বড়, বল হে শ্রীশচীর নিমাই ॥
আমরা করেতে ধরে অসি, দুষ্ট জনে বিনাশি,
শিষ্টরে আসনে বসাই।
কেবল পরনারী করতে চুরি—
তোমার এই বাঁশের বাঁশীর জুড়ি নাই ॥
জবাব—তোর ঐ অসি আর এই বাঁশীর তত্ত্ব শোন রে জগা শোন।
তোর ঐ সর্বনাশা অসিতে, পারে এই বিশ্ব নাশিতে,
মধুর প্রেম সাগরে ভাসিতে—বাঁশীর প্রয়োজন ॥
জানি মুক্তকেশী ধরে অসি,
অসংখ্য দৈত্যদানব করে ক্ষয়।
ছুটায় রক্তের প্রস্রবণ, কি ভীষণ বিভীষিকাময় ॥
শুনলে মধুমাখা বাঁশীর গান, দ্রব হয় কঠিন পাষাণ,
ভক্তের প্রাণ আকুল করে লয়।
যত সাধকের হয় সাধন সিদ্ধি—
প্রেমিকের প্রেম যমুনায় উজান বয় ॥
অসিতে হিংসা জাগে—বাঁশীতে জাগে প্রেম প্রণয় ॥
প্রশ্ন ঃ—নাকি অসি হতে বাঁশী শ্রেষ্ঠ শ্যাম কালশশী।
যেদিন আয়ান ভয়ে কৃষ্ণকালী, সাজিলে বনমালী,
সেদিন কেন বাঁশী ফেলি—ধরিলে অসি ॥
যেদিন মাধা মেরে কাঁধার বাড়ি—
নিতাইকে করেছিল নির্যাতন;
বাঁশী না ধরে কেন, ধরিলে চক্র সুদর্শন ?
যেদিন কুরুবংশ করতে নাশ, পাণ্ডবের হও ক্রীতদাস,
না করে বাঁশরী বাদন;
সেদিন পাণ্ডবেরে কৌশল করে—
শিখালে অসি ধরা কি কারণ ?

## রূপ গোস্বামী—সনাতন

প্রশ্ন ঃ—তুমি রূপ গোস্বামী আমি তোমার দাদা সনাতন।
একটি কথা শুনে ব্যথা পাই, তাইতে এসেছি তোমার ঠাঁই,
আমার কাছে শুনতে চাই—সত্য বিবরণ ॥

মোদের ভাই-এর বেটা জীব গোস্বামী—
সে তোমার মন্ত্র শিষ্য হয় একজন ;
জ্ঞানে গুণে পাণ্ডিত্যে, কে আছে শ্রীজীবের মতন।
ও তার গুরু চিন্তা গুরু জ্ঞান, গুরু অনুগত প্রাণ,
গুরুর ধ্যান করে সর্বক্ষণ ;
তুমি তার উপরে ক্রোধ করে—কি জন্য দেখতে চাও না তার বদন ?
জবাব—কেন জীব গোস্বামীর মুখ দেখি না কই তোমার কাছে।
আছে বৈষ্ণব ধর্মে যে বিধান, জীব তাহা করে দিল ম্লান,
জাতি বিদ্যার অভিমান—এখনো আছে ॥
আমায় তর্ক যুদ্ধে জয় করিতে—
আসিল নামে পণ্ডিত দিগ্বিজয় ;
তর্ক না করে মাত্র, জয়পত্র লিখে দিলেম তায়।
জীব গোস্বামী তাই শুনে, পন্ডিতকে ডেকে এনে,
তর্কে তায় করলো পরাজয়।
ও সেই মানী লোকের মান মেরেছে—
দাম্ভিকের মুখ দেখা কর্তব্য নয় ॥
প্রশ্ন—বললে, জীব গোস্বামী মানী লোকের মান্য মেরেছে।
যে জন তোমার করে মান হানি, সে আবার কি রকম মানী,
জীব তারে ডেকে আনি—জব্দ করেছে ॥
তুমি তর্ক ছেড়ে নির্বিচারে—
জয়পত্র লিখে দিয়েছ যাঁরে ;
রূপ গোস্বামী মানে হার—
এ প্রচার কোন জ্ঞানে করে ?
মোদের গুরু গৌরাঙ্গ ঠাকুর, দর্পীর দর্প করতে চুর,
কাশ্মীরীর শ্লোকে ভুল ধরে ;
জীব তো সেই আদর্শে কাজ করেছে—
কি বুঝে গুরুদন্ড দাও তারে ?
জবাব—বললে, কাশ্মীরী পরাস্ত করে গৌরাঙ্গ রতন।
ও সে শ্রীগৌরাঙ্গ যে সময়, কাশ্মীরী করে পরাজয়,
নিমাই তখন বৈষ্ণব নয়—পণ্ডিত হয় একজন ॥
কিন্তু জীব গোস্বামী বৈষ্ণব হয়ে—
দেখাল পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি ;
বৈষ্ণবের এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে নারি।

করে নিজকে তৃণ সমজ্ঞান, অমানীরে দিয়ে মান,
আমি যার মান রক্ষা করি।
কেন তর্কের দ্বারায় তারে হারায়—
করতে চায় খোদের উপর খোদকারী ?
গুরুর দেওয়া জরপত্রের অপমান করেছে ভারী ॥

### ভক্তদাস—সর্বেশ্বর তর্কভারতী

প্রশ্ন ঃ—ঠাকুর চণ্ডিদাসের শিষ্য, আমি নামটি ভক্তদাস।
তুমি নান্নুরের সমাজপতি, সর্বেশ্বর তর্কভারতী,
রাধাকৃষ্ণ মুরতি, পূজ বারমাস ॥
হেথায় বাশুলী দেবীর মন্দিরে—
চণ্ডিদাস পেয়েছিলেন পূজার ভার ;
রজকিনী রামিনী, সেই পূজার ষোড়শ উপাচার।
পেয়ে নিত্যাদেবীর প্রত্যাদেশ, ব্রজরসের ভাবাবেশ,
চণ্ডিদাস করতেছেন প্রচার।
তুমি জাত বিচারে হয়ে অন্ধ—
আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার ?
জবাব—আমি চণ্ডিদাসের সমাজ বন্ধ করি কি কারণ ?
ও সে হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের বেদাচার ফেলে,
অসতের সঙ্গে মিলে হয়েছে পতন ॥
ও সে রামিনী ধোপানীর সনে—
করেছে অবৈধ প্রেম সম্বন্ধ,
তার এই অবৈধ কাজে সমাজে সবে কয় মন্দ ॥
ছেড়ে মন্ত্রতন্ত্র গায়ত্রী, নিয়ে সেই আশ্রয়পাত্রী,
দিন রাত্রি করে আনন্দ।
অদ্য নষ্ট করতে সেই ব্যভিচার
আমি তার করেছি সমাজ বন্ধ ॥
প্রশ্ন ঃ—বললে, ধোপানীর অবৈধ প্রেমে মজে চণ্ডিদাস।
ঠাকুর চণ্ডিদাস যে প্রেম করে,
ডুবেছে প্রেমের আকরে,
বেদ বিধির পরপারে—সে প্রেমের নিবাস ॥
শুনি পরকীয়া প্রেমের তরে—
শ্রীকৃষ্ণ মনে করে অভীষ্ট ;
রাইকে বনে আসিতে, বাঁশীতে করে আকৃষ্ট।

যদি হরণ করে পরদার, কৃষ্ণের না হয় ব্যভিচার,
সে তোমার সাধনার ইষ্ট ;
তবে চণ্ডিদাস আর রজকিনী, কও শুনি—
কোন বিচারে নিকৃষ্ট ?

### নারদ-বশিষ্ঠ

প্রশ্ন ঃ—আমি নামান্বেষী নারদ ঋষি ভ্রমি ত্রিভুবন।
তুমি গুণে কর্মে বিশিষ্ট,
নাম তোমার মুনি বশিষ্ঠ,
লিখেছ যোগবাশিষ্ট—শ্রেষ্ঠ রামায়ণ ॥
নাকি স্ত্রী শূদ্র দ্বীজবন্ধুনাং—
তাদের নাই বেদবেদান্তে অধিকার ;
এই বলে লোকসমাজে কি বুঝে করিলে প্রচার।
নাকি এক বিষ্ণু চতুরাংশে,
এসেছেন সূর্য বংশে—রাম কিসে পূর্ণ অবতার।
আবার শম্বুক শূদ্রের মাথা কেটে—
রাম তোমার কোন ধর্ম করলেন প্রচার ?
জবাব—শূদ্রে যোগতপস্যা করলে ধর্মের হানি হয়।
প্রশ্ন ঃ—বললে, শূদ্রে করলে যোগ তপস্যা ধর্মের হয় হানি।
জানি গুণ কর্মে জাতি নির্ণয়,
একথা গীতা শাস্ত্রে কয়,
তবে শূদ্র কিসে ক্ষুদ্র হয়—আগে কও শুনি ॥
জানি শূদ্র সিন্ধু হত্যা করে—
দশরথ ঠেকল ব্রহ্ম হত্যার দায় ;
বৈশ্য সুতকে করে নাশ—বলরাম তীর্থে পাপ ঘুচায়।
যদি একটাকা চার ভাগ করে,
ভাগে এক সিকি পড়ে,
চার সিকি এক মূল্যে বিকায়।
কেন ভরত লক্ষ্মণ বাদ পড়িল—
একা কেন রামের নামে পাতক যায় ?

### অর্জুন—শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্ন ঃ—আমি কল্পনাতে অর্জুন, তুমি সখা শ্যামরায়।
তুমি আমার এই রথের গতি, সুপথে নিবে শ্রীপতি,
তাই ভাবিয়ে সারথী—করেছি তোমায় ॥

অদ্য কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে—
সসৈন্যে সেজে এল দুর্যোধন।
দুই পক্ষের সৈন্য দেখে,
আজ আমার কেঁদে উঠল মন।
আমার গুরু ভীষ্ম দ্রোণ,
আত্মবন্ধু ভ্রাতৃগণ—এই যুদ্ধে করল আগমন।
তুচ্ছ রাজ্যের তরে কেন মোরে—
এই যুদ্ধে প্রেরণা দাও নারায়ণ?
জবাব—বললে, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কেন যুদ্ধ করতে কও?
জানি পাণ্ডু রাজার এই রাজ্য,
ভোগ দখল তোমাদের কার্য,
থাকিতে শৌর্য বীর্য—যুদ্ধকে ভয় পাও?
জানি জননী আর আর জন্মভূমি—
তার চেয়ে স্বর্গ বেশী বড় না;
পিতৃরাজ্য সুমহান, তুচ্ছ জ্ঞান করতে পার না।
তোমার পিতৃরাজ্য করে ছল,
যারা করে ভোগ দখল—আত্মীয় মনে করো না।
তোমার জন্মভূমি উদ্ধারার্থে—
দিতেছি যুদ্ধ করতে প্রেরণা ॥

## হনুমান—শ্রীরাম

প্রশ্ন ঃ—আমি কবির ভাবে বীর হনুমান পবন নন্দন।
আমি রামের ভক্ত রামের দাস,
সর্বদা রাম নামে বিশ্বাস,
সদা মনের সুখে করি বাস—রামকদলী বন ॥
তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিতে—
এসেছি অন্তরে হয়ে সুখী;
তত্ত্ব খুলে আমাকে বল, আজ রাম কমলাঁখি।
শুনি দিনে শিবা রাত্রে কাক, গাভীর কোলে বৎসের ডাক,
রাজ্যে কেন অমঙ্গল দেখি?
কেন বাম ভাগেতে সোনার সীতা—
কোথায় মা লক্ষ্মী সীতা জানকী?
জবাব—আমি প্রজার মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে বনবাস দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ—তুমি সীতা দিলে বনবাসে বললে রঘুবর।
সীতার গর্ভ ছিল পঞ্চমাস, গর্ভ নাশেতে সর্বনাশ,
না হয় সীতা দিতে বনবাস, প্রসব হওয়ার পর ॥
সে ত রাম ভিন্ন অন্য জানে না—
তবে কেন বনে দিলে রঘুরায় ;
সীতাকে আন দেশে, রামচন্দ্র ধরি তোমার পায়।
সীতা ছিল সতী সৎ, সাক্ষী দিল দশরথ,
শেষে রাম আনলে অযোধ্যায়।
আবার সেই সীতাকে বনে দিতে
এই যুক্তি দিল তোমার কোন বাবায় ?
জবাব—আমি সীতার অভাবে যজ্ঞস্থলে সোনার সীতা স্থাপন করেছি।
প্রশ্ন ঃ—তোমার ঘরে মাতা সাত শত, নিরামিশ অবিরত,
খেয়ে হয়েছে মৃতবৎ।
যদি সোনার সীতায় যজ্ঞ চলে—
বানাও রাম সোনার একটা দশরথ ॥
জবাব—শাস্ত্রে কুশপুত্তলের ব্যবস্থা আছে।
প্রশ্ন—আমরা শুনি নাই আর এ সংসারে,
কে করে শব থাকিতে কুশপুত্তল।

## সদানন্দ—সোনার গৌরাঙ্গবাড়ির পূজারী

প্রশ্ন ঃ—আমি সদানন্দ পরিব্রাজক, ভ্রমি দেশ বিদেশ।
এলেম সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ি, তুমি মন্দিরের পূজারী,
তোমাকে প্রশ্ন করি, বলো সবিশেষ ॥
শুনি গৌর সেজে দীনভিখারী—
জয় করেন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ।
ত্যাগ মন্ত্রে নিয়ে দীক্ষা, শিক্ষা দেন ত্যাগের প্রসঙ্গ ॥
তিনি দেখতেন না বিষয়ীর মুখ,
ত্যাগ করিয়ে বিষয় সুখ, নিয়েছেন দণ্ড করঙ্গ।
তাঁর সেই ত্যাগের মূর্তির পরিবর্তে—
তোমরা কেন বানাও সোনার গৌরাঙ্গ ?
জবাব—গৌর দেখত না বিষয়ীর বদন—এ ধারণা ভুল।
কেবল সোনা রূপা বিষয় নয়,
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়,
সেই বিষয়ই বিষময়—সর্বনাশের মূল ॥

দয়াল গৌরাঙ্গ যে পরতত্ত্ব—
সে জ্ঞানে আমরা করি না সাধন,
শচী মা'র বাৎসল্য ভাব, সেই স্বভাব করেছি গ্রহণ।
বলতো শচীমাতা অনিবার, সোনার গৌরাঙ্গ আমার,
এই জ্ঞানে করিত যতন।
আমরা সোনার গৌরাঙ্গ বানায়ে—
করেছি শচী মা'র অনুকরণ॥

প্রশ্ন ঃ—বললে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয় বিষের সমতুল।
এই যে দর্শন স্পর্শন শ্রবনে, কীর্তনে রসাস্বাদনে,
ঐ পঞ্চ বিষয় বিনে—সব সাধনা ভুল॥
পূজ বাৎসল্যে সোনার গৌরাঙ্গ—
যেভাবে চাইত তারে শচীমায়,
শচীর সে সেবার সনে—তোমাদের তুলনা কোথায় ?
শচী মা পায়ের ধূলি, স্বহস্তে নিজে তুলি,
দিত যে গৌরাঙ্গের মাথায়।
তোমরা বাৎসল্যের পূজারী হলে—
কোন জ্ঞানে পুষ্পাঞ্জলি দাও তার পায় ?

## দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী—ভক্তিবিনোদ সরস্বতী

প্রশ্ন ঃ—আমি দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী কাব্যগীতিকায়।
তুমি ভক্তিবিনোদ সরস্বতী, গৌড়ীয় মঠে বসতি,
গৌরচরিত প্রভৃতি, বলে দাও আমায়॥
তোমায় গৌর যদি নন্দের নন্দন—
কলিতে শচীর গর্ভে জন্ম পায় ;
কৃষ্ণ ছিলেন রাধার দাস—
গৌর কেন প্রিয়াকে কাঁদায় ?
করতে সমাজের কল্যাণ, যুগে যুগে ভগবান,
অবতার হয়ে আসে যায়।
তোমার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে—
জীবেরে কি কি বস্তু দিয়ে যায় ?

জবাব—তুমি দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী সুবিজ্ঞ পণ্ডিত।
থাকলে অহমিকার পরশন,পায় না সে লীলা দরশন,
সরলপ্রাণা হয় যে জন, বুঝে সে চরিত॥

বললে গৌর কেন বৌকে ফেলে—
কও শুনি হরি বলে যায় চলে ?
ত্যাগ না থাকলে ভোগের জয়—
হয় না তাই ভাগবতে বলে।
সর্ব ধর্মের সার মর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম,
গৌর তার আদর্শ নিলে ;
জীবের ভবের ক্ষুধা নাশ করিতে,
দিয়েছে নাম সহিতে প্রেম ফলে ॥

## জগদানন্দ—শ্রীচৈতন্য

প্রশ্ন ঃ—আমি জ্ঞানান্ধ জগদানন্দ আছি উড়িষ্যায়।
তুমি সার্বভৌমের অতিথি, অঙ্গে তপ্ত স্বর্ণের জ্যোতি,
কি নাম কোথায় বসতি—কিবা সম্প্রদায় ॥
তুমি আত্মারাম শ্লোকের ভিতরে—
দেখালে একাদশটি তত্ত্বের মূল,
কি সে একাদশ তত্ত্ব—
শুনিতে চিত্ত হয় ব্যাকুল ॥
শুনি ভক্ত শ্রীরূপের ঘরে, তালপাতায় কি শ্লোক পড়ে,
কার ভাবে কেঁদে হও আকুল।
আবার সার্বভৌম পরাস্ত কর—
বেদান্তের কোন্ সিদ্ধান্তে ধরে ভুল ॥
জবাব—আমি সার্বভৌম পণ্ডিতের ঘরে অতিথি নিমাই।
পণ্ডিত আত্মারাম এক শ্লোক পড়ে, যখনে শুনায় আমারে,
আমি একাদশটি পদ ধরে—ভাবার্থ শুনাই ॥
আত্মা রাম মুনি নিগ্রন্থা উরু এম, মিথম্ভুত—
হেতু ভক্তি গুণ হরি ;
কুর্বন্তী পরস্মৈপদ—এই একাদশ অর্থ করি।
দেখলেম রূপের লেখা তালপাতায়,
কৃষ্ণ বিরহ ব্যথায়, যে আক্ষেপ করেন কিশোরী।
ব্রহ্মের নাই আকার নিরাকার বলে—
এই অর্থে সার্বভৌমের ভুল ধরি ॥
নির্ণয় নাস্তি নিরাকার—বেদান্তে সিদ্ধান্ত হেরি ॥
প্রশ্ন ঃ—বললে, নামটি তোমার গৌরহরি শ্রীশচীর নন্দন।
তবে এত অল্প বয়সে, মন কেন দিলে সন্ন্যাসে,

বল ভোগ ছেড়ে ত্যাগীর বেশে সাজলে কি কারণ ?
তোমার আত্মারামের কি কি অর্থ,
সার্বভৌম ভক্তিতে করে শ্রবণ ;
ত্যাগ করিয়ে ব্রহ্মবাদ, ভক্তিবাদ করিলেন গ্রহণ।
আর রূপের ঘরে তালপাতা, বললে কি ছাতামাথা,
মূল কথা রয়েছে গোপন।
বেদের কোন সিদ্ধান্তের ভুল দেখায়ে—
ভুলালে বৈদান্তিক পণ্ডিতের মন ?

**পদ্মাবতী—জয়দেব বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ**

প্রশ্ন ঃ—আমি কল্পনাতে পদ্মাবতী, কেন্দুবিল্বে ধাম।
তুমি ভক্ত জয়দেব গোস্বামী, আমারই হৃদয়ের স্বামী,
তোমার সেবাতে আমি—নিযুক্ত হলাম ॥
প্রভু আজ তোমার ভজনের কালে—
মন্দিরে মাধব মূর্ত্তির দিকে চাই ;
তোমার সাথে লাড়ে মুখ এ কৌতুক—
আর তো দেখি নাই।
দিয়ে আমার দুই নয়নের জল,
ধোয়াই তোমার চরণ তল,
প্রতিদিন কেশ দিয়ে মুছাই।
তোমার চরণতলে আঁকাবাঁকা—
আজ এসব কিসের রেখা দেখতে পাই।
জবাব—তুমি পদ্মাবতী সতী আমি কৃষ্ণগুণাধার।
অদ্য ধরে তোমার পতির সাজ,
তোমার মন্দিরে এলেম আজ,
সাধিতে এক মহৎ কাজ, উদ্দেশ্য আমার ॥
জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখতে গিয়ে—
তার মনের ভাব হল অন্য রকম ;
রাধা আমার আরাধা
না বুঝে ঘটায় ব্যতিক্রম ॥
রাধার পাও কৃষ্ণের শিরে,
জয়দেব লিখিতে নারে,
এলো তার সেব্য সেবক ভ্রম।
আমি কলম ধরে পুরাইলাম—
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ॥

প্রশ্ন—নাকি মহৎ কাজ করিতে এলে বললে আমাকে।
কেন রাধারানী করে মান, কেন পায় ধরো কালাচাঁদ,
ভালো লোকে কাটা কান, চুল দিয়ে ঢাকে ॥
কোন মহৎ কাজে মহীমাঝে—
কেউ কভু কপট সাজে করে না ;
তুলসীর গুঁতায় হও পুতা—
সেকথা মনে পড়ে না।
হরণ করা পরদার, চিরদিনের স্বভাব যার,
সে তাহা ভুলতে পারে না।
যদি কুত্তারে দেয় যজ্ঞের চরু—
তবু সে বিষ্ঠা পেলে ছাড়ে না ॥

## অধর—গৌরাঙ্গ

প্রশ্ন—অদ্য আমি অধর তুমি আমার গৌরাঙ্গ ঠাকুর।
তুমি কোন গুরুর উপদেশে, ক্ষুর দিয়ে সেই চাঁচর কেশে,
সেজে এসেছ কাঙাল বেশে, শ্রীধাম শান্তিপুর।
কেন সংসারেতে মন বসে না—
ত্যাগ করে এলে নিজের ঘরবাড়ি ;
হিয়ার ধন বিষ্ণুপ্রিয়া—কেন তার বুকে দাও ছুরি ?
ভবে কে আছে এমন কঠিন, কোমল অঙ্গে ডোর কৌপীন,
দিয়ে আজ সাজায় ভিখারী।
তুমি কার যুক্তিতে এই কলিতে, সাজিলে দণ্ড কমণ্ডলুধারী ?

জবাব—শুনলেম শ্রীঅধরের অধরে অদ্য বাক্য সুমধুর।
আমি পেয়ে গুরুর উপদেশ, মুড়ালেম মাথার চাঁচর কেশ,
সেজে এলেম কাঙাল বেশ—শান্তির শান্তিপুর ॥
আমি ত্যজলেম নারী, ত্যজলেম বাড়ি,
হব সদাচারী ব্রজবাসী ;
শুন শ্রীধর মনে কয় অধরচাঁদ ভালবাসি ॥
আমি গিয়েছিলেম কাটোয়ায়, ধরিলেম ভারতীর পায়,
মন হল দেশের বিদ্বেষী।
তাইতে ডোর কৌপীন পরায়ে মোরে,
ভারতী সাজায়েছে সন্ন্যাসী ॥

## মীরাবাঈ—রূপ গোস্বামী

প্রশ্ন—আমি নগণ্য জঘন্য মীরা সকলে জানে।
রত্নপ্রসূতা ভারতভূমি, তার একটি সার রত্ন তুমি,
ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনে ॥
তুমি ব্রজবাসী, তাইতে আসি, করিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমভিক্ষা;
রাধা কি আর কৃষ্ণ কি—
কও শুনি স্বরূপের ব্যাখ্যা।
আর গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে, পার্থক্য কি এই ভবে,
কি স্বার্থে জীবে লয় দীক্ষা,
কেন আমায় দেখে মুখ ফিরালে—
করে এই দাসীর প্রণাম উপেক্ষা?
জবাব—তুমি রাণা কুম্ভের মহারাণী নামটি মীরাবাঈ।
লোকে আমায় কয় ভক্ত শ্রীরূপ, জানি না স্বরূপ যে কিরূপ,
তাইতে রাই শ্যামের যুগল আরোপ—করে কাল কাটাই ॥
জানি শ্যাম স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—
মহাভাবস্বরূপিণী হল রাই;
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে, পাঁচ ভাবে— এক স্বরূপ ধেয়াই ॥
দেহে থাকলে পুরুষ অভিমান, বৃন্দাবনে হয় না স্থান,
তাই আমি নারী হতে চাই।
কিন্তু মনকে নারী করতে নারি—
সেই দুঃখে নারী দেখে মুখ ফিরাই ॥
প্রশ্ন—বললে, কৃষ্ণ বৈষ্ণব অভেদত্ব, ভিন্ন স্বরূপ নয়।
যেদিন যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে, শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে দ্বারে,
কেন বৈষ্ণব ভোজনের তরে—
বৈষ্ণব আনতে কয়?
শুনি ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ—
যখনে গুরুর কাছে মন্ত্র লও;
গোপীর স্বভাব করতে লাভ,
ভেক নিয়ে জাত বৈরাগী হও।
যদি সেজে বৈষ্ণব আকৃতি, মন না হয়ে প্রকৃতি,
এখনো পুরুষ মানুষ রও;
ওসব লেংটী পুংটী খুলে ফেল—
শুধু কেন গাধায় চিনির বোঝা বও?

জবাব—বললে, কৃষ্ণ থাকতে বৈষ্ণব আনতে কৃষ্ণ কেন কয় ?
ছিল যুধিষ্ঠিরের জাত বিচার, ঘুচাতে জাতিত্বের বিকার,
রুইদাসকে এনে তার—অভিমান ঘুচায় ॥
বললে, ডোর কৌপীন প্রকৃতির ভূষণ—
একথা কেমন করে স্বীকার পাই ;
মাকালের ফল বাহির লাল, ভিতরে তাহার কাল ছাই।
কীর্তনীয়া হরিদাস, কৌপ্ণী পরতো বারমাস,
মন নারী করতে পারে নাই।
নইলে নারীর হাতে ভিক্ষা নিতে—
তারে কি ত্যাগ করতেন গৌর গোঁসাই ?
প্রশ্ন—বললে, যুধিষ্ঠিরের জাত ঘুচাতে বৈষ্ণব আনতে হয়।
এই যে জাতাজাতির সংস্কার, সবই তো কৃষ্ণের আবিষ্কার,
বর্ণাশ্রমে পরিষ্কার—তাহার প্রমাণ রয় ॥
গৌর হরিদাস ত্যজেছে বলে—
দিও না ডোর কৌপীনের অপবাদ ;
মেয়ের হাতে ভিক্ষার দায়—
গৌরাঙ্গে তারে দেয় নাই বাদ।
যারা গৌরাঙ্গ সেবার তরে, ভিক্ষা দিল তার করে,
অপূর্ণ রেখে তাদের সাধ ;
বেটা সেই ভিক্ষার চাউল বদল করে—
করেছে সেবাবাদের অপরাধ ॥

## বালি—শ্রীরাম

প্রশ্ন—আমি কবির ভাবে বালি রাজা, কিষ্কিন্ধায় নিবাস।
যত মানব দানব সমুদয়, সকলে আমায় করে ভয়,
আমি করেছিলমে দিগ্বিজয়—এখন সর্বনাশ ॥
আমার দম্ভে লম্ফে ভূমিকম্পে, ধরাকে করি সরা জ্ঞান,
সুগ্রীবের সঙ্গে এসে, কি দোষে বধলে আমার প্রাণ ?
তোমার তনু দেখি মনোহর, করে ধরা ধনুঃশর,
জটা আর বাকল পরিধান।
থেকে বৃক্ষের আড়ে কিসের তরে—
আমারে মারলে তুমি চোরা বাণ ?
জবাব—আমি দশরথের পুত্র রাম,
মিতা সুগ্রীবের সাহাযার্থে তোমায় বাণ মেরেছি।

প্রশ্ন—রাজা দশরথের পুত্র তুমি নাম ধর শ্রীরাম ॥
তোমার পিতৃ সত্য পালনে, এসেছ গহণ কাননে,
সত্য করলে সুগ্রীবের সনে, তাইতে আমায় বাম ॥
তুই যে সূর্য বংশে জন্ম নিলি, এই কথা বিশ্বাস করি কিরূপে ;
বধলে আমায় সত্যের দায়, এই কথা শুনে প্রাণ কাঁপে ॥
আর ত্যজ্য করে গৃহবাস, সত্যের কারণ বনবাস,
বেশ কীর্তি রাখলে রামরূপে।
এই যে বিনা দোষে বানর মারতে—
এই সত্য করাল তোর কোন্ বাপে ?

## বৈশম্পায়ন—দ্বৈপায়ন ব্যাস

প্রশ্ন—আমি তোমার শিষ্য বৈশম্পায়ন, তুমি দ্বৈপায়ন।
তুমি নির্ণয় করে বেদের ব্যাস, উপাধি পেলে বেদব্যাস,
সদভ্যাস কি বদভ্যাস—জানেন নারায়ণ ॥
নাকি কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—ভাগবতে তুমি করেছ লিখন ;
স্বয়ং হলে কেন তার—জরার শর খেয়ে হয় মরণ ?
আর হরিতে অধর্মের ভার, ভগবান দশ অবতার,
করিতে ধর্মসংস্থাপন।
তবে সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম—
সে যুগে পাঁচ অবতার কি কারণ ?
মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ আর বটু বামন ॥
জবাব—বললে, স্বয়ং হলে জরার শরে কেন হয় পতন ?
করতে ইন্দ্রে মুক্ত রঘুবর, বালিকে মারি চোরা শর,
অঙ্গদেরে রামের বর—এই শরের কারণ ॥
জানি সত্য যুগে নাই অধর্ম—
তবু চাই ধর্মচর্চার প্রচলন ;
হয়ে পঞ্চ অবতার, করেন তার সত্যানুশীলন।
যথা মীনরূপে সত্যব্রতে, কূর্ম মন্দর বহিতে,
বরাহে ধরিত্রী ধারণ।
করেন নৃসিংহে কৈশিপু তারণ—
সুতলে বলির দ্বারী হন বামন ॥
প্রশ্ন—বললে, রামের বরে জরার শরে ভগবান পড়ে।
যিনি নিত্য শুদ্ধ সর্বেশ্বর, অপ্রাকৃত যার কলেবর,
প্রাকৃত এই জরার শর—বিঁধল কি করে ?

বললে সত্যে পঞ্চ অবতারে—
ভগবান ধর্মানুশীলন করে ;
কোন ধর্মের অনুশীলন, করিলেন তুলসীর ঘরে ?

**শুক্রাচার্য—শ্রীকৃষ্ণ**

প্রশ্ন—আমি দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য, তুমি ভগবান।
শুনি যক্ষ রক্ষ কিন্নরে, দেবদানব গন্ধর্ব নরে,
নাকি তোমার সাধনা করে—প্রাপ্ত হয় নির্বাণ ॥
অদ্য সমুদ্র মন্থন করিল—
দেবাসুর হয়ে সমান অংশীদার ;
সুধা বণ্টন করিতে—তোমার পর দেয় মধ্যস্থভার।
তুমি ধরিয়ে মোহিনীর ভান, দেবে করাও সুধা পান,
দৈত্যেরে মারো আঁখি ঠার।
তোমার দেবতা এত প্রিয় কিসে—
কোন্ দোষে দৈত্যের প্রতি অবিচার ?
জবাব—দৈত্যে কেন পায় না সুধা শোন তপোধন।
ওরা চায় না এ তুচ্ছ সুধা, অন্তরে লালসার ক্ষুধা,
সুধা ভুলে চায় সদা—আমারই বদন ॥
আমার দেবের চেয়ে দৈত্য ভাল—
তবে তার দোষ রয়েছে একস্থানে ;
সাধন করে নিলে বর—
বর্বর সাজায় ভগবানে ॥
আমি আগে করে দেই মানা, স্বর্গের আশা করো না,
ভূস্বর্গ গড়াও সাধনে।
আমার বাক্য নষ্ট, দিয়ে কষ্ট—
বসতে চায় স্বর্গের শ্রেষ্ঠ আসনে ॥
প্রশ্ন—বললে, কামে অন্ধ দৈত্যবৃন্দ তাইতে করো ছল।
তবে কোন প্রেমেতে শশাঙ্ক, অঙ্গেতে ধরেন মৃগাঙ্ক,
ইন্দ্রের অঙ্গে ভগাঙ্গ—কাম না প্রেমের ফল ?
ক'রে কৌশিপুর বনিতা হরণ, দেবরাজ ইন্দ্র করে পাপাচার,
তারে ধ্বংস না করে, কেন হও নৃসিংহাবতার ?
আবার বলি রাজার কোন পাপে,
সাজিয়ে বামনরূপে, তার দাও পাতালে আগার।
আবার বজ্ররূপে চুপে চুপে,
কোন পাপে বৃত্রাসুরে করো সংহার ?

## চণ্ডীদাস—বিশালাক্ষী

প্রশ্ন—তুমি বিশালাক্ষী মহামায়া, আমি চন্ডীদাস।
করতে তোমার পূজা সমাধান,
করিতে গেলাম গঙ্গাস্নান,
একটি ফুল ভেসে এসে উজান—লাগল আমার পাশ ॥
দিয়ে বুকের রক্ত শ্বেত জবাকে—
লাল করে দিয়েছিলেম চরণে ;
পাষাণ কন্যা ঈশানী—কথা কইস না আমার সনে।
আমার মনে হল অভিপ্রায়, এই ফুল দিব তোমার পায়,
নিষেধ করিস কি কারণে ?
কেন মস্তকেতে দিতে বলিস—
এ জবার জন্ম হল কোন খানে ?
জবাব—এই পদ্মের জন্ম হয়েছে প্রেম-সরোবরে।
প্রশ্ন—বললে, এই পদ্মের হয়েছে জন্ম প্রেম-সরোবরে।
যদি ফুলের নামটি হয় রাধা, চরণে দিতে কি বাধা,
জানি উভয় শক্তি নয় দ্বিধা—এই চরাচরে ॥
ধরে তিন বর্ণ এই রাধাপদ্ম—
জন্মিল নিত্যময় সে ব্রজধাম ;
কোন রং-এ ঠাকুর কৃষ্ণ, কোন রং-এ ঠাকুর বলরাম ?
যদি আমার পূজায় তুষ্ট রও, তুমি যদি আমার হও,
শুনে তাই তুষ্ট হইলাম।
কেন রজকিনীর কাছে যেতে বলতেছ—
বলে পুরাও মনস্কাম ॥
প্রশ্ন—বললে, রাধাপদ্মের মধু লোভে ঘুরছে অলিকুল।
আমি জানি না তো এতকাল,
একটি পদ্মের তিনটি রয় মৃণাল,
আছে তিনটি শ্বেত পীত লাল—সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল।
কোন রসিক সুজন না থাকিলে—
কি জন্য উজানে ঐ ফুল আসে ;
নিত্যধামের সত্যফুল, এল কেন প্রবর্ত্তের দেশে ?
ঐ যে রামী নাম রজকিনী, তার সনে বিকিকিনি,
করতে চাও কিবা উদ্দেশে।
আমার কিসে হবে সাধ্য সাধন—
যদি তার ভাবের সঙ্গে না মিশে ॥

## নারদ—নারায়ণ

প্রশ্ন—আমি নামান্বেষী নারদ ঋষি, তুমি নারায়ণ।
ভবে ভক্ত আর অভক্ত রয়, এই দুইয়ের কেবা শ্রেষ্ঠ হয়,
ভক্তাধীন শ্যাম রসময়—বলে কি কারণ ?
ছিল বীর সুধন্বা তোমার ভক্ত—
অর্জুনের কাটা বাণে মারা যায় ;
অভক্ত সেই শিশুপাল, সাযুজ্য মুক্তি দিলে তায়।
তোমায় দিয়ে ষোড়শ উপাচার, পূজা করিয়ে তোমার,
অকালে প্রবীর প্রাণ হারায়।
আবার বিষমাখা স্তন মুখে দিয়ে—
পুতনা মাতৃগতি কেন পায় ?
জবাব—বললে, শিশুপাল সাযুজ্য পেল—কোন্ গুণে কানাই ?
সে যে শত্রুভাবে চিরদিন, স্মরণ মননে ছিল লীন,
তাইতে আমি ভক্তাধীন—অঙ্গেতে মিশাই ॥
ভক্ত সুধন্বা যুদ্ধে মরিল—
কেবল তার আত্ম কর্তৃত্বের দ্বারায় ?
জীবন ভিক্ষা না চেয়ে—বাণ কাটার প্রার্থনা জানায়।
আমার দেওয়া চক্রবাণ, প্রবীর বীরে করে দান,
ভুলিয়ে কুহকীর মায়ায়।
আবার পুতনা পেল মাতৃগতি—
শুধু তার পূর্ব জন্মের কামনায় ॥
প্রশ্ন—বললে, বাণ কাটার প্রতিজ্ঞার জন্যে সুধন্বায় মার।
করে কাটা বাণে শক্তি দান, বধিয়ে বীর সুধন্বার প্রাণ,
রক্ষা করতে বোনাইর মান—শালার কাজ কর ॥
বললে, শত্রুভাবে গালি দিয়ে, শিশুপাল প্রাপ্ত হল মোক্ষধাম ;
গালমন্দে সে মুক্তি পায়—তাহলে ভক্তির কিবা দাম ?
তোমায় তুলসী সতী দেয় গুঁতো, এক গুঁতোয় বানায় পুতো,
সাজিলে শিলা শালগ্রাম।
যখন গুঁতান কেষ্ট গুঁতোয় তুষ্ট,
আজ হতে নাম হোক তোমার গুঁতারাম ॥
পূর্বে ধরাদেবী কেটে স্তন, তোমায় করায়ে ভোজন,
ব্রজে পায় যশোমতী নাম।
গেল সেই মা তোমার প্রভাস যজ্ঞে—
দ্বারীরা তোলে কেন পিঠের চাম ?
মা'র চেয়ে হল বেশী, রাক্ষসী পুতনা বেটির দাম ॥

## জটায়ু—রাবণ

প্রশ্ন—আমি কবির ভাবে কল্পনাতে জটায়ু পাখি।
আমার বৃদ্ধ বয়স দুর্দিনে, পঞ্চত্ব নিকটে জেনে,
এসে পঞ্চবটী কাননে—নির্জনে থাকি ॥
তোমার ব্যাঘ্রচর্মে কটি আঁটা—
মস্তকে জটা গায় ভস্মরাশি ;
পুণ্য সাজে কে তুমি পাপের কাজেতে প্রয়াসী ?
একটি অবলার ধরে চুলে, বসালে রথে তুলে,
ভয় পেয়ে কাঁদছে রূপসী।
তোমার কি সম্পর্ক বল শুনি—
ঐ ধনি কার কন্যা কার মহিষী ?
জবাব—আমি রাবণ রাজা, রামের সীতাকে হরণ করে নিচ্ছি।

প্রশ্ন—বললে, রামের সীতা হরণ কর নাম ধর রাবণ।
তুমি বীরের বেটা মহাবীর, ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর,
কেন খাল কেটে আনলে কুমির—মরণের কারণ ॥
হল রাম লক্ষ্মণ কি অপরাধী—
কেন দিস শুধু শুধু মনস্তাপ ;
অবলারে কর বল, তোর কি রে হয় না মহাপাপ।
এই যে পূর্ণ লক্ষ্মী জানকী,
জানকীর গুণ জান কি, জান কি শ্রীরামের প্রতাপ ?
কেন গলাতে কলসী বেঁধে, সাধ করে দিতে চাও সাগরে ঝাঁপ ?

জবাব—বোন শূর্পনখার নাক কেটেছে, তাই রামের সীতা হরণ করেছি।

প্রশ্ন—বললে, শূর্পনখার নাক কেটেছে তাইতে করিস জাঁক।
করতে শ্রীরামকে পতি বরণ, কাম জ্বালায় হল অচেতন,
ছিল সম্মুখে ঠাকুর লক্ষ্মণ—কেটে দিল নাক ॥
ও তুই লঙ্কাপুরের অধিকারী—
কি জন্যে এলি অখ্যাতির কাজে ?
ওরে রাবণ তোর বচন, কাঁটার মতন অঙ্গে বাজে।
যদি হতি তুই বীরের সন্তান, করে নিয়ে ধনুর্বাণ,
আসিতি সংগ্রামের সাজে।
করলি রাজা হয়ে নারী চুরি—
সমাজে মুখ দেখাবি কোন্ লাজে ?

## যুধিষ্ঠির—ধৃতরাষ্ট্র

প্রশ্ন—আমি পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির হই, কবির কল্পনায়।
আমি সুসময় কি দুঃসময়, সব সময় ভাবি বিশ্বময়,
আমি বলি এখন যে আশায়—এলেম হস্তিনায়॥
তুমি সম্পর্কেতে জ্যেঠা আমার—
একথা জানতে কারো বাকী নাই ;
কার কাছে কই জ্যেঠা গো—যে কষ্টে ছিলেম পঞ্চ ভাই।
হল পাশাতে সর্বস্ব নাশ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস,
এক বৎসর অজ্ঞাতে কাটাই।
এখন দেশের মানুষ দেশে এলেম—
জ্যেঠা গো আমার বিত্ত আমি চাই॥
জবাব—দুর্যোধন রাজ্যের মালিক, আমি দেবার কে?
প্রশ্ন—নাকি দুর্যোধন হয় রাজ্যের মালিক, আমাকে জানাও।
জ্যেঠা মুখে জানাও সরল ভাব, অন্তরে আছে কপট ভাব,
কেবল কপটেতে রাজ্যলাভ—করতে বুঝি চাও?
বললে, তোরা জানিস তারা জানে—
বাছারে আমি কিছু জানি না ;
নিবার সময় নিয়াছ, দিবার সময় আর পার না।
তোমার বংশের শনি শকুনি, বর্তমান থাকতে তিনি,
সৎপথে যেতে দিবে না।
জ্যেঠা শালা ছাড়, পোলা মার—
নইলে আর বংশের মঙ্গল দেখি না॥

## জীবন ঠাকুর—সনাতন

প্রশ্ন—আমি মানকরেরই সেই জীবন ঠাকুর, তুমি সনাতন।
বাবা বিশ্বনাথের আদেশে, দারিদ্র্য ঘোচাবার আশে,
এসেছি তোমার পাশে—ভিক্ষা চাইতে ধন॥
ছিল মাটির নিচে পরশমণি—
আমাকে দেখাইলে সন্ধানে ;
দেখে তোমার ব্যবহার, আজও আমার সন্দেহ মনে।
যদি স্পর্শমণির পরশ পায়, লোহা সোনা হয়ে যায়,
বিতৃষ্ণা কেন সে ধনে?
তুমি কোন ধনে হয়েছ ধনী—
যার কাছে স্পর্শমণি হার মানে?

জবাব—আমি কোন ধনে হয়েছি ধনী, শুধালে আমায়।
আমার ধনী হতে চায় না মন, হয়েছি শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন,
অপার্থিব প্রেমরতন—লাভের প্রত্যাশায় ॥
আমি দিনভিখারী ভিক্ষা করি—
দিয়েছি অর্থ স্বার্থ বিসর্জন ;
কৃপা করে গৌরাঙ্গ—দেয় যদি ব্রজের প্রেমধন।
করে যবন রাজার দাসত্ব, পেয়েছি বহু অর্থ,
তাতে মোর তৃপ্ত হয় না মন।
তাইতে অনর্থের মূল অর্থ ফেলে—
এসেছি পেতে পরমার্থ ধন ॥

প্রশ্ন—বললে, অনর্থের মূল অর্থ চাই না—পরমার্থ চাই।
তুমি যারে কও অর্থ অর্থ, অর্থেই পায় পরমার্থ,
ধর্ম কর্ম সব ব্যর্থ—অর্থ যাহার নাই ॥
শুনি মরুত রাজা যজ্ঞ করে,—
সে অর্থ ব্রাহ্মণেরে করে দান ;
সেই অর্থে যুধিষ্ঠির রাজ—
অশ্বমেধ করেন সমাধান।
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারটি বর্গের শুনি নাম,
তার মধ্যে অর্থই প্রধান।
তোমার বিগ্রহ যে মদনমোহন,
তিনিও তো ধনীর কাছে অর্থ চান ॥

## দ্রোণ—সাত্যকি

জবাব—কেন একলব্যের আঙ্গুল কাটি সাত্যকি তুই শোন।
বেটা দেখাতে জাতির গুমান, আমাকে করতে অপমান,
শিক্ষা করে ধনুর্বাণ—গড়ে মাটির দ্রোণ ॥
হয় না মাটির কাছে খাঁটি শিক্ষা—
করেছে বাণ চালানো আয়ত্ত ;
আঙ্গুল কেটে না নিলে বুঝত না গুরুর মাহাত্ম্য।
এখন বাম হাতে ধরিয়ে বাণ, সব কিছু করবে সন্ধান,
সে লক্ষ্য হবে অব্যর্থ ॥
দিলেম ধনুর্বেদের মন্ত্রে দীক্ষা—
এই শিক্ষা হল তার গুরুদত্ত ॥

## চাষী—বৈষ্ণব

জবাব—অদ্য তুমি চাষী আমি বসি নামের কীর্তনে।
তোমরা চাষ করে যে ফসল পাও,
তা দিয়ে দেহের খোরাক দাও,
আত্মার খোরাক কোথায় পাও—নামযজ্ঞ বিনে?
জানি শ্যামস্বরূপ সচ্চিদানন্দ—
মহাভাব স্বরূপিণী হল রাই;
যে স্বরূপে ডুব দিয়ে কৃষ্ণ হন গৌরাঙ্গ গোঁসাই।
দ্বারকায় চিকনকালা, করেন ঐশ্বর্যের খেলা,
কলিতে ঐশ্বর্য ভাব নাই।
তাইতে মাধুর্য প্রেম শিক্ষা দিতে—
ত্যাগ ধর্ম নিয়েছেন শচীর নিমাই॥
জবাব—বললে, লাঙ্গল ধরে চাষ কর না গৌরাঙ্গ ঠাকুর।
আমি লাঙ্গল ধরলেম সঙ্কর্ষণ, এ দেহ করিতে কর্ষণ,
করে হরিনামের বীজ বপন—ধরাব অঙ্কুর॥
শেষে অনুরাগ নিড়ানী দিয়ে—
নিড়াব নাংলা জমির জংলা ঘাস;
পাপী পাষণ্ডীয়ারা তারা করতে জানে না চাষ।
পেতে একনিষ্ঠা দমের ফল, গোড়ায় দিব ভক্তি জল,
শ্রদ্ধা গোবরের দিব ফাস।
তবে মধুর প্রে[illegible]র ফল ফলিবে—
আনন্দে বসে খাব বারমাস॥

## রামমোহন বনাম তাঁর মা

প্রশ্ন—আমি কল্পনায় রাজা রামমোহন, তুমি আমার মা।
আমি আসিয়ে রাধানগর, শ্মশানে বাঁধিয়াছি ঘর,
তোমায় পেয়ে বার বৎসর পর—সুখের নাই সীমা॥
তুমি রাজরাজেশ্বর মূর্তি গড়ে—
চোখ বুঁজে ধ্যান কর দিবারাত্র,
দরিদ্র নারায়ণে দেখ না, মেলিয়া নেত্র।
দেখে হিন্দু ধর্মে গোঁড়ামী,
বৈষ্ণব না হয়ে আমি, পড়েছি বেদান্তের সূত্র॥
তুমি কি দোষ ধরে, কোন বিচারে—
আমাকে করিলে ত্যজ্যপুত্র?

জবাব—তুমি সনাতন হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজায় বিরোধী,
তাই তোমাকে ত্যাগ করেছি।
প্রশ্ন—আমি মূর্তিবাদে অবিশ্বাসী, এই নাকি মোর দোষ।
আমি মানি না যে মূর্তিবাদ, এটা কি আমার অপরাধ,
যদি ব্রহ্মানন্দের পেতে স্বাদ, করতে না এ রোষ॥
তোমরা ফুর্তি করে মূর্তি গড়ে—
তার কাছে নৈবেদ্য দাও ভারে ভার;
ভিখারী এলে দ্বারে, তার ঘাড়ে পাদুকা প্রহার।
আছেন সর্বভূতে নারায়ণ, আদিবাসী হরিজন,
কর কেন ছুঁৎমার্গের বিচার।
দেহে না থাকিলে ব্রহ্মানন্দ—
ঘুচবে না বন্ধ মনের অন্ধকার॥

## রাধাবিনোদ—বঙ্কিমচন্দ্র

জবাব—আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট।
তুমি রাধাবিনোদ গোস্বামী, পরলোকে ছিলাম আমি,
আকর্ষণ করে তুমি, বাধালে বিভ্রাট॥
আমি গীতার শ্লোকে ভুল ধরেছি—
যেখানে লেখা ধর্ম সংস্থাপন;
কি এমন করেছি দোষ, কেন রোষ কর অকারণ।
ধর্ম হল সনাতন, ধ্বংস যা হয় না কখন,
তার আবার কি করে স্থাপন;
তাইতে অকপটে স্থাপন কেটে—
আমি লিখেছি ধর্ম সংরক্ষণ॥
প্রশ্ন—বললে, ধর্ম কভু স্থাপন হয় না, আছে চিরদিন।
জানি ধর্ম চির বিদ্যমান, ধর্ম দীপ হয় না কো নির্বাণ,
থাকে অধর্ম গ্লানিতে ম্লান—ধর্ম জ্যোতি হীন॥
থাকলে আলোর কাছে ময়লা মাটি—
হয় না সে আলোর জ্যোতি বিকিরণ;
আলো থাকতে অন্ধকার, হাহাকার করে জীবগণ।
যখন অধর্মের হয় অভ্যুত্থান, ধর্মের জ্যোতি করে ম্লান,
ভগবান আসিয়ে তখন;
করেন অধর্মের নাশ, ধর্মের প্রকাশ—
তারেই বলে ধর্ম সংস্থাপন॥

## মুকুন্দ—রামানন্দ

জবাব—তুমি কল্পনায় মুকুন্দ আমি হই রামানন্দ।
ভেবে বিষয় বিদ্যা অনিত্য,
পড়েছি বৈষ্ণব সাহিত্য,
হরিনাম প্রেমে'হয়ে মত্ত, ভজি গোবিন্দ ॥
তুমি নিজে একজন কালীভক্ত—
তোমাতে আমাতে নাই ব্যবধান ;
তুমি যার কর ভজন, সেও একজন বৈষ্ণবীর প্রধান।
তুমি গানে কও স্বদেশ স্বদেশ,
বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ,
তারাও তো এই দেশের সন্তান।
জীবের অপবিত্র দেহক্ষেত্র—
বৈষ্ণবে চষে করে ফুলবাগান ॥

## আবুল কালাম—জহরলাল

প্রশ্ন—কবির কল্পনাতে হই আবুল কালাম তুমি জহরলাল।
করলে ইন্‌টেরিম গভর্নমেণ্ট, তুমি তার হলে প্রেসিডেণ্ট,
বিনে লীগ-কংগ্রেসে এগ্রিমেণ্ট—দেশের একি হাল !
করলে সোনার বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, জিন্না আর তুমি করে জেদ,
তাতে ভারতবাসীর মনে খেদ, রইল চিরকাল ॥
এদেশ উদ্ধারেশে ব্রতী ছিল—যত পূর্ববঙ্গের সভ্যগণ,
আজ পেয়ে নিজে রাজ্যভার, তাদের আর করলে না স্মরণ ;
হল স্বাধীনতায় অরাজক, অন্নবস্ত্র চিন্তা রোগ,
পালায় সব প্রাণ রক্ষার কারণ ;
একবার পূর্ববঙ্গে এসে দেখ—
তোমার এই স্বাধীনতার সুখ কেমন ॥

## ধুয়া

[ টপ্পা ( প্রশ্ন ) করে বা টপ্পার জবাব দিয়ে কবিয়ালগণ একখানা ধুয়া দেন ( ডাক-ধুয়া ), এবং আসর বন্দনা করে ত্রিপদী ছন্দে ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য বলতে থাকেন। কবিয়াল বক্তব্য পরিবেশনে যে ভাবালম্বন করবেন তার কিছুটা ইঙ্গিত ধুয়াতে পাওয়া যায়। ছড়া-পাঁচালীতে বক্তব্য শেষ করে আর একখানা ধুয়া দিয়ে ঐ ধুয়ার সুরে কবিয়াল কীর্তন-পাঁচালী শুরু করেন। টপ্পা ও ধুয়া পর্যন্ত যদিও বা লিপিবদ্ধ করা যায়, কিন্তু উপস্থিত ছড়া-পাঁচালী এবং যোটের পাল্লা, বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর 'সরকার'দের অনর্গল ছন্দাকারে বক্তৃতা, লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। সংগ্রহ থেকে কয়টি ধুয়া এখানে নমুনা স্বরূপ দেওয়া গেল ]।

১। মন-ভ্রমরা বলি তোরে শোন,—
এমন সুরসের বন ত্যজ্য করে, যাস না বে কুরসের বন ॥

২। কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী—প্রাণ নিল কাড়িয়া গো—
বারণ কর গো তারে যাইয়া ॥

৩। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঘরে—
সিন্ধু পারের তরীখানি নিয়ে গেল চোরে ॥

৪। দিলের গোঁসাই বিনে কে জানে—
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে ॥

৫। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে আবার এসেছি ॥

৬। তোরা আমারে দুষ না সজনী—
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে, গৌরাঙ্গ গুণমণি ॥

৭। অবোধ মন রে আমার, মাইট্যা দেহের গুমান কইর না ॥

৮। আমার মন ত মানে না যাদু রে—আজ তোমার কথা শুনে ॥

৯। তোমরা প্রেম কর রে সুজন রসিক চাইয়া,—
বয়সের কালে করলেম প্রেম, বাড়ইর মাইয়া পাইয়া ॥

১০। হরি বলে ডাকলে পরে, রাখেন হরি রাঙ্গা পায় ॥

১১। অবোধ মন আমার, নিতাইর বাজারে হরি বল ॥

১২। মরি হায় রে হায় এই ছিল কপালে,—
এমন সাধের পাল্লা নষ্ট করল, ভাঙ খাওয়া মাতালে ॥

১৩। কলি ধন্য চৈতন্য হল মানুষ অবতার ॥

১৪। প্রেমের বাতাস লেগেছে যার গায়—
ও তার ঘরে থাকা দায় ॥

১৫। ওমা দুর্গা গো—দুর্গতিনাশিনী—
পতিতে করুণা কর গণেশজননী ॥
১৬। মরি হায়রে হায় কপালে আগুন—
বানরে কামড়াইয়া গেল পালানের বাগুন ॥
১৭। আর কত কাঁন্দিব আমি, পারঘাটায় দাঁড়াইয়া দীনবন্ধুরে—
আমার দিন কি এমনি যাবে বইয়া ॥
১৮। বাজা বেণু সাজা ধেনু, আয় রে কানু বনে যাই ॥
১৯। মনের বনে হরিণটিরে মারলি একটি বাণে রে নিঠুর বেইদে—
আমায় ঘর ছাড়া করিলি শর-সন্ধানে ॥
২০। মন তুই বুঝলি না রে খুঁজলি না রে,
পরশমণি সাধুর বাজারে ॥
২১। হরে কৃষ্ণ হরিনাম, বল রে আমার মন, বদন ভরিয়া রে—
অসাধনে দিন যায় বইয়া ॥
২২। কানার হতে কুড়াল দিও না—গাছের জাম্বুরা থাকবে না ॥
২৩। মরি হায় রে হায় মনোদুঃখেতে মরি—
ভেদা মাছে নষ্ট করল বেগুনের তরকারী ॥
২৪। হারে ঐ শোন বাজে গো বাঁশী—যমুনা পুলিনে ॥
২৫। পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে,—
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
২৬। এই দেশে আর রইতে চায় কি মন—
যে দেশে নাই একতা, নাই কৃষ্ণকথা, সে দেশ অরণ্যের মতন ॥
২৭। দিন গেলে বসে বসে কাঁদবি—
ভবে আসা-যাওয়া কি যাতনা, যাওয়ার কালে জানবি ॥
২৮। প্রেমের ভরা রসের গোরা, গোরা বড় রসিক সুজন ॥
২৯। গোঁসাইরে নি দেখছ গাছতলায়—
ও গোঁসাই লেজ লাড়ে আর খেজুর খায় ॥
৩০। প্রেম করস তো খালই লইয়া আয় লো সুন্দরী ॥
৩১। আগে না বুঝে পিরীত করে যে জনা—
ও তার চক্ষের জলে বালিশ ভেজে, শুইলে ঘুম আসে না ॥
৩২। প্রেমিকেরা বুঝে শুনে প্রেম করিস—
পিরীত করবার কালে রসগোল্লা, ভাঙবার কালে গোল মরিচ ॥

# রঙ ফুকার বা মাল ফুকার

[ রঙ ফুকার বা মাল ফুকার বিপক্ষ কবিয়াল বা তার দলের গায়ক গায়িকাদের লক্ষ্য করে ঠাট্টা বিদ্রূপ, কিংবা গানের উদ্যোক্তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে গাওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মোটা রসের রসিক শ্রোতারাও আদি রসাত্মক রঙ ফুকার করতে সরকার-দের উস্কানি দেয়। তবে বিশিষ্ট ও ভদ্র আসরে এবং নামী কবিয়ালদের কাছে কেউ রঙ ফুকারের হুকুম দিতে সাহস করে না ; আর হুকুম দিলেও দক্ষ কবিয়াল কিভাবে হুকুমদাতাদের ফাঁদে পা না দিয়ে পাশ কেটে যান, নোয়াখালীর কবিয়াল রমেশ আচার্য থেকে প্রাপ্ত রঙ ফুকার কয়টিই (৬-১০) তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তাছাড়া, জীবনী আলোচনা কালেও অনেক রঙ ফুকার সংযোজিত হয়েছে। ]

১। দেখি নকুল সরকার সুকৌশলে,
কয়টা নটী আনলো দলে, যাদুমন্ত্র শিখায়ে,
ওরা নাচে মাজা বাঁকায়ে।
সবাই বলে নকুল নকুল, কেউ ধরে নকুলের ভুল,
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল,
নটীর নাচনা দেখায় ॥

জবাব—মিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে,
ঠাট্টা করে গেলি মোরে,
নটী নিয়ে কবি গায় ;
আছে নটীর মান্য এ ধরায়।
ব্রজ রসের পরিপাটি, কৃষ্ণ নট আর রাধা নটী,
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী কপালকুটি—
প্রণাম দেয় সেই নটীর পায় ॥

২। দেখি ঐ দলের রাঙা যামিনী,
নূতন দল করেছেন তিনি, পুরাণ লাগে না ভাল ;
তাইতে নূতন 'সরকার' জোটালো।
দলে দুইটা ছুকরী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে,
থাকে ছোকরা 'সরকার' পাছে পাছে—
সভাটা করলো আলো ॥

জবাব—বললে, যামিনী বেশ দল করেছে,
ছোকরা সরকার ছুকরীর পাশে,
সভা আলো করেছে।

এলোকেশীর এলো চুলে, শরৎ বাবু গেছেন ভুলে,
তাইতে ছোঁড়া সাজতে বুড়া কালে,
কচি সাল্‌সা ধরেছে ॥
৩। দিলি শালা বলে গালাগালি—
তাই শুনে মনে ব্যথা পাই,
দুঃখ বলব কি বোনাই।
লোকে কয় বোন থাকিলে,
শালা হয় বিয়ে দিলে,
কিন্তু শালাকে যে শালা বলে—
তার মতো ছোট লোক আর নাই ॥
৪। খাওয়াইল আ-বাইছ্যা খই,
জনে আড়াই তোলা দই,
কাণ্ডটা হল কি অদ্ভুত ;
দিযে দই টেপা টেপা পাতে পাতে—
পলাইল কালীচরণ শীলের পুত।
চুকা চুকা রাবগুড় যত—
ঠিক যেমন পিত্তজ্বরের মুত ॥
৫। সন্ধ্যারানী ইন্দুর মেয়ে,
নতুন না' এর পুরান নেয়ে,
বুড়া রমেশ নাইয়া হয়ে,
চিপা দাঁড়ায় লগি বায় ॥
জবাব—বললে, চিপা দাঁড়ায় আমি নাকি মরছি লগি বাই।
তুমি নডবড় নৌকার বুড়া নাইয়া,
হালে পানি না পাইয়া,
মরছ তুমি দাঁড় বাইয়া,—
লগি মারার হিম্মৎ নাই ॥
৬। আছে কবিগানে রঙের ফুকার,
কারো কারো মনের বিকার ,
স্বীকার পাই সভার কাছে ;
তারা ফুকারের শীকার আছে।
নাইনটিন্‌ থার্টি নাইন ইয়ারে,
নাৎসী নেতা হের হিটলারে,
দারুণ কাল যুদ্ধ ঘটাবার পরে,—
বদ রঙের দর বেড়েছে ॥

৭। রঙের ফুকার করবার তরে,
কেহ কেহ সভার ধারে,
হুকুম করে করতে রঙ,
পড়লেম পত্রিকাতে রঙ বেরঙ।
আমি কি রঙ করতে জানি,
কেমন করে রঙে জিনি,
আমার বিপক্ষেতে সরকার যিনি,—
খুনি রঙের দুনি রঙ ॥

৮। আবার রঙের ফুকার করবার জন্য,
কেহ হইয়া অগ্রগণ্য,
করতে কয় ফুকারে ফাইট ;
কিন্তু আমার নাই সে রঙের আঁইট।
অসৎ রঙ করি যদ্যপি,
অপযশ হয় সর্বব্যাপী,
আমি ক্ষুদ্র কেরোসিনের কুপি,
বিপক্ষ হয় হ্যাজাক লাইট ॥

৯। বাবু কাল চুল হয়েছে সাদা,
শুংটি হল কাঁচা আদা,
আমি গাধা চিরকাল ;
নাইকো আমার ভিতর রঙের মাল।
যা করেন সেই কমলাক্ষ,
ফুকারেতে করি লক্ষ্য,
যে জন অদ্যকার সরকার বিপক্ষ,—
তিনি হলেন রঙ দুলাল ॥

১০। করতে রঙের ফুকার কর্তৃপক্ষে,
আজ দেখি সভার সমক্ষে,
আদেশ দিলেন রমেশে ;—
আমি রঙ করব কি উদ্দেশে।
দাঁড়ায়ে সভার ভিতর,
অসৎ রঙে চিত্ত কাতর,
বাবু, কালগুণে কেরোসিন আতর,—
ইক্ষু রস খায় বায়সে ॥

# পরিশিষ্ট

## [ কবিয়ালদের জেলাওয়ারী নাম-ধাম]

### ঢাকা

| | |
|---|---|
| রামকুমার সরকার | ভাওয়াল |
| ভৈরব মজুমদার | জয়পাড়া |
| হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী | ডোকাদি |
| ভগবান আচার্য | পলাশ |
| বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী | পারুলিয়া |
| রাইচরণ সূত্রধর | কালিয়াকুড় |
| চন্ডী ঠাকুর ( আচার্য/গণক ) | মাওয়া |
| হরিচরণ আচার্য | নরসিংদি |
| কানাই মালী | কুকুটিয়া |
| অম্বিকা পাটনী | বেণুপুর |
| জ্ঞানেন্দ্র পাটনী | ঐ |
| জয় হরি (কৃষ্ণ গোপ) | গালকান্দাইল |
| গঙ্গাচরণ আচার্য | রাজাদি |
| পঞ্চানন আচার্য | আলগী |
| রামকানাই আচার্য | ঐ |
| নীলমণি চক্রবর্তী | ভুলতা |
| রামকানাই সরকার | বিক্রমপুর |
| দেবেন্দ্রকুমার সরকার ( দাস ) | হাসারা |
| মদন সরকার ( শীল ) | রাজখাড়া |
| পূর্ণচরণ সূত্রধর | কালিয়াকুড় |
| ( বড় ) হরি সরকার | |
| ( ছোট ) হরি সরকার | |
| নিশি সূত্রধর | কালিয়াকুড় |
| প্রহ্লাদ সরকার | নরসিংদি |
| দ্বারিকা সরকার | কালিয়াচাপড়া |
| মনোরঞ্জন ঠাকুর (চক্রবর্তী) | দয়াগঞ্জ |
| মধুসূদন সাহা | রহিমাবাজ |
| মোহনবাঁশী কর্মকার | রাজখাড়া |
| হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী | জিনারদি |
| রেবতী ঠাকুর | কামারকান্দা |
| সর্বানন্দ আচার্য | সাধারচর |
| হরিমোহন আচার্য | |
| রসিক আচার্য | |
| কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | তস্তর |
| মহেশ ঠাকুর | |
| মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| ক্ষিতিমোহন কর্মকার | হাসারা |
| কানাই সরকার | ঐ |
| পাঁচকড়ি সরকার | |
| মহেশ মালী | |
| অবিনাশ সরকার | যাত্রাবাড়ী |
| বৃন্দাবন ঠাকুর | লক্ষ্মীবিলাস |
| কুমুদরঞ্জন সরকার | কুসুমহাটি |
| উপেন্দ্র সরকার ( কপালী ) | |
| মাখন সরকার ( বসাক ) | বোয়ালিয়া |
| ধীরেন সরকার | ঐ |
| রূপ বৈরাগী | রূপগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| রাজমোহন সরকার | | কাঙ্গালী সরকার | নান্দীপাড়া |
| রাজেন্দ্র ভুঁইমালী | বিক্রমপুর | বিহারী সরকার | |
| হরেন্দ্র সরকার | মাণিকগঞ্জ | মুকুন্দ চক্রবর্তী | কালিয়াকুড় |
| লোকনাথ সরকার | ” | গোপাল শীল | রাজখাড়া |
| ভাসানী সরকার | ” | বলাইদাস বৈরাগী | চরসিন্ধু |
| সহদেব সরকার | ” | কালীমোহন সরকার | পারুলিয়া |
| কাশীনাথ সরকার | ” | শ্রীতারিণীচরণ সরকার | মাসাব |
| দেবেন্দ্র দাস | জারিয়া | শ্রীঅমূল্যরতন সরকার | গাংডুবি |

### ময়মনসিংহ

| | | | |
|---|---|---|---|
| লোকনাথ চক্রবর্তী | কাশীপুর | সর্বেশ্বর আচার্য | |
| লোচন কর্মকার | আমতলা, নেত্রকোনা | হরিহর আচার্য | বিরুনিয়া |
| হারাইল বিশ্বাস | চাইরগাতিয়া | কালীচরণ দে | আইথর, |
| চণ্ডীপ্রসাস ঘোষ | তারাচাপুর | শক্তিরাম কপালী | কাশীপুর |
| দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ | ঐ | শম্ভু জেলে | |
| কানাই নাথ | দগদগা | পরাণ কর্মকার | |
| বলাই নাথ | ঐ | রামদয়াল নাথ | |
| হরেকৃষ্ণ নাথ | ঘাটাইল | হরচন্দ্র চক্রবর্তী | |
| ছাড়ু নাথ | সত্রশির | গোবিন্দ আচার্য | রামেশ্বরপুর |
| রামনাথ ভুঁইমালী | আউটপাড়া | কৃষ্ণমোহন মালী | |
| রামগতি শীল | গাঙ্গাইল | কৃষ্ণমোহন দে | |
| রামকানাই ভুঁইমালী | | কালীকুমার ধর | বেতাটি |
| রামজয় | | ঈশান দত্ত | গোবিন্দপুর |
| রামসুন্দর আচার্য | | কিঙ্কর শীল | রামেশ্বরপুর |
| রামকানাই নাথ | | শক্তিরাম | |
| মগল সাহা | | মহেশ | |
| সাধু মিয়া ( সাধুচরণ সরকার ) | | নিতাই | |
| মধু মিয়া | | উপেন্দ্র | |
| লাল মামুদ | | কালাচাঁদ | |
| বিজয়নারায়ণ আচার্য | নেত্রকোণা | কৈলাস শীল | |

| | |
|---|---|
| তারাচাঁদ ( অন্ধ কবি ) | বৃন্দাবন |
| গৌরী ঠাকুর | কালীমোহন |
| অর্জুন ধুবী | দীননাথ দাস |
| দ্বারকা ঠাকুর | ভারত |
| জগৎ আচার্য | দয়া ধুবী |

## ফরিদপুর

| | | | |
|---|---|---|---|
| বেচারাম সরকার | | গঙ্গাচরণ সরকার | বাটিকামারী |
| ঈশ্বর বালা | গোহালা | মহিম শীল | গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী |
| তারিনীচরণ চট্টোপাধ্যায় | | মহেন্দ্র শীল | ঐ |
| আনন্দ সরকার | দুর্গাপুর | দেবেন্দ্র শীল | ঐ |
| হরিবর সরকার | ঐ | মাধব সরকার ( মুসলমান ) | ঐ |
| মনোহর সরকার | ঐ | যাদব সরকার ( গুহ ) | |
| মথুরানাথ বালা | গোহালা | বিন্দু বৈরাগী | কোটালীপাড়া |
| মদন বালা | ঐ | রজনী সরকার ( বড় ) | পাঁচ আইল |
| কোদাই বালা | ঐ | রজনী সরকার ( ছোট ) | নিজড়া |
| পরীক্ষিৎ বালা | ঐ | অধরচাঁদ সরকার | উজানচর |
| গোবিন্দ বালা | ঐ | বসন্ত ররকার | পীরের পাড় |
| জলধর ঠাকুর | বান্দাবাড়ী | শশী সরকার | ঘাগোর |
| হীরালাল | রাজবাড়ী | অম্বিকা সরকার | ভাঙ্গা |
| মতিলাল | ঐ | নিবারণ সরকার | গোপালগঞ্জ |
| ইসমাইল কারিগর | গোয়ালন্দ | চন্দ্র সরকার | ঐ |
| জইনদ্দি সরকার | গঙ্গানগর | রাজেন্দ্র সরকার | কোটালীপাড়া |
| বিষ্ণুবর সরকার | জিকাবাড়ী | চন্ডী জোলা | |
| ষষ্ঠীবর সরকার | গোলাবাড়ী | নিবারণ মাঝি | |
| কামিনী সরকার | কুড়ালতলা | ( পাগলা ) যাদব | |
| বরদাকান্ত সরকার | বোয়ালমারী | কালীপদ সরকার | |
| অম্বিকা সরকার | বাটিকামারী | আদিত্য সরকার | |
| রাসবিহারী সরকার | জানদী | নিত্য গোপাল | |

| | |
|---|---|
| বিনয় সরকার | সাতপাড় |
| নারায়ণচন্দ্র বালা | গোহালা |
| হরষিৎ ভট্টাচার্য | ডালিনা |
| শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য | ডালিনা |
| শ্রীনিশিকান্ত সরকার | ভৈরবনগর |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার | কান্দী |
| শ্রীনিবাস সরকার | ঐ |

## বরিশাল

| | |
|---|---|
| গোবিন্দ মালী | বাড়তি |
| ভারত শীল | নবগ্রাম ( গরঙ্গা ) |
| কুঞ্জবিহারী দত্ত | রঘুনাথপুর |
| শরৎ বৈরাগী | ঝালকাটি |
| উমেশ শীল | নবগ্রাম ( গরঙ্গা ) |
| চন্দ্রকান্ত দাস | উঃ সাহাবাজপুর |
| প্রসন্ন নলি ( সরকার ) | গোবিন্দপুর |
| রামরূপ আচার্য | উঃ সাহাবাজপুর |
| হরি কপালী | ঐ |
| রামসুন্দর আচার্য | ঐ |
| পরাণ আচার্য | ঐ |
| খগেন্দ্র দাস | গোলকপুরা |
| কামিনী ঠাকুর | মুন্সীরহাট |
| রাধাকান্ত সরকার | ঝালকাটি |
| মনোমোহন সরকার | বাতুয়া |
| মঙ্গল সরকার | চর কালে খাঁ |
| গোপাল সরকার | মেমানিয়া |
| উপেন্দ্র দাস | বাওনাচিতনা |
| শ্রীনাথ দাস | কামারচিড়া |
| নিশি অগ্রদানী | গাড়ুলিয়া |
| ষষ্ঠীচরণ করাতী | গাভা |
| লালু নন্দী | সুন্দরকাটি |
| অশ্বিনী সরকার | বল্লভপুর |
| নিবারণ সরকার | |
| রাখাল ঠাকুর ( আচার্য ) | |
| প্রকাশ শীল | |
| অনন্ত সরকার | তারাবুনিয়া |
| সিদ্ধেশ্বর সরকার | |
| কুসুম কুমারী | ঝালকাটি |
| হরিচরণ নাথ | হিজলতলা |
| নকুলেশ্বর সরকার | ঝালকাটি |

## ত্রিপুরা

| | |
|---|---|
| জয়চন্দ্র মজুমদার | পাইকপাড়া |
| জগবন্ধু দত্ত | ঐ |
| গৌর সরকার ( গোলক ) | খলিলপুর |
| মহেন্দ্র সরকার ( ধুপী ) | ঐ |
| গোবিন্দ সরকার ( ধুপী ) | ঐ |
| হরকুমার শীল | হোসেনপুর |
| রামচন্দ্র মাষ্টার | কুড়পাই |
| অনঙ্গ সরকার | ঐ |
| অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ | আন্দিকুট |
| কানাই নাথ | |
| কৃষ্ণধন সরকার | |
| ভগবান সেন | |

| | |
|---|---|
| বৈষ্ণবচরণ দাস | সাঁইতলা |
| দুর্গাচরণ সরকার | ভাসখলা |
| চৈতন্য শীল | সকুদি |
| শচীন্দ্র শীল | ঐ |
| কালীকুমার দত্ত | চালতাতলী |
| হেমকুমার দত্ত | ঐ |
| উদয় ঠাকুর | ধানুকা |
| নগরবাসী শীল | খাগারতা |
| রজনী শীল | ঐ |
| গুরুচরণ সরকার | দোললাই |
| রজনী দে | খোলামুড়া |
| ভগবান দে | পিওর |
| জগৎ ঘোষ | পিওর |
| শশী দে | ঐ |
| শঙ্কর আচার্য | দারোগা |
| কামিনী শীল | বাকিলা |
| নিকুঞ্জ বণিক | |
| জগদীশ দে | ছাপাড়া |
| হরিমোহন আচার্য | বাজেয়াপতি |
| যোগেশচন্দ্র সরকার | ফরকাবাজ |
| রাইহরণ সরকার | ভাসখলা |
| শ্রীকালশশী চক্রবর্তী | বাবুরহাট/ এনাতনগর |

## নোয়াখালী

| | |
|---|---|
| ধর্মনারায়ণ রক্ষিত | দেবপাড়া |
| গুরুচরণ রক্ষিত | ঘাটলা |
| কালীকুমার দে ( মাষ্টার ) | বচৈর |
| কাশীনাথ নট্ট | মহেশদিয়া |
| তারিনীচরণ নট্ট | কল্যাণপুর |
| ভগবতী ভূঁইয়া | রামদি |
| তারক পণ্ডিত | ওগলি |
| রমেশচন্দ্র আচার্য | শিবপুর |
| অক্ষয় আচার্য | পাইনালা |
| চন্দ্রকান্ত আচার্য | |
| অম্বিকা লোধ | করটখিল |
| বিপিন সরকার | করপাড়া |
| বসন্ত লোধ | ঢলটা |
| সারদা সরকার | দত্তপাড়া |
| সুরথ সরকার | ঐ |
| নগেন্দ্র নট্ট | আলমপুর |
| সুবল ভট্ট | সুলতানপুর |
| আনন্দচন্দ্র দাস | চরবদু |
| যোগেন্দ্র দাস | ঐ |
| গোপাল নট্ট | বিষ্ণুপুর |
| জ্যোতিন্দ্র গণ | ধর্মপুর |
| মহেন্দ্র মজুমদার | সোমপাড়া |
| অন্নদাচরণ নট্ট | নরোত্তমপুর |
| বঙ্গচন্দ্র নট্ট | বিষ্ণুপুর |
| যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট | ইন্দ্রপুর |
| নন্দকুমার দাস | চরবদু |
| শ্রীরাম দাস | ন্যায়মস্তি (সন্দীপ) |
| প্রাণকৃষ্ণ দাস | হুদ্রাখালী (ঐ) |
| অন্নদা সরকার | |
| নরহরি সরকার | |

## খুলনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| মহিমচরণ সরকার | কাটাদুরা | রসিকলাল বৈরাগী | মালগাজী |
| মথুর দেবসরকার | লালচন্দ্রপুর | বিপিন সরকার | খণ্ডগ্রাম |
| বিধুভূষণ দেবসরকার | ” | অক্ষয়কুমার সরকার | বলাবুনিয়া |
| নদেরচাঁদ সরকার | বৈঝাকি | প্রিয়নাথ সরকার | চালনা |
| নদেরচাঁদ সরকার | বোড়াশির | রাজেন্দ্র সরকার | বসুরাবাদ |
| রসিক ঠাকুর | ডোয়াতলা | গৌরচন্দ্র সরকার | কাইনমারী |
| পুলিন সরকার | ” | আদ্যনাথ ঠাকুর | পাঁচপাড়া |
| হরিবর সরকার ( ছোট ) | বড়ীরডাঙ্গা | রাইচরণ সরকার | ডোবা |
| দ্বিজবর সরকার | ” | বেণীমাধব সরকার | আজোপাড়া |
| শরৎ সরকার | | রামবরণ সরকার | কাথলী |
| হরমোহন সরকার | | দুর্গাচরণ সরকার | জয়ডিহি |
| রামদয়াল ধুপী | | কালীচরণ সরকার | মান্দারতলী |
| নেপাল ধুপী | | জলধর পাটারী | রামজীবনপুর |
| মাখন সরকার | | রাজেন্দ্রনাথ সরকার | চুনখোলা |
| পরেশ সরকার | | শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার | চুনখোলা |
| পূর্ণচন্দ্র সরকার | | শ্রীস্বরপেন্দু সরকার | |

## যশোহর

| | | | |
|---|---|---|---|
| তারক কাড়াল | জয়পুর | অবিনাশ পাটনী | |
| রাসমোহন দাস | | অধর মালো | |
| সূর্যকুমার চক্রবর্তী | দেবীপুর | বিনোদ সরকার ( বড় ) | |
| কালীচরণ দাস | আউড়িয়া | বিনোদ সরকার ( ছোট ) | |
| অক্ষয়দাস বৈরাগী | | পুলিন সরকার | কোদ্‌রা |
| রাইচরণ মালো | হাড়িয়াঘোপ | যোগেন্দ্র শীল | যোগনিয়া |
| রসময় মালো | | কিরণ শীল | ” |
| পঞ্চানন দত্ত | | রাজেন্দ্রনাথ সরকার | ” |
| দ্বারিক জেলে | | বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী | ডুমদি |
| বৃন্দাবন মালো | খৈলসা | রসিকলাল সরকার | |

## শ্রীহট্ট

| | | | |
|---|---|---|---|
| যামিনী দত্ত | | হরি পাট্‌নী | |
| ঈশান দত্ত ( পাঠক ) | হবিগঞ্জ | বিপিন পাল | |

## চট্টগ্রাম

| | | | |
|---|---|---|---|
| রমেশচন্দ্র শীল | গোমদণ্ডী | চিন্তাহরণ | |
| মোহন বাঁশী | | | |